শত পাপিয়ার চিত্তহারা তান,
শত কোকিলের সঙ্গীত তুফান,
শত ভ্রমরের ললিত আহ্বান,
উঠিছে গুঞ্জরি।
দোল পূর্ণিমায় নব বৃন্দাবনে,
আনন্দ যমুনা উথলে যেমনে,
বহে চারিধারে চিত্ত ব্রজবনে
উৎসব লহরি!
কে যেন রে আজি ঘুচাইয়া রাতি,
জ্বালিয়া দিয়াছে শত মোমবাতি!
ফানুশে, ঝালরে, আলোকের ভাতি
হের চারিধারে!
জোনাকির শ্রেণী, তরুশিরে শিরে,
কে যেন রে, চুপে, বসাইল ধীরে!
দেয়ালী উৎসবে, জ্বালিল নীরবে
দীপ্ত দ্বারে দ্বারে!

৫

ফুলমালা দিয়া, ফুলের তোড়া,
আজি এ মন্দিরে সাজাব মোরা!
রোগ, শোক, দুঃখে, দিয়ে মহাফাঁকি,
যে ভাষার শব্দে "মা" বলিয়া ডাকি,
মাতৃরূপা সেই ধাত্রী জননীরে,
প্রয়াগের বঙ্গসাহিত্য-মন্দিরে,
বসায়ে আসনে এস করি পূজা!
আশ্বিনে যেমতি বঙ্গে দশভূজা
পান মহাপূজা—কুসুমে, কুসুমে,
ভরি দাও গৃহ সর্জ্জরসধূমে!

৬

বঙ্গভ্রাতৃগণ, কোথা তব শিক্ষা?
বল বঙ্গ কোন্ গুরুগৃহে দীক্ষা
পেয়েছিলে? বল কোন্ মন্ত্রবলে
জাগালে ইহারে? পড়ি ভূমিতলে
চৈতন্যবিহীনা, সুষুপ্তি মগনা,
কাঙ্গালিনী সমা, বিপদ বিপন্না,
ছিল যেই মম মানসী সুন্দরী,
তার কর্ণে ঢালি কি সুধা লহরী
জাগাইয়া দিলে? দেহধূলি ঝাড়ি,
পরাইয়া দিলে বারাণসী সাড়ি!
মধুর বচনে ঘুচাইয়া ভীতি,
ভালে দিলে এর মোহনীয়া সিঁতি,
চিকন কৌশলে চরণে বাজিছে
নূপুর শিঞ্জিনী, কটিতে নাচিছে
রজত কিঙ্কিণী!—কোন্ সে ভূষণে?
কোন নন্দনের পুষ্প আভরণে
করিলে ইহারে ত্রিলোক সুন্দরী?
এ চিরদুঃখিনী হাসিছে আমরি,
পুরাকালে যথা পরীরাজ্য দেশে,
স্বর্ণকাটি স্পর্শে, সুপ্ত কন্যা হেসে,
উঠেছিল জাগি! অহল্যা পাষাণী
শাপান্তে যেমতি নারীকুলরাণী
হইয়া, দাঁড়াল মহিমা-গৌরবে,
রামচন্দ্র পাদপদ্মের সৌরভে।

৭

বঙ্গভ্রাতৃগণ! কোথা এই মন্ত্র
শিখেছিলে? বল, কোন প্রভাযন্ত্র

ঘুরাইয়া, তব অঙ্গুলি-কৌশলে;
আঁধার দৈত্যেরে তাড়ালে স্বদলে ?
চক্রে চক্রে, হের, পলাইয়া যায়
অবুদ্ধি বাদুড় !—নব উষাপ্রায়
গোলাপি আলোক হের কিবা ভায়
মধুর কিরণে ? ভক্তির উৎপল
ভাতিছে, হাসিছে জ্ঞান শতদল !

৮

ওহে যাদুকর, তোমাদের এই
মহিমা প্রদীপ্ত প্রভা শক্তিময়ী
কোন্ যাদু জানে ? কি প্রলেপ দানে,
মোহজাল মম নয়ন হইতে
দিলে সরাইয়া ? হের আচম্বিতে,
দিব্যচক্ষু আজি পাইয়াছে দাস !
কোথা হ'তে আজি দেবের উল্লাস
ছাইল পরাণে !—তোমার, আমার,
ইঁহার, উঁহার, হের চারিধার,
সমবেত এই মণ্ডলিমাঝার,
নাহিক শরীর !—অশরীরী সাজে
সকলের আত্মা সহাস্যে বিরাজে !
হের দেখ দৃশ্য—একি আচম্বিতে,
এই শত আত্মা দেখিতে দেখিতে,
এক হয়ে গেল, জলে জল যেন,
দীপে দীপ যেন, পারদের হেন !
এক মাত্র আত্মা দাঁড়ায়ে সম্মুখে !
মুখে হাসি নাই, কাঁদে অধোমুখে !

৯

চীরগ্রন্থীবাসা যেন নলরাণী
বিজন বিপিনে ! যোড় করি পাণি
দুয়ারে দাঁড়ায়ে যেন ভিখারিণী !
আকুল কুন্তলা, লুণ্ঠিত অঞ্চলা,
ঘোর শোকাকুলা যেন উন্মাদিনী !
তমসার তটে যেন আকুলিতা
সদ্য নির্ব্বাসিতা রাজবধূ সীতা !

১০

দ্রৌপদীর সম ফুকারি ফুকারি,
ডাকে, শোন, উচ্চে এই বরনারী !
"এস গো শ্রীহরি, এস গো শ্রীহরি,
বস্ত্রধরি টানে, মোর চির অরি,
শনৈশ্চর দুঃশাসন !
প্রবাসী বঙ্গের ভাগ্যলক্ষ্মী আমি,
এ বিপদে রক্ষ, হে অন্তরযামি,
চিরলজ্জা নিবারণ !"

১১

হের বঙ্গবাসি, হরি দয়াময়,
এই রঙ্গভূমে ঐ যে উদয় !
নীরদবরণ, পীতাম্বর বাস,
মুকুন্দ, মুরারি, মুখে মৃদুহাস,
শত লজ্জা বস্ত্রে দুঃখিনীর অঙ্গ,
ঢাকিছেন ওই ললিত ত্রিভঙ্গ !
দূরে গেল ভয়, ঘুচিল সংশয়,
হাসে ওই বীরাঙ্গনা।

কি সুন্দর বস্ত্র! এ সাটীর নাম
"একতা" ও "ঐক্য"; ও সাটীর নাম
"সত্যব্রতে বীরপণা"।

১২

এ সাটীর নাম "প্রীতি ভালবাসা"
ওই দুই চেলি "উৎসাহ ও আশা"!
এ বস্ত্রটি "দয়াময়ী"
এই ক্ষৌমবাস "ধর্ম্ম" নাম ধরে।
হিরন্ময়ী দ্যুতি যাহা হ'তে ঝরে!
সুন্দর "অহিংসা" ওই!

১৩

বঙ্গ ভ্রাতৃগণ! দেখিতে দেখিতে,
বঙ্গভাগ্য লক্ষ্মী একি আচম্বিতে
সাজিল মোহিনী সাজে।
শ্রী হস্তে শোভিছে কি লীলা কমল!
শ্রবণে দুলিছে কি দিব্য কুণ্ডল!
অধরেতে হাসি, বাক্যে সুধা রাশি
রূপরাশি অঙ্গে রাজে!

১৪

বুঝেছ'ত ভাই? একতার বলে
ভাগ্য লক্ষ্মী সুধু হাসে ধরাতলে!
একতার বলে ভূমণ্ডল টলে!
সে একতা কিসে আসে?
তোমরা পবিত্র, তোমরা বিদ্বান,
আমি ঘোর পাপী পাষণ্ড অজ্ঞান,
আমি কি বুঝাব তাহার সন্ধান!
ভয়ে কাঁপি, মরি ত্রাসে!

১৫

উপদেশ দিব সে ধৃষ্টতা নাই,
পুণ্য কথা কব, নাহি সে বড়াই।
স্বর্ণ মুষ্টি কোরো, এই ভস্ম ছাই,
তোমাদের নিজ গুণে!
সে একতা আসে সুধু ধর্ম্মবলে,
সুধু পুণ্যবলে ভূমণ্ডল টলে!
অসাধ্য সাধন হয় মহীতলে,
সুধু হরিনাম গুণে।

১৬

একথা নিশ্চয়, একথা নিশ্চয়,
খাঁটি স্বর্ণরেণু এই কথাচয়,
যথা ধর্ম্ম তথা জয়!
একবার তবে বঙ্গবাসী ভাই,
ভুলি আত্মপর, আলাই বালাই,
মান, অপমান, দীনতা, বড়াই
বল "হরি-দয়াময়"।

১৭

প্রবাসী বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করি,
ডাক আজি উচ্চে "হরি, হরি, হরি,"
কি ভয়? কি ভয়? বল "জয়, জয়"!
প্রবাসে, তুফানে, কি ভয়, কি ভয়?
বিপদে কাণ্ডারী হরি!
একবার সবে, আকুল উৎসবে,
গাও হরিনাম, জয় হরি রবে,
উচ্চ কণ্ঠে, প্রাণ ভরি!

১৮

আমরা আজিকে পেয়েছি টের,
জগতে শুধুই নামের ফের!
কেটেছে আজিকে মোহের ছেদ,
পিতাতে মাতাতে নাহিক ভেদ!
যেই নারায়ণ সেই সে ভারতী!
জয় জয় হরি, জয় সরস্বতী!
ফুল মালা দিয়া, ফুলের তোড়া,
আজি এ মন্দিরে সাজাব মোরা!
রোগ, শোক, দুঃখে, দিয়ে মহালোক,
যে ভাষার শব্দে "মা" বলিয়া ডাকি,
মাতৃরূপা সেই ধাত্রী জননীরে,
প্রয়াগের বঙ্গ সাহিত্য-মন্দিরে,
বসায়ে আসনে, এস করি পূজা!
আশ্বিনে যেমতি, বঙ্গে দশভুজা
পান মহাপূজা—সর্জ্জরস ধূমে,
ছেয়ে ফেল গৃহ কুসুমে কুসুমে!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

পারস্য ভাষা ও সাহিত্য।

পারস্য ভাষা পণ্ডিতদিগের দ্বারা চিরকাল প্রসংশিত হওয়া সত্ত্বেও সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত হয় নাই, কেহ বা দায়ে পড়িয়া কেহ বা সখ করিয়া ইহার চর্চ্চা করিয়া থাকেন। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে পারস্য ভাষা পৃথিবীর অন্য সকল ভাষা অপেক্ষা শ্রুতিমধুর, এমন কি পুরাতন প্রভেন্সাল এবং আধুনিক ইতালীয় ভাষা এ বিষয়ে ইহা অপেক্ষা হীন। নির্ঝরিণীর জলস্রোতের ন্যায় ইহা অবিরল তরল মধুর সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। ভালবাসার কথা বলিবার জন্যই যেন ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল—এমনি ইহার মধুরতা! ইহার সাহিত্যভাণ্ডার বহুবিধ ইতিহাস, জীবন চরিত, দর্শন এবং কাব্যরত্নে পরিপূর্ণ। এ ভাষার ব্যাকরণ অতি সহজ এবং এত অনায়াসে আয়ত্ত করা যায় যে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য মনে হয় কেন এ দেশে এ ভাষার আরো অধিক চর্চ্চা নাই! সমগ্র মধ্যএসিয়ার সভ্যসমাজে ও ভারতবর্ষের মুসলমান

প্রজাবর্গের মধ্যে এই ভাষা ব্যবহৃত হয়—ইহা হইতেই সহজে অনুমান করা যায় এই ভাষার অভিজ্ঞতা কত কাজে লাগিতে পারে। সীমান্তবাসী পাঠানগণ এবং রুষ অধিকৃত খানেটের টার্কোমানগণ ইহা সহজে বুঝিতে পারে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে পারস্য ভাষার উৎপত্তি, গঠন ও পরিপুষ্টি সম্বন্ধে আলোচনার আবশ্যক নাই, পণ্ডিত মহোদয় সার উইলিয়াম্ জোন্স সর্ব্ব প্রথমে ইংরাজী ভাষায় এই বিষয়ের সবিস্তারে সুদক্ষ আলোচনা করিয়াছিলেন—সম্প্রতি আরো অনেকে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করায় জনসাধারণকে আর বড় কিছু নূতন কথা বলিবার নাই। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাসকলের মধ্যে পুরাতন পারস্যভাষা কিরূপ স্থানের অধিকারী হইবার যোগ্য তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন।

প্রাচীন ইরাণ রাজ্য আফগানিস্থান, পারস্য, তুরস্ক এমন কি ভূমধ্যসাগরের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং কাইয়ান রাজবংশের অধীনে এই সুবিস্তৃত রাজ্য সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্দারের হস্তে পতিত হইয়া ইহার সৌভাগ্যশ্রী নষ্ট হইয়া যায়। সকলেই জানেন আলেকজান্দার মত্ত অবস্থায় কোন অসৎ নারীর প্ররোচনায় পারস্য রাজধানী ধ্বংস করেন। সাধারণতঃ সকলেরই বিশ্বাস আরবজাতীয়েরা ঈর্ষাবশতঃ ইরাণী সাহিত্য নষ্ট করে,—যথার্থতঃ তাহা আলেকজান্দার কর্ত্তৃক প্রজ্জলিত অগ্নিতেই ভস্মীভূত হইয়াছিল। পার্থিয়ানবংশীয়েরা অধিকার করিয়া সেলুসিডিরদিগকে নির্ব্বাসিত করেন—তাঁহাদিগের রাজত্বকালে দেশে কিছুকালের জন্য শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল, সাসানবংশীয়েরা সিংহাসনাধিরোহণ করিলে আবার রাজ্যে পূর্ব্ব সৌভাগ্য ফিরিয়া আসিয়াছিল। সুদীর্ঘ চারিশত বৎসর কাল এই রাজগণ অসীম ঐশ্বর্য্য এবং প্রবল

প্রতাপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন—রোমের দিগ্বিজয়ী সৈন্যগণও ইঁহাদিগের নিকট বারম্বার পরাস্ত এবং তাড়িত হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানগণ পারস্য রাজ্য অধিকার করেন। বিদ্বেষী সমালোচকগণ আক্রমণকারীদিগের ধ্বংসপ্রবৃত্তির বহুবিধ নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন, এই আক্রমণকালেই পারস্যের কীর্ত্তিকলাপ লোপ পাইয়াছে এইরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু একজন দার্শনিক ফরাসী পণ্ডিত এই সকল বিরুদ্ধবাদের অমূলকতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। যে সুদীর্ঘকাল আরবীয় এবং পারসিকদিগের সংগ্রাম চলিয়াছিল তাহাতে আশা করাই অন্যায় যে কোন প্রকার ক্ষতি হয় নাই। পুরোহিতদিগের উত্তেজনায় পারসিকগণ প্রায়ই বিদ্রোহী হইত, এবং ধর্ম্মস্থান অগ্নিমন্দিরগুলি বিদ্রোহের কেন্দ্রভূমি হওয়াতে সাহিত্য এবং কারুকার্য্যের বিবিধ শ্রেষ্ঠ রত্নসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—তবে মুসলমানগণ ধর্ম্মবিদ্বেষবশতঃ স্বেচ্ছায় সে সকল নষ্ট করিয়াছিলেন একথা সত্য নহে—বরং যাহা কিছু সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল এবং যাহা কিছু পুরোহিতগণ আবিষ্কার করিয়া দিতেন তাহাই বাগ্দাদে খালিফগণের প্রাসাদে অতি যত্নে সংগৃহীত এবং রক্ষিত হইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন বাগ্দাদ রাজধানী তাতারদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত হয় তখন সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

সাসানিয়ানদিগের অধীনে পারসিকগণ দুই প্রকার ভাষা ব্যবহার করিতেন। একটী পহ্লভি, অপরটী দরি। পারস্য দেশীয় বীরগণ, রস্তম ও ইস্ফিনদিয়ার প্রভৃতি পহ্লভি, ব্যবহার করিতেন। সার উইলিয়াম জোন্স বলেন এই ভাষার সহিত আরব্য চাল্ডিয়ান ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে। দরি অতি শ্রুতিমধুর সমাসবহুল ভাষা, ইহা রাজসভায় এবং নগরীর অভিজাতবংশীয়দিগের মধ্যে চলিত ছিল।

আরবীয়গণ যখন পারস্য অধিকার করেন তখন দেশবাসীগণের আরব্য ভাষা চর্চ্চার দিকে ঝোঁক পড়িল এবং দেশের সমৃদ্ধ মান্য গণ্য ব্যক্তি-গণ স্বভাবতঃই বিজয়ীদিগের ভাষা কহিতে এবং লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বহুকাল পর্য্যন্ত ইরাণের মাতৃভাষা অনাদৃত ছিল, অবশেষে খালিফ অল মামুনের রাজত্বকালে তাঁহারি যত্নে ইরাণী ভাষা পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই পুনর্জীবিত ভাষা তাঁহারি সমাদরে নূতন শ্রীলাভ করে এবং সেই সময় হইতেই বর্ত্তমান পারস্য সাহিত্য বিকশিত হইয়া উঠে। প্রসিদ্ধ মাভনগরনিবাসী আব্বাস মাভাজী, মামুনের রাজত্ব কালে কাব্য রচনায় সবিশেষ খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে পারস্যের আদি কবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার ভাষা সহজ, সুমধুর, অনেকাংশে লুপ্তপ্রায় পহ্লভি ভাষার সহিত একরূপ। খালিফ মামুনের সদৃষ্টান্তে তাঁহার প্রতি-নিধিগণও আপন আপন রাজ্যে পারস্য শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া সাধ্যমত বিবিধ যত্ন এবং চেষ্টায় ইহার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। "আতস কদা" গ্রন্থে খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত যে পারসিক কবিগণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন তাঁহা-দিগের নাম এবং কাব্যাংশ উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্দৃষ্টে আধুনিক পারস্য ভাষার সুন্দর ক্রমবিকাশ সম্যক উপলব্ধি হয়।

আফ্গানাস্থান এবং সমগ্র মধ্য এসিয়ার একাধীশ্বর প্রবল প্রতা-পান্বিত সুলতান্ মামুদ গজ্নির শাসন কালে দশম শতাব্দীর শেষে, একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে, পরিব্রাজক, গণিতশাস্ত্রবিৎ এবং দার্শনিক অল-বেরুনি, কবি ফারদুসী এবং দাকিকি, আরও বহু-সংখ্যক কবি এবং পণ্ডিতগণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁহাদের জ্ঞানালোকে রাজসভা সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। যদিও আব্বাস

মার্ভাজীকে আদি কবি এবং পারসিক কাব্যের জন্মদাতা বলা যায়, তথাপি তৎপরবর্ত্তী কবি ফারদুসী অধিকতর সম্মানের যোগ্য। মাসে-দের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র তুস পল্লীতে ফারদুসির জন্ম হয়, তিনি দেশ দেশান্তে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, দেশের প্রাচীন ভাষা, কাব্য, উপন্যাস এবং ইতিহাসে তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইতিহাস চর্চ্চাকালে তিনি পারস্যের একখানি বহু পুরাতন ইতিহাস পাইয়াছিলেন। তাহা হইতে বহু যত্নে বিবিধ আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করেন। সুলতান মামুদের নিয়ত উৎসাহে ফারদুসী একখানি মহাকাব্য রচনা করেন—এই কাব্যখানি পৃথিবীর সমুদায় শ্রেষ্ঠ কাব্যের সহিত তুল্য স্থানের অধিকারী। ত্রিশ বৎসরের যত্ন, পরিশ্রম এবং অনুসন্ধানের ফলে "সাহনামা" রচিত হইয়াছিল। সার উইলিয়াম জোন্স বলেন "সাহনামা"তে ষষ্ঠিসহস্র দ্বিপদী শ্লোক আছে—প্রত্যেকটিই অতি সুমার্জ্জিত; সরসতা এবং মাধুর্য্য গুণে ইহা অনেক প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবির রচনার সমকক্ষ। এই কাব্যের ভাষা সুগম্ভীর, মহান, সংযত ও সঙ্গীতে পরিপূর্ণ; উপমাসৌন্দর্য্য অতুলনীয়, বর্ণনাকৌশলে প্রত্যেক দৃশ্য সমুজ্জ্বল চিত্রের ন্যায় উদ্ভাসিত। পারস্য ভাষায় এমন আর একখানি কাব্য নাই যাহার সহিত "সাহনামার" তুলনা হইতে পারে—এমন কি পাশ্চাত্য সাহিত্যে ইহার সমতুল্য কাব্য অতি বিরল। ফারদুসী এবং সুলতান মামুদের মধ্যে যে বিবাদ হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। "সাহনামা" সমাপ্ত হইলে সম্রাট কবিবরকে বহুমূল্য উপহারাদি দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন—কিন্তু যখন সময় উপস্থিত হইল তখন সভাসদদিগের কুমন্ত্রণায় অতি সামান্য উপহার দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন—ফারদুসি সম্রাটের এই ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক আহত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করেন, তাহার

জ্বলন্ত ভাষা আজিও সুলতান মামুদের কৃপণতা ও সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষ্য স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই কবিতার আরম্ভে ফীরদুসী লিখিয়াছেন, "হে সম্রাট, হে বিশ্ববিজয়ি, তুমি আর কাহাকেও ভয় কর বা না কর অন্ততঃ সেই সর্ব্বশক্তিমানের কথা একেবারে বিস্মৃত হইও না।" ইহার পর সুলতান মামুদের বংশ, পিতৃপুরুষ এবং তাঁহার ব্যবহারের প্রতি কতকগুলি বিষ-দিগ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া এই বলিয়া কবিতার উপসংহার করেন—"স্বভাব-তিক্ত কোন তরুকে যদি স্বর্গের নন্দনকাননে লইয়া বপন কর, যদি প্রতিদিন অতিযত্নে তাহাতে মন্দাকিনী-সলিল, দুগ্ধ এবং মধুরস সেচন কর, তবুও দেখিবে ফলপ্রসবের সময় তাহা তিক্ত ফলই প্রসব করিবে"। ফীরদুসী এই কবিতা সম্রাটের মস্তকে প্রচণ্ড বজ্রের ন্যায় নিক্ষেপ করিয়া বাগ্দাদে চলিয়া যান—সেখানকার খালিফ তাঁহাকে ক্রুদ্ধ মামুদের প্রতিশোধ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সুলতান কিছুকাল পরে আপনার অন্যায় বুঝিতে পারিয়া কবির যোগ্য বিবিধ উপহার তথায় তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। রাজভৃত্যগণ যখন এই বহুমূল্য অসংখ্য উপহার লইয়া কবির গৃহ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেছিল ঠিক সেই সময়েই কবির অনুচরগণ তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া বাহিরে লইয়া যাইতেছিল। ফীরদুসীর একমাত্র দুহিতা তাঁহারি অনুরূপ গর্ব্বিতস্বভাব ছিলেন—সেই রাজ উপঢৌকন তিনি স্পর্শ মাত্র না করিয়াই সে সমস্ত নগরীর দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন। ফীরদুসীর রচিত "সাহনামা" প্রাচ্য প্রতিভা এবং পাণ্ডিত্যের সমুন্নত স্মৃতি মন্দির, যদি কখনও সর্ব্বসাধারণ্যে ইহা পারস্য ভাষায় পঠিত হয়, তবেই ইহার যোগ্য সমাদর হওয়া সম্ভব। ইহা যে আদি কবি বাল্মীকির রচনা অপেক্ষা

কোন অংশে ন্যূন নহে, সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ থাকিবে না। নিম্নে "সাহনামা" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদের জীবনকালে পারস্য ভাষা যেরূপ ছিল, ইহার ভাষা অনেকাংশে তদনুরূপ। মহম্মদ এই ভাষার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি বলিতেন এ ভাষা এমন মধুর যে স্বর্গে ব্যবহার হইবার যোগ্য।

"হে পথিক তুমি কি দূরে অই পীত লোহিত পুষ্পসমাকীর্ণ প্রান্তরটি দেখিতেছ—উহা দেখিলে প্রত্যেক বীরের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়। ওখানে কত বন, উপবন, কত উদ্যান, কত কলনাদিনী নির্ঝরিণী আছে তাহা তুমি জান কি? উহাই বীরদিগের একমাত্র যোগ্য বাসস্থান। অই তৃণাচ্ছন্ন ভূমি চীনাংশুকের ন্যায় সুকোমল, মৃদুবাহী পবন কস্তুরি সুগন্ধে আমোদিত, তটিনীর স্রোতধারা দেখিয়া মনে হইবে বুঝিবা গোলাপ জলের প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে। মৃণাল ওইখানে পুষ্প গৌরবের ভারে আনত—উপবন ওইখানে মনোহর গোলাপসৌরভে পরিপূর্ণ। সুন্দর পুষ্পোদ্যানে কলাপী ময়ূর গর্ব্ব ভরে বিচরণ করিতেছে, কপোত এবং পাপিয়া ঘনচ্ছায় দেবদারু তরুশাখে নিরন্তর কূজন করিতেছে। হে দেবতা আশীর্ব্বাদ কর অদূর তটিনীর উভয় তট চিরদিনই যেন নন্দনকাননের অনুপম সৌন্দর্য্যে ভূষিত থাকে। অই প্রান্তরে অই শ্যাম শৈলমালায় কত অপ্সরাবিনিন্দিতা অপরূপ লাবণ্যময়ী নারীকে ভ্রমণ করিতে দেখিবে, স্মিত মধুর হাস্যে তাঁহাদের কতজনকে বিশ্রাম করিতে দেখিবে। অই উপবনে আফ্রিসিয়ার দুহিতা মানিজা স্বচ্ছ নীলাকাশের সূর্য্যের ন্যায় রূপচ্ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া আছেন—ঐখানে সখীজন-পরিবৃতা সিতারা রাজ্ঞীর ন্যায় বসিয়া আছেন—নক্ষত্রমালা পরিবেষ্টিত

চন্দ্রমার ন্যায় তাঁহার স্নিগ্ধ নির্ম্মল সৌন্দর্য্যে চারিদিক রমণীয় হইয়াছে। সুন্দরী সিতারা এই উপবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুসুম—তাঁহার শোভায় নিরুপম অরুণ গোলাপ ও বিশদ মল্লিকা উভয়েই ম্লান হইয়া গিয়াছে। ইঁহাদিগের নিকটে কত তুর্ক রমণী উপবেশন করিয়া আছেন অবগুণ্ঠনে তাঁহাদের মুখমণ্ডল আবৃত—সুন্দর তনুযষ্টি তরুণ দেবদারু তরুর ন্যায় সরল, উন্নত ; কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ চমরী পুচ্ছের ন্যায় নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ—কোমল কপোল দেশ গোলাপ দলের ন্যায় সুকুমার অরুণাভ—নেত্র দুইটি নিদ্রার ন্যায় স্নিগ্ধ শান্ত ভাব সমাচ্ছন্ন, ওষ্ঠাধর মদিরার ন্যায় মধুর, গোলাপ জলের ন্যায় সুবাসিত। যদি আমরা একবার ঐ উপবনে যাইয়া এক দিবস অতিবাহিত করিতে পারি তবে এমনি কত সুন্দরীকে লইয়া গিয়া সম্রাট সৈরাসকে উপহার দিতে সক্ষম হইব।”

“সাহনামা” গ্রন্থে পারস্য জাতির প্রথম রাজত্ব কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আরব্য সাম্রাজ্যের সহিত সম্মিলন পর্য্যন্ত সময়ের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে—তুরাণের উপর ইরাণের, মোগলের উপর আর্য্য জাতির আধিপত্য, আলেকজান্দারের সহিত আক্রিমিনিয়াস-দিগের যুদ্ধ, পরিশেষে ওয়াজজার্দের পরাভব, মোগলদিগের উপর আফ্রিসিয়ারের রাজত্ব—ক্রমে সৈরাসের ক্ষমতা বৃদ্ধি ; এই সকল বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে যে অংশ উদ্ধৃত হইল তাহা কোনও তরুণ নায়কের উক্তি—তিনি আফ্রিসিয়ারের কন্যার প্রেমে জড়িত হওয়া অপরাধে তুর্কমানদিগের দ্বারা দুর্গম অন্ধকার কারাকক্ষে অবরুদ্ধ হয়েন, অবশেষে বীর রস্তম তাঁহার উদ্ধার সাধন করেন।

আরবীয় এবং পারসিকদিগের যুদ্ধ ব্যাপার বর্ণনায় স্বজাতির প্রতি কবির আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা না হইলে তাঁহার নায়ক ওয়াজার্দাদের মুখে নিম্নলিখিত উক্তি কখন স্থান পাইত না।

"উষ্ট্রদুগ্ধ পান, গোধিকা মাংস ভক্ষণ করিয়া আরব্যদিগের স্পর্দ্ধা এতই বৃদ্ধি হইয়াছে যে তাহারা এখন খস্রু রাজের রাজত্ব পাইবার আকাঙ্ক্ষা করে।—হায় ভাগ্যদেবতাগণ তোমাদিগকে ধিক্।"

সুলতান মামুদের রাজত্বকালে দাকিকি এবং আন্সারি নামে আরো দুইজন কবি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন-ইহাদের মধ্যে দাকিকি প্রকৃতপক্ষে ফীরদুসির প্রতিদ্বন্দী ছিলেন। অন্যকালের অন্য কবির তুলনায় দাকিকি যদিও একজন উচ্চদরের কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন তবুও ফীরদুসীর দীপ্তসূর্য্যপ্রতিম প্রতিভার পার্শ্বে তাঁহার কবিত্বজ্যোতিঃ দীপালোকের ন্যায় একেবারেই ম্লান হইয়া গিয়াছিল। আন্সারি ফীরদুসীর শিষ্য এবং বন্ধু ছিলেন, তাঁহাকে কি প্রকার ঐকান্তিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন তাহা কতকগুলি সুন্দর হৃদয়-স্পর্শী কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ফীরদুসির পুরুষোচিত উদার কাব্যের মহৎ আদর্শ আন্সারির আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত অন্য সকল কবিই অনুকরণ করিয়া আসিতেছিলেন। নিজাম-উলমুলুক মালিক-সাহ প্রণীত "সিয়াসৎ নামা" (অর্থাৎ রাজ্য নীতি এবং রাজ্য শাসন সম্বন্ধে বিচার) এইরূপ প্রাঞ্জল অথচ সুগম্ভীর ভাষায় রচিত—ইহাতে পরবর্ত্তী কবিদের অলঙ্কারবহুল জটিল ভাষার আড়ম্বর কিছু মাত্র নাই। রাজ জ্যোতির্ব্বিদ ওমার খৈয়ামের কাব্যও এই সরল সরস বিশুদ্ধতার জন্য অধুনা ইউরোপে এবং এদেশে এতাদৃশ সমাদৃত হইয়াছে। সেনজুকিদিদিগের অভ্যুদয় কাল হইতেই পারস্য সাহিত্য উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, কিন্তু এই উন্নতি ক্রমে অলঙ্কারবহুল জটিলতায় পরিণত হয়। গজনীনগরে গজনবীগণ তখনও পারস্য ভাষার পূর্ব্বতন বিশুদ্ধ সরলতা রক্ষা করিয়াছিলেন। দার্শনিক হাকিম সানাই সুলতান ইব্রাহিমের রাজত্বকালে হাদিকা এবং দিওয়ান নামক

দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন—ইহাদের ভাষা অতুলনীয়—মধ্যে মধ্যে আরবীয় উপমার সাহায্য গ্রহণ করিলেও গ্রন্থকার আপন মাতৃভাষার পরিপূর্ণ বিকাশের কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ধর্ম্মমুগ্ধ কবি মৌলানা জেলালুদ্দিনের কাব্য পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায় সানাইএর জীবন এবং গ্রন্থাবলী পারসিকদিগের কত শ্রদ্ধার সামগ্রী। মৌলানা জেলালুদ্দিন কনিয়াই (Iconium) নগরে বাস করিতেন; তিনিই মৌলভী নামক মুসলমানধর্ম্মসম্প্রদায়ের স্থাপনা করিয়াছিলেন। মালিকসাহের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী সুলতান সাঞ্জরের রাজত্বকালে কবি আন্‌সারি জীবিত ছিলেন, এবং একটি অতি সুন্দর কবিতায় তাঁহার রাজত্বকালের গৌরব গান করিয়া গিয়াছেন। উত্তরকালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতবর্ষীয় মুসলমান কবি সন্দ ইঁহার কবিতার অবিকল সুন্দর অনুকরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুলতান সাঞ্জরের যশোগাথা এবং বাগ্দাদ নগরীর বর্ণনা এই দুইটিই কবি আন্‌সারির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। আন্‌সারীর সময় হইতে পারস্যভাষার আদিম গাম্ভীর্য্য, ও বিশুদ্ধ সরলতা দূর হইয়া অলঙ্কারবাহুল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ক্রমে তাহা হাফিজের সময়ের মৃদু মধুর ছন্দোগত ভাষায় পরিণত হইয়াছে। আন্‌সারি ভিন্ন সুলতান সাঞ্জর সালমান, জালির এবং রাসিদির পোষকতা করিয়াছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই বুদ্ধিমান এবং প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন এবং প্রত্যেকেই আপনাপন বিশেষ কার্য্যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন—সালমান অতি সুন্দর গীতি কবিতা রচনা করিতেন, জালি নীতিবিষয়ক কাব্যরচনায় বিশেষ পটুতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং রাসিদি তাঁহার রচনার বিশুদ্ধতার জন্য সর্ব্বসাধারণে প্রশংসিত হইয়াছিলেন। তাতারদিগের আক্রমণকালে খাকাম এবং ফালাকি দুইজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের নাম শুনা যায়, খাকাম সর্ব্বদাই স্বীয় বিদ্যা

এবং প্রতিভার গর্ব্ব করিতেন, তিনি পূর্ব্বতন আরব্য কবিদিগের অনুকরণ করিতেন এবং আপনাকে তাঁহাদের খ্যাতির যোগ্য উত্তরাধিকারী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার কাব্য—আরব গ্রন্থ, তদ্দেশীয় রচনা-প্রণালী, উপমা, অলঙ্কার প্রভৃতি পারস্য দেশে সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার পারস্য কবিতায় আরব কথা এবং শ্লোক একত্র গ্রথিত হইয়া সমধিক সুন্দর হইত। নিম্নলিখিত দ্বিচরণের শ্লোক হইতে তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়।

"সেই তাহার ছায়ামূর্ত্তি,—যাহার সৌন্দর্য্য ছায়াকেও আলোকিত করে—গত রাত্রে আমার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছিল, ভাগ্যদেবতার এই অকস্মাৎ দয়ায় বিস্মিত হইয়া আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম—কোথা হইতে এ সৌভাগ্যের উদয় হইল" এই কবিতার প্রথম চরণ বিশুদ্ধ আরব ভাষা এবং তদ্দেশীয় পুরাতন কবিদিগের আদর্শে লিখিত।

"এই অন্ধকার সৌধে, ওষ্ঠে তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া, জানুতে মস্তক রাখিয়া আরও কতকাল আমার প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিব? হে সুভগ পানপাত্র-বাহক আমার নিকটে আনন্দের বার্ত্তা আনয়ন কর। কে বলিতে পারে সুখের দিন আবার ফিরিয়া আসিবে না?" এই কবিতার শেষ চরণটী কোনও আরব কবিতা হইতে গৃহীত।

পারস্যের অন্য সকল নগরী অপেক্ষা সিরাজ নগরেই অধিকাংশ খ্যাতনামা কবির বাসস্থান, ইহাকে পারস্যের উজ্জয়িনী বলা যাইতে পারে। সাদি এই সিরাজের অধিবাসী, খৃষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন আতাবেগফার্স বিদ্বান এবং গুণী লোকদিগকে সমাদরে উৎসাহিত করিতেছিলেন তৎকালে সাদির কবিত্বের খ্যাতি চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল। কবির যথার্থ নাম সাদি নহে, তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক আতাবেগসাদকে সম্মান দেখাইবার জন্য এই নাম

গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাদির অপূর্ব্ব প্রতিভা এবং সৃজন ক্ষমতা তাঁহার অগণ্য কবিতার বৈচিত্র্যে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বভাবতঃ তিনি অতি উচ্চদরের প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, দেশ বিদেশে ভ্রমণ, নানা ভাষা পর্য্যালোচনায় তাঁহার আরও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। ভ্রমণ বিষয়ে সাদি আরব কবি মাসুদির সমকক্ষ ছিলেন, সাদির রচিত "গুলিস্তান" নামক কবিতা গ্রন্থ পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ফিরাদুদ্দিন নামে আর একজন ঈশ্বরপ্রেমিক কবি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাতারদিগের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে হত হয়েন। তাঁহার কবিতা ভদ্র ইতর সকলেরই নিকট এতই সমাদৃত হইয়াছিল, যে আজ পর্য্যন্ত সিরাজ, ইস্পাহানের প্রতি পথে তাঁহার কবিতা গীত হইতে শোনা যায়। কবি ফিরাদুদ্দিন আতরের ব্যবসায় করিতেন বলিয়া তিান ফিরাদুদ্দিন আতর নামে অভিহিত হইতেন। পারস্য ভাষার চর্চ্চারত যে কোন পাঠকই বিশুদ্ধ এবং মহৎ ভাবের মর্য্যাদা বোঝেন তিনিই ফিরাদুদ্দিনের কবিতা সমাদর করিবেন।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সিরাজ নগরে কবি সামসুদ্দিন হাফিজ জন্ম গ্রহণ করেন। এই জগদ্বিখ্যাত কবির জন্মস্থান হওয়াতে সিরাজ নগরীর গৌরব আরো দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। হাফিজ গীতিকবিদিগের মধ্যে অতি উচ্চ আসনের অধিকারী। হাফিজ সম্রাট তৈমুরলঙ্গের সমসাময়িক, শুনা যায় সম্রাট কবিকে এতই শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন যে তাহা দেবভক্তির সহিত তুলনা হইতে পারে। হাফিজের কবিতা একদিকে যেমন মৃদুমধুর সুললিত পদাবলীর আদর্শ—অপর দিকে আবার ইহা দৃঢ় পুরুষোচিত ভাষার আদর্শ। এই ভাষা আজিও পারস্য রাজধানী সিরাজে ব্যবহৃত হয়।

অন্য সকল পারসিক কবিদিগের ন্যায় হাফিজও একজন ঈশ্বর

প্রেমিক ছিলেন—ভক্ত মুসলমানগণ আজিও তাঁহার সুরা এবং মানব প্রেমের স্তোত্রগীতিতে সেই দেবাদিদেবের প্রতি মুগ্ধ ভক্তের প্রেম-বিহ্বলতা দেখিতে পান। নিম্নলিখিত অংশ হইতে হাফিজের কবিতার আদর্শ পাওয়া যাইবে—

"গোলাপের অবগুণ্ঠন পরিয়া ঊষা আগত-প্রায়, হে বন্ধুগণ, প্রভাতের পানীয় লইয়া আইস,—প্রভাতের প্রথম পানীয়। অপরাজিতার কপোল বহিয়া শিশির বিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে,—হে প্রিয় সঙ্গীগণ মদিরা লইয়া আইস, মদিরা লইয়া আইস। উদ্যানে স্বর্গের সমীরণ নিশ্বসিত হইতেছে—আইস তবে পুণ্য মদিরা পান করি। কুঞ্জবনে গোলাপ আপনার মরকত সিংহাসন বিস্তার করিয়াছে—মাণিক্যের ন্যায় উজ্জ্বল আরক্ত-কান্ত মদিরা হাতে তুলিয়া দাও। এখনও কি তাহারা ভোজন কক্ষে রুদ্ধ রহিয়াছে?—হে কবাট-উদ্ঘাটনকারী, কবাট উদ্ঘাটন কর, বড়ই বিস্ময়ের কথা এমন শুভক্ষণেও পান্থালয়ের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে! ত্বরা কর, হে প্রেমমুগ্ধ তরুণ, সাগ্রহে সুরাপান কর, আর তুমি হে প্রৌঢ় জ্ঞানী, উচ্চ কণ্ঠে দেবতার জয় গান কর, দেখ হাফিজের মত তুমিও অপ্সরা বিনিন্দিতা প্রেয়সীর অরুণ কপোল হইতে মদিরার ন্যায় সুমধুর চুম্বন পান কর।

হে তরুণ জাগ্রত হও, দেখ অপরাজিতার পেয়ালা মদিরায় পরিপূর্ণ—আর কতদিন অবিশ্বাস বাচিয়া থাকিবে, কতদিন আর ধর্ম্মমূঢ়তার জয় হইবে? অহঙ্কার, ঘৃণার কাল আর নাই, দেখ কালবশে রোম সম্রাটের রাজবেশ ধূলিলিপ্ত ভূলুণ্ঠিত, পারস্যাধীশ্বরের রাজমুকুট, দলিত ভগ্ন প্রায়! হে বন্ধু জ্ঞানের সঞ্চয় কর—দেখ প্রভাত বিহঙ্গ প্রেমানন্দে উন্মত্ত প্রায়—আর ঘুমাইওনা জাগ্রত হও, অনন্ত-নিদ্রার কাল এখনও তোমার সম্মুখে পড়িয়া আছে। হে বসন্তের

সুন্দর পুষ্পিত তরুণ তরু, কি সুন্দর ভঙ্গীতেই তোমার দেহযষ্টি আন্দোলিত হইতেছে—দেবতার বরে, তোমার পুষ্প কোরকগুলি পৌষের শীতে যেন কখন ঝরিয়া না যায়! ভাগ্যদেবতার অনুগ্রহে কেহ বিশ্বাস করিও না, তাঁহার কুটিল হাস্যে কেহ ভ্রান্ত হইও না। ধিক সেই হতভাগ্য যে বিশ্বাসঘাতক অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

গোলাপ পুষ্পের দীপ্তি ও গৌরব দেখিয়া মুগ্ধ, বিস্মিত হইও না, দুদিনেই বাতাস তাহার দল গুলিকে নষ্ট করিয়া আমাদিগের পদতলে ছড়াইয়া দিবে। বদান্য হাতেমতাইএর উদ্দেশ্যে মদিরা পান কর—আইস আমরা এইরূপে কৃপণদিগের ইতিহাস বিস্মৃতির অন্ধকারে লুপ্ত করিয়া দি। নিঃশব্দে একমনে শ্রবণ কর, কুঞ্জবিতানের গায়কগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে—বেণু বীণারব, মুরজ মন্দিরা ধ্বনির সহিত একত্রে মিশিতেছে। উদ্যানের মধ্যে তোমার বিরাম আসন খানি স্থাপিত কর, অই দেখ সেবারত ভৃত্যের ন্যায় দেবদারু সাগ্রহে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান, তন্বী বংশ যষ্টিও সযত্নে তাহার নীবি বন্ধ দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া লইয়াছে। হে হাফিজ তোমার মধুর মোহিনীশক্তির খ্যাতি রায় এবং রুমের সীমান্ত হইতে চীন এবং মিসরের প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।"

হিন্দুস্থানের ন্যায় ইরানেরও পরকীয় আচার ব্যবহার ভাব গ্রহণ করিয়াও অবিচলিত থাকিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। যে দেশে যেমন ভাবেই একজন পারসিক বাস করুন না কেন তিনি সেই পারসিকই থাকেন—তাঁহার স্বভাবের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনা। কিন্তু কোন বিদেশী আসিয়া যদি পারস্যের ঔপনিবেশিক হন তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি পারসিক হইয়া বসেন। ইরাণ কালে

কালে মাসিডোনিয়া আরব ও তাতারের হস্তগত হইয়াও স্বদেশীয় ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার কিছুই ত্যাগ করে নাই। সর্ব্বাপেক্ষা ইহাই তাহার গৌরবের বিষয় যে বিজেতাদিগের ভাষা গ্রহণ করা দূরে থাকুক বরং জেতাগণই বিজিতদিগের ভাষা কহিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই প্রান্তরবাসী তাতারবীরগণ, তাঁহাদের চিরন্তন পরুষ প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া দিব্য শান্ত নম্র রাজোচিত চরিত্র লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বয়ং পারস্য ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং অপরিমেয় দানশীলতার সহিত ইহার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেন। কালে গুটিকত মোগল কথা পারস্য ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছিল কিন্তু মোটের উপর ইহার ভাষাগত বিশুদ্ধতা নষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই।

আধুনিক তুরস্ক ভাষার গঠনে ও উন্নতিবিষয়ে পারস্য ভাষার বিস্তর আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। কনষ্টাণ্টিনোপলের বিজেতা সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ কবি ফীরদুসীর বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন এবং সদা সর্ব্বদাই 'সাহনামার' সুদীর্ঘ অংশ সকল আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার বদান্যতায় অনেক পারসিক সাহিত্যকার এবং পণ্ডিতগণ প্রতিপালিত হইতেন। ইহাদিগের মধ্যে খ্যাতনামা নুরুদ্দিন একজন প্রধান, ইনি জোসেফ এবং জুলিখার প্রেম সম্বন্ধে একটি সুন্দর কবিতা রচনা করেন। অনুবাদে মূল রচনার সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য রক্ষা হওয়া সম্ভব নহে, পাঠক তবুও নিম্নলিখিত অংশ হইতে তাঁহার রচনার পারিপাট্য কতক অনুমান করিতে পারিবেন।

"ঊষাকালে বায়স কৃষ্ণরাত্রি যখন পলায়ন করিতেছে, প্রভাত বিহঙ্গমগণ প্রথম তান ধরিয়াছে, পাপিয়ার সুমধুর স্বরসংঘাতে গোলাপ কোরকের সুকুমার অবগুণ্ঠন যখন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে—

যখন গোলাপ এবং নব মল্লিকা প্রভাত শিশিরে স্নাত; শীরিষ যখন বিন্দু বিন্দু শিশির সিঞ্চনে আপনার সুগন্ধ সুকোমল কুন্তলজাল আর্দ্র করিয়া লইয়াছে—তখন জুলিখা যেন সুখ নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন—হায় ভ্রান্তি নিদ্রা কখন জুলিখাকে সান্ত্বনা দিতে আসিত না, সুদীর্ঘ বিনিদ্র বিরহ রাত্রির অবসানে ক্লান্তিতে তাঁহার সর্ব্বশরীর, মন অবসন্ন হইয়া পড়িত। পরিচারিকাগণ যখন স্নেহভরে আপন আপন কপোল দেশ তাঁহার পদতলে রাখিত, সখিগণ সাদরে হস্ত চুম্বন করিত তখন তিনি অবগুণ্ঠন মোচন করিতেন, অতি ধীরে ধীরে শিশিরসিক্ত পদ্ম কোরকের ন্যায় নিদ্রাকাতর অশ্রুপূর্ণনেত্র দুইটি উন্মীলন করিতেন, এবং শয্যা হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া শ্রান্ত নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেন"।

কবি নুরুদ্দিনের সময়ই কাতিবি নামক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির কথা শুনা যায়, তিনি তৈমুর লঙ্গের বংশধর মির্জ্জা ইব্রাহিমের রাজসভায় বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান ধর্ম্মাবতার মহম্মদের বংশধর সাহ ইস্মাইল বিখ্যাত সুফি বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের অনেক গুলি সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট ইংলণ্ডের সপ্তম হেন্‌রি, এলিজাবেথ, প্রথম জেম্‌স, ফ্রান্সের পঞ্চম চার্লস এবং প্রথম ফ্রান্সিস প্রভৃতি রাজগণের সমসাময়িক ছিলেন, রাজসভার ঐশ্বর্য্য আড়ম্বরে, প্রভূত ব্যয় বাহুল্যে, সাহিত্য এবং শিল্পকারদিগের প্রতিপালনে অসীম বদান্যতায় ইউরোপীয় রাজগণের সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করিতেন। এই সুফিরাজগণের শাসনাধীনে অনেক সাহিত্যকার এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রসিদ্ধ কবি হাজিমের নাম শুনা যায়। আফগানদিগের আক্রমন কালে তিনি পলায়ন করিয়া

ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কবির আত্মজীবনীর ভাষা অতি বিশুদ্ধ, সুন্দর, সংযত; বর্ব্বর আফগানদিগের আক্রমণে প্রাণপ্রিয় জন্মভূমির যে ক্ষতি যে ধ্বংস, যে শ্রীহীনতা হইয়াছিল তাহা তিনি বিশদ হৃদয়-স্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। হাজিমের ছোট ছোট কবিতা গুলি অতি সুন্দর।

"হৃদয়ের শিলাফলকে হে পিতৃদেব, আমি তোমার বাক্য গুলি সযত্নে খোদিত করিয়া রাখিয়াছি—তোমার সমাধি মন্দিরে যেন অনন্ত কাল ধরিয়া দেবতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়"।

"বৎস যদি কখনও কোনও পতিতের সহিত একত্র বাস করিতে বাধ্য হও তাহার প্রতি রূঢ় আচরণ করিওনা, তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিওনা। এ জীবনে যদি কাহাকেও সুখী করিবার সুবিধা না পাও, তবে অন্ততঃ কাহাকেও অসুখী করিওনা"।

আফগানদিগের অধিকার কালে পারস্য রাজ্যে যে অরাজকতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, নাদির সাহের মৃত্যুতে ও কাজার রাজাদিগের অভ্যুদয়কালে যে সুদীর্ঘ দুঃসময় আসিয়াছিল তাহাতে বহুকাল পর্য্যন্ত সাহিত্যের উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল; সাহ নাসিরুদ্দিনের সময়ে পারস্য ভাষা পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আমি কেবল মাত্র কবিদিগের কথাই বলিলাম, তাই বলিয়া পারস্য ভাষায় ঐতিহাসিক, জীবনচরিতকার এবং দার্শনিকগণের অভাব নাই। ফিরিস্তা ভারতবর্ষের, রসিদুদ্দিন এবং ওয়াসফ মোগল আক্রমণের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। মিরখন্দ এবং তাঁহার পুত্র দুইখানি অতি সুললিত মনোহারী ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছেন।

পরলোকগত সাহের রাজত্বকালে নাসিক-উত-তওয়ারিখ, পারসিক লেখকদিগের রচনা একত্রিত করিয়া একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ

এবং গনহর-ই-মুরাদ আভিস্তিক দর্শনের একখানি সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশ করিয়াছেন।*

সৈয়দ আমীর আলি।

বিদেশী।

ভেবেছিনু ওগো পান্থ সুজন
তুমি মোর দেশবাসী,
বুঝাতে করিনি কোন আয়োজন
অবাধ কথার রাশি!

ভেবেছিনু মোর জটিল সরল
আলোক আঁধার কঠিন তরল
বুঝিবে সমান ভাবে
সুখদুখ যত তোমারি সমুখে
বিকাশি বিরাম পাবে!

এখন দেখি যে কিছুই বোঝনা
বিফল আমার ভাষার যোজনা
বিফল প্রকাশ ব্যথা,
আকার প্রকার সবই বৃথা আজ
বৃথা যত ব্যাকুলতা!

---

* জষ্টিস আমীর আলি বাঙ্গালা জানিলেও বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ রচনায় অনভ্যস্ত হওয়ায় সঙ্কোচবশতঃ ভারতীর জন্য এই প্রবন্ধটি ইংরাজীতেই রচনা করিয়াছিলেন; আমাদের উপর ভাষান্তরের ভার অর্পিত হইয়াছিল।—ভাঃ সং

কাছে যতবার ডাকিগো আদরে
তুমি সরে বস অভিমান ভরে
ভয়ে চাও মুখপানে
যাও যদি বলি, এস বড় কাছে
হাসি ভরা দুনয়ানে !

কাছে রাখি আর হেন সাধ নাই
শ্রান্ত আমি অতিশয়,
বিদায়ের বাণী কেমনে বুঝাই
এবে মোর সেই ভয় !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বেহারে বাঙ্গালিনী।

ভাগলপুর সহর হইতে তিন ক্রোশ দূরে ফুলবাড়িয়া গ্রাম; সহরের এত নিকটস্থ হইলেও গ্রামখানি নেহাত পাড়া-গাঁ গোছেরই বটে। শিক্ষা সভ্যতার ঢেউ যেন ভাগলপুরের গণ্ডী-তেই বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে, তাহার আধ মাইল তফাতেই আর নবীন আধুনিকতার চিহ্ন মাত্রও দেখা যায় না। সুতরাং এই দীর্ঘ নয় মাইলের পর আর কোনরূপ সভ্যতাবৈচিত্র্য দেখিবার আশা বিড়ম্বনা মাত্র। তবে চারতপ্পার (অংশ) মধ্যে বড়ারীতপ্পার এই গ্রামখানি বিশেষ সমৃদ্ধ। বিস্তর ব্রাহ্মণ ভদ্রের বাস এবং কয়জন অপেক্ষাকৃত ধনবান লোকের বসতিও আছে।

বাবু একনাথ শুকুল একজন অবস্থাপন্ন লোক। বিশেষত

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পূর্ণিয়ায় পেস্কারী কর্ম্ম করেন, তাঁহার আয় এঅঞ্চলের লোকের পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ, কাজেই একনাথ বাবুর (বাবু পদবীটা পশ্চিমে বড় সুলভ নহে) ক্ষমতা ও সম্ভ্রম কিছু অসাধারণ হইয়া পড়িয়াছিল।

তাঁহার প্রকাণ্ড বাটী মৃত্তিকাপ্রাচীর বেষ্টিত, তন্মধ্যে সদরে একখানি ঘর ও একটী সরু ও লম্বা বারাণ্ডাগোছ। ইহাই তাহাদের বাঙ্গলা বা সদর। তাহার পর অন্দরে বিস্তর ঘর; পূর্ব্বমুখী একটা খাপরেলের কোটা বা ছাত; তাহাতে উপরে দুইখানি ঘর, নিম্নেও দুইটী ঘর একটী বড় ওস্‌ড়া বা দাওয়া। পশ্চিমেও তদ্রূপ একটা বাড়ী, তদ্ভিন্ন দক্ষিণে ও উত্তরে দুইখানি লম্বা লম্বা দুচালা নামান রহিয়াছে, তাহাতে রন্ধন প্রভৃতি অন্যান্য সাংসারিক সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে।—এক কোনে একটা ইঁদারা, তাহার নিম্নে চতুর্দ্দিকে পুদিনার গাছ, গেঁধারী নটের শাক, তিতুয়া পাট প্রভৃতি শাকগুলি অস্থিসার দেহে জীবনের ক্ষণস্থায়ী পরিণাম স্মরণ করিতেছে।

মধ্যে বিস্তৃত "এ্যাঙ্গ্‌না" (উঠান) একধারে রাশিকৃত জঞ্জালও অপরিচ্ছন্নতার নানাবিধ সরঞ্জামে সজ্জিত হইয়া মূর্ত্তিমান ঘৃণার ছবি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। সম্প্রতি এ কয়দিন শুকুলদেব বাটীতে 'যজ্ঞ'। তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র প্রেমলালের 'গাউনা' বা দ্বিরাগমন; এদেশে দ্বিরাগমনে প্রায় বিবাহের ন্যায়ই বিধি ব্যবহার ও ব্যয় হইয়া থাকে। গ্রাম গ্রামান্তর হইতে আনীতা বেটী সাবাসিনগণের দ্বারা ভবনপূর্ণ।

আজ সকাল হইতেই গীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সকলেই মহা ব্যস্ত; চালার একপার্শ্বে একটা ক্ষুদ্র খাটিয়ায় শায়িতা বাবুর বৃদ্ধা মাতা কফরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিতেছিলেন, "হে দুলহ্যান!

চিলাম্‌ঠো দ্যা ভরিকে হে।" (ও বৌমা কল্কেটা সেজে দাও না)। কিন্তু জুলগ্যানগণের তামাকুতৃষা এখন বলবতী নহে, তাহাদের কথা শুনিবার কর্ত্তব্যজ্ঞানও বড় মাথা তুলে নাই সুতরাং শাশুড়ীর গলা ভাঙ্গিয়া গেল তথাপি বধূগণ আগ্রহ দেখাইল না দেখিয়া একটি বালিকাকে ধরিয়া বসিলেন। শ্রীমতী সুর্য্যাবতীর ধীরতার প্রমাণ কেহ না পাইলেও এবং স্বয়ং বৃদ্ধারও সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ থাকিলেও এখন সে তাঁহার নিকট বড়ই লছমি নাম পাইয়া গেল; ক্ষুদ্র কলিকার গলরজ্জুবদ্ধ চিমটা ঝুলাইতে ঝুলাইতে রন্ধন গৃহাভিমুখে ছুটিল। অবশেষে যখন তামাক সাজিয়া বৃদ্ধাকে দিল তখন কি সে কোন পুরস্কার পায় নাই?—তামাক পাইয়া নানী সাহ্লাদে পোতীকে বলিলেন, "পিয় বেটী সুলগাই দ্যা"।

বাটীর গৃহিণী মহাব্যস্ত।—সুমলিন বস্ত্রে ও মলিনতর তৈলধূলিরঞ্জিত আঙ্গিয়ায় (কুর্ত্তায়) ধনীর গৃহলক্ষ্মী বেশভূষায় পার্শ্বচারিণী ধান্‌ক্যান (দাইগণের) সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য দেখাইয়া নিয়ত হুকুমজারীতে আপনার কর্ত্রীত্ব জানাইতেছিলেন, আর অন্যান্য রমণীরা শুগাপঙ্খী, কক্‌রেজ্জা, কুস্‌মী প্রভৃতি রংএর কাপড়ে লাল শালু, রঙ্গিন ছিট কচিৎ ফিতার মগজীদার সাটিনের কুর্ত্তায়, আর আপাদ মস্তক অসংখ্য ঘুঙ্গুরদার রৌপ্যালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া নানারূপ বিধি, রন্ধন ও অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে গীতের বড় ক্ষতি হইতেছিল না, এক স্থানে কয়েক জন স্ত্রীলোক গানের আখড়া স্থাপন করিয়াছিল; যখন যাহার অবসর হইতেছিল সেই আসিয়া যোগ দিতেছিল, এবং অপরা কার্য্যে যাইতেছিল, এইরূপে স্বরে আর নিম্নতার ভয় ছিল না। বরং এক একটা বিধির সময় সে স্বর সপ্তম গ্রাম ছাড়াইয়া অষ্টম স্বর অন্বেষণ করিতেছিল।

লাল ভৌজি অর্থাৎ গৃহিণীর কনিষ্ঠা যাতা, ইনি সকলেরই লাল ভৌজি—ননদ হইতে পুত্র কন্যা এবং ভাসুর-পুত্র-কন্যাগণের সকলেরই লাল ভৌজি! ইহাঁর চুল বাঁধায় বড় প্রতিপত্তি; এক দল কিশোরী বালিকা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছিল এবং অগ্রে চুল বাঁধিবার উমেদারী করিতেছিল। তাহাদের দ্বারা অনেক কার্য্য সিদ্ধি করিয়া অবশেষে লাল ভৌজি চুল বাঁধিতে বসিলেন।

সে চুলবাঁধা এক বিরাট ব্যাপার! যাহারা "সাটিয়া"—আনিয়াছিল তাহাদের তো সহজেই হইয়া গেল, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সৌখিন বালিকারা যে বিঁধ্‌লি ও মাল্‌হোরিয়ায় সজ্জিত হইতে ইচ্ছুক ছিল তাহাদিগকে লইয়াই তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

সাটিয়া এক প্রকার সল্‌মার পাত, চিকনা বা তিসির আঠা পাটি পাড়িয়া সেই "সাটিয়া" কাটিয়া কাটিয়া বসাইয়া দিতে হয় আর "বিঁধলী" অতি ক্ষুদ্র স্বর্ণ রৌপ্য নীল সবুজ নানা রঙ্গের টিক্‌লী এই গুলিকে থালায় পাড়িয়া একটি তৃণের সাহায্যে সেই মসিণ পিচ্ছিল পাটীটিতে একে একে সাজাইয়া নানাবিধ ফুল কাটিতে হয় ইহা বড় পরিশ্রমসাধ্য। লাল ভৌজি সাধ্যমত করিয়া অবশিষ্ট কয়েক জনের শুধু সিন্দুর দিয়া ফুল করিয়া দিলেন। তাহারা দুঃখে কেবল কাঁদিতেই বাকি রাখিল। তবে আবার কল্য ভাল করিয়া দিবে লাল ভৌজি এই আশ্বাস দিয়া কতক সান্ত্বনা করিয়াছিলেন।

চুলবাঁধা শেষ হইল; কয়েক জন যুবতী আসিয়া সেখানে বসিয়া পড়িলেন; সে নব যৌবন দর্পের চলল্লীলা তরঙ্গের নিকট বালিকারা থাকিতে বড় ভালবাসে না, ঝাঁক বাঁধিয়া উঠিয়া যায় দেখিয়া একজন কহিলেন "গে পঞ্চি!—নুনুয়া কে লেনে যো!" (ও পঞ্চি খোকাকে নিয়ে যা)। পঞ্চির কিন্তু ছেলে লইবার এসময় নয়

তাড়াতাড়ি সে উত্তর করিল 'মদিয়া কাঁহা ?' —হামে এখনি—(মদিয়া কই ? আমি এখন) অৰ্দ্ধসমাপ্ত কথা মুখে লইয়া পক্ষী পলায়ন করিল।

যুবতী সবিরক্ত হাস্যে বলিলেন "কেনু আঁব বোঢ়ন ঝঁটি।" এই সময় একজন নবীনা কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাগে দিদি! কনিয়ানী কেহ্নি ছেই গে ?" (হাঁ দিদি কনে কেমন ?) "বড়ি আচ্ছা" (বেশ)—'বোলবো চালবো হামরা আরো নেকি" (কথা বার্ত্তা আমাদের মত ?) যুবতী হাসিয়া উঠিলেন, "গে মাই! সে কেনাকে হোতেই! বাঙ্গালা মুলুককে বাৎ চিৎ হামরা দেশ না কি কথিলে হোতেই! (ওমা-সে কেমন করে হবে! সে দেশের চলন বলন এদেশের মত কেন হবে ?)" বধূ পশ্চিমবাসিনী নহেন বঙ্গবাসী বেহারী ব্রাহ্মণের কন্যা।—পশ্চিমের চক্ষে বাঙ্গালী বাবুসাহেবই কত আগ্রহের দ্রব্য ; কিন্তু তাঁহাদের অধিষ্ঠাত্রীবর্গ যে কিরূপ বস্তু তাহা কেহ জ্ঞাত নহেন ;—যদিবা কোন চাকুরে বাবুর স্ত্রীপরিবারের সহিত ভাগলপুর বা মুঙ্গেরবাসিনী রমণী আলাপ করিবার চেষ্টা করে তা সে দুর্ব্বোধ কথার দায়ে ও বাঙ্গালিনীর অদ্ভুত চাল চলনে বিব্রত হইয়া তাহারা সরিয়া পড়ে।

তবে এরূপ ঘটনা বড়ই বিরল। বাঙ্গালীর পেঁয়াজ প্রভৃতি অখাদ্য ভোজনের প্রমাণ না পাইয়াই, তাঁহারা "ডিমকের ভর্ত্তা খাইছেই হে! ওকরা হাঁ নেই যেই হো, কিরিস্তান ছেই। (ডিম সিদ্ধ খায় গো! ওদের বাড়ী যেওনা ওরা খ্রীষ্টান।)" ইত্যাদি মন্তব্য প্রকাশে সে দুর্জ্জনকে শত হস্ত দূরে পরিহার করেন—সুতরাং এই অচিরাগমন-সম্ভাবিতা কন্যা যে কিরূপ আশ্চর্য্য বস্তু হইবেন ইহা লইয়া আজ কয় দিন হইতে যুবতীবালিকামহলে কোলাহল উঠিয়াছিল।

বিবাহের সময় কন্যা আইসে নাই, এই প্রথম আসিতেছে। তাই

সকলেই অধীর ভাবে কন্যার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। বাস্তবিক তাহারা যেরূপ আগ্রহভরে কন্যার পথ চাহিয়াছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের চাতকও তত উৎসাহে আষাঢ়জলদবর্ষণ প্রতীক্ষা করে না।

নানারূপ কল্পনা চলিতে লাগিল। যত সম্ভব অসম্ভব বিচিত্র চরিত্র তাহারা সৃষ্টি করিতে পারিত তাহা বাঙ্গালী চরিত্রে অর্পণ করিয়া ভালোয় মন্দে মিশাইয়া এক অতিলৌকিক মনুষ্যের উদ্ভাবন করিয়া ফেলিল।

বেলা দুইটা, গৃহিণী কহিলেন "জানানী লোককো পরোশ" (মেয়েদের পরিবেশন কর।) একটা তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল। আগে স্ত্রীলোকদের ভোজন শেষ হইবে, পরে পুরুষদের ভোজন।—ইহা পশ্চিমের একটা বিপরীত নিয়ম।—বড়া বড়ি তিলোড়ি পাঁপর চাক্কা ঝুটি প্রভৃতি অসংখ্য ভাজা তরকারীর উপকরণ—এদেশের ন্যায় ডাল্‌না, চচ্চড়ি ঘণ্টর আদর পশ্চিমে আদৌ নাই;—অবশেষে দহি ও ভূরা; সন্দেশ মিষ্টান্ন এখানে বড়ই অসুলভ, তবে বড়মানুষের বাটীর ক্রিয়া বলিয়া এক একটা মিঠায়ের দর্শন পাওয়া গিয়াছিল।—আর মৎস্য মাংস তো একেবারেই পরিত্যজ্য।—মেয়ে ভোজ শেষ হইল, তারপর পুরুষদের "বাঁজে" অর্থাৎ ডাক হইল।

গাউনা বা গান তখন ভয়ানকমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, আহারের সময় গানটা বড়ই প্রয়োজনীয়, নতুবা যেন আহার সম্পূর্ণ হয় না, বাস্তবিক আহার্য্য বস্তুজাত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াও যদি একটি গীতে একটি ক্ষুদ্র ভুল হয় তবেই বড় নিন্দা! পুরুষ সমাজেও টিট্‌কারী পড়িয়া যায়!—

আহার শেষ প্রায়:—দধিভোজন ও তাহার গীত চলিয়াছে এমন সময় দূরে গ্রামের বাহিরে মহারোলে বাদ্য বাজিতে লাগিল; "বর এলেই বর এলেই" রব চারিদিকে জাগিয়া উঠিল।—কিন্তু হইতে

কি হয়! এখনও প্রায় এক প্রহর বেলা, সূর্য্য না ডুবিলে তো নূতন কন্যা শ্বশুরবাড়ী প্রবেশ করিতে পাইবে না। গ্রামের বাহিরে এক আম বাগানে অবশিষ্ট সময়টুকু বরযাত্রারা অপেক্ষা করিয়া থাকিবে। বরের মাতা পিতিয়ান্ প্রভৃতি সকলে সময়োচিত বিধি বেহভার করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।—ছোট ছোট ছেলে মেয়ে কন্যা দেখিবার জন্য ছুটিয়া চলিল।

তারপর সন্ধ্যার আঁধার যখন ঘন হইয়া আসিল তখন বরকন্যার পাল্কী দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, ওঃ গানের কি তীব্রতা! প্রচণ্ড বাদ্য-ধ্বনি সে গীতের শব্দে ডুবিয়া যাইতেছে।

প্রথমতঃ শাশুড়ী আসিয়া বহুর গালে সেক দিলেন, পরে অন্যান্য সকলে বরকন্যাকে "পরছি" লইলেন। সারি সারি কয়েকটা ডালি-য়াতে এক একখানি সোহারী পাতা ছিল। সোহারী এক রকম শুষ্ক লুচী; কন্যা প্রথমেই সেই সেই সন্দমঙ্গলা সোহারীতে পদার্পণ করি-লেন। তার পর ডালায় ডালায় পা দিতে দিতে একেবারে কুলদেবতার ঘরে উপস্থিত হইলেন।

সেইখানে বর কন্যাকে "কোহবরে" (বাসর) বসাইয়া গান আরম্ভ হইল। এই সময় বরের ভগিনীগণ ছুটিয়া আসিয়া "খোইছ" ঝাড়িবার জন্য ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিল, কিন্তু বরের মাতা বিবাদটা বড় বেশি দূরে যাইতে দিলেন না, কনিষ্ঠা কন্যার হাত ধরিয়া বলি-লেন "রাজিয়া কনিয়ানীকের খোঁইছ খোলতেই" (রাজিয়া কনের কোঁচা খুলবে), তার পর খোঁইছ অর্থাৎ অঞ্চলবদ্ধ কতকগুলি আতপ চাল একটু সিন্দূর ও একটা টাকা পাইয়া সাহ্লাদে রাজিয়া সমবয়স্কা ভগিনীদের দেখাইতে গেল। তবে ভগিনীর এই লাভে অপরা

ভগিনীরা প্রীতি দেখাইয়া স্বীয় নির্লোভত্বের পরিচয় দিতে পারে নাই ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

কিছুক্ষণ পরে বর কোহংবর অর্থাৎ বাসর হইতে উঠিয়া গেলেন। তখন কন্যার মুঁ দেখিবার ধুম পড়িল।

"মুঁ" খানি সুন্দর কি মন্দ তাহার বিচার মোটেই হইল না, "বড়ি সুন্দর, গোরী নাড়ী" (বেশ সুন্দর সুগৌরী) ইহাই সমস্ত সৌন্দর্য্যের বিশেষণরূপী হইয়া, অলঙ্কার ও বেশ ভূষায় দৃষ্টি পড়িল।

"দীয়া ঠো নান্ মহিয়া (মহিয়া আন্ আন্)" বলিয়া সকলে সেই বালিকাকে একেবারে আক্রমণ করিলেন। চিকৃ ধরিয়া নাড়িতে নাড়িতে এক যুবতা বলিল "ই কেইন কাট্সির হে দিদি! দেখ দেখ!" (এ কেমন কাট্সর, কাট্সর এক রকম কণ্ঠাভরণ) সাশ্চর্য্যে অপরা বলিয়া উঠিলেন, "হে! হে! দেখ! কনিয়ানীকে হাতমে দুঠো "মঠিয়া" ছেই, (কনের হাতে দুটো বালা আছে,) একঠো বাঁহিসে একঠো লুলুয়ামে" (একটা বাহুতে একটা নিচে হাতে) সকলেই মহা আশ্চর্য্য! কি অদ্ভূত অদ্ভূত গহনা! গলার চন্দ্রহার কোমরে! কানে তড়কী বীড় বা করণ্ফুল ঝুমক * নাই; তৎ-পরিবর্ত্তে একটা "চক্র হেন" কি ঝুলিতেছে।—হাতে বিধবার মত কতকগুলা চূড়ী আর মরদানার মত মঠিয়া! নোঘরী কাঙ্না মাঝালিয়া পুন্দ বা পেছালিয়া† ইত্যাদি কিছুই নাই!

সর্ব্বোপরি আশ্চর্য্য কণ্যার চুলবাঁধা! মেয়ে প্রথম শ্বশুর বাড়ী আসিল, মায়ে মেয়ের মাথায় নাড়ার সুতায় ফুদ্না বাঁধিয়া সিঁতুর পাটী দেয় নাই তৎপরিবর্ত্তে একটু ক্ষুদ্র সিন্দুরবিন্দু রঞ্জিত সুদীর্ঘ

---

* এ গুলি এক প্রকার কাণের গহনা।

† হস্তালঙ্কার।

সিঁথি কাটিয়া, একটা প্রকাণ্ড খোঁপ"! তাজব! তবে এত অলঙ্কারের মধ্যে একটি গহনা তাহাদের বড়ই মনঃপুত হইল, তাহা * * *। ইহার বড়ই প্রশংসা হইল, যাহা হউক কোন বিশেষ কারণে এ অলঙ্কারের পশ্চিমের নাম দিতে পারিলাম না, কিন্তু ইহা অপর কিছু নহে আমাদেরই সিঁথি! গহনার সমালোচনা চলিতেছে হঠাৎ এক বুদ্ধিমতী একটা নবীন আবিষ্ক্রিয়ায় বড়ই ধন্যবাদ ভাজন হইলেন। কন্যার অলঙ্কার গুলিতো রূপার নহে! সোনার যে! এত সোনা? কন্যার বাপ কিছু একনাথ বাবু অপেক্ষা ধনী নহেন, তা তাঁহার পত্নীর এক জোড়া ঝুমকা নথ ও মাথার সেই সিঁথি ছাড়া আর কিছু সোনার নাই, আর এ মেয়ের সর্ব্বাঙ্গে সোনা ঝক্ মক্ করিতেছে। আশ্চয্য! বাঙ্গালী লোকের সকলি আশ্চর্য্য!

অবশেষে ধাৰ্য্য হইল এত সোনা নহে! একজন প্রৌঢ়া বিজ্ঞতা-পূর্ণ স্বরে কহিলেন, "ছোটুকি ভৌজি নেই জানেইছ! (ছোট বৌ জান না!) বাঙ্গালী আরো গিল্‌ট্টকে গহোনা পিন্দেইছে! (বাঙ্গালীরা গিল্‌টীর গহনা পরে!) ফুফুদিদি ভাগলপুরসে একদফে হামরালেন এইনে মঠিয়া আরো মালা ভেজিলিঢ়েই; (পিসিমা ভাগলপুর থেকে একবার আমার জন্যে এমনি বালা ও মালা পাঠিয়েছিল,) হাম্রে এইনে গহনা ফুফুদিদি লগ্ বহুৎ দেখিছালা। (আমি এমন গহনা তাঁর কাছে অনেক দেখেছিলাম)।"

যাহা হউক সে বিস্তর কথা। অবশেষে কন্যার নাকে নথ নাই ইহা মহা অমঙ্গলের চিহ্ন, সে সম্বন্ধে সম্‌ধি, আর সম্‌ধিনীকে (বেহাই ও বেহান্) অনেক অনুযোগ করিয়া এবং তৎপরিবর্ত্তে কন্যার নাকে একটি ক্ষুদ্র লণ্ঠনবিশেষ ঝুলিবার কোনও কারণ না দেখিতে পাইয়া নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন;

অবশেষে শ্বাশুড়ী আসিয়া বলিলেন, তোমরা এখন একটু বাহিরে যাও, বউ কাপড় ছাড়ুক। আর তোমরা বউকে জলখাবার আনিয়া দাও।—

সে রাত্রিটা এক রকম গোলমালে কাটিয়া গেল। মুখ দেখার ব্যাপারটা বাঙ্গালী বেহারীতে প্রভেদ নাই, সমস্ত গ্রামের ইতর সাধারণের স্ত্রীগণেকও মুখ দেখাইতে দেখাইতে কন্যা বেচারা ক্লান্ত হইয়া পড়িল।

কন্যার সঙ্গে একজন দাসী আসিয়াছিল, সে তো এখানে আসিয়াই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গিয়াছে। সে অশ্রুতপূর্ব্ব ভাষা, (পশ্চিমের পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের ভাষায় বিস্তর প্রভেদ!) সে নিভাঁজ মেয়েলি কথাগুলা দাসীটার বড়ই জঞ্জাল হইয়া উঠিল; তবে ইসারা ইঙ্গিতে যতদূর হয় তাহাই! কিন্তু ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলি তাহাকে লইয়া বড় রঙ্গ করিতে লাগিল।

একটি মেয়ে আসিয়া বলিল হে দাই!—দাসী দাই শব্দ শুনিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিল, ছেলে প্রসব করাতে জানিনে বাবু! তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া আর একটী মেয়ে বলিল "পান পিবা দাই!" (জল খাবে?) দাই বলিল, "না গো পান খাবনা আমি, তোমাদের এখানে যে পান, মুখ পুড়ে গ্যাছে, ধনে সুপুরী দাওনা পানে, ও পান কি খাওয়া যায়!"

অনর্গল এতগুলি কথা তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইল না, বলিল, "পুরি খেইভ্যা? গে মাই দাইনে পুরি খাইনে মাঙ্গেইছে গে! (লুচি খাবে? ও মা দাই পুরি খেতে চায়!)

বালক ছুটিয়া মাতার নিকট চলিল, সে দাসী তো মহা ব্যাকুল;

ওমা কোথা যাব গো! কে পুরী খেতে চেয়েছে গো! একেবারে গিন্নির কাছে হাজির হলে কেন?

মেয়ে কয়টি বুঝিল না, বলিল—"তোঁহে কি জাত ছ জি"

এবার দাসী বুঝিল, বলিল "জাত! আমরা কৈবর্ত্ত"; "কোবোত্তো! কুর্ম্মি" ?—

"না না কৈবর্ত্ত দাস!—তোমাদের দেশে কি বলে ছাই জানিও না যে!"

এমন সময় একটি বড় মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া বলিল "হে জি! কনিয়ানীকে মাই আরো চাচী কের নাও কি জি! (ও গো কনের মা ও কাকীর নাম কি ?)"

দাই উত্তর দিতে না দিতে আর একটি স্ত্রীলোক দৌড়িয়া আসিয়া বলিল—"নেই বলিহ দাই! নাই বলিহ! গারী দেতেই—(বলিও না বলিও না গালি দিবে)" এই নবাগতা যুবতী দূর সম্পর্কে কন্যার পিসি; জন্মেও ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্রদের মুখ না দেখিলেও তাহার সম্পর্কজ্ঞান সাধারণ পশ্চিমে স্ত্রীলোকদের ন্যায় তীব্র! যে গ্রামে একজনের "নানীহর" (মাতামহালয়) সেখানে একজনের "শ্বসড়ার" শ্বশুর বাড়ী) সুতরাং দুইজনের নিকট সম্পর্কে কোনও পশ্চিমের অধিবাসী সন্দেহ রাখেন না। সুতরাং বঙ্গপ্রবাসিনীর বিস্তর পিসি মাসী দাদী জুটিতে বিলম্ব হয় নাই। প্রথমা ঈপ্সিত কার্য্যে বাধা পাইয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "নেই বোল্লেই কি হোতেই! হামে পরেমকে পূছবন্। (না বল্লেত কি ? আমি পরেমকে জিজ্ঞাসিব)।"

"হঁ! পরেম শাশুরো নাম লেতেই! (হ্যাঁ পরেম শাশুড়ীর নাম লবে ?)"

দুইজনে তখন রীতিমত কলহের উদ্যম দেখিয়া ঝিটা অন্যত্র

প্রস্থানের পথ দেখিতে লাগিল। বাস্তবিক মেয়ের মায়ের নাম না জানায় তাহাদের গীতের বড় সুবিধা হইতেছিল না।

এদিকে কন্যার অধিক বিপদ! তাহার বয়স প্রায় ত্রয়োদশ উত্তীর্ণপ্রায়; তবুও ছেলে মানুষ। মায়ের কোল ছাড়িয়া প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসিতে কোন্ মেয়ের মন প্রফুল্ল থাকে? তাহার উপর হঠাৎ এই অপরিচিত দেশে অপরিচিত মানুষদের মধ্যে পড়িয়া বালিকা বড় অস্থির হইয়া উঠিল, চারিদিকে চাহিয়া সে এমন লোক খুঁজিয়া পাইল না যাহার কাছে একটু বসিয়া কাঁদে! সঙ্গে ভাই ছিল, সে তো সর্ব্বদা ভিতরে আসে না, আসিলেও তাহার কাছে সর্ব্বদা এত লোক থাকে যে কথা বলিবার সময় হয় না। দাসীরও পক্ষে তাহাই! তবে তাহার সঙ্গিনীগণের দ্বারা সে সর্ব্বতোভাবে উপদ্রুত হইলেও তাহাদের কথা শুনিয়া সে হাসি রাখিতে পারিত না! অবশ্য সে কথা সে সমস্তটা বুঝিতে পারিত না।

একটী মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "হে ভৌজি তোরা নাম কি ছেই জি! (বৌ তোমার নাম কি ভাই!)" সে কি বলিবে! লজ্জায় প্রথমে সে কিছুই বলে না, পরে অনেক আবদারে অবশেষে ফুস্ ফুস্ করিয়া বলিল 'সরোজ কুমারী"।

একটু দূরে একজন যুবতী আপনার কন্যার মাথার উকুন মারিতেছিলেন, তিনি নাম শুনিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন "বড়ি আচ্ছা! দোনো গত্নীকে (গত্নী অর্থাৎ জা) নাম এক্কে রঙ্! (বেশ! তুই আর নাম এক রকমই।) তারাবতী আর সারাবতী!" বা! বা! কি সুন্দর উদ্ভাবন শক্তি! সরোজ তো মনে মনে হাসিয়া আকুল; কোথায় সরোজ আর কোথায় সারাবতী! বতীত্বটুকু সব নামে যোগ করিতে হইবেই তো!

তার পর নুনাবতী—নামটি নুনিয়ারই উচ্চ সংস্করণ, বাল্যের নুনিয়া যৌবনে নুনাবতী হইয়াছেন, ইনি সরোজের ভাগিনেয়ী, ফুলবাড়িয়ার মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা সভ্যা রমণী; ঢোলক বাজাইয়া গীত গাহিতে ইঁহার মত প্রায় কেহ জানে না, এবং আঙ্গিয়া টোপি ঘাঘ্‌ড়ী কুর্ত্তা প্রভৃতি সূচীকার্য্য সিকিরঝাঁপি মৌনি ডালিয়া প্রভৃতি বিস্তর শিল্পকার্য্যেও ইঁহার অধিকার ছিল;—নুনাবতী মামীর নিকট বসিয়া বলিল মামী হে! হামড়া তোহরা আরো হেন বাঙ্গালী বোলী সমুঝাই দ্যা নি!) আমাকে তোমাদের মত বাঙ্গালা কথা শিখাও না!)

হাঃ হাঃ! মামীকেই তুমি এখন দুইমাস ধরিয়া তোমার কথা শিখাও, তবে না হয় মামী একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে!

এইরূপে সর্ব্বদাই কৌতুক চলিতেছিল কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একটা কৌতুকে একটু বিভীষিকাও ছিল।

সরোজ যখন দাসীকে লইয়া ইঁদারার আড়ালে স্নান করিতেছিল তখন একটা ছোট মেয়ে তাহা লুকাইয়া দেখিতেছিল, হঠাৎ দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া মাতাকে বলিল "দিদি গে দিদি! ছোটকী চাচী মরদানা হেনী বড়কাঠো গামুছা সেঁ সগ্‌রো আঙ্গ পোছেছে, কেশটানি ঝপাস্‌ ঝপাস্‌ দ্যাকে ফটুকাইছে গে! (পুরুষের মত একটা বড় গামছায় সমস্ত গা মুছিতেছে; চুলগুলি ঝপ্‌ ঝপ্‌ করে ঝাড়িতেছে।)"

মাতা কন্যাকে চটাস করিয়া এক চড় মারিলেন। "চুপ রহে হাড়াসঙ্খ নেইতি!" (চুপ্‌ কর মুখপুড়ি!)

তার পর চুপি চুপি বধূর নিকটে আসিয়া বলিলেন আমাদের দেশে স্ত্রীলোক গামছা ব্যবহার করে না, আঁচলেই সে কাজ সারিতে

হয়। "বেটি পুতহু" র 'দে?' চন্দ্র সূর্য্য যেন দেখিতে না পান ইহাই নিয়ম! স্নানটা একটু শীঘ্রই শেষ করিও। সরোজ নিঃশব্দে শুনিল, কিন্তু এত লজ্জাশীলতার কারণ বুঝিতে পারিল না; শ্বশুরবাড়ীর কঠোর নিয়মে মনে মনে শিহরিল। পরদিন গামছাখানি ঝিকে দান করিল, তবে চুল শুকাইবার ভয়ে মাথায় আর বেশি জল ঢালিত না।

তার পর এক দিন সরোজের পিত্রালয় হইতে একখানি চিঠি আসিয়াছিল, বালিকা তো প্রথমে মহা ব্যস্ত, সে চিঠি দেখিয়া না জানি ইহারা কি বলে! কিন্তু তাহা হইল না, দুলাহিনী পড়িতে পারে দেখিয়া মেয়ে মহলে এক হুলস্থুল পড়িয়া গেল! স্ত্রীলোকে পড়িতে পারে? কি আশ্চর্য্য! "পরেম্‌ক বহু"র মান্যটা একটু উচ্চ হইল। নুনাবতী প্রমুখ যুবতীরা সরোজের উপর পড়্‌তা হইল, হাম্‌রা আরোকে লিখা পঢ়া শিখাব নেই জি! (আমাদেরকে লেখা পড়া শিখাও না ভাই)।

সরোজ হাসিয়া বলিল, "আমি তো হিন্দি জানি না ভাই!"

"তবে বাঙ্গলাই শিখাও।"

তাই হইবে! সরোজ তাহাদের কথায় পারিত না, অগত্যা স্বীকার হইল; কিন্তু প্রথমভাগ কোথায়, অন্যান্য উপকরণ কোথায়! আচ্ছা এবার যখন সরোজ ফিরিয়া আসিবে তখন লইয়া আসিবে। তবে এখন? সরোজ শ্বশুরবাড়ী আসিবার সময় আপনার বইগুলি রাখিয়া আসিয়াছে; তবুও পোর্টমেণ্টের ভিতরে দুই একখানি বই ছিল, মেয়েরা তাহা ধরিয়া ফেলিল, "পড়, তাহাদেরকে এই বহি পড়িয়া শুনাও!"

অগত্যা সে পড়িল। তবে সরোজের দরদের বই "স্নেহলতা" বা

"কৃষ্ণকান্তের উইল" শুনিয়া তাহারা বিন্দুমাত্রও আনন্দ প্রকাশ করে নাই; বরং "আলো ও ছায়া" খানি শুনিয়া তাহারা বাহবা দিয়াছিল! অবশ্য তাহা কবিতার মধুর মর্ম্ম বুঝিয়া নহে; তবে সরোজের সুমিষ্ট স্বরে ছন্দের মিলশুদ্ধ আবৃত্তির গুণে তাহারা উপন্যাস অপেক্ষা কাব্যই বড় পছন্দ করিয়াছিল। কিন্তু সরোজ এই পড়াপড়ি ব্যাপার বড় পছন্দ করিল না, কারণ এযে কেহ বুঝিতে পারে না তাহা সে বুঝিয়াছিল। সে বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা পরাইতে তাহার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ ছিল না।

সরোজের স্বামীর কথা কিছু বলা হয় নাই, আর বলিবারও বড় বেশি নাই; ছেলে মানুষ বর, এই মাত্র সতের বৎসর বয়স। বিশেষ পশ্চিমের পুরুষগণ স্বভাবতই লজ্জাশীল, তিন চারি সন্তানের পিতা হইয়াও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা পিতা বর্ত্তমানে তাহারা দিবসে স্ত্রীর ছায়া স্পর্শ করে না।

বেচারী প্রেমলাল দ্বিরাগমন করিয়া মধ্যে এক সপ্তাহ বাটীতে ছিল, তাহার পর ভাগলপুর চলিয়া গিয়াছে। সেখানের স্কুলে সে থার্ড ক্লাসের ছাত্র।

এই সামান্য অবসরে সে যে কয় রাত্রে স্ত্রীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিল, তাহাতে মেয়েরা অনেক চেষ্টা করিয়াও বাঙ্গালীর মেয়ের স্বামীর সহিত নির্লজ্জ আলাপ দেখিতে পায় নাই। তবে তাহা স্বামীর সহিত সরোজের ভাব না থাকার দরুণ নয়, বাপের বাড়ী থাকিতে প্রায়ই বর সেখানে যাইত।

বলা বাহুল্য সে প্রণয় এখানে সরোজের বড় আশ্রয় ছিল না, তাহার নিঃসঙ্গ দিন সেই একমাত্র প্রিয়ের দর্শনকামনায় অধীর হইলেও বালিকার সুখগ্রহণ তাহার লজ্জা পর্ব্বতের কোন্ কন্দরে যে লুক্কায়িত হইয়াছিল তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

যাহা হউক দিন কষ্টে দুঃখে চলিয়া যাইতে লাগিল, পশ্চিমে বাস ক্রমে সরোজের অভ্যাস হইতে লাগিল। তবু দেশের কথা, সেখানকার সাঙ্গনীদের কথা, সেই তাস খেলা, গল্প গুজব রঙ্গরস সব মনে পড়িলে তাহার এই "তেরি মেরি" ভাষিণীগণের সঙ্গ অসহ্য হইয়া উঠিত। কিন্তু থাকিতে থাকিতে সরোজ বুঝিল সুসভ্য বঙ্গদেশে বাস অতি সুখের হইলেও এই বিদেশই তাহার আপন দেশ; এই দেশেই তাহাকে চিরজীবনটা কাটাইয়া যাইতে হইবে। ইহা ভাবিতে বালিকা সরোজ যেন হাঁপাইয়া উঠিত। আবার সময় সময় ভাবিত এদেশে থাকিব না, বড় হইলে বরকে বলিয়া বাঙ্গলা দেশে গিয়া থাকিব। আবার কখনও ভাবিত ভয় কি? আমারও হয় তো এদেশের মতই অভ্যাস হইয়া যাইবে, তখন আর সে দেশের জন্য মন কেমন করিবে না! ইত্যাদি। তবে কিছু দিন থাকিতে থাকিতে সে ক্রমেই বুঝিল এদেশ অসভ্য হইলেও মানুষের দেশ, পশ্চিমের মেয়েরা নির্ব্বোধ হইলেও নারী, স্ত্রীহৃদয়ের সমস্ত কোমল গুণরাশিতেই তাহারা ভূষিতা; ক্রমে সরোজের সহিত মেয়েদের বেশ ভাব হইল।

তবে পশ্চিমের রীতি নীতি সরোজ কোন মতে আয়ত্ত করিতে পারিল না। আর সময় সময় শাশুড়ী প্রভৃতির মুখে "বাঙ্গালীক্ বেটির" (বাঙ্গালী মেয়ের) "ঝগ্‌রাহী" (কুঁদুলে) প্রভৃতি বিশেষণ বিশিষ্ট গুণগান শুনিয়া সে বড়ই ব্যথিত হইত। মনে করিত আমি যদি এখানে থাকি দেখাইব বাঙ্গালীর মেয়ে বেশি ঝগড়া জানে কি তোমাদের পশ্চিমের মেয়েরা বেশি জানে।

এইরূপে বাঙ্গালীর মেয়ে বেহারে বাস করিতে লাগিল।

প্রবাসিনী।

বাঙ্গালীর শ্রেণীবিভাগ। *

ক্ষত্রিয়।

বর্ণবিভাগের ক্রম ব্যবস্থা অনুসারে ক্ষত্র বা ক্ষত্রিয় দ্বিতীয় বর্ণ। বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে বহুস্থানে এই জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ পুরুষ সূক্তে আছে যথা;—"বাহূরাজন্যকৃতঃ" ব্রহ্মের বাহুই রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয়। মনু বলিয়াছেন "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ"। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিনটি বর্ণ দ্বিজাতি। দ্বিজাতিরা উপনয়নাদি সংস্কারার্হ। অধ্যয়ন, শস্ত্রবিদ্যাভ্যাস ও প্রজাপালন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। পুরাকালে ক্ষত্রিয়েরাই শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণের অনুশাসন অনুসারে পৃথিবী পালন করিতেন। ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব মহাবীর পরশুরাম ব্রাহ্মণের অবমাননার প্রতিশোধার্থ একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। বহুবিপ্লবে ভারতবর্ষে এক প্রকার ক্ষত্রিয়তেজঃ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে উদয়পুরের মহারাণাই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশের উদাহরণ বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত। মনু ক্ষত্তৃ নামে আর একটি বর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা;—"শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা" শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ক্ষত্তরা ধনী, পূর্ব্বকালে ইঁহারা কোষাধ্যক্ষের কার্য্য করিতেন। এখনও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অনেক বাণিজ্যব্যবসায়ী ধনশালী

---

* বিগত মাসে ভ্রমক্রমে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নাম বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ তর্কালঙ্কার মহাশয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নহেন। তিনি রাঢ়ীয়শ্রেণী ব্রাহ্মণ। মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।

ক্ষত্তুর বাস আছে। ক্ষত্রিয় কিংবা ক্ষত্তু এই উভয় জাতিই বাঙ্গালা-দেশের প্রাচীন অধিবাসী নহেন। সুপ্রসিদ্ধ বর্দ্ধমানের মহারাজা ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভভ বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। জঙ্গিপুরের রাজবংশ ক্ষত্রিয়।

প্রচলিত মতানুসারে বাঙ্গালা প্রদেশে বৈশ্যজাতির বাস নাই। কলিকাতার বড়বাজারের আগরওয়ালা বেণেরা আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন কিন্তু তাঁহারাও অবিমিশ্র বৈশ্য কি না উহা প্রমাণসাপেক্ষ। আমাদের দেশে গন্ধবণিক্, সুবর্ণবণিক্ প্রভৃতি যে সকল বাণিজ্যব্যবসায়ী জাতি বৈশ্যত্বের দাবী করেন যথাস্থানে তাঁহাদের বিষয় আলোচিত হইবে।

বৈদ্য।

বাঙ্গালাদেশে বৈদ্য ও কায়স্থ নামক দুইটি জাতির বাস আছে। এই উভয় সম্প্রদায়ে, অনেক ক্ষমতাপন্ন লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই দুই সম্প্রদায়ের কে বড়, কে ছোট লইয়া একটা প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। এই জিজ্ঞাসার মীমাংসার জন্য অনেকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রধানতম রাজপুরুষ হইতে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পর্য্যন্ত সকলেই এই সমস্যার মীমাংসার জন্য ব্যাকুল। এ পর্য্যন্ত কোন মীমাংসা হয় নাই, ভবিষ্যতেও যে সর্ব্ববাদিসম্মত কোন মীমাংসা হইবে তাহারও সম্ভাবনা অল্প। এই দুই বর্ণের কে শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে আমরাও কোন মত প্রকাশ করিব না, তবে আপাততঃ এই উভয় সম্প্রদায়ই সম আসনে আসীন এইরূপ স্থির করিয়া উভয়ের বিবরণ কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বৈদ্যদের মধ্যে অনেকে আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত

করেন। কারণ বৈদ্য নামক কোন জাতির বিষয় শাস্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই। বৈদ্য শব্দ সাধারণতঃ চিকিৎসক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঙ্গালাদেশের বাহিরে অর্থাৎ বিহার, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ, মধ্য-ভারতবর্ষ ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ব্রাহ্মণেরাই চিকিৎসাবৃত্তির অনু-শীলন করেন এবং তদ্দেশীয় চিকিৎসক ব্রাহ্মণেরাই বৈদ্যনামে অভি-হিত হইয়া থাকেন। অন্য জাতীয় লোকেও যদি চিকিৎসাবৃত্তি করে তাহাদিগকেও বৈদ্য বলে। অতএব বৈদ্যশব্দ যে কোন জাতি বা সম্প্রদায়বাচক নহে, উহা এক প্রকার নিঃসন্দেহ। অতএব অম্বষ্ঠকেই যদি বৈদ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তাহাতেও আপত্তি উপস্থিত হয়। বৈদ্যেরা স্বয়ংই ঐরূপ আপত্তি করেন। কারণ মনুসংহিতা প্রোক্ত অম্বষ্ঠ জাতি বর্ণসঙ্কর। মনু বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠোনাম জায়তে।

মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায় ৮ম শ্লোক"।

প্রাচীন মেধাতিথি এই শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন;—"কন্যাগ্রহণং স্ত্রীমাত্রোপলক্ষণার্থমিতি ব্যাচক্ষতে বৈশ্যস্ত্রিয়ামিত্যর্থঃ"। অর্থাৎ এই শ্লোকে যে 'বৈশ্যকন্যা' শব্দের প্রয়োগ আছে উহার অর্থ বৈশ্যস্ত্রী। অতএব মেধাতিথির মতে ব্রাহ্মণের ঔরসে যে কোন বৈশ্যস্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান অম্বষ্ঠ। ইহাতে ব্রাহ্মণের পরিণীতা পত্নী বুঝাইল না। অতএব ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত না হইলে অবৈধ সন্তান হয়, সুতরাং প্রাচীন সুবিজ্ঞ বৈদ্যগণ বরং বৈশ্যত্ব কিংবা শূদ্রত্ব স্বীকার করিতেন তথাপি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের অবৈধ সন্তান বলিতে সম্মত হইতেন না। কিন্তু আধুনিক নব্যশিক্ষিত বৈদ্যগণের মত স্বতন্ত্র। তাঁহারা ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভজাতত্ব অঙ্গীকার করিয়া উপবীত গ্রহণ করি-তেছেন। মনুসংহিতার অপর টীকাকার কুল্লুকভট্টের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত

করিয়া তাঁহারা আপনাদিগের দ্বিজজাতিত্ব ও উপনয়ন সংস্কারার্হত্ব প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। কুল্লুকভট্ট লিখিয়াছেন ;—"কন্যাগ্রহণাদত্র উঢ়ায়া মিত্যধ্যাহার্য্যং বিন্নাস্বেব বিধিঃ স্মৃত ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন স্ফুটীকৃতত্বাচ্চ। ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামূঢ়ায়ামম্বষ্ঠাখ্যো জায়তে"। অর্থাৎ পরিণীতা বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি হইয়াছে। মনু বর্ণসঙ্করগণের বৃত্তি নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন। "সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্"। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বিপ্রকন্যার গর্ভজাত সন্তান সূতজাতি, তাহার বৃত্তি অশ্বসারথ্য। আর ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত সন্তান অম্বষ্ঠ, তাহার বৃত্তি চিকিৎসা। স্কন্দপুরাণে অম্বষ্ঠজাতির উৎপত্তি সংক্রান্ত একটী উপাখ্যান আছে নিম্নে উহার সারাংশ লিপিবদ্ধ হইল।

মহর্ষি গালব এক সময়ে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। একদিন পথিমধ্যে তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়েন। ঋষি জলের অনুসন্ধান করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন একটী যুবতী জলপূর্ণ কলসী কক্ষে করিয়া সেই পথে গমন করিতেছেন। ঋষি তাঁহার নিকট জল প্রার্থনা করিলেন। যুবতী ঋষিকে জলপান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিলেন। ঋষি "পুত্রবতী হও" বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। যুবতী কাঁদিয়া বলিলেন "ঋষে ! আমার অদ্যাপি বিবাহ হয় নাই। আমি কুমারী অতএব কিপ্রকারে পুত্রবতী হইব ?" কন্যার পিতা ঐ ব্যাপার জানিতে পারিয়া গালবকে বলিলেন "মহর্ষে ! আমি জাতিতে বৈশ্য, আপনি কৃপা করিয়া আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন"। গালব বৈশ্যকন্যার পাণিগ্রহণে সম্মত হইলেন না, কিন্তু তিনি যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন উহা মিথ্যা হইবার নহে। সুতরাং অন্যান্য ঋষিগণ মন্ত্রণা পূর্ব্বক কুশদ্বারা একটি পুত্র নির্ম্মাণ করিয়া

বৈশ্য কুমারীর ক্রোড়ে প্রদান করিলেন। সেই পুত্রই অমৃতাচার্য্য—ধন্বন্তরি। তাঁহার পিতৃকুল নাই, জন্মাবধি অম্বা অর্থাৎ মাতৃকুলে অবস্থিতি করায় অম্বষ্ঠনামে পরিচিত হন এবং বেদমন্ত্রদ্বারা প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিয়া বৈদ্যনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

এই বৈদ্যজাতি কেবল বাঙ্গালা দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের অন্য কোনও প্রদেশে এই জাতির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে অম্বষ্ঠনামক এক সম্প্রদায়ের বাস আছে, তাঁহারা কায়স্থ জাতির একটি শ্রেণীবিশেষ। কথিত আছে ঢাকার সুবাদার নিবাইস মহম্মদের পত্নী স্বামীর মৃত্যুর পর ঢাকার শাসন-কর্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত হন। বৈদ্যজাতীয় রাজা রাজবল্লভ তাঁহার অধীনে নায়েব সুবাদারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। অসাধারণ কৌশলী রাজা রাজবল্লভ সুবাদারপত্নীর বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি বিপুল সম্পদ্ অর্জ্জন করেন। ঢাকা জেলার অন্তর্গত (অধুনা পদ্মাগর্ভে লয় প্রাপ্ত) রাজনগরে তাঁহার বাস ছিল। বহু অট্টালিকা ও জলাশয়াদি দ্বারা তিনি ঐ নগরকে সুশোভিত করেন। রাজবল্লভ বৈদ্যজাতীয় বহুব্যক্তিকে ভূসম্পত্তি ও চাকুরী দিয়াছিলেন। বৈদ্য-জাতির উপনয়ন সংস্কারের বিষয় প্রথমে তাঁহারই মনে উদিত হয়। এক সময়ে তিনি কাশী মিথিলা নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতবর্গকে সমবেত করিয়া বৈদ্য জাতি যে অম্বষ্ঠ এবং উপনয়ন সংস্কারার্হ এই মর্ম্মে এক ব্যবস্থাপত্র প্রার্থনা করেন। তাঁহার ইচ্ছানু-সারে এক ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত হয়—সকল পণ্ডিত উক্ত ব্যবস্থা-পত্রে স্বাক্ষর করেন নাই। কিন্তু গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ বৈদ্যগণ বলেন তাঁহারা অনেক দিন হইতে উপবীত গ্রহণ করিয়া আসিতে-ছেন। পূর্ব্বে ইঁহারা উপবীত কোমরে রাখিতেন, এখন গলদেশে

ধারণ করিতেছেন। প্রায় ১৭। ১৮ বৎসর গত হইল পূর্ব্ববঙ্গের দুই তিনটি বৈদ্যজমিদার মিলিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের নিকট হইতে এক ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতেই নানা স্থানে বৈদ্যগণের উপনয়ন সংস্কার আরব্ধ হইয়াছে। এবারেও যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইতেছে তাহা বলা যায় না।

পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যজমিদারেরা যে ব্যবস্থাপত্র প্রণয়ন করাইয়াছিলেন, উহাতে বহুস্থানের বহু অধ্যাপক স্বাক্ষর করিয়াছেন। কোন একটি প্রধান স্থানে উক্ত ব্যবস্থাপত্র স্বাক্ষরিত করাইতে গেলে একজন অধ্যাপক বলিয়াছিলেন "বৈদ্য জাতিই যে অম্বষ্ঠ উহার যতক্ষণ নিঃসন্দেহ প্রমাণ না পাইব, ততক্ষণ ব্যবস্থাপত্র স্বাক্ষরিত করিব না"। তাহার পর সেখানকার আর একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত তাঁহাকে বলেন যে "আমরা ত এরূপ ব্যবস্থা দিতেছি না যে অমুক সেন কিংবা অমুক গুপ্ত দ্বিজ কিংবা উপনয়ন সংস্কারার্হ। আমরা বলিতেছি মনুপ্রোক্ত অম্বষ্ঠ জাতি উপনয়ন সংস্কারার্হ, তাহাতে আমাদের দায়িত্ব কি"? তাহার পর উক্ত অধ্যাপক ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করেন। আর একটি স্থানে এক জন স্মার্ত্ত অধ্যাপকের কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য যজমান ছিল। ব্রাহ্মণ যজমানেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! আপনি কি বৈদ্যগণের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করাইবেন?" তিনি বলিলেন স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্পষ্ট বলিয়াছেন "কলৌ অম্বষ্ঠঃ শূদ্রবৎ" কলিযুগে অম্বষ্ঠেরা শূদ্রবৎ ব্যবহার্য্য অতএব কি প্রকারে উক্ত কার্য্য করিব। উহা শুনিয়া বৈদ্যরা সেই অধ্যাপককে পুনরায় উপনয়ন সম্পন্ন করাইতে অনুরোধ করিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণেরা বলিলেন আপনি উপনয়নে পৌরহিত্য

করিলে আমরা আপনার দ্বারা ক্রিয়া করাইব না। অধ্যাপক সঙ্কটে পড়িয়া ব্রাহ্মণ যজমান ত্যাগ করিতে পারিলেন না সুতরাং বৈদ্যগণ অন্য পুরোহিত গ্রহণ করিলেন।

যাহা হউক বহুদিন হইতে বৈদ্যসংক্রান্ত অনেক তর্ক বিতর্ক হইতেছে। নানা গ্রন্থে এ বিষয়ে নানা কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সে সমুদয়ের আলোচনা সম্ভবপর নহে। তবে বাঙ্গালাদেশের বৈদ্যদের চিকিৎসাবৃত্তি ও পরম্পরাগত প্রসিদ্ধি অনুসারে বোধ হয় ইঁহারা অম্বষ্ঠ জাতি। বৈদ্যদের উপবীত গ্রহণে তত বাধা হইত না যদি পুরুষ-পরম্পরাগত উপনয়নের প্রথা থাকিত। যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের উপনয়ন সংস্কার একেবারে হয় নাই, তাঁহাদের ঔরসজাত সন্তানেরা ব্রাত্যহোমরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কি প্রকারে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন, ইহাই লোকের প্রধান আপত্তির হেতু। আপত্তিকারীরাও যে বৈদ্যদের উপনয়ন সংস্কারে বাধা দিতে গিয়া ভাল কার্য্য করেন তাহা নহে। আজকাল যে সকল জাতি উপবীত গ্রহণের জন্য আন্দোলন করিতেছেন, তাহাদের তুলনায় বৈদ্যদের উপবীত গ্রহণে বাধা কি? আর উপবীত গ্রহণ করিলেই যে তাঁহারা রাতারাতি ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবেন এ আশঙ্কাও অমূলক। বৈদ্যসম্প্রদায়ও বোধ হয় তাহা ইচ্ছা করেন না। পূর্ব্বে সকল বৈদ্যই এক মাস অশৌচ গ্রহণ করিতেন, এখন কোন স্থানে ১৫ দিন কোথায়ও এক মাস অশৌচ গৃহীত হয়।

আমাদের এই সকল লেখা পাঠ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে বাঙ্গালা দেশের সকল বৈদ্যই উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ অদ্যাপি বৈদ্যসম্প্রদায়ের অর্দ্ধাংশের অধিক অনুপনীত অবস্থায় আছেন। অনুপনীত বৈদ্যকে উপনীত বৈদ্য যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন। রাঢ়দেশ ভিন্ন পূর্ব্ববঙ্গে অদ্যাপি

অনেকে অনুপনীত অবস্থায় আছেন। কালিয়া সেনহাটী প্রভৃতি বৈদ্য প্রধান স্থানেও কিছু দিন পূর্ব্বে অনেকের উপনয়ন হয় নাই। বোধ হয়, আজও কেহ কেহ অনুপনীত থাকিতে পারেন।

বৈদ্যদের মধ্যে কৌলীন্য আছে। কিন্তু বহুবিবাহ তত দেখা যায় না, কারণ ইঁহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক নহে। বৈদ্যদের মধ্যে কতিপয় জমিদার আছেন, তন্মধ্যে বাণীবহ তেঁওতা ও মেহেরপুরের জমিদারেরা অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন। অনেক দিন হইতে বৈদ্যেরা সংস্কৃত-চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন। এ সম্প্রদায়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যতীত ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রবীণও অনেক লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভট্টিকাব্যের অন্যতম টীকাকার ভরত মল্লিক আপনাকে অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইদানীন্তনকালেও মুরসিদাবাদের মৃত গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় নানা শাস্ত্রে প্রবীণতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক কৃতবিদ্য ছাত্র আছেন। কলিকাতার কবিরাজবৃন্দের মধ্যে প্রসিদ্ধ কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত। এতদ্ভিন্ন কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র কবিরাজ, নিশিকান্ত সেন, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও নগেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতিও চিকিৎসাশাস্ত্রে নিপুণ।

বৈদ্যসম্প্রদায়ে অনেক কবি ও গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিত্বের জন্য বিখ্যাত। নববিধান সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অতিশয় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। বৈদ্যসম্প্রদায়ের সংখ্যা অনুসারে চাকুরে ও উকীল মোক্তার ডাক্তার প্রভৃতির সংখ্যা অনেক অধিক। ব্যারিষ্টার ও উকীল সম্প্রদায়ে মিঃ পি, সি, সেন, বাবু দুর্গামোহন দাস, কালীমোহন দাস, বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ বরাট

প্রভৃতি অতিশয় খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সিবিলিয়ানের সংখ্যা অল্প নহে। উড়িষ্যার কমিসনার মিঃ কে, জি, গুপ্ত, হাইকোর্টের জজ মিঃ বি, এল্ গুপ্ত, দেশীয় সিবিলিয়ান মিঃ কে, এন্, রায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ডেঃ মাজিষ্ট্রেটের মধ্যে বাবু রামশঙ্কর সেন, কবি নবীনচন্দ্র সেন, রঘুবংশের অনুবাদক নবীনচন্দ্র দাস প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণের পরিচিত। তিব্বতভ্রমণকারী রায় শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই তিব্বতীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সভাজগতে সুপরিচিত হইয়াছেন। ইণ্ডিয়ান্ মিরার সম্পাদক নরেন্দ্র নাথ সেন রাজনীতিবিশারদ বলিয়া ভারতবিখ্যাত হইয়াছেন। বৈদ্য সম্প্রদায়কে প্রায় নিম্নকার্য্যে ব্রতী দেখা যায় না। স্বগণ প্রতিপালন করা ইঁহাদের আর একটি গুণ। বংশের মধ্যে একজন ক্ষমতাপন্ন হইলে অন্য সকলে নিশ্চয়ই তাঁহার দ্বারা উপকৃত হন। চট্টগ্রাম প্রদেশে বৈদ্য ও কায়স্থ জাতিতে পরস্পর বিবাহ হয়। এ সম্বন্ধে সংপ্রতি চট্টগ্রামের মোক্তার বাবু জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে ভারতী কার্য্যালয়ে যে পত্রখানি আসিয়াছে তাহার মর্ম্ম আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

এখনও চট্টগ্রামে বৈদ্যেরা একমাস অশৌচ গ্রহণ করেন এবং স্ত্রীলোকেরা নামের শেষে দাসী ও পুরুষেরা দাস, দাস দাস, দাস দাস দাস, লেখেন। চট্টগ্রামে এমন বৈদ্যবংশ বিরল, যাহার সহিত কোন না কোন সময়ে কায়স্থবংশের বিবাহ হয় নাই। জগৎবাবু বলেন এদেশের বৈদ্যদের অনেকেই বড় চাকুরে ও জমিদার হইয়া ক্রমে ক্রমে কায়স্থদের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিতেছেন। কালে কায়স্থের সহিত সম্বন্ধ ছিল এ কথাটী বিলুপ্ত হইয়া যাইবে তজ্জন্য তিনি এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

কায়স্থজাতি।

কায়স্থজাতির তত্ত্ব সংক্ষেপে লিখিলেও একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। অতএব বর্ত্তমান প্রবন্ধে এতদ্বিষয়ের সূচনা মাত্র করা হইবে। কাশ্মীর হইতে মলবর উপকূল ও গুজরাট হইতে আবাকান পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র কায়স্থজাতির বাস। এমন মহানগরী, নগরী উপনগরী কিংবা গ্রাম বিরল, যেখানে উল্লেখযোগ্য কায়স্থের বাসস্থলী বিদ্যমান নাই। বেদে অম্বষ্ঠ কিংবা কায়স্থজাতির উল্লেখ নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু অম্বষ্ঠজাতির উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু কায়স্থের উল্লেখ করেন নাই। প্রাচীন স্মৃতিসংহিতা ও অগ্নিপুরাণ, স্কন্দ পুরাণ গ্রন্থে কায়স্থজাতির ভূরি ভূরি উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন সংস্কৃতনাটক মৃচ্ছকটিক এবং মুদ্রারাক্ষসে ও নৈষধ চরিতে কায়স্থের বর্ণনা আছে। এই কায়স্থজাতিকে কেহ শূদ্র, কেহ বর্ণসঙ্কর, কেহ বা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলেন। প্রথমে বিচার করা কর্ত্তব্য "কায়স্থ" শব্দটী জাতিবাচক কি না? যদি জাতিবাচক না হয়, কেবল লেখক অর্থে রূঢ় হয়, তবে অন্য পন্থা দেখা উচিত। আর যদি কায়স্থ শব্দ জাতি-বাচক হয় তবে কায়স্থ শব্দসম্বন্ধে স্বপক্ষ বিপক্ষ মতগুলির আলোচনা করা একান্ত বিধেয়। আমরা কায়স্থ শব্দযুক্ত প্রাচীন বচনগুলি বারংবার তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়াছি। দুই চারিটি স্থলে লেখক অর্থ করিলেই বেশ সঙ্গত হয় কিন্তু অধিকাংশ স্থলে জাতি অর্থ না করিলে অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না, অতএব কায়স্থ শব্দ জাতিবাচকই স্থির করা গেল।

অগ্নিপুরাণে লিখিত হইয়াছে—ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, পদদ্বয় হইতে শূদ্র নামক কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র হাম। হামের পুত্র প্রদীপ।

প্রদীপের পুত্র কায়স্থ। এই কায়স্থের চিত্ররথ, চিত্রগুপ্ত ও চিত্রসেন নামে তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। চিত্ররথ গন্ধর্ব্বলোকের আধিপত্য লাভ করেন। চিত্রগুপ্ত যমরাজের লেখক পদে বৃত হন। আর চিত্র-সেনের ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত, করণ, সেন, সিংহ ইত্যাদি ৭২ সংখ্যক পুত্র উৎপন্ন হন, তাঁহারাই কায়স্থজাতির মূল।

কেহ কেহ বলেন মনুপ্রোক্ত করণজাতিই কায়স্থ। মনু বলিয়াছেন ;—

ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্‌ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসোদ্রবিড় এবচ।"

(মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায় ২২ শ্লোক)

ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, দ্রবিড় এই কয়টি জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। নিচ্ছিবি, নট, খস, দ্রবিড় প্রভৃতি স্বনাম প্রসিদ্ধ। এক সময়ে নিচ্ছিবিগণ মহা পরাক্রান্ত হইয়া বাহুবলে ভারতবর্ষের একাংশ শাসন করিয়াছিল। খস্ জাতি নেপাল প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়, উহারা ক্ষত্রিয় অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন। যদি করণই কায়স্থ হয় তাহা হইলে কায়স্থ জাতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয়।

কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ মতে করণজাতি বর্ণসঙ্কর। বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রা কন্যার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা মসীজীবী বা লেখক। যদি লেখনবৃত্তি দর্শনে কায়স্থকে করণ বলা যায় তাহা হইলে ভ্রম হয়। বস্তুতঃ কায়স্থের বর্ণসঙ্করত্ব সম্বন্ধে কোনই প্রবাদ নাই। প্রকৃতপক্ষেও কায়স্থ বর্ণসঙ্কর নহে। বোধ হয় ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত-পুরাণোক্ত করণজাতি উড়িষ্যার সৃষ্টিকরণ নামক মসীজীবী জাতিবিশেষ হইবে। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত রেণুকা মাহাত্ম্যে লিখিত হইয়াছে ;—যখন পরশুরাম ধনুতে শরযোজনা করিয়া ক্ষত্রিয় বধে

প্রবৃত্ত হইলেন, তখন কোন নৃপতি গহনবনে কেহবা পাতালে পলায়ন করিলেন। পূর্ণগর্ভা ক্ষত্রিয়রাজ চন্দ্রসেনের ভার্য্যা দাল্‌ভ্য ঋষির আশ্রমে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। তাহার পর পরশুরামও সেখানে আসিয়া অতিথি হইলেন। ঋষি, পরশুরামকে উত্তমরূপে আহার করাইলে তিনি বধের নিমিত্ত চন্দ্রসেনের ভার্য্যাকে প্রার্থনা করিলেন। দাল্‌ভ্য ঋষি বলিলেন আমি চন্দ্রসেনের ভার্য্যাকে প্রদান করিতেছি কিন্তু তাহার গর্ভস্থ সন্তানটি আমাকে প্রদান করিতে হইবে। রাম বলিলেন আমি ক্ষত্রিয়ান্তকারী আমার নিকটে তুমি কায়স্থ অর্থাৎ শরীরস্থ গর্ভ প্রার্থনা করিলে অতএব তোমাকে আমি উহা প্রদান করিলাম। এই শিশুর "কায়স্থ" এই আখ্যা হইবে এই বলিয়া পরশুরাম স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সেই ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেনরাজার স্ত্রী দাল্‌ভ্য ঋষির আশ্রমে পুত্র প্রসব করিলেন। মহর্ষি দাল্‌ভ্য পরশুরামের অনুরোধে সেই তনয়কে ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া চিত্রগুপ্তের ধর্ম্ম তাহাকে অর্পণ করিলেন। তাহার বংশে যে সকল সন্ততি জন্মগ্রহণ করিল, তাহারা দাল্‌ভ্য গোত্র হইল। দাল্‌ভ্য গোত্রীয় ক্ষত্রধর্ম্ম বহিষ্কৃত কায়স্থেরা দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা ও অতিথি সেবায় নিরত।

এই সকল বিষয় পাঠ করিয়া নিশ্চয় প্রতীতি হয়, কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়জাতি হইতেই সমুদ্ভূত। কায়স্থজাতির বুদ্ধিও সাহসও ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচায়ক। আর প্রায় দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্ব হইতে এই জাতিকে রাজনৈতিক ব্যাপারে ব্যাপৃত দেখা যায়। অনেক কায়স্থ "সান্ধিবিগ্রহিকের" কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে কায়স্থজাতি যদি ক্ষত্রিয় হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে, তবে ইঁহারা উপবীত গ্রহণ করেন না কেন? ইহার উত্তর এই কায়স্থেরা ক্ষত্রধর্ম্ম বহিষ্কৃত ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, এই জন্য কায়স্থেরা উপবীত গ্রহণের চেষ্টা করেন নাই। বিহারে

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে কোন কোন কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে উপবীত গ্রহণ প্রথা আছে কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণের যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকেন। অন্যান্য দেশের কায়স্থের বিষয় বলিতে হইলে একখানি গ্রন্থ হইয়া পড়ে অতএব আমরা এখানে বাঙ্গালাকায়স্থের বিষয় সংক্ষেপে লিখিয়াই কায়স্থজাতির বিষয় শেষ করিব।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কায়স্থকে শূদ্র এবং শূদ্রোচিত বিধি পালনেরই ব্যবস্থা দিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে একটি প্রবাদ আছে যে বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ৮৩২ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার তদানীন্তন রাজা আদিশূরের যজ্ঞে যে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন করেন, তাঁহাদের সহিত পাঁচজন কায়স্থ ভৃত্যরূপে আগমন করিয়াছিলেন। ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত, উপাধিবিশিষ্ট কায়স্থেরা তাঁহাদেরই সন্তান। এখন প্রশ্ন হইতে পারে পূর্ব্বোক্ত পাঁচ জন কায়স্থ ব্যতীত সেন, সিংহ, দে, রাহা, নাগ, দাস, হোড়, আইচ্, ভৌমিক, রাহুত, চন্দ্র, চাকী, রুদ্র, ভঞ্জ, গুপ্ত, সোম, রক্ষিত, ধর, নন্দী, পালিত, কর, বর্দ্ধন, গুঁই, আশ, ভদ্র, শীল, দাম, বল, হেশ, প্রভৃতি বহু উপাধিবিশিষ্ট কায়স্থের বাস কি পূর্ব্ব হইতেই এদেশে ছিল না পরে হইয়াছে? এ বিষয়ে অনেকে অনেক মত প্রকাশ করেন। আমরা এখানে সে বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। কায়স্থজাতির কুলজীতে আছে, যে চারিজন কায়স্থ কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন বল্লাল কর্ত্তৃক তাঁহারা কৌলীন্য মর্য্যাদায় ভূষিত হন। আর দত্ত "দত্ত কার ভৃত্য নয় সঙ্গে এসেছে" বলিয়া নিজের গাত্র হইতে ভৃত্যত্বের ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদত্ত হয় নাই। কোন

কোন কায়স্থ বলেন—"কায়স্থ-জাতি কোন দেশে, কোন কালেই শূদ্র ছিল না। আর কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহচর কায়স্থেরাও ভৃত্য ছিলেন না। পঞ্চ ব্রাহ্মণ এদেশে আগমনপূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত নিরীহ বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ পাইয়া তাহার উপর সম্ভবাতিরিক্ত প্রভুত্ব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এমন কি তাঁহাদের সাহায্যকারী কায়স্থদিগকেও ভৃত্যত্ব স্বীকার করাইয়া তবে তাঁহাদের স্বীয় প্রতিপত্তির অংশভাগী হইতে দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কনোজাগত ব্রাহ্মণগণের ষড়যন্ত্রেই বাঙ্গালায় কায়স্থ জাতি "শূদ্র"। সে যাহা হউক সংপ্রতি কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিয়া অভ্যুত্থান করিতেছেন। কয়েক দিন পূর্ব্বে কলিকাতার বাবু রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে এক পণ্ডিতসভা হয়। উহাতে বাঙ্গালার অনেক অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই কায়স্থকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় স্বীকার করিয়া এক ব্যবস্থা পত্র দিয়াছেন। কায়স্থদের এই অভ্যুত্থান কিছু অসাময়িক হইয়াছে, অন্ততঃ বৈদ্যগণ যে সময় উপবীত গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে সময়ে যত্ন করিলেও অপেক্ষাকৃত সুবিধা হইত। এতদিন প্রাচীন শ্রেণীর কায়স্থেরা শূদ্রত্ব পাকাইবার জন্যই যেন ব্যস্ত ছিলেন। এখনও দাস উপাধিবিশিষ্ট কলিকাতার ও মফস্বলের কায়স্থেরা নিমন্ত্রণ পত্রাদিতে "দাস দাস" উপাধির ব্যবহার করেন। যাহা হউক প্রাচীন কায়স্থেরা বিনয় প্রকাশের অনুরোধেই হউক, অথবা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের প্ররোচনাবশে হউক কিংবা নিজেদের অজ্ঞতা প্রযুক্তই হউক স্ব স্ব নামের পশ্চাৎ দাস শব্দ ব্যবহার করায় তাঁহাদের ক্ষত্রিত্বের দাবী এক কালে বিলুপ্ত হয় নাই। নানা দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে কায়স্থকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়াই মনে হয়। বাঙ্গালার কায়স্থেরা এক মাস অশৌচ গ্রহণ করেন। এবং সর্ব্ববিষয়েই শূদ্রাচার প্রতিপালন করেন।

বাঙ্গালা দেশে কায়স্থেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ;—দক্ষিণরাঢ়ী বঙ্গজ, উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র। সকল শ্রেণীর কায়স্থের মধ্যেই কৌলীন্য প্রথা আছে। কায়স্থের কৌলীন্য ব্রাহ্মণের ন্যায় কন্যাগত নহে, উহা পুত্রগত। অনেকে বলেন "অনেক সময় কায়স্থ জাতির মধ্যে অনেক বিভিন্ন জাতি প্রবেশলাভ করিয়াছে"। এই জাতির মধ্যে হাইকোর্টের জজ্ হইতে আদালতের পেয়াদা, দোকানদার, ফেরিওয়ালা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী কায়স্থের মধ্যে মাহামুদপুরের সীতারাম রায় ও যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য ক্ষত্রোচিত বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। কায়স্থজাতিতে অনেক বাঙ্গালা কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কাশীরামদাস, মাইকেল মধুসূদন, হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান সময়েও রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর এক জন খ্যাতনামা গদ্য লেখক। অমৃতবাজারের বাবু মতিলাল ঘোষ প্রভৃতি রাজনৈতিক ব্যাপারে নিযুক্ত আছেন। কায়স্থজাতিতে চাকুরের সংখ্যা এত অধিক যে সংখ্যা করা যায় না। প্রত্যেক বিভাগেই প্রায় কায়স্থ বড় কর্ম্মচারী। হাইকোর্টের জজ্ মৃত দ্বারকা নাথ মিত্র, রমেশচন্দ্র মিত্র ও বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও চন্দ্র মাধব ঘোষ হাইকোর্টের বিচারাসনে উপবিষ্ট আছেন। সিবিলিয়ান্ রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রভৃতি অনেক আছেন। ব্যারিষ্টার মিষ্টার টি পালিত, মনোমোহন ঘোষ, মিষ্টার আর মিত্র, আনন্দমোহন বসু, প্রভৃতি বিখ্যাত। শেষোক্ত মিষ্টার বসু ও পাটনাকলেজের অধ্যাপক মিষ্টার ডি, এন, মল্লিক বাঙ্গালীর মধ্যে 'র‍্যাঙ্গলার'। উকীল রাসবিহারী ঘোষ, গণেশচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীনাথ দাস, কালীনাথ মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণনগরের প্রসন্নকুমার বসু, মেদিনীপুরের কার্ত্তিক চন্দ্র মিত্র, নাগপুরের বিপিনকৃষ্ণ বসু, বৰ্দ্ধমানের

নলিনাক্ষ বসু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। কুচবেহারের দেওয়ান কালিকাদাস দত্ত, দরভঙ্গার চন্দ্রশেখর বসু প্রভৃতি রাজামাত্য। সবজজ্ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, আফিসের বড় বাবু অনেক আছেন। জমিদারের মধ্যে দীনাজপুরের মহারাজ, পাইকপাড়ার রাজবংশ, শোভাবাজারের রাজবংশ, টাকীর মুন্সীবংশ, পাথুরেঘাটার ঘোষবংশ, ঝামাপুকুরের মিত্রবংশ, ভবানীপুরের ঘোষবংশ, যশোহর চাঁচরার রাজবংশ, নড়ালের জমিদারবংশ, রংপুর কাঁকিনিয়ার রাজা, ডিমলার রাজা, ময়মনসিংহ সন্তোষের জমিদার, ফরিদপুর লক্ষ্মীকোলের রাজা, মানিকদহের রায়বংশ প্রভৃতি অনেক আছেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র ও প্রসিদ্ধ আবিষ্কারক অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু কায়স্থকুলভূষণ। ইয়ুরোপে ও আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্মের গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য কায়স্থ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দস্বামী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

উগ্রক্ষত্রিয়।

বাঙ্গালাদেশের আর একটি জাতি উগ্রক্ষত্রিয়। মনু বলিয়াছেন;—

ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্বস্তুরুগ্রোনাম প্রজায়তে ॥
(মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায় ৯ শ্লোক)

ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্র কন্যার গর্ভে উগ্রক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা ক্ষত্র ও শূদ্র উভয় বপুবিশিষ্ট। বর্দ্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় এই সম্প্রদায়ের সংখ্যা অধিক। উগ্র ক্ষত্রিয়েরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। বর্দ্ধমান ও নদীয়া জেলায় উগ্র ক্ষত্রিয় জাতীয় কতিপয় জমিদার আছেন। উগ্র ক্ষত্রিয়েরা নামের অনুরূপ কঠোর প্রকৃতিবিশিষ্ট, বলবিক্রমে বাঙ্গালায় অতি অল্পজাতি আছে, যাহারা উগ্র ক্ষত্রিয়ের তুল্য। এই জাতির মধ্যে অনেক

ইংরেজী শিক্ষিত ও চাকুরে আছেন। সংস্কৃতমহাভারতপ্রকাশক প্রতাপচন্দ্র রায় সি, আই, ই, উগ্রক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীসত্যপ্রকাশ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীশ্রীকল্যাণেশ্বর মহাদেব।

দূর হইতে চন্দ্রমৌলি পাহাড়ের পশ্চিম দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, কেবল কতকগুলি অবিরল-সন্নিবিষ্ট গাঢ় শ্যামবর্ণ বৃক্ষশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটু নিকটে অগ্রসর হইলে দেখিবে, সেই শ্যামল বৃক্ষশ্রেণী ভেদ করিয়া, একটী ত্রিশূলশোভিত মন্দিরের চূড়া আকাশের পানে উঠিয়াছে। আরও নিকটে যাও দেখিবে, সেই তরুরাজির মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাকিয়া একটী অতি প্রশস্ত পথ উৰ্দ্ধদিকে উঠিয়াছে, আর তাহার দুই ধারে গাছগুলি বিচ্ছিন্নভাবে একটীর উপরে আর একটী থাকে থাকে উঠিয়াছে। সেই পথ দিয়া কিছুদূরে অগ্রসর হইলে একটী বৃহৎ দেবমন্দির ও তৎসংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র পল্লী আবিষ্কৃত হইবে। এই মন্দিরে শ্রীশ্রীকল্যাণেশ্বর মহাদেব বিরাজমান, এই গ্রামটীর নাম কল্যাণপুর। মন্দিরটী চন্দ্রমৌলি পাহাড়ের সংলগ্ন ও পার্শ্বদেশে অবস্থিত।

মন্দিরটী প্রস্তরনির্ম্মিত, পাহাড়ের সঙ্গে গাঁথা। তাহাতে উঠিবার জন্য সুবিস্তৃত ও সুপ্রশস্ত সোপানশ্রেণা বিদ্যমান। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে থরে থরে সাজান বৃক্ষশ্রেণী। চারিদিকের ফুলগাছে চাঁপা নাগকেশর, করবীর, টগর, জবা প্রভৃতি ফুল, বন্যলতায় নানাবর্ণের বনফুল ফুটিয়া

রহিয়াছে। পাহাড়ের শৃঙ্গ হইতে একটী নির্ঝরধারা শুষ্ক পত্ররাশির মধ্য দিয়া ধীরে নীরবে অবতরণ করিয়া মন্দিরের সম্মুখে একটী প্রস্তরময় বাপীর মধ্যে অলক্ষিতভাবে সঞ্চিত হইতেছে, ও তাহার মধ্য হইতে একটী পিত্তলনির্ম্মিত ব্যাঘ্রমুখ নলের দ্বারা সশব্দে তীব্রবেগে মন্দিরপাদপ্রান্তে উদ্গীর্ণ হইতেছে। এই নির্ঝরবারি স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল—যেন দ্রুত রজতধারা প্রবাহিত হইতেছে। সেই সুশীতল বারিশীকরস্পর্শে সমস্ত উপবনটী প্রচণ্ড মধ্যাহ্নকালেও সুস্নিগ্ধ। এখানে প্রায়ই সূর্য্যের আলো প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা পাহাড়ের পশ্চিম দিকে অবস্থিত বলিয়া বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে এখানে সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না। সূর্য্য মস্তকের উপর আসিলে বৃক্ষরন্ধ্রের মধ্য দিয়া যে আলোকরেখা প্রবেশ করে, তাহা শ্যামবর্ণ পত্ররাজির উপরে নিপতিত হওয়াতে এক প্রকার স্নিগ্ধ তরল শ্যামল ছায়াময় আলোকে সমস্ত উপবন আলোকিত হয়। তখন সেই শ্যামোজ্জ্বল আলোকপ্রবাহে শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত প্রভৃতি নানাবর্ণের পুষ্পগুলি মৃদু বায়ুবিধূননে হেলিয়া দুলিয়া ভাসিতে থাকে। উপবনের শান্তিময় গম্ভীর নিস্তব্ধতা সেই বারিধারা পতনের ঝঙ্কৃত নিনাদে ভগ্ন হইয়াছে। আর থাকিয়া থাকিয়া ময়ূরের কর্কশধ্বনি, কোকিলের পঞ্চমতান, পাপিয়ার স্বরলহরীতে সেই বনভূমি কম্পিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীকল্যাণেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটী এই সুরম্য উপবনের ক্রোড়ে অবস্থিত। মন্দিরটী বহু প্রাচীন, এখন প্রায় জীর্ণ হইয়াছে। বাহিরের গায়ে প্রস্তরগুলি স্থানে স্থানে স্খলিত হইয়াছে। মন্দিরের ভিতরে ঘোর অন্ধকার, এমন কি দিবা দুই প্রহরে আলো ব্যতিরেকে প্রবেশ করা কঠিন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে হয়।

।নিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে, মন্দিরের মধ্যস্থলে একটী সুচিক্কণ কৃষ্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত বৃহৎ বাণলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই কল্যাণেশ্বর মহাদেবের মূর্ত্তি।

কল্যাণেশ্বর মহাদেব জাগ্রত দেবতা। এই অঞ্চলের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলে তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করে। প্রতি বৎসর শিবরাত্রির সময়ে এখানে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয় ও সাত দিন পর্য্যন্ত একটী মেলা বসে। অন্য সময়েও দেশ বিদেশ হইতে অনেক যাত্রী দেবদর্শনে আসিয়া থাকে।

মন্দিরের নিম্নে কল্যাণপুর গ্রামে ৮।১০ ঘর সেবক ব্রাহ্মণের বাস। তাঁহারা এই ঠাকুরের সেবা পূজা করেন। কণকপুরের কোন এক পুরাতন রাজা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ গুলী স্থাপন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের নামে ৫০ মান (একর) জমি "খঞ্জা" আছে, তদ্দারা ব্রাহ্মণ ঠাকুরের সেবা ও নিজ নিজ সেবা নির্ব্বাহ করেন। এই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ পল্লীতে বিনন্দ পণ্ডার বাস।

বেলা এক প্রহর হইয়াছে, কিন্তু এখনও কল্যাণপুর গ্রামে সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করে নাই। সূর্য্যের মুখ দেখা না গেলেও সম্মুখবর্ত্তী প্রান্তর হইতে তাঁহার কিরণের উজ্জ্বলতা উদ্ভাসিত হইয়া গ্রাম আলোকিত করিয়াছে। বিনন্দ পণ্ডা তাঁহার ঘরের পিণ্ডায় বসিয়া তালপত্রে উড়িয়া ভাগবতগ্রন্থ নকল করিতেছেন। পিণ্ডার নাচে একটী গরু বান্ধা আছে, সে খড় খাইতেছে। ঘরের সম্মুখে কয়েকটী আম ও কাঁটাল গাছে অনেক ফল ধরিয়াছে। এক ঝাঁক বানর সেই আম গাছে বসিয়া কাঁচা আমের সর্ব্বনাশ করিতেছে। পণ্ডা ঠাকুর এক একবার উঠিয়া গিয়া "হো—হো—মলা—মলা" রবে তাহাদিগকে তাড়া করিতেছেন, কিন্তু তাহারা আবার আসিয়া বসিতেছে ও ঠাকুরের দিকে

তাকাইয়া দাঁত খিচাইতেছে। বিনন্দের বয়স প্রায় ৩০ বৎসর, চেহারা গৌরবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি। মাথায় লম্বা চুল, বুকের লোমও বিলক্ষণ লম্বা। তাঁহার ঘরে একমাত্র স্ত্রী—তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর। বিনন্দ তাঁহাকে দশ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির রীতি অনুসারে তাঁহাকে ৬ বৎসর পিত্রালয়ে থাকিতে হইয়াছিল—আজ দুই বৎসর হইল তাঁহাকে স্বগৃহে আনিয়াছেন।

অন্যান্য সেবকদিগের সহিত ভাগ বণ্টনে বিনন্দ কেবল দুই মান দেবোত্তর জমি পাইয়াছেন। ইহাই তাঁহার একমাত্র উপজীবিকা। এই জমির উৎপন্ন হইতে মাসের মধ্যে পাঁচ দিন তাঁহাকে মহাদেবের অন্ন-ভোগ দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন নিজের গৃহে পৈত্রিক কুলদেবতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মী জনার্দ্দন বিগ্রহও আছেন। তাঁহাকেও প্রত্যহ পূজা করিতে হয় ও ভোগ দিতে হয়। তবে এই গৃহদেবতার ভোগ দেওয়া বড় কঠিন কথা নহে। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাদের উভয়ের ভোজনের জন্য প্রত্যহ যে অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করেন, তাহাই প্রথমে এই বিগ্রহের নিকট নিবেদন করা হইলে, তাঁহারা সেই প্রসাদ ভোজন করেন। ইহা ছাড়া বিনন্দের কয়েকঘর যজমানও আছে। তাহাদের বাড়ীতে শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে মাসে আট আনা কিম্বা এক টাকা প্রাপ্তি ঘটে। এই পৌরহিত্য ব্যবসায়ে তিনি খুব পটু। অর্থাৎ অর্থ না বুঝিয়া অনেক গুলি মন্ত্র তন্ত্র আওড়াইতে পারেন, আর মহিম্নস্তোত্র ও বিষ্ণুর সহস্র নাম বেশ সুর করিয়া পড়িতে পারেন, এবং গীতগোবিন্দের দুই একটী শ্লোকও তাঁহার কণ্ঠে বিরাজ করে। তাঁহার হাতের লেখাটী ভাল, তিনি খুব দ্রুতবেগে তালপত্রে লিখিতে পারেন। সেজন্য ভাগবত পুঁথি নকল করিয়া বিক্রয় করাতে তাঁহার কিঞ্চিৎ লাভ হয়। মোটকথা, এই ব্রাহ্মণটী এক হিসাবে খুব দরিদ্র, কিন্তু অন্য আর এক হিসাবে

্ব সৌভাগ্যশালী। তাঁহার স্ত্রী সাবিত্রীদেবী অসাধারণ রূপলাবণ্য-
়তা। বিনন্দের দোষের মধ্যে এই, তাঁহার বুদ্ধিটা বড় মোটা।

বিনন্দ পণ্ডা বানর তাড়াইয়া আসিয়া আবার সেই লেখনী হস্তে
পণ্ডার উপরে বসিলেন, এমন সময়ে দুইজন লোক আসিয়া উপস্থিত
ইল। বিনন্দ তাহাদিগকে বসিতে বলিবার পূর্ব্বেই তাহারা পিণ্ডায়
উঠিয়া বসিল ও তন্মধ্যে দৈত্যারি দাস নামক এক ব্যক্তি এইরূপে কথা
আরম্ভ করিল। "পণ্ডা! একি করিতেছ?"

বিনন্দ তাঁহার লেখনী ও তালপাতা রাখিয়া বলিলেন "কেন?
ভাগবত লিখিতেছি।"

"ভাগবত লিখিয়া তুমি পাও কি?

"এক একটী অধ্যায় লিখিয়া দুই পয়সা পাই।"

"একটী অধ্যায় লিখিতে কত সময় লাগে?"

"তা শ্লোক সংখ্যা বুঝিয়া—তবে এক দিনে একটী অধ্যায় শেষ
হইতে পারে।"

"এক দিন পরিশ্রম করিয়া, তুমি পাইলে মাত্র দুই পয়সা, মাসে
পাইলে প্রায় এক টাকা! আচ্ছা একশ টাকা এইরূপে রোজগার
করিতে তোমার কত দিন লাগিবে?"

এতগুলি টাকা তাঁহার দ্বারা রোজগার হইবার সম্ভাবনা শুনিয়া
বিনন্দের মুখে একটু হাসি দেখা দিল। তিনি দন্ত বাহির করিয়া
বলিলেন "কেন? এ কথা জিজ্ঞাসা কর? এত টাকা রোজগার করা
আমার এ জীবনেও ঘটিবে না! আমি গরিব ব্রাহ্মণ!"

দৈত্যারি একটু অগ্রসর হইয়া বসিয়া বলিল "আচ্ছা; যদি তুমি
একসঙ্গে একশ টাকা আজই পাও, তবে তোমার কেমন লাগে?"

বিনন্দ ঈষৎ কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল—"তুমি আমাকে ঠাট্টা

কর কেন? আমি একশ টাকা আজ কোথায় পাব? তুমি দিবে নাকি?"

দৈত্যারি হৃষ্টচিত্তে বলিল—"হাঁ আমিই দিব—বাস্তবিক ঠাট্টা নয়—আমি যথার্থই তোমাকে একশ টাকা আজ—এখনই—দিতে পারি, যদি তুমি আমার একটা কথা রাখ।"

ইহা বলিয়া দৈত্যারি দাস ঝনাৎ করিয়া একটা টাকার তোড়া বাহির করিয়া বিনন্দের সম্মুখে রাখিল।

কোন চির-অনশনগ্রস্ত ব্যক্তির সম্মুখে এক থালা অন্ন ব্যঞ্জন রাখিলে, তাহার জিহ্বায় যেমন জল আসে, সেই টাকার তোড়া দেখিয়া বিনন্দের জিহ্বায়ও জল আসিল। সে এক সঙ্গে এত টাকা এজীবনে কখনও দেখে নাই, তাই সতৃষ্ণ নয়নে পুনঃপুনঃ সেই তোড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া দৈত্যারি ভাবিল, বঁড়শি মাছে ঠোকরাইতেছে, এবার টান দিলেই হয়। সে বলিল—

"কি দেখিতেছ? টাকা গুলি নেবে? যদি আমার কথা মত কাজ কর, তবে এখনি এগুলি তোমাকে গণিয়া দিতেছি।"

বিনন্দ হাসিয়া বলিল—"আমাকে কি করিতে হইবে বল না?"

তখন দৈত্যারি তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া অস্ফুটস্বরে কি বলিল। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া এক হাত দূরে গিয়া সরিয়া বসিল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইল। সে ক্রোধভরে বলিল—

"তুমি কেন এরূপ জাতি যাওয়ার কথা বল? তুমি কেন এখানে আসিয়াছ? তুমি এখনই চলিয়া যাও। আমার দ্বারা কখনই সে জাতি যাওয়ার কাজ হবে না।"

দৈত্যারি বলিল "আরে ঠাকুর রাখিয়া দেও তোমার জাতি! ুমি ত কোথাকার এক সেবক ব্রাহ্মণ—কত কত শাসন (১) ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ রাজার নিকট তাহাদের ভার্য্যা পাঠাইয়া দিয়া থাকে। কন, তুমি মাধব মিশ্র, মায়াধর সতপক্ষী, রত্নাকর ষড়ঙ্গী ইহাদের ্থা জান না? ইহারা বরং ইহাতে বিশেষ গৌরব মনে করে। াব, তোমার এত ভয় কেন—রাজাইত তোমার জাতি দিবার ও াত লইবার মালিক। আর রাজা ত তোমার ভার্য্যাকে রাখিয়া বেন না, আজই রাত্রে আমি পাল্‌কি করিয়া রাখিয়া যাইব, কেহ কথা জানিতেও পারিবে না।"

এই প্রবোধবাক্যে বিনন্দের মুখ আবার একটু প্রসন্ন হইল। হার মধ্যে টাকার তোড়াটার উপরে তাহার একবার দৃষ্টি পড়িল। বলিল—"আমার ভার্য্যা ইহাতে সম্মত হইবে না।"

তখন দৈত্যারি আবার ধমক দিয়া বলিল—"দেখ পণ্ডা, তুমি এই াজার এলাকায় বাস কর, রাজার দত্ত জমি খাও, আজই ইচ্ছা করিলে 'জা তোমার ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতে পারেন, ার তোমার জমিটুকু কাড়িয়া লইতে পারেন। তুমি বিবেচনা করিয়া থা বল। রাজার হুকুম, তুমি সম্মত না হইলে তোমাকে ধরিয়া ইয়া যাইব।"

বিনন্দ সভয়ে বলিল—"আমি কি নাস্তি করিতেছি? আমার ভার্য্যা দি আমার কথা না শুনে?"

(১) যে সকল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে উড়িষ্যার পূর্ব্বতন রাজারা গ্রাম দান করিয়া পিত করিয়াছিলেন তাহাদিগকে শাসন ব্রাহ্মণ বলে। শাসন অর্থ রাজদত্ত নপত্র।

"আরে তোমার ভার্য্যা তোমার কথা শুনিবে না, সে কি কথনও সম্ভব? তুমি তাহাকে বলিয়া দেখ না কেন? যাও একবার ঘরের ভিতরে যাও—আর এই টাকার তোড়াটাও হাতে করিয়া লইয়া যাও।"

ইহা বলিয়া দৈত্যারি টাকার তোড়াটা ঘরের দরজায় রাখিয়া দিল। বিনন্দও ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে বেশী দূর যাইতে হইল না। তাহার স্ত্রী সাবিত্রী বাসন মাজা শেষ করিয়া, সে গুলি রাখিবার জন্য ঘরে আসিয়াছিলেন। তিনি বাহিরে কি কথাবার্ত্তা হইতেছিল তাহা শুনিবার জন্য কপাটের আড়ালে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিনন্দকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া অন্তঃপুরের আঙ্গিনায় গেলেন।

সাবিত্রীদেবীর পরিধানে একখানা নীল রঙ্গের "কচ্ছ"-সাড়ী, হাতে পায়ে সামান্য রকমের সিসের গহনা—গলায় একছড়া রূপার মালা। তাঁহার পরিহিত বস্ত্রের মধ্য দিয়া উজ্জ্বল লাবণ্যছটা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তিনি বিনন্দকে বলিলেন—

"ও কি কথা হইতেছিল? ঐ টাকা কিসের?"

বিনন্দ সন্ত্রস্তভাবে বলিল "কেন তুমি ত দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিয়াছ। এই এক বিপদ উপস্থিত—"রজা" আমার ভিটা মাটি উচ্ছন্ন দিতে বসিয়াছেন—ইহার কি করা যায়?"

সাবিত্রী। কেন? তুমি ত আমাকে ঐ একশ টাকায় বিক্রয় করিয়াছ! তোমার আর বিপদ কি? তোমার এই রকম বুদ্ধি না হইলে, আমার কপালে আর এই দুর্দ্দশা ঘটিবে কেন?" ইহা বলিতে বলিতে সাবিত্রীর কণ্ঠ আর্দ্র হইল—চক্ষে জল আসিল। তিনি অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিলেন।

বিনন্দ বলিল—"আমি কি সাধ করিয়া এই জাতি যাওয়ার কথায় সম্মত হইয়াছি? তিনি হইতেছেন রজা—"দুর্ব্বল" (১) হাকিম—তাঁহার কাছে আমার কি বল আছে? আজ যদি উহারা তোমাকে জোর

(১) দুর্ব্বল অর্থাৎ দুষ্ট বল যাহার, অত্যাচারী, প্রবল

করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, তবে সাধ্য কি যে আমি তোমাকে রাখিতে পারি ?”

সাবিত্রী। তাই বুঝি টাকার লোভে, আপন খুসিতে আমাকে বেচিয়া ফেলিতেছ ? ধিক্ তোমারে! আর তোমারই বা দোষ দেই কেন ? দোষ আমার কপালের।

বিনন্দ। তবে এখন উপায় ? আমিত বাহিরে গেলেই উহারা আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে।

সাবিত্রী। তুমি তোমার নিজের পথ দেখ—তুমি নিজে পলাইয়া প্রাণ বাচাও—আমার পথ যাহা আছে তাহা আমি জানি।

ইহা শুনিয়া বিনন্দ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল, অনেকক্ষণ “ন যযৌ ন তস্থৌ” ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, আস্তে আস্তে রসুই ঘরের এক পার্শ্বে কুকুরের মত গিয়া বসিল। দৈত্যারির নিকট বাহির হইতে তাহার সাহসে কুলাইল না। সাবিত্রী সেই আঙ্গিনায় বসিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন, ও আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য নানা রকম চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণের দেরী দেখিয়া দৈত্যারি দাস দাও হইতে ডাকা ডাকি হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল। কোন সাড়াশব্দ নাই। কতক্ষণ পরে সাবিত্রী উঠিলেন, তাঁহার চক্ষে তখন জল নাই—দৃষ্টি স্থির, মুখ গম্ভীর। তিনি উঠিয়া গিয়া ঘরের মধ্য হইতে সেই টাকার তোড়া দরজা দিয়া বাহিরে ঝনাৎ করিয়া সজোরে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন ও দরজা বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। দৈত্যারির সম্মুখে হঠাৎ যেন একবার তড়িৎপ্রভা চমকিয়া গেল। সে সাবিত্রীর এই ব্যবহার দেখিয়া তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল এবং ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিনন্দ ও তাহার স্ত্রীকে নানা প্রকার অশ্রাব্যভাষায় গালি দিতে লাগিল। দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিবে এরূপ ভয়ও দেখাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে, নিতান্ত অসহ্য বোধ হওয়ায় সাবিত্রী আস্তে আস্তে দরজা খুলিলেন ও অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া স্থির গম্ভীর অথচ আর্দ্রকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

"দেখ, তুমি কি ভয় দেখাইতেছ? তুমি নিশ্চয় জানিও, যে সতী রমণী তাহার নিজের ধর্ম্ম রাখিতে চায়, কেহই তাহার ধর্ম্ম নাশ করিতে পারে না। এ সংসারে ধর্ম্ম কি একেবারেই নাই? তুমি যদি এখন বেশী বাড়াবাড়ি করিবে, তবে নিশ্চয়ই আমি আত্মহত্যা করিব। আর তোমাকে একথাও বলি, আমি যদি যথার্থ সতী হই, কল্যাণেশ্বর মহাপ্রভুকে যদি আমি যথার্থ ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করিয়া থাকি, তবে তুমি নিশ্চয় জানিও আমার উপর অত্যাচার করিলে তোমার রাজার কখনই কল্যাণ হইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মহাপ্রভু আমাকে রক্ষা করিবেন।"

ইহা বলিয়া সাবিত্রী পুনর্ব্বার দরজা বন্ধ করিলেন—দ্রুতবেগে অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। দৈত্যারি দাস হঠাৎ এইরূপে বাধা পাইয়া দমিয়া গেল। সে বুঝিল, এখন বেশী বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় পাছে সাবিত্রী আত্মহত্যা করিয়া বসেন। সে তাহার সঙ্গী লোকটীকে টাকার তোড়া কুড়াইয়া লইতে বলিল, ও উভয়ে আস্তে আস্তে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া গেল, সায়ংকালে রাজার লোকজন পাল্কী লইয়া আসিবে সাবিত্রী যেন তেল হলুদ মাখিয়া প্রস্তুত থাকেন।

সাবিত্রীদেবী কি করিলেন? তিনি স্বামীকে কোন কথা বলিলেন না বিনন্দও আর তাঁহার কাছে আসিতে সাহসী হইল না। তিনি স্নান করিয়া ধৌত বস্ত্র পরিধান করিলেন ও পূজা উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া কল্যাণেশ্বরের মন্দিরে গমন করিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মহাদেবের পূজা করিলেন ও দুই বাহু দ্বারা সেই মূর্ত্তিকে বেষ্টন করিয়া ভূমিতলে পড়িয়া ধন্না দিয়া রহিলেন। বিপদভঞ্জন কল্যাণেশ্বর তাঁহাকে কি এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন না?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

চিত্রাঙ্কন।

আমরা বাল্যকালে শ্লেটে কিম্বা কাগজে তিলোত্তমার মত লতা পাতা, হিজিবিজি, সেঁজুতির শিব ইত্যাদি লিখিতে লিখিতে হঠাৎ ঘোড়ার চেহারার মত যদি কিছু আঁকিয়া ফেলিতাম, তবে আশাস্নেহার্দ্র অভিভাবকগণ উৎসাহ দিয়া বলিতেন—"উট মুট ঘোড়া, এই চিত্রের গোড়া!" তখন মনে করিতাম, ছবি আঁকা এমন কঠিন কাজই বা কি? কিন্তু সত্যের অনুরোধে স্বীকার্য্য, তখনও কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহং উষ্ট্র অস্মজ্জনকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় নাই,—আর নিজের হস্তমুষ্টি, সে ত শ্লেট পেন্সিল ধরিতেই বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িত! এবং বোধ হয়, অন্য কাহাকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আদর্শ ধরিতে বলিলে তাহা "অদৃষ্ট" ক্রমে পৃষ্ঠদেশে পতিত হইবারই বিশিষ্ট সম্ভাবনা ছিল!

যাহা হউক, উট মুট ও ঘোড়ার ছবি আঁকা খব শক্ত হইলেও চিত্রাঙ্কনী শক্তির উহাই চরম সীমা নহে। বস্তুতঃ সুচিত্রকর হইতে হইলে সুকবির মত প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যাঁহার চিত্রাঙ্কনে স্বাভাবিক শক্তি আছে তিনি উপযুক্ত শিক্ষা পাইলেই উৎকৃষ্ট চিত্রশিল্পী হইতে পারেন। তবে অঙ্কনক্ষমতা ন্যূনাধিক পরিমাণে অনেকেরই আছে—যিনি বর্ণমালা লিখিতে জানেন তিনি ছবি আঁকাও শিখিতে পারেন। চিত্রাঙ্কনে চক্ষু ও হস্ত একত্র কাজ করে—যাহা চোখে দেখা যায় তাহা হাতে আসা চাই; এবং তাহা অভ্যাসের উপর অনেকটা নির্ভর করে।

পৃথিবীর সভ্যাংশে বহু প্রাচীনকাল হইতেই চিত্রকলার অনুশীলন হইয়া আসিতেছে। সংস্কৃত কাব্যাদিতে দেখা যায় পূর্ব্বকালে আমাদের দেশেও চিত্রবিদ্যার সমধিক চর্চ্চা ছিল। রাজারাণীরাও চিত্রাঙ্কন-

জ্ঞানের গর্ব্ব করিতেন; বিরহীবিরহিণীরা পরস্পরের চিত্র অঙ্কন করিয়া সুদীর্ঘ বিরহবাসর কথঞ্চিৎ কর্ত্তন করিতেন; প্রণয়ী প্রণয়িণী একত্র মিলিত হইয়া চিত্রদর্শনে চিত্তবিনোদন করিতেন; সুচিত্রিত রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া প্রেমিক আদর্শরমণী সৌন্দর্য্যের নিকট আত্মবলি প্রদান করিয়াছেন, তাহার কাহিনীও শুনা যায়। সুতরাং তখনকার ছবি যে খুব সুন্দর হইত তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহার আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

বর্ত্তমানে ইয়ুরোপে চিত্রশিল্প যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে ও করিতেছে তাহারই আদর্শে আমাদেরও চলিতে হইতেছে, কিন্তু আমরা এখনও বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছি। হস্তিদন্তাদির উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত বর্ণচিত্রে পশ্চিমাঞ্চলবাসীরা কেহ কেহ প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু বোম্বায়ের রবিবর্ম্মা ব্যতীত প্রকৃত চিত্র-কলায় ভারতে আর কেহ তত সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। দিনকত সংবাদপত্রে শ্রীযুক্ত শশিকুমার হেশের খুব সুখ্যাতি শুনিয়াছিলাম—তাঁহার তুলিকার কার্য্য এ পর্য্যন্ত আমাদের নয়নপথে পতিত হয় নাই। তিনি হয় ত দেশের বড় বড় লোকের চেহারা আঁকিয়াই জীবন ক্ষেপণ করিতেছেন—ঐতিহাসিক, পৌরাণিক অথবা কল্পনা-রাজ্যের চিত্রাবলী তাঁহার তুলিকায় উন্মীলিত হইয়া জনসাধারণের চক্ষে পড়িবে কি না তাহা কে বলিবে?* কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের কাদম্বরী-চিত্রের হাফ-টোন অনুকরণ রবীন্দ্রবাবুর কল্যাণে "প্রদীপে" ঈষৎ ফুটিয়া উঠিয়াছিল—মূল তৈল-চিত্রখানি যে কল্পনায় ও কলাকৌশলে খুবই আশাপ্রদ হইয়াছিল

* এই প্রবন্ধ মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হওয়ার পর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে শ্রীযুক্ত শশী-কুমার হেশের অঙ্কিত পৌরাণিক চিত্র শীঘ্রই সকলের দৃষ্টিগোচর হইবে।

তাহাতে সন্দেহ নাই। সংবাদপত্রে এই সকল উদীয়মান চিত্রকরের কার্য্যকলাপ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

যাহা হউক, আমরা অদ্য চিত্রাঙ্কনের কতিপয় মূল সূত্রের আভাস দিতে চেষ্টা করিব; তাহাতে ছবি আঁকিবার না হউক, ছবি বুঝিবার কিছু সহায়তা করিতে পারে।

সকলেই জানেন, জ্যামিতিক ক্ষেত্রাদি সরল বা বক্র রেখাদ্বারা এক সমতলে অঙ্কিত করা হয়—তাহাতে দৈর্ঘ্য ও বিস্তার মাত্রই দেখান যায়; উৎসেধ বা বেধ অঙ্কনের বিষয়ীভূত হয় না। কিন্তু বস্তু মাত্রই দৈর্ঘ্যবিস্তার ও বেধবিশিষ্ট, এবং যাহার উপর ছবি আঁকা হয়, যথা—বস্ত্র, প্রস্তর বা ধাতুফলক এবং কাগজ ইত্যাদি সমস্তই সমতল, সুতরাং সমতলের উপর পদার্থের প্রতিকৃতি কিরূপে আঁকিলে তাহার দৈর্ঘ্য বিস্তার ছাড়া বেধও যথাযথ প্রতিভাত হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক।

কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে পরিদৃষ্ট পদার্থের প্রতিকৃতি সমতল ক্ষেত্রে অঙ্কিত হওয়ার নামই ত ছবি? কাজেই অঙ্কিতব্য পদার্থ এবং চিত্রকরের অবস্থান সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট থাকা চাই—নচেৎ দর্শক বা বস্তুর অবস্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে প্রতিকৃতিরও রূপান্তর ঘটিবে। যেখান হইতেই দেখা যাউক না, পদার্থের সমস্ত অংশ ত আর দৃষ্টিপথে পড়ে না! সুতরাং যতটা দেখা যায়, তাহা ছাড়া, দর্শক বুঝিবে না ভয়ে এক চুল বেশী করিয়া আঁকিলেও, ছবি নষ্ট হইয়া যাইবে। প্রশ্ন হইয়াছিল—"পুতুলে আর ছবিতে তফাৎ কি?" এক ব্যক্তি উহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—"মূরতের চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা যায়, কিন্তু তোমার ছবির পিছনটা দেখা দূরে থাক্, চসমা চোখে দিয়া পাশটিও দেখিবার যো নাই।"

এই কথার মধ্যে এইটুকু সত্য নিহিত আছে যে ছবিটা একটু নড়াইলে চড়াইলে অথবা ছবি স্থির রাখিয়া চোখ দুটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিলেও, ছবিতে যাহা আঁকা আছে তাহা ছাড়া বেশী কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবে না! তবে কি ছবিতে ঠিক সম্মুখ ছাড়া আশপাশ একটুও আঁকা যায় না? ইহার উত্তরে এই বলিলেই যথেষ্ট যে, যাহা স্থিরদৃষ্টির বিষয় তাহাই ছবির বিষয় হইতে পারে। আঁকিবার সময় দৃষ্টি ধরাতলের সমান্তরাল ভাবে আদর্শের পানে ছাড়িয়া দিতে হইবে, এবং ঘাড় উঁচু নীচু না করিয়া সোজা রাখিতে হইবে—ডাহিনে বামে কিংবা উঁচু নীচু দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন আবশ্যক হইলে চোখের তারা দুটিকেই কেবল ঘুরাইয়া লইতে হইবে।* এইরূপে আদর্শের যতটুকু দেখা যায় তাহাই ছবিতে ফুটান যায়।

তবেই বুঝা গেল যে, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে পদার্থের যতটা একেবারে দৃষ্ট হয় তাহাই অঙ্কনের বিষয়ীভূত হইতে পারে। সম্পূর্ণ গোলাকার পদার্থের বিশেষ কোন পার্শ্ব ধরা যায় না—তথাপি তাহারও অর্দ্ধেকটা যথাযথ আঁকা যায়। কিন্তু চিত্রে আলোছায়ার সূক্ষ্ম রেখাপাত বা বর্ণবিন্যাস না করিলে তাহা জ্যামিতিক বৃত্ত হইয়া দাঁড়ায়। চিত্রকরেরা আলো ও ছায়ার সূক্ষ্ম বৈষম্য দিয়াই চক্ষে ধাঁ ধাঁ লাগাইয়া সমতলের উপর উচ্চতা-নিম্নতা বা দূরত্ব-নিকটত্ব প্রদর্শন করেন।

শুধু তাহাই নহে। কখন কখন পদার্থাবলি এমন অবস্থায় দেখা যাইতে পারে যে ছবিতে তাহার স্বরূপ পরিস্ফুট করা কঠিন। একখানি চাকা বা একটি টাকা যদি ঠিক চক্ষুর সমসূত্রে ধরাতলের সমান্তরাল বা লম্বভাবে অবলম্বিত হয় তবে তাহা একটি ঋজুরেখা

* কেহ কেহ অঙ্কনের সময় একটি চক্ষু ব্যবহার করেন। কিন্তু দুই চক্ষু ব্যবহারের ক্ষতি কি, ভাল বুঝাইতে পারেন না।

মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে; একটি হার্ত.বাক্স ঐ অবস্থায় আয়ত ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে, চক্ষের এইরূপ অনুপ্রস্থ সমসূত্রতা ধরিয়াই চিত্রের মূল পত্তন করিতে হয়। অঙ্কয়িতার চক্ষের উন্নতি অবনতির সঙ্গে এই আড়াআড়ি সমসূত্ররেখাও উঁচু নীচু দেখা যায়। যেখানে পৃথিবী ও আকাশ পরস্পর মিলিত বোধ হয়, তাহাই ধরাপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান চিত্রকরদৃষ্ট সমসূত্র রেখা—সংস্কৃতে ইহাকে দিক্‌চক্র বা চক্রবাল বলে; আমরা ইহাকে "দিগন্ত" রেখা বলিব।

বিস্তৃত মাঠে, কি নদী বা সমুদ্রতীরে দাঁড়াইলে যেখানে এই দিগন্তরেখা দেখা যাইবে, বসিয়া দেখিলে তাহা অপেক্ষা নীচুতে, এবং গৃহের ছাদে উঠিয়া দেখিলে তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চে এই দিগন্ত-রেখা পড়িবে। প্রকৃতিতে এই রেখা চক্রাকার—ছবিতে সরল, কেন না একবার দৃষ্টি করিলে খানিকটা মাত্র দেখা যায়।

দিগন্তরেখার নীচেকার কোন বস্তুর উপরিভাগ যদি সমতল হয় (যথা—টেবিল, বাক্স), তবে তাহা ছবিতে এমন ভাবে আঁকিতে হইবে যেন তাহা বর্দ্ধিত করিলে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া দিগন্তরেখায় সঙ্গত হইতে পারে—আবার দিগন্তরেখার উপরিস্থ কোন সমতল সেইরূপ নীচু ঝুঁকিয়া দিগন্তরেখায় সূক্ষ্মাগ্রভাগে মিলিত বোধ হইবে। এই হেতু রেলওয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া, যেদিকে সমান্তর লাইনগুলি দৌড়িয়াছে সেই দিকে দৃষ্টি যোজনা করিলে দেখা যায় যে সেগুলি চক্ষের সম-উচ্চে দিগন্তরেখায় মিলিয়াছে; আর দুধারে তাড়িতবার্ত্তাবহ তারস্তম্ভগুলির মস্তক ক্রমে নীচু হইয়া রাস্তার উপর ঝুঁকিয়া একই "মিলন" বিন্দুতে দিগন্তরেখায় সঙ্গত হইয়াছে। আমরা এতক্ষণ যে সমতলের কথা বলিলাম, তাহা ধরাতলের সমান্তরাল; অন্যরূপ 'তল'

বা তাহার ধার অবশ্যই দিগন্তরেখায় মিলিবে না। যাহা হউক, সমান্তর রেখাগুলি ছবির মধ্যে দিগন্তরেখায় মিলনবিন্দুর পানে ছোটে ইহা বলাও যা, দূরত্ব অনুসারে পদার্থসমূহ ক্রমশঃ ক্ষুদ্র দেখায় ইহা বলাও তাই।

কিন্তু ছবিস্থ সমস্ত সমান্তর রেখাই মিলনবিন্দুতে যায় না। যে পদার্থগুলি ধরাতলে লম্বভাবে থাকে, অথবা দিগন্তরেখার সমান্তরাল তাহারা ছবিতেও লম্বভাবে বা সমান্তরভাবে থাকিবে। একখানি চৌকস টেবিলের পায়া ছবিতেও, ধরাতলের সহিত সমকোণ করিয়া লম্বভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে; এবং সম্মুখ হইতে দেখিলে, কাছের ধার ও দূরের ধার দিগন্তরেখার সমান্তর হইবে। সমস্ত টেবিলটা দিগন্ত-রেখার নিম্নে থাকিলে, দুই পার্শ্বের রেখাগুলি মাত্র মিলন-বিন্দুর দিকে ঊর্দ্ধমুখে দৌড়াইবে; দিগন্তরেখার উপরে থাকিলে (অর্থাৎ মাটীতে বসিয়া আঁকিলে) পার্শ্ব-রেখাদ্বয় মিলনবিন্দুর দিকে নিম্নমুখে নামিবে। আপনি যে জানালার পাশে বসিয়া আছেন, তাহার মধ্য দিয়া রাস্তার অপরপার্শ্বস্থ বাড়ীটার পানে তাকান, এবং যে কাগজে ছবি আঁকিবেন মনে করুন তাহা স্বচ্ছ, ও জানালার ফ্রেমের মধ্যে বসান আছে; এখন আপনি বলিতে পারেন যে ওটা ত জানালা নয়, উহা ঐ বাড়ীটারই ছবি! যদি জানালা কাচের হয়, তবে ঐ বাড়ীটার ছাদ, জানালা, কার্ণিস থাম প্রভৃতি সম্বলিত একটি নক্সাও কাচের উপর প্রতিবিম্বের দাগে দাগে মিলাইয়া আঁকিতে পারেন। এইরূপে, ছবিতে লম্বরেখা, সমান্তররেখা, এবং কোন্ রেখাগুলি দিগন্তে দৌড়ায়, তাহা বেশ ধরিতে পারিবেন। অনেক চিত্রকর প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির চিত্রাঙ্কনের সময় ফ্রেমেবদ্ধ একখণ্ড বৃহৎ কাচফলক (দর্পণ নহে) সম্মুখে লম্বভাবে স্থাপিত করিয়া তাহার উপর পতিত

প্রতিবিম্বের একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়া লন; পরে তাহা দেখিয়া আসল চিত্রটি অঙ্কন করেন।

বলা বাহুল্য ছবি দেখিয়া ছবি আঁকা সহজ, কিন্তু জীবিত নরনারী, জীবজন্তু, পুষ্পলতা, প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির আদর্শে তথা স্মৃতি-বলে ছবি টান খুবই কঠিন।

যেমন অট্টালিকা নির্ম্মাণের সময় রাজমিস্ত্রীরা বহু বংশদণ্ড বা কাষ্ঠখণ্ড নানাস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক তাহার সাহায্যে তলদেশ হইতে গাঁথনি আরম্ভ করিয়া ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠে এবং কার্য্য সমাধা হইলে সেগুলি অপসারিত করিয়া ফেলে, সেইরূপ ছবির বিষয়টি ঠিকরূপে আঁকিবার জন্য চিত্রকরেরাও প্রথমে ভূমিরেখা পরে দিগন্তরেখা শেষে ঊর্দ্ধরেখা অনুপ্রস্থভাবে পরস্পর সমান্তর করিয়া আঁকিয়া ছবির বিভিন্নাংশের পরিমাণের অনুপাত ঠিক করিয়া পাত করেন, পরে এই রেখাগুলি (বিশেষতঃ দিগন্তরেখা) অনাবশ্যক বোধ হইলে তুলিয়া ফেলেন। দিগন্তাদি রেখাপাতের ব্যতিক্রম ঘটিলে ধরাতল বা নভস্তলস্থিত পদার্থের প্রতিবিম্ব ছবিতে যথাবৎ প্রতিফলিত করা সম্ভবপর নহে। এই প্রকার ভ্রমে ধরাতলস্থিত মূর্ত্তি শূন্যে উত্থিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইবে। অপটু পটুয়াদের আঁকা নাটকের সীন এবং দেশীয় সংবাদপত্রের কাষ্ঠ খোদিত ছবিগুলি প্রায়ই এইরূপ ভ্রমের 'উজ্জ্বল' দৃষ্টান্ত।

ফলতঃ, প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির প্রকৃত মূর্ত্তি কি প্রকারে আলো ছায়ার বৈচিত্র্যে বা বর্ণের বৈষম্যে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট, এবং দূরত্ব নিকটত্ব অনুসারে ক্ষুদ্র বৃহৎ হইয়া চক্ষে প্রতিভাত হয় তাহার নিয়ম অনুসন্ধানই একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান, এবং ইহার উপরেই যাবতীয় চিত্রাঙ্কণের মূল ভিত্তি স্থাপিত।

কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যকারেরা যেমন একদিকে অসামান্য কবিত্বশক্তিশালী, অন্যদিকে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত লোক ছিলেন, সেইরূপ উৎকৃষ্ট চিত্রশিল্পীরও নানা বিজ্ঞানে অল্পাধিক পরিমাণে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মানবমূর্ত্তি-চিত্রকরের মানসিক বৃত্তিরও বিকাশ চাই; মাংসপেশী সংস্থান অস্থিপঞ্জর সম্বন্ধেও কিছু জানা শুনা চাই। তাই বলিয়া এইরূপ জ্ঞানের জন্য মেডিক্যাল কালেজের ডিসেক্‌শন রুমেই যে যাইতে হইবে তা নয়, তবে এ বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক—নতুবা আপনার চিত্রিত নরনারী, 'আর্টষ্টুডিও' হইতে প্রকাশিত মাংসপিণ্ডময় অবয়ববিশিষ্ট দেবদেবীর বা মানব মানবীর ছবির মত হইতে পারে!

সহৃদয়তা, ভাবপ্রবণতা কিংবা বহুদর্শনজনিত জ্ঞানের সম্যক্ প্রয়োগ না করিলে কখন কখন প্রসিদ্ধ শিল্পীরাও হঠাৎ ভ্রমে পতিত হন। কল্পনাসুন্দরী কবির মত চিত্রশিল্পীরও নিত্য সহচরী। প্রাচীন গ্রীসে দুইজন সুবিখ্যাত ভাস্করের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়।—কোন বীর পুরুষ যুদ্ধযাত্রা কালে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া গৃহনিষ্ক্রান্ত হন যে জয়শ্রী লাভ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইলে যে ব্যক্তির সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ হইবে তাহাকেই দেবতার উদ্দেশে বলি প্রদান করিবেন। ঘটনাচক্রে বিজয়ীবীর গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার একমাত্র কন্যা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার স্বাগত অভ্যর্থনা করিলেন। বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হইবার নহে। দুহিতা বধ্যভূমিতে আনীতা হইয়াছেন। এক্ষণে অজ্ঞাত-পিতৃ-প্রতিজ্ঞা কন্যার আসন্ন মৃত্যু নিরীক্ষণে পিতার মুখশ্রী কিরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে—প্রতিমূর্ত্তিতে সেই ভাব ফুটাইতে হইবে। একজন শিল্পীর মনস্তত্ত্ব ও শারীরস্থানতত্ত্ব বিশেষরূপে আয়ত্ত ছিল—তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পিতার সেই

নয়কার নেত্রবক্ত্ বিকার ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে
পুরস্কার লাভ ঘটে নাই! অপর ভাস্কর, এইরূপ মর্ম্মবিদারক কর্ম্ম-
দর্শনে অসহিষ্ণু পিতা মুখমণ্ডল যেন বস্ত্রখণ্ডে আবৃত করিয়া আছেন,
এই ভাবের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াই উৎকৃষ্টতর শিল্পী বলিয়া বিবেচিত
হইয়াছিলেন! যে ভাব প্রস্তরমূর্ত্তিতে সহানুভূতি আকর্ষক হয় নাই
তাহা চিত্রেও হইত না।

কয়েক বৎসর অতীত হইল সার এডবার্ড পয়্ণ্টার একখানি ছবি
তৈলবর্ণে চিত্রিত করেন। মিসরে নির্ব্বাসিত 'ইজ্‌রাএল'গণ দাস্যে
নিযুক্ত হইয়া তাহাদের প্রভুর আজ্ঞায় একটি প্রকাণ্ডকায় সিংহের
প্রস্তরমূর্ত্তি টানিতেছে, ইহাই ছবির বিষয় ছিল। একজন প্রসিদ্ধ
এঞ্জিনীয়ার ছবিটী বহুমূল্যে ক্রয় করেন। দাম চুকাইয়া দিবার
সময় তিনি ছবির একটি ভুল বাহির করেন—ছবিতে যতগুলি লোক
সিংহবহন কার্য্যে নিযুক্ত আছে দেখান হইয়াছিল, তাহাদের পক্ষে ঐ
ভার বহন, অসম্ভব! চিত্রকর সহাস্যে ত্রুটি স্বীকার করিয়া আর
গোটাকত লোকের ছবি তাহাতে যোগ করিয়া দিলেন। ভাগ্যে
তৈলবর্ণের ছবিতে ভুল হইলে সংশোধন চলে! এই যোগাযোগের
কার্য্য না চলিলে উপস্থিত ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ গোলযোগেরও সম্ভাবনা ছিল!

আমাদের রবিবর্ম্মার অঙ্কিত অধিকাংশ চিত্রই "দিগন্ত" রেখাপাত
বর্ণবিন্যাস কিংবা ভাববিকাশ সম্বন্ধে ভ্রম প্রমাদ শূন্য। কিন্তু যে
চিত্র খানিতে অপ্সরা মেনকা দুষ্মন্তপ্রত্যাখ্যাতা ষোড়শী শকুন্তলাকে
বক্ষে ধারণ করিয়া গগনমার্গে উদ্‌গামিনা হইয়াছেন তাহাতে ভাবটি
সম্পূর্ণরূপে ফুটে নাই—মূর্ত্তি যুগলের সমস্তই ঠিক্ ঠাক, অতিপিনদ্ধ
বসনের অঞ্চলটুকুও চঞ্চল পবনে বা নভোভ্রমণে আন্দোলিত হইতেছে
। তাঁহারা ঊর্দ্ধে উঠিতেছেন কি নিম্নে অবতরণ করিতেছেন ভাল

বুঝা যায় না—যেন চিত্রকর তাঁহাদের গতির কথা বিস্মৃত হইয়াই চিত্রখানি প্রস্তুত করিয়াছেন!

পরিশেষে, এদেশের বাঙ্‌লা মাসিকপত্রের "হাফ্‌টোন্‌" চিত্রের সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। ফটো-চিত্রই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বিশেষে পরিবর্ত্তিত ধাতুফলকে খোদিত হইলে হাফ্‌টোন নামধারণ করে। 'প্রদীপ' 'সাহিত্য' এবং নব প্রকাশিত 'প্রবাসী' পত্রাদির চিত্র প্রায়ই এই হাফ্‌টোন। আজকাল হাফ্‌টোন ছবিতে বাঙালীও দুই একজন বেশ কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। কিন্তু এই প্রকারের ছবির ইতর বিশেষ থাকিলেও ইহাতে হস্তনৈপুণ্য তত আবশ্যক হয় না। তথাপি দুঃখের বিষয় যে বাঙ্‌লা মাসিকে বিলাতি মাসিক পত্রাদির ন্যায় স্থায়ী সুন্দর হাফ্‌টোন দেখিতে পাই না। তাহা কতকটা আদর্শের দোষে, কতকটা ছাপিবার দোষে, এবং কতকটা বোধ হয় কালীর দোষেই ঘটিয়া থাকে। তাহা ছাড়া আরও একটি মজ্জাগত দোষ আছে—আমাদের সচিত্র মাসিকগুলি প্রায়ই দুচারি পত্রে ক্ষীণ-কলেবর, উহাদের পাঁচসাত খানি উপর্য্যুপরি স্থাপন না করিলে দৈর্ঘ্যবিস্তারের অনুরূপ পুরু হইতে পারে না। যে গুলি আবার দুই একবার ভাঁজ হইয়া, বালী-কাগজের মিহি মোড়করূপ পীতধড়া সাজ লইয়া, ডাকঘরের মোহরের ঘাত সহিতে সহিতে নগ্ন ভগ্ন কুঞ্চিত লাঞ্ছিত অবস্থায় মফস্বলবাসী নিরীহ গ্রাহকের হস্তে আসিয়া পঁহুছে তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া বাস্তবিকই দুঃখ হয়! যদি সচিত্র মাসিক-পত্র স্থূল কলেবর করা সম্ভব না হয় তবে ডাকে পাঠাইবার সময় ভাঙিয়া ভাঁজ না করিয়া, লম্বালম্বি ভাবে গোলাকারে জড়াইয়া মোড়ক করিলে বোধ হয় কিছু নিরাপদ হইতে পারে। বিলাতি সকল ম্যাগাজিনই যে পুরু কাগজের তাহা নয়, 'রিভিউ অব্

রিভিউজ্' এর ন্যায় সুবিখ্যাত পত্রও অপেক্ষাকৃত পাতলা কাগজের, তথাপি সে গুলিত অক্ষত অবস্থায়ই ডাকে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া মাসে মাসে এদেশে আসে! ফলতঃ, বাঙ্‌লা কাগজের ছবিগুলি ভাঁজের দোষেই বেশি খারাপ হইয়া যায়।

ছবি ভাঁজে নষ্ট না হইলেও, হয়ত কখন কখন যে রঙিন কালীতে ছাপা হয় তাহাই মাসিকের পক্ষে প্রশস্ত নয়। বিলাতি কাগজের ছবিত কালো কালিতেই প্রায় ছাপা হইয়া থাকে—অথচ মুদ্রিত অক্ষর সমূহের সমান ছবিগুলিও দীর্ঘজীবী হয়। কিন্তু আমাদের মাসিকের প্রথমস্থ চিত্রখানি—যেখানি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টভাবে মুদ্রিত হইয়া থাকে—তাহাই সর্ব্বাগ্রে নষ্ট হইয়া যায়। পাঠান্তে দ্বিতীয়বার উদ্‌ঘাটন করিলে দেখা যায়, চিত্রখানি যেন ঊর্ণনাভ-তন্তু পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, অথবা কোন তীক্ষ্ণপদ অন্ধকীট উহার উপর দিগ্বিদিক্ হারাইয়া হাঁটিয়া ঘাঁটিয়া বেড়াইয়াছে! ইহার প্রতিবিধান বিষয়ে পত্রপরিচালকগণের অবধান প্রার্থনীয়।

চিত্রকলা সম্বন্ধে আরও অনেক কথাই বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী।

সংস্কৃত কাব্যের ক্ষীরপায়ী হংস।

ভারতবর্ষের অনেক লোকের বিশ্বাস এই যে হংস জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জলভাগ পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধভাগ পান করে। এই বিশ্বাসের মূলে কোন প্রকার সত্যতা আছে কিনা এবং এই বিশ্বাস কতকাল পূর্ব্বে সমুৎপন্ন হইয়াছিল তাহা নির্দ্ধারণ করাই

বর্ত্তমান প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য। যদি যথার্থই হংসের ক্ষীর-নীর বিবেচন ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে নবাবিষ্কৃত দুগ্ধ-পরীক্ষণ-যন্ত্র (lactometre) উহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইবে সন্দেহ নাই। আমেরিকার হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক সি, আর, ল্যান্‌ম্যান্ হংসের এই অনন্যসাধারণ শক্তির পরীক্ষার নিমিত্ত বহু চেষ্টা করিয়াছেন।

হংসগণের আহার ক্ষীর। কিন্তু এই ক্ষীর কি প্রকার তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। ইহার নির্ণয়কল্পে পণ্ডিতগণ দ্বিবিধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই দ্বিবিধ মতের পোষক বচনসমূহ সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমরা নিম্নে (১) ও (২) চিহ্নে প্রকাশ করিলাম। উপসংহারে এই দ্বিবিধ মত ব্যাখ্যাত হইবে।

(১)

বৃদ্ধ চাণক্য * লিখিয়াছেন :—

শাস্ত্র অনেক, জানিবার বিষয় বহু, সময় অল্প, এবং বহু বিঘ্ন অতএব হংস যেমন জলমধ্য হইতে ক্ষীর পৃথক করিয়া লয়, মনুষ্য গণেরও যাহা সার তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থে † বিষ্ণুশর্ম্মা লিখিয়াছেন :—

শব্দ শাস্ত্রের পার নাই, মনুষ্যের আয়ুঃ অতীব অল্প, তাহাতে আবার জীবনে বহু বিঘ্ন। অতএব হংস যেমন জলমধ্য হইতে

---

* অনেক শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং
অল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বু মধ্যাৎ॥ (বৃদ্ধ চাণক্য)॥

† অনন্তপারং কিল শব্দ শাস্ত্রং
স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
সারং ততো গ্রাহ্যম্ পাস্য ফল্গু
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বু মধ্যাৎ॥ (পঞ্চতন্ত্র)॥

ক্ষীরভাগ গ্রহণ করে। সেইরূপ মনুষ্যেরও অসার পদার্থ ত্যাগ করিয়া সারভাগ গ্রহণ করা উচিত।

সুভাষিতার্ণব গ্রন্থে * লিখিত আছে :—

হংসও শ্বেতবর্ণ, বকও শ্বেতবর্ণ ; বক ও হংস এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি ? ক্ষীর ও নীর পৃথক করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই হংসের হংসত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তৎসামর্থ্য না থাকায় বক বকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভর্ত্তৃহরি নীতিশতক গ্রন্থে † লিখিয়াছেন :—

হায় ! বিধাতা কুপিত হইয়া হংসের নিয়ত পদ্মবনে বিচরণ নিবারিত করিতে পারেন বটে কিন্তু তিনিও উহার জল ও দুগ্ধ বিভাজন করিবার নৈপুণ্যজনিত সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তি অপহরণ করিতে সমর্থ নহেন।

কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকের ‡ ৬ষ্ঠ অঙ্কে প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন :—

বধ্যজনে বাছি' লবে এই মোর বাণ।
হংস যথা নীর ত্যজি' ক্ষীর করে পান ॥

---

* হংসঃ শ্বেতো বকঃ শ্বেতঃ কো ভেদো বকহংসয়োঃ।
ক্ষীর-নীর-বিভাগেন হংসো হংসো বকো বকঃ ॥ (সুভাষিতার্ণব) ॥

† অম্ভোজিনী বনবিলাসনমেব হন্ত
হংসস্য হন্ত নিতরাং কুপিতো বিধাতা।
ন ত্বস্য দুগ্ধজলভেদ বিধিপ্রসিদ্ধাং
বৈদগ্ধ্যকীর্ত্তিমপহর্ত্তুমসৌ সমর্থঃ ॥ (নীতি-শতক) ॥

‡ যো হনিষ্যতি বধ্যং ত্বাং রক্ষ্যং রক্ষতি চ দ্বিজম্।
হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জয়ত্যপঃ ॥ (অভিজ্ঞান শকুন্তল) ॥
উদ্ধৃত অনুবাদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অনুবাদিত অভিজ্ঞান-শকুন্তল হইতে গৃহীত হইল।

মহাভারতের * আদিপর্ব্বে লিখিত আছে :—

হংস যেমন জলের মধ্য হইতে ক্ষীর গ্রহণ করে, সেইরূপ বিজ্ঞ-ব্যক্তি লোকের মুখে শুভ ও অশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া শুভ বাক্যই গ্রহণ করেন।

শঙ্করাচার্য্য † কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর ভাষ্যে লিখিয়াছেন :—

শ্রেয়ঃ (হিতকর) ও প্রেয়ঃ (মনোহর) এই দুই পদার্থ সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু ইহারা পরস্পর মিশ্রিত হইয়া মনুষ্যগণের নিকট উপস্থিত হয়। হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধভাগ গ্রহণ ও জলভাগ ত্যাগ করে, সেইরূপ ধীর ব্যক্তি সম্যক্ বিচার করিয়া শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এতদুভয়ের মধ্য হইতে শ্রেয়োভাগ গ্রহণ করেন ও প্রেয়োভাগ পরিহার করেন।

তত্ত্বমুক্তাবলী নামক ‡ প্রাচীন দর্শনগ্রন্থে লিখিত আছে :—

জল ও দুগ্ধ পরস্পর মিশ্রিত হইলে লোকে উহাদের পৃথক সত্তা অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু হংস ক্ষণকাল মধ্যে জল হইতে দুগ্ধ পৃথক করিয়া লইতে পারে। সেইরূপ যাঁহারা গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারেন কোন্ ব্যক্তির চিত্ত ব্রহ্মেলীন হইয়াছে ও কোন্ ব্যক্তি সংসারসাগরে ভাসিতেছেন।

সাংখ্য সূত্রের § ৪র্থ অধ্যায়ের ২৩শ সূত্রে লিখিত আছে :—

হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধ পৃথক করিয়া লইতে

* প্রাজ্ঞস্তু জল্পতাং পুংসাং শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভাঃ।
গুণবদ্বাক্যমাদত্তে হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ॥ (মহাভারত)॥

† সাধনতঃ ফলতশ্চ মন্দবুদ্ধীনাং দুর্ব্বিবেকরূপে সতী ব্যামিশ্রীভূতে ইব মনুষ্যম্ এতং পুরুষং আ ইতঃ প্রাপ্নুতঃ শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ। অতো হংস ইব অম্ভসঃ পয়ঃ তৌ শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ পদার্থৌ সম্পরীত্য সম্যক্ পরিগম্য সম্যঙ্ মনসা আলোচ্য গুরুলাঘবং বিবিনক্তি পৃথক্ করোতি ধীরো ধীমান্। (শঙ্কর ভাষ্য)॥

‡ তত্ত্বমুক্তাবলী edited and translated by E. B. Cowell.

§ Sankhya Aphorisms edited by J. R. Ballantyne.

পারে, সেইরূপ যাঁহার বাসনার ক্ষয় হইয়াছে তিনি স্বীয় আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক করিয়া লইতে পারেন।

এইরূপে রাজতরঙ্গিণী *, সুভাষিতাবলী †, সুভাষিতরত্নাকর ‡, সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগার ¶, ভামিনীবিলাস °, শার্ঙ্গধর পদ্ধতি ÷ ইত্যাদি প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে হংসের ক্ষীর-নীর-বিবেচন ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে।

ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ। তাহাতেও হংসের ক্ষীর-নীর-বিভাজন ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে।

যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ⋎ দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে:—

ক্রৌঞ্চ পক্ষী যেমন জলমধ্য হইতে ক্ষীর পৃথক করিয়া লইয়া পান করে, সেইরূপ ইন্দ্রও জল হইতে সোমরস পৃথক করতঃ উহা পান করেন।

ইহার টীকায় সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন :—

জলমিশ্রিত দুগ্ধ ক্রৌঞ্চ পক্ষীর মুখে প্রবেশ করিলে উহার মুখ-গতরসসম্পর্কে ক্ষীর ও জল পৃথক হইয়া পড়ে।

* রাজতরঙ্গিণী edited by Dr. Stein.

† সুভাষিতাবলী edited by P. Peterson.

‡ সুভাষিতরত্নাকর edited by K. Bhatavadekara.

¶ সুভাষিত রত্ন ভাণ্ডাগার edited by K. P. Paraba.

° ভামিনীবিলাস edited by L. R. Vaidya.

÷ শার্ঙ্গধর পদ্ধতি edited by P. Peterson.

⋎ যজুর্বেদ German edition.

অদ্‌ভ্যঃ ক্ষীরং ব্যাপিবৎ
ক্রুঙ্‌ঙ্‌ আঙ্গিরসো ধিয়া।
অদ্‌ভ্যঃ সোমং ব্যাপিবচ্
ছন্দোভির্ হংসাঃ শুচিষাৎ॥ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ)॥

ক্ষীরপাত্রে স্বমুখে প্রক্ষিপ্তে সতি মুখগতরসসম্পর্কাৎ ক্ষীরাংশো জলাংশশ্চোভৌ বিবিচ্যেতে॥ (সায়ণাচার্য্যকৃত টীকা)॥

এইরূপে যজুর্ব্বেদের মৈত্রায়ণীসংহিতা, কাঠক, বাজসনেয়ী সংহিতা ইত্যাদিস্থলে হংসব্যাপার উদ্ধৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদের * ১০ম মণ্ডলেও উহার আভাস পাওয়া যায়।

বৌদ্ধপালিসাহিত্যেও উক্ত আখ্যায়িকা উদ্ধৃত হইয়াছে। উদান† নামক পালিগ্রন্থে লিখিত আছে:—ক্রৌঞ্চ পক্ষী যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জলভাগ ত্যাগ করে, সেইরূপ বিদ্বান্ লোক পুণ্য ও পাপ মিশ্রিত সংসারের পাপ ভাগ ত্যাগ করেন।

সুমঙ্গল বিলাসিনী‡ নামক পালিগ্রন্থে বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন:—

জলের পাত্র ও সুরার পাত্র এতদুভয় যদি সুশিষ্যের মুখ সমীপে অর্পিত হয় তাহা হইলে, ক্রৌঞ্চ পক্ষী যেমন জলের মধ্য হইতে দুগ্ধ গ্রহণ করে, সেইরূপ সেই শিষ্যের মুখাভ্যন্তরে জল প্রবেশ করে কিন্তু সুরা প্রবিষ্ট হয় না।

এইরূপে তিব্বতীয় গ্রন্থকারগণ পুনঃ পুনঃ হংসের অসাধারণ উল্লেখ করিয়াছেন।

(২)

পক্ষান্তরে কালিদাস মেঘদূত কাব্যে লিখিয়াছেন:—

যার গুণে শিলিন্ধ্র ফুটে ওঠে ধরণী ছাইয়া
মধুর গর্জ্জন সেই শুনিলেই, উচ্ছ্বসিত হিয়া,

---

* ঋগ্বেদ edited by F. Maxmuller.

† সদ্ধিংচরং একতো বসং মিস্‌সো অঞ্ঞেঞ জনেন বেদগূ। বিদ্বা পজহাতি পাপকং কোঞ্চো ক্ষীরপকো ব নিন্নগং তি ॥ (উদান) ॥ edited by P. Steinthal.

‡ সুমঙ্গল বিলাসিনী edited by Dr. Morris in the Journal of the London Pali Text Society 1887.

কৈলাশ অবধি লয়ে মৃণালাদি পাথেয় বিস্তর,
মরাল মানস-যাত্রী হবে তব পথের দোসর ॥*

বিক্রমোর্ব্বশী† নাটকের ১ম অঙ্কে কালিদাস লিখিয়াছেন :—

বিষ্ণুপদ-মধ্যাকাশে, ওই দেখ সুরাঙ্গনা
করিল গমন।
রাজহংসী ছিন্ন মুখ মৃণালের সূত্র যথা
করে আকর্ষণ
তেমনি অপ্সরা-বালা দেহ হতে মন মোর
করিল হরণ ॥

* উদ্ধৃত অনুবাদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অনুবাদিত মেঘদূত হইতে গৃহীত হইল। মূল শ্লোক যথা :—

কর্ত্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং
তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জ্জিতং মানসোৎকাঃ।
আকৈলাসাদ্ বিসকিসলয়চ্ছেদ পাথেয়বন্তঃ
সম্পৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ ॥ (মেঘদূত)॥

† উদ্ধৃত অনুবাদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অনুবাদিত বিক্রমোর্ব্বশীনাটক হইতে গৃহীত হইল। মূলশ্লোক যথা :—

এষা মনো মে প্রসভং শরীরাৎ
পিতুঃ পদং মধ্যমুৎপতন্তী।
সুরাঙ্গনা কর্ষতি খণ্ডিতাগ্রাৎ
সূত্রং মৃণালাদিব রাজহংসী ॥ (বিক্রমোর্ব্বশী)॥

বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের* ৪র্থ অঙ্কে কালিদাস লিখিয়াছেন :—

ওগো জলবিহঙ্গরাজ !

ক্ষণতরে ত্যজ এবে মৃণালপাথেয়,
মানসে যাইবে যদি পরে লয়ে যেয়ো।
প্রিয়ার বিরহ হতে, মোরে এবে কর গো উদ্ধার
স্বার্থ হতে গুরুতর, সাধুদের বন্ধু-উপকার ॥

বল্লভদেব স্বীয় সুভাষিতাবলী গ্রন্থে হংসের বিস্তৃত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহার কিঞ্চিৎ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"হংসের রূপ মনোহর; উহার সহচরী মনোরমা; পদ্মের মধু উহার পানীয় এবং উহার ক্রীড়াভূমি জলাশয়। পদ্মনিচয়ের মধ্যে উহার বসতি এবং পদ্মপরাগ উহার ভূষণ। পদ্মের বিস (মৃণালদণ্ড) উহার আহার। মধুর ঝঙ্কারনিরত মধুমক্ষিকা উহার বন্ধু। হে হংস তুমি পরসেবা, পরিশ্রম, দরিদ্রতা, এবং হীনতা ইত্যাদি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তুমিই প্রকৃত সুখী।

হে হংস সর্ব্বত্রই মুক্তার ন্যায় সুনির্ম্মল জলরাশি বিদ্যমান আছে। সর্ব্বস্থানেই মৃণালদণ্ড ভগ্ন করিলে উহা হইতে ক্ষীর নির্গত হয়। সর্ব্বদাই পদ্মরস সুলভ। সিকতাময় নদীতীরও দুর্লভ নহে। হে হংস কি অভিপ্রায়ে তুমি এই ঘৃণিত পঙ্কময় জীর্ণ পল্বলে কর্কশভাষী বকগণের মধ্যে আসিয়া বসতি করিতেছ?"

---

* উদ্ধৃত অনুবাদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহোদয়ের অনুবাদিত বিক্রমোর্ব্বশীনাটক হইতে গৃহীত হইল। মূল এই :—

হংহো জল বিহঙ্গমরাজ !
পশ্চাৎ সরঃ প্রতিগমিষ্যসি মানসং ত্বং
পাথেয়মুৎসৃজ বিসং গ্রহণায় ভূয়ঃ।
মাং তাবদুদ্ধর শুচো দয়িতা প্রবৃত্ত্যাঃ
স্বার্থাৎ সতাং গুরুতরা প্রণয়িক্রিয়ৈব ॥ (বিক্রমোর্ব্বশীনাটক) ॥

উপসংহার—উদ্ধৃত (১) ও (২) চিহ্নিত বাক্য সমূহের সমালোচনা করিয়া আমরা প্রধানতঃ দুইটী সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইলাম।

১ম সিদ্ধান্ত—সায়ণাচার্য্য। প্রমুখ পণ্ডিতগণের মত এই হংসের মুখের মধ্যে এক প্রকার রস আছে। উহার মুখ হইতে উক্ত রস জলমিশ্রিত দুগ্ধের পাত্রে নিঃসৃত হইলেই দুগ্ধ ও জল পৃথক্ হইয়া যায়। কাহারও কাহারও মত এই যে হংসের মুখের লালা অম্লরস বিশিষ্ট। উক্ত অম্লরসের সম্পর্কে দুগ্ধ ঘনীভূত হইয়া দধির অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং জল তরল অবস্থায়ই থাকে। এইরূপে জল ও দুগ্ধ পৃথক হইয়া পড়ে।

২য় সিদ্ধান্ত—অধ্যাপক ল্যান্‌ম্যান্ প্রভৃতির মত এই পদ্মশোভিত জলাশয়েই হংসগণ প্রায়শঃ বাস করে। জলের মধ্যে পদ্মের বিস বা মৃণালদণ্ড বিদ্যমান থাকে উহাই হংসের আহার। উক্ত মৃণালদণ্ডের গ্রন্থি ভগ্ন করিলে এক প্রকার রস নির্গত হয় তাহাকে ক্ষীর বলে। হংসগণ পদ্মের মৃণালদণ্ডের গ্রন্থি ভগ্ন করিয়া উক্ত ক্ষীর পান করে। উক্ত মৃণালদণ্ড জলের অভ্যন্তরে থাকে বলিয়া কবিগণ বলিয়াছেন হংস জলের মধ্য হইতে ক্ষীর তুলিয়া খায়। মৃণালরস ও দুগ্ধ উভয়কেই ক্ষীর বলে। অতএব "হংস জলের মধ্য হইতে দুগ্ধ (ক্ষীর) পান করে," এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে "হংস জলের মধ্যস্থিত মৃণালদণ্ডের রস (ক্ষীর) পান করে"। এই হেতুই কালিদাস প্রমুখ কবিগণ মৃণালকে হংসের পাথেয় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অনেকে বলেন মৃণালরস দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ।

আমেরিকার ওয়াসিংটন নগরের বিখ্যাত ডাক্তার কাউএস্ বলেন হংসের মুখের মধ্যে এক প্রকার নৈসর্গিক যন্ত্র আছে। খাদ্য দ্রব্য ঐ যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলে, উক্ত খাদ্য দ্রব্যের কঠিন অং-

মুখে থাকিয়া যায় ও জলীয় ভাগ বহির্গত হয়। এই পুষ্টিকর কঠিন খাদ্যই দুগ্ধ শব্দদ্বারা উপলক্ষিত হইয়াছে। ডাক্তার কাউএসের মত আমার নিকট সমীচীন বোধ হয় না।

সুবিখ্যাত বিহঙ্গম-বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত C. J. Jerdon স্বীয় "Birds of India" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "হংসগণ চৈত্র মাসের শেষে হিমালয় পর্ব্বতাভিমুখে ধাবমান হইয়া মানসসরোবরে অবিস্থিতি করে। কার্ত্তিক মাসের শেষে হিমালয় প্রদেশ হইতে ভারতে প্রত্যাগমন করে। সমগ্র গ্রীষ্মকাল মানসসরোবরে বাস করিয়া অতিবাহিত করে। শীত ঋতু যাপন করিবার জন্য ইহারা ভারতে আগমন করে। আর্য্যাবর্ত্তেই হংসদিগের বাস। বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণে ইহাদিগের গতিবিধি নাই। দিনের বেলায় উত্তাপাধিক্য হইলে ইহারা নদীর সরস বালুকায় তীরে অথবা সরোবরের মধ্যে বাস করে। ইহারা কখনও ৪।৫টী, কখন ও ২০।২৫টী, এবং কখনও বা বহুসংখ্যক একত্র হইয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বিচরণ করে। ইহারা সুখ-প্রিয়।"

হংসগণ ময়ূরের ন্যায় মন্থর গতি নহে। ইহারা দেখিতে বড় সুন্দর। শার্ঙ্গধরপদ্ধতি গ্রন্থে লিখিত আছে হংসগণ বড় অভিমানী। ইহারা সর্ব্বত্রই আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকে। যেখানে বক বা অন্যান্য কর্কশভাষী পক্ষী শব্দ করে, হংস সেই স্থান ত্যাগ করিয়া দূরে গমন করে, অথবা উত্তর প্রত্যুত্তর না করিয়া সেই স্থানে নীরবে বসিয়া থাকে। ইহারা মানসসরোবর ভিন্ন অন্য কোথায়ও সন্তান প্রসব করে না।

মদীয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল বলেন লঙ্কাদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশে হংস দৃষ্ট হয় না। অমর সিংহ ইহাদিগকে মানসৌকাঃ (মানসসরোবর যাহার বাসস্থান) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

"হিন্দু"-শব্দতত্ত্ব।

(পরিশিষ্ট)

"হিন্দু" শব্দ সম্বন্ধে আমি সাধারণতঃ আটটি ভুলের কথা উল্লেখ করিয়াছি; আরও অনেক ভুলের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধকে ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর করা শোভা পায় না, এজন্য সমুদয় ভুলগুলির কথা উল্লেখ করিবার আকাঙ্ক্ষা নাই। আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, পারস্যভাষায় শ ষ স স এই চারিটি বর্ত্তমান, সুতরাং স স্থানে হ অথবা হ স্থানে স হওয়ার কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আমরা ইহাতে দেখাইয়াছি যে, সংস্কৃত সপ্তাহ এবং পারস্য হপ্তা শব্দ একার্থবাচক শব্দ হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ভিন্ন শব্দ। পারস্যভাষায় হপ্তা শব্দ মৌলিক এবং রূঢ়ি শব্দ সুতরাং সংস্কৃত "সপ্তাহ" শব্দকে অপভ্রংশে হপ্তা করিবার আদৌ আবশ্যকতা নাই। সংস্কৃতভাষায় 'শিব' শব্দ আছে, য়িহুদীদের ইব্রিয় (Hebrew) ভাষাতেও শিব শব্দ আছে; হিন্দুজাতির মধ্যে শিব শব্দ ব্যক্তিবিশেষের নাম হইতে পারে, য়িহুদীদের মধ্যেও তাহাই।* হিন্দুদের শিবশব্দ তিনটী ভিন্ন ভিন্ন ধাতু হইতে উৎপন্ন হইতে পারে ইহা দেখান যায়, কিন্তু সকল ধাতুরই অর্থ মঙ্গল বা কল্যাণ;—"শিবম্" কল্যাণম্, মঙ্গলম্ ইত্যাদি। য়িহুদীদিগের 'শিব' শব্দ 'শূ' ধাতু হইতে উৎপন্ন; উভয় ভাষার শিব শব্দ একার্থবাচক হইলেও এক ধাতুবাচক নহে। কারণ, হিব্রুভাষায় শূ অর্থে লোহিতবর্ণ। য়িহুদী, আর্ম্মেণি, সারাকীণ প্রভৃতি জাতিরা লোহিতবর্ণকে মহাপবিত্রতা এবং মহা কল্যাণের

* বাইবেলের New Testament অংশের The Acts of the Apostles নামক পুস্তকের উনবিংশ অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ শ্লোক পাঠ করিলে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন। "And there were seven sons of one Sceva, a Jew." ইত্যাদি। ইংরাজীতে য়িহুদীদের 'শিব' শব্দ Scevaরূপে লিখিত হয় কিন্তু উচ্চারণে "শিব" হয়। শিবনামে য়িহুদীদের এক মহাবীরও ছিলেন।—লেখক।

চিহ্ন বলিয়া গণ্য করেন, এইজন্য শূ ধাতু হইতে উৎপন্ন শিব শব্দ ঈশ্বর-অর্থবাচক। এইজন্য য়িহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রমতে ঈশ্বর অগ্নির মত লাল (লোহিত)। প্রমাণ—"Our God is a consuming fire" অর্থাৎ আমাদের ঈশ্বর প্রজ্বলিত বৈশ্বানর। ইহা য়িহুদীবংশাবতংস মহাত্মা সাধুপলের উক্তি। (বাইবেলের New Testament অংশের The Hebrews গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক দেখুন।) "The Lord appeared unto him (Moses) in a flame of fire." অর্থাৎ "মুশার সম্মুখে প্রভু (ভগবান) অগ্নিশিখামধ্যে আবির্ভূত হইলেন।" (বাইবেলের Old Testament অংশের Exodus পুস্তকের ৩য় অধ্যায়ের ২য় শ্লোক দেখুন।) এখন বলুন দেখি, সংস্কৃতের "শিব" এবং য়িহুদীদের "শিব" কি একই শব্দ? ভিন্ন ভিন্ন ভাষার কি ইহারা ভিন্ন ভিন্ন ধাতুমূলক ভিন্ন ভিন্ন শব্দ নহে? তবে কেমন করিয়া, সপ্তাহ ও হপ্তা শব্দ এক বলিতে সাহসী হইতেছেন? এখন প্রশ্ন এই, তবে হিন্দুশব্দের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি কোথায়?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পারস্যভাষায় হিন্দ্ শব্দ ভারতবর্ষ-বাচক শব্দ, যথা—তাজিরাত-এ-হিন্দ্, সেতার-এ-হিন্দ্, কৌকব-এ-হিন্দ্, তামর্-এ-হিন্দ্* ইত্যাদি। এই হিন্দ্ শব্দের উৎপত্তি বা ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে এক্ষণে আলোচনা করিবার সময় উপস্থিত, এই আলোচনায় হিন্দুশব্দের প্রকৃত অর্থ নিষ্পন্ন হইবে। আর এক কথা প্রথম হইতেই বলিয়া রাখা ভাল, পারস্য ব্যাকরণানুসারে হিন্দুশব্দ নিষ্পন্ন হয় না, সুতরাং "হিন্দু" পারস্য শব্দ নহে। এই কথার উপর তর্ক চলে না; পারস্য ভাষায় অধিকার থাকিলে আমাদের নিষ্পত্তি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। "হিন্দু" শব্দ যে পারস্য শব্দ নহে ইহার প্রমাণ দিয়াছি, আরও প্রমাণ পরে দিব।

এক্ষণে কতকগুলি প্রশ্ন ধার্য্য করিয়া রাখা উচিত, সেই প্রশ্নমত নিষ্পত্তি হইলে বুঝিবার এবং বুঝাইবার উপায় আরও সরল এবং সুখকর হইয়া উঠিতে পারে।

---

* ইংরাজী Tamarind পারস্য তামর্-এ-হিন্দ্ শব্দের অবিকল রূপান্তর। হিন্দ্ অর্থে ভারতবর্ষ, তামর্ অর্থে অম্ল, "এ" সম্বন্ধবাচক; অর্থাৎ ভারতের অম্ল।—লেখক।

প্রশ্ন।

১ম। হিন্দু শব্দ প্রথমে কোন্ গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে?

২য়। হিন্দু শব্দ সর্ব্ব প্রথমে কাহাদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হয়?

৩য়। "হিন্দু" শব্দের বয়ঃক্রম কত?

৪র্থ। কোন্ ব্যাকরণ অনুসারে হিন্দু শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে?

৫ম। গ্রীক ও মুসলমানদিগের সহিত "হিন্দু" শব্দের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না?

৬ষ্ঠ। হিন্দু শব্দের প্রকৃত অর্থ কি?

৭ম। ঐ অর্থ হিন্দুদিগের ধর্ম্ম, সমাজ বা জাতীয়গৌরবের পরিপোষক কি না?

৮ম। মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও হিন্দু রাজা "হিন্দু" নাম ব্যবহার করিয়াছেন কি না?

৯ম। বেদে হিন্দু শব্দ আছে কি না?

১০ম। আর্য্য শব্দের সহিত হিন্দু শব্দের কোন সম্পর্ক আছে কি না?

এই সকল প্রশ্ন বা "ইস্থুর" যদি ঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হওয়া যায়, তাহা হইলে আমার পক্ষে "ডিক্রী" একথা নিশ্চয়। যে সকল প্রশ্ন ধার্য্য করা গিয়াছে তাহারই উত্তর দিতে আরম্ভ করিলাম; ডিক্রী বা "রায়" অবশ্য পাঠক-হাকিমের হাতে!

মহাবীর মহম্মদ, খৃষ্টের জন্মগ্রহণের পঞ্চশত বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের প্রায় সার্দ্ধেক শত বৎসর পরে ভারতে মুসলমানের আগমন ও আক্রমণ। হিন্দু শব্দ যদি মুসলমানের তৈয়ারি শব্দ হয়, তাহা হইলে এই শব্দের বয়ঃক্রম দ্বাদশ শত বৎসরের অধিক নহে, কিন্তু পাঠক মহাশয় ইহা শুনিয়া বোধ হয় আশ্চর্য্য হইবেন যে, খৃষ্ট জন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু শব্দ বর্ত্তমান ছিল। জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে কি বেদের মধ্যে এই শব্দ ছিল? উত্তর "না"। হিন্দু শাস্ত্রে ছিল না, মুসলমান বা বৌদ্ধ শাস্ত্রেও নয়! তবে কোথায় ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে পাঠক মহাশয়কে একটা নূতন কথা শুনাইব। যে পার্শী(ক) জাতিকে হিন্দুরা এক্ষণে ম্লেচ্ছ মধ্যেই গণ্য করিয়া রাখিয়াছেন, সেই পার্শীকদিগের প্রাচীনতম অগ্নি-উপাসনাকারী ঋষি বা

মনীষীগণ সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাদের সেই অতি প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ জেন্দাবস্তা গ্রন্থে ইহা (অর্থাৎ হিন্দু শব্দের প্রাথমিক রূপ) ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু য়িহুদীদিগের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট মধ্যেও হন্দ্ শব্দ পাওয়া যায়: এবং বেদের যেমন নিরুক্ত ব্যাকরণানুসারে অনেক বৈদিক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে তেমনি এই প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থেরও বৈয়াকরণিকদিগের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে হিন্দু শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যখন পার্শী এবং য়িহুদী এই উভয় জাতির গ্রন্থেই উহা পাওয়া যাইতেছে তখন দেখা উচিত, ইহাদের মধ্যে কোন্ গ্রন্থটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর ? জেন্দাবস্তা এবং ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট এতদুভয় গ্রন্থ যে সমসাময়িক নহে তাহা অনেকবর্ষকাল ব্যাপিয়া মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে।* ইংরাজ খৃষ্টানেরা বলেন, য়িহুদীদের পুরাতন টেষ্টামেণ্ট খৃষ্ট জন্মের ৫ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে সংগৃহীত হয়; জেন্দাবস্তা সম্বন্ধে খৃষ্টানেরা যাহাই বলুন, পার্শীক প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন "Our Zendavesta is as ancient as the Creation; it is as old as the Sun or the Moon." জেন্দাবস্তা হইতে ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থ যে নবীন, তাহার কয়েকটি প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। প্রমাণ—

১ম।—য়িহুদীদের শাস্ত্র হিব্রু ভাষায় লিখিত, পার্শীদের শাস্ত্র জেন্দভাষায় লিখিত। জেন্দভাষা, হিব্রুভাষা হইতে প্রাচীনতর। হিব্রু বা ইব্রীয় ভাষা অনার্য্য সেমেটিকদিগের এবং চাল্ডিকদিগের ভাষার সমসাময়িক; জেন্দভাষা আর্য্য-পার্শীদিগের ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্মিলিত।

২য়।—ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থের বর্ণিত অনেক স্থান নবীন; এই নবীন স্থান বা অরণ্য সমূহের, জেন্দাবস্তা প্রচার কালে, অস্তিত্ব ছিল না।

* এ কথার প্রমাণ জন্য কাহারও উক্তি উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। প্রত্যেক বাইবেলের Chronology মধ্যে ইহা লিখিত আছে। খৃষ্টের পঞ্চ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে জগতের সৃষ্টি ইহাই খৃষ্টানের বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া Old Testament গ্রন্থকে ৫ হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন।—লেখক।

৩য়।—ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থে সভ্যজনোচিত বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, আচার্য্য হল (Hall's "Essays on the Parsis") এবং সমাজতত্ত্ববিদ মালাবারী (B. M. Malabari, Esqr.) তাঁহার গুজরাটি ভাষায় বিরচিত পার্শীসমাজ নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, প্রাচীন পার্শীকজাতির মধ্যে মনুর আর্ষ বিবাহের মত সভ্যবিবাহ প্রথা ছিল না। ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজে যে সকল বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল, জেন্দাবস্তায় তাহার বর্ণনা আছে।

৪র্থ।—অগ্নি উপাসনা পৃথিবীর অতি প্রাচীন জাতির প্রাচীন উপাসনা মধ্যে গণ্য। ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট যখন প্রচারিত হয় তখন অগ্নি উপাসনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, জেন্দাবস্তার সময়ে ইহার বহুল প্রচার ছিল।

৫ম।—জেন্দাবস্তায় য়িহুদী শব্দ বা য়িহুদী জাতির উল্লেখ নাই, ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থের অন্যূন নয়টী স্থানে পার্শীর উল্লেখ আছে।

৬ষ্ঠ।—পার্শীকেরা য়িহুদীদেশ ও য়িহুদী জাতিকে জয় করিয়া তদ্দেশে অনেক দিন রাজত্ব করেন, ইহা বাইবেলের অনেক স্থানে উল্লেখ আছে। য়িহুদীদের কেহ প্রাচীন পারস্যদেশ বা পার্শী জাতিকে জয় করে নাই। পার্শীক রাজারা যখন য়িহুদী দেশে আইন জারী করেন, তখন য়িহুদী জাতির নিজের আইন ছিল না। (বাইবেলের Kings এবং Solomon নামক গ্রন্থে ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে।)

৭ম।—ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থে লেখা আছে, প্রাচীন য়িহুদী জাতির মতে The Laws of the Parsis are unalterable (অর্থাৎ) "আমাদের রাজন্যবর্গের (পার্শীদিগের) আইন পরিবর্ত্তনশীল নহে।" পার্শীদের আইন কেন পরিবর্ত্তনশীল হইতে পারে না অথবা পরিবর্ত্তনশীল করা উচিত নহে, তাহার উত্তর বাইবেলেই পাওয়া যায়। য়িহুদীদিগের বিশ্বাস ছিল, মানুষ মরিলে তাহার প্রেতাত্মা মনুষ্যসমাজে ফিরিয়া আসিয়া কথা কহিতে পারে। যদি রাজার প্রবর্ত্তিত আইন তাঁহার মৃত্যুর পরে অন্য কোনও রাজা অথবা প্রজাসমিতি বদলাইয়া লয় তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির ভ্রমণশীল আত্মা, পরিবর্ত্তন-

কারীর উপরে প্রতিহিংসা লইবেন।* এখন দেখুন, মৃত ব্যক্তির আত্মা সম্বন্ধে জেন্দাবস্তায় কি লেখা আছে। বর্ত্তমান ইংরাজি বর্ষের প্রথমে যখন বোম্বাই হাইকোর্টের জজ মিঃ গোবিন্দ রাণাডে ভবলীলা সম্বরণ করেন, তখন কলিকাতার 'বেঙ্গলি' নামক সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের বোম্বাইস্থ খ্যাতনামা পার্শী সংবাদদাতা মিষ্টর ডি, ই, বাচা মহাশয় ঐ পত্রে রাণাডে মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে এক সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন। শ্রীযুক্ত বাচা মহাশয় পার্শী শাস্ত্রে খুব পণ্ডিত; তাঁহার প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন "মৃত ব্যক্তির আত্মা সম্বন্ধে এইরূপে নানাদেশে নানা সম্প্রদায়ের লোক মধ্যে নানা প্রকার মত ও বিশ্বাস শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন পার্শীক জাতি বাস্তবিক মৃত মনুষ্য এবং তাহার আত্মা সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। জেন্দাবস্তার সময় অতি প্রাচীন, সেই অতি প্রাচীন সময়ে আত্মা সম্বন্ধে মানুষে অধিক অনুসন্ধান করে নাই এবং করিতে পারেও নাই। অগ্নির উপাসনাকারা প্রাচীন পার্শীকেরা আত্মাতত্ত্ব বিষয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে অজ্ঞ ছিলেন অথবা কোনও অভি-মত প্রকাশ করেন নাই। জেন্দাবস্তের পরবর্ত্তী অনেক গ্রন্থে আত্মা সম্বন্ধে অনেক বিশ্বাস ও মতের কথা শুনা যায়" —ইত্যাদি।

এতক্ষণ যাহা লিখিয়া ও দেখাইয়া আসিলাম, তাহাতে প্রতিপন্ন হইল পার্শীদের জেন্দাবস্তা গ্রন্থ য়িহুদীদের বাইবেল হইতে প্রাচীনতর।

পার্শীকদিগের জেন্দাবস্তা গ্রন্থে কি ভাবে এবং কোন্ স্থানে ঐ হিন্দুশব্দ ব্যবহৃত আছে, এখন তাহারই আলোচনা করা যাউক। জেন্দাবস্তা জেন্দভাষায় লিখিত, এই সসেমিরের ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই; দুই একজন ভাষাবিদ্ বাঙ্গালা এই ভাষায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অধিকার রাখিতেন তাঁহারাও ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ইংরাজী অনুবাদই আমাদের পক্ষে "অধম তারণ" স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজী অপেক্ষা বাঙ্গালা

---

* য়িহুদীদের যে এই বিশ্বাস ছিল এবং তাহাদের মনুষ্যমাত্রের মৃত আত্মা ফিরিয়া আসিতে পারে এই উক্তি, ইঙ্গিত মাত্রে আমরা বাইবেলের অন্ততঃ চারিটি স্থল হইতে দেখাইতে পারি। বাহুল্য ভয়ে নিরস্ত হইলাম।—লেখক।

আরও সহজ এবং সুখপাঠ্য হইতে পারে, এই জন্য একজন বঙ্গীয়া লেখিকার রচনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া উহার আভাষ দেখাই-তেছি। বাঙ্গালা ১৩০৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের "ভারতী" পত্রিকায়, ভারতী সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা দেবী, বি, এ, মহাশয়া "হিন্দু ও নিগর" নামে একটী সুন্দর ও সুখপাঠ্য প্রবন্ধ লেখেন। সম্পা-দিকা মহাশয়ার প্রবন্ধ হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যুক্তি-যুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়িনী লেখিকা লিখিতেছেন "হিন্দুশব্দ সংস্কৃত সিন্ধুশব্দ হইতে উৎপন্ন নহে, বহু প্রাচীন কবি ওমর খৈয়ামেও উহা ঐ অর্থে পাওয়া যায়। জেন্দাবস্তা নামক প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ বেদের সমসাময়িক, তাহাতে হিন্দুশব্দ একবার উল্লিখিত হইয়াছে। হারোবেরেজেতি (আলবোর্জ্জ) পর্ব্বতের সন্নিকটে প্রথম ঐর্য্যান বয়েজো (আর্য্যনিবাস) ছিল। ক্রমে অহুরমজ্‌দ্ ষোলটি নগরের সৃষ্টি করেন, তাহার পঞ্চদশতমের নাম হপ্তহিন্দব, বেদে ইহাই সপ্তসিন্ধবঃ। জেন্দ তীরইয়াস্তে পর্ব্বত বিশেষের নাম স্বরূপ আর একবার ঐ হিন্দবশব্দ পাওয়া যায়, এবং অনুমান হয় উহা আধুনিক হিন্দুকুশের প্রজনিতা। * * বহুপরন্তন বৈয়াকরনিকেরা ঐ মূল অর্থ অব্যবহারে বিস্মৃত হইয়া স্যান্দ্ ধাতুর উত্তর ঔনাদিক উ প্রত্যয় করিয়া কোনরূপে জোড়াতাড়া দিয়া সমুদ্রার্থ বোধক সিন্ধু শব্দ যে নিষ্পন্ন করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের একটি কারিগরী মাত্র।" ইত্যাদি। এই কথা সম্পূর্ণ নূতন; লেখিকার এই উক্তি বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কার। বাঙ্গালীদিগের প্রত্নতত্ত্বসমাজে একথা আমি আর কখনও শুনিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। এখন বুঝিলেন কি, হিন্দুশব্দ যাবনিক নহে, মুসলমান ইহার প্রজনিতা নহে? সর্ব্বপ্রথমে সেই অতি প্রাচীন ও পবিত্র জেন্দাবস্তা গ্রন্থে হিন্দুশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ বেদের সমসাময়িক। প্রাচীন পার্শীকেরা অগ্নিহোত্রী (অগ্নির উপাসক) ছিলেন। তাঁহারা প্রাচীন আর্য্য।

কেবল এইটুকু দেখিলে বা দেখাইলেই যে শেষ হইল তাহা নহে; আমি এতক্ষণ দেখাইলাম—অঙ্কুর; তাহার পরে দেখাইব অঙ্কুরোৎ-পন্ন বৃক্ষ এবং তদন্তর দেখাইব বৃক্ষের ফল। আমি এতক্ষণ দেখাই-

লাম - সম্প্রসারণ, এইবার দেখাইব—বিপ্রকর্ষণ। হিন্দু শব্দের ক্রমিক উন্নতি ও পরিণতির ইতিবৃত্ত দেখাইয়া ইহার শব্দাবর্ত্তন বাদ (Phylological Evolution) আলোচনা করিব। তাহা হইলেই পথ পরিষ্কার হইল। আমরা পার্শীকদিগের জেন্দাবস্তা লইয়াই এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম, এক্ষণে সেই প্রাচীন য়িহুদী জাতির ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থ লইয়া কিছু সময় অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করি; কারণ য়িহুদীদের প্রাচীন শাস্ত্রে হিন্দু কথা পাওয়া যাইতেছে।

বাইবেলের পাঠক মহাশয়গণ বোধ হয় অবগত আছেন যে, য়িহুদীদের "নুমস" (Law) নামক ধর্ম্মশাস্ত্র ইংরাজিতে ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট নামে প্রসিদ্ধ, এই শাস্ত্রের অভ্যন্তরে ৩৯ খানি গ্রন্থ নিহিত। প্রথম পুস্তকের নাম জেনেসিস, শেষ পুস্তকের নাম মালেকহি। এই পুস্তকাবলীর সপ্তদশ সংখ্যক পুস্তকের নাম The Book of Esther, হিব্রুভাষায় ইহার সংজ্ঞা আজ্থুর, এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের ইংরাজি অনুবাদ এইরূপ—

"Now it came to pass in the days of Ahasuerus, this is Ahasuerus which reigned, from *India* even unto Ethiopia, over an hundred and seven and twenty provinces :" ইত্যাদি। (Esther, Ch. I., Verse I.)

পুরাতন ইংরাজিতে, বাইবেল অনুবাদকার লিখিতেছেন "আহাস্যুরেস রাজা ইণ্ডিয়া হইতে ইথিয়োপিয়া পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।" ইত্যাদি। এখন দেখা উচিত, এই "ইণ্ডিয়া" শব্দ কোন্ অর্থবাচক? বলা বাহুল্য, ঐ অনুবাদ মূল হিব্রুভাষার অনুবাদ। মূল হিব্রু শব্দগুলির কথা আমরা পরে বলিব। এই সময়ে একটা কথার মীমাংসা করিয়া রাখা উচিত। একথা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, য়িহুদীদিগের ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট শাস্ত্র, মুসলমান ধর্ম্ম অথবা মুসলমান শাস্ত্র কিম্বা মুসলমান ভাষা বা সাহিত্যের কিম্বা তাহাদের জাতির সৃষ্টি হইবার বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। বেদ বা জেন্দাবস্তা হইতে ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট আধুনিক হইলেও এই গ্রন্থ পৃথিবীর অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ব-

বিদেরা অনুমান করেন, এই গ্রন্থ যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রচারিত হয় * যখন য়িহুদীদের গ্রন্থে ইণ্ডিয়া শব্দ রহিয়াছে এবং ইহার পূর্ব্বে লিখিত জেন্দাবস্তা গ্রন্থে হিন্দব শব্দ রহিয়াছে, তাহা হইলে মুসলমানেরা ইণ্ডিয়া শব্দের জন্মদাতা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। কিন্তু মূল হিব্রু গ্রন্থে শব্দটা ইণ্ডিয়া (India) নহে; মূলে যে শব্দটা আছে তাহারই অনুবাদ করিতে গিয়া অনুবাদক ইণ্ডিয়া (India) লিখিয়াছেন। এখন, আইসুন, সেই মূল শব্দটার অন্বেষণ করি। Esther গ্রন্থ য়িহুদীদের ইব্রিয় (Hebrew) ভাষায় লিখিত, সেই মূল শ্লোকে যে শব্দটা আছে তাহার নাম

"হন্দ্"

হিব্রুভাষায় হন্দ্ শব্দের অর্থ বিক্রম, তেজ, গৌরব, বিভব, প্রজ্ঞা, শক্তি, প্রভাব, ইত্যাদি। প্রমাণ—

১। "The Lord is my *strength.*" *Psalms.* XVIII. 2.

এই ইংরাজিটুকু হিব্রু শ্লোকের অনুবাদ। মূল টুকু এই—

"জেহোবা হন্দ্ মাশা।"

২। "Behold! The Mountains declare the glory of God."

Psalms.

মূল হিব্রু শ্লোক—"নোমায়েষ্ কোহো জেহোবা হন্দ্।"

এতদ্ভিন্ন যে কোনও ইব্রীয় অভিধান অথবা Anglo Hebrew Lexicography পড়িয়া দেখিতে পারেন। আর প্রমাণের আবশ্যক নাই।

এই সাম (Psalms) পুস্তক বাইবেলের অংশ, য়িহুদীরা ইহাকে "জব্বুরে দায়ুদ" বলিয়া থাকেন। আমরা মূল হিব্রু হইতে উদ্ধৃত

---

* খৃষ্টানদিগের মতে পৃথিবীর সৃষ্টি, খৃষ্টের জন্মগ্রহণের পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, সুতরাং তাঁহারা সকল বিষয়েই ঐ একটা নির্দ্দিষ্ট কালকে লক্ষ করিয়া গণনা শেষ করেন। হিন্দু বা পার্শীকেরা তাহা করেন না, হিন্দুমতে সৃষ্টি অনাদি অথবা বহুসহস্র বর্ষ কাল পূর্ব্ববর্ত্তী—লেখক।

করিয়াছি। এখন বুঝা গেল, Esther পুস্তকোক্ত হন্‌দ্‌ অর্থে শক্তি, গৌরব প্রভৃতি বুঝাইতেছে। Esther গ্রন্থের প্রথম শ্লোকের অর্থ, তাহা হইলে এইরূপ হওয়া উচিত—"আহাস্থরেস্‌ রাজা হন্‌দ্‌ (শক্তি) হইতে ইথিয়োপিয়া পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।" ইংরাজিতে যেমন অনেক সময়ে গুণবাচক শব্দকে কেবল তাহার গুণের উল্লেখ দ্বারা বুঝা যায়, সেইরূপে য়িহুদী ভাষায় গুণের উল্লেখে গুণবাচক স্থান বা মনুষ্যের অর্থ বুঝা যায়। "হন্‌দ্‌ হইতে রাজত্ব করেন," অর্থে "হন্‌দ্‌ (শক্তি বিশিষ্ট) রাজ্য হইতে রাজত্ব করেন' বুঝিতে হইবে। প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে গেলে, প্রবন্ধ আরও দীর্ঘ হইবে, সুতরাং প্রমাণ দিলাম না। ইংরাজিতে Zululand না বলিলে Zuluদের দেশ বুঝায়না, উর্দ্দুতে "কবরস্থান" না বলিলে কবরভূমি বুঝায় না, কিন্তু হিব্রুভাষায় হন্‌দ্‌ বলিলে হন্‌দ্‌ (বিক্রম) যুক্ত স্থানকে বুঝায়। (যাঁহারা সামান্য আয়াসে সামান্য হিব্রু শিক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহারা Dr. Haigue's Anglo-Hebrew Grammar পড়িয়া দেখুন।)

য়িহুদীরা গ্রীক জাতি হইতে প্রাচীন; গ্রীকেরা নিজে তাহা স্বীকার করেন। মূল New Testament গ্রন্থ গ্রীক ভাষায় লিখিত, তাহাই গ্রীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র। উক্ত শাস্ত্রের The Acts of the Apostles গ্রন্থের ২৮টি অধ্যায় মধ্যে প্রসিদ্ধ খৃষ্টীয় বক্তা সাধু পলের অনেক বক্তৃতায় একথার অকাট্য প্রমাণ আছে এবং তদ্ভিন্ন ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ইহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। গ্রীকদিগের গ্রন্থে য়িহুদীদের অনেক কথা আছে কিন্তু য়িহুদীদের গ্রন্থে গ্রীকের কথা কম দেখা যায়। মিগাস্থিনীশ গ্রীকদিগের একজন প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লেখক, ইনি লিখিয়াছেন "য়িহুদী প্রভৃতি জাতিরা পার্শীকদিগের নিকটে জ্ঞান ও শিক্ষা এবং ভারতবর্ষীয়দিগের নিকটে ধন ও প্রভুত্ব অর্জ্জন করিয়াছে।" ঐতিহাসিক গিবনের "রোমরাজ্যের অধঃপতন" নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি ইতিহাসে একথা বহুল প্রমাণ সহকারে অনেক স্থানে উল্লিখিত আছে। য়িহুদীরা ভারতে বাণিজ্য করিয়া খুব ধনবান হইয়াছিল ইহা তাহাদের নিজের লিখিত ইতিহাসে বর্ণিত আছে। রাজা দায়ুদের (David) পুত্র প্রসিদ্ধ

সোলেমানের (King Solomon) জগদ্বিখ্যাত দেবালয় বহুলক্ষলোকের পরিশ্রমে এবং বহুলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে য়িহুদীদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্যের জন্য ভারতবর্ষ হইতে নানাপ্রকারের কাষ্ঠ, প্রস্তর প্রভৃতি গিয়াছিল এবং উহার সুসজ্জীকরণ জন্য ভারতবর্ষীয় রাজারা নানাপ্রকারের মূল্যবান দ্রব্য উপঢৌকন দিয়াছিলেন। য়িহুদীরা প্রাচীনকাল হইতে সুদক্ষ সওদাগর বলিয়া বিখ্যাত। থটাক্লুশ নামে জনৈক বহুদর্শী গ্রীক লেখক লিখিয়াছেন "ভারতবর্ষের বিক্রম ও গৌরব দেখিয়াই য়িহুদীরা ঐ দেশকে (ভারতবর্ষকে) হন্দ্ বলিয়া ডাকিত; ঐ নাম আসিয়ার অনেক দেশে অনেক কাল পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল।"*

হন্দ্ শব্দ যখন ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট পুস্তকে স্পষ্টতঃ পাওয়া গিয়াছে তখন অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কি? ভারতবর্ষকে "হন্দ্" বলিয়া য়িহুদীরা ডাকিত, একথা যখন তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত রহিয়াছে, তখন অন্য গ্রন্থকে প্রমাণ স্বরূপে দেখান বাহুল্য মাত্র।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, য়িহুদীরা এই হন্দ্ শব্দ কোথা হইতে পাইয়াছিল? উত্তর—পার্শীকদিগের নিকট হইতে অর্থাৎ জেন্দাবস্তা গ্রন্থ হইতে। প্রমাণ :—

১ম। পার্শীকেরা অনেক বৎসর ব্যাপিয়া য়িহুদী দেশে রাজত্ব করেন। তাঁহাদের রাজত্ব সময়ে য়িহুদী আদালতে জেন্দভাষা রাজভাষা ছিল, শিক্ষিত লোকেরা জেন্দ ভাষায় কথা কহিত; য়িহুদীরা পার্শীকদিগের মত ঠিক অগ্নি-উপাসক না থাকিলেও সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ইত্যাদির পূজা এবং আরাধনা কালে হোম ক্রিয়া করিত, এখনও করে। তাহারা জেন্দাবস্তা পড়িত; য়িহুদী দেশে জেন্দাবস্তার প্রচলন ছিল। ইহার প্রমাণ দেখান যাইতে পারে। খৃষ্টানে হিন্দুতে যেরূপ বিচ্ছেদ, পার্শীক ও য়িহুদীতে সেরূপ বিচ্ছেদ ছিল না। সুতরাং

* Thetisocles quoted by Aikman in the Chamber's Journal, 1866. Vol XXXI.

পার্শীকদের হিন্দু বা হিন্দব শব্দ, য়িহুদীদিগের নিকট পরিচিত থাকা অসম্ভব কেন ?

২য়। অনেক দেশের অনেক পর্ব্বতের অনেক নদ নদীর নাম য়িহুদীরা জেন্দাবস্তা হইতে লইয়াছে। প্রমাণ—

জেন্দ ভাষা।	য়িহুদী ভাষা।
তরাশশ্ (Taurus)	তরশ্
মোশ্জা	মৌশজা
মজ্দাহা	মেশায়া (Messiah)
কঃশা	কোশা
অর্দ্জু	ইয়ারজউ

(Glossary of the Old Testament By Bishop Knox. Published by the Church Missionary Society ; Salisbury square ; London)

এতদ্ভিন্ন "S. P. C. K. Press, Vepery, Madras" এই স্থানে সুলভে প্রাপ্য Hebrew Grammar *(Royal Edition)*, Hebrew Vocabalary এবং Trilingual Dictionary of the Old Testament এই তিনখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে আমাদের উক্তির অকাট্যতা বুঝিতে পারিবেন। পার্শীদের নিকট হইতে লইয়া হিন্দব শব্দ য়িহুদীরা ব্যবহার করিয়াছিল, ইহাতে বিচিত্রতা কি ?

৩য়। অনেকের বিশ্বাস ছিল, হিব্রু ভাষা মৌলিক ভাষা, তাহা নহে ; ইহা জেন্দ ভাষা হইতে উৎপন্ন। ইহা বুঝাইতে গেলে বা ইহার প্রমাণ দিতে গেলে, আবার একটা নূতন প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হয়, তাহা করিব না। জেন্দ ভাষা, হিব্রু ভাষার প্রসূতি, ইহা অখণ্ডনীয় সত্য। তবে জেন্দের হিন্দব, য়িহুদীদের হিব্রু ভাষায় ইনুদ্ রূপে ব্যবহৃত হইবার আশ্চর্য্যটা কি ?

জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, হিন্দব শব্দ হনদ্ হইল কেন ? ইকার এবং ব কোথায় উড়িয়া গেল ? ইহার সদুত্তর দিতেছি। পাঠক মহাশয় ! রাজপুতনার মাড়োয়ারী (কেঁয়ে) দিগের অথবা উত্তর-

পশ্চিমাঞ্চলের আগর্‌ওয়ালা বেনেদিগের "মুণ্ডী" অক্ষর কখনও দেখিয়াছেন কি? ইহাকে কেহ কেহ "কুঠিওয়ালী হরফ্" বলিয়া থাকেন। এই ভাষা বা অক্ষরে ইকার, আকার, উকার প্রভৃতি নাই; বাবা, বিবি, বোবা, বুবু, একই প্রকারে লেখা যায়, নিজের বুদ্ধি অনুসারে মানে বুঝিয়া লইতে হয়, এই জন্য অনেক সময়ে মামা মামি হইয়া যায়, পিসি পাশা হইয়া যায় কেতাব কুতুব হইয়া যায় এবং ঘড়া ঘোড়া হইয়া যায়। হিব্রু ভাষাও কতকটা তাহাই। এই ভাষা দক্ষিণ দিক হইতে বামদিকে পড়িতে হয় এবং ইহার অপত্য আরব্য ও পৌত্র পারস্য ভাষাদ্বয়ে যেরূপ বৈয়াকরনিকেরা কতকটা আকার ইকার উকার স্থির করিয়া লইয়াছেন, হিব্রুভাষায় এখনও সেরূপ কিছুই হয় নাই। বর্ণমালায় স্বরবর্ণ দুই একটি মাত্র, তাহাও অপরিস্ফুট; সুতরাং চিহ্ন দিয়া অনেক কথার উচ্চারণ বুঝাইতে হয়। এই জন্য ইকার অনেক স্থলে লোপ পাইয়াছে। দৃষ্টান্ত*—

জেন্দ ভাষা।	হিব্রু ভাষা।
কিরিয়াদ্	করয়োয়দ্
শিকিনা	সকনা †
হিশিয়া	অশয়ঃ
হিজর্ দ্	য়জানুদ্
বিরজোদ্	বর্ জাদ্

প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে হিব্রুভাষায় ইকার নাই, মৌলিক হিব্রুশব্দ না হইলে সম্পূর্ণ ইকার থাকে না; উচ্চারণে ইকার আসিলেও লেখায় ইকার থাকে না।

---

* আমরা পূর্ব্বে "শিব" (Sceva) শব্দের উল্লেখ করিয়াছি। ইহা মৌলিক শব্দ র্থাৎ খাস হিব্রুশব্দ বলিয়া ইহার পরিবর্ত্তন হয় নাই, ভাষান্তর হইতে গৃহীত শব্দে রবর্ণ খুব কমই দেখা যায়।

† ইহা হিব্রুভাষার একটি মহা প্রসিদ্ধ শব্দ, হিব্রুশাস্ত্র সমূহে ইহার পুনঃ পুনঃ বহার আছে। ইহার অর্থ "The glory of God" জেন্দভাষায় শিকিনা ঐ অর্থে বহার হয়।

দৃষ্টান্ত——

হিব্রু উচ্চারণ।	হিব্রু লেখা।
জিহোবা	জহোবা
ইঞ্জিল্ †	অন্জল্।
ইশ্রাইল।	য়শ্রহিল।
ইজায়া।	আজায়া।
ইয়াকুব।	আকুব।
মরিয়ম্	মরম্।

সুতরাং জেন্দশব্দ "হিন্দব"র প্রথমে যে ইকার আছে তাহা উড়িয়া যাইবার বিচিত্রতা কি? এখন আরও জিজ্ঞাস্য এই যে, ব কোথায় গেল? সদুত্তর দিতেছি। ইব্রিয় (হিব্রু) ভাষায় ত, থ, দ, চ, ছ, ঋ, ড, এই কয়েক অক্ষরের উচ্চারণ আসিলে ব ফ এবং ওয়া অক্ষরের লোপ পাইবে।

দৃষ্টান্ত—

হিব্রু শব্দ।	উচ্চারণে লোপ।
তোবা	তোহা
অস্থুবা	অস্থুহা
সন্দব	সন্দ অথবা সন্দ্
গদব্	গদ্
দাউদব্	দাউদ্
আদাবা	আদাহা

তাহা হইলে ইব্রিয় ভাষায় পার্শীকদিগের প্রাচীন জেন্দাবস্তা গ্রন্থোক্ত সেই পবিত্র হিন্দব শব্দ "হন্দ্" রূপে পরিণত হইয়াছে। এতক্ষণ যাহা দেখা গেল, তাহাতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে,

১ম। হিন্দু শব্দ প্রথমে জেন্দাবস্তা গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে।
২য়। পার্শীকগণ ঐ শব্দের প্রজনিতা।

† ইহা একটি প্রসিদ্ধ হিব্রু শব্দ। বাইবেলকে য়িহুদিরা ইঞ্জিল বলে। জিহোবা শব্দের অর্থ—ঈশ্বর।

৩য়। য়িহুদীরা ঐ শব্দ জেন্দাবস্তা হইতে প্রাপ্ত হইয়া হন্‌দ্ শব্দে পরিণত করিয়াছে।

পাঠক মহাশয়, প্রবন্ধ শেষ হইতে বিলম্ব আছে, এখনও শব্দাবর্ত্তন বাকি রহিয়াছে।

য়িহুদীদিগের ভাষায় জেন্দাবস্তার হিন্দবঃ কি আকারে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা দেখান গিয়াছে। প্রাচীন গ্রীকদিগের সাহিত্যে এই হিন্দব শব্দ কোন্ আকারে উপনীত হইয়াছিল তাহাও একবার দেখা উচিত, কারণ ভারতবর্ষের নামের সহিত প্রত্নতত্ত্ববিদেরা গ্রীক জাতির বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বোধ করিয়া থাকেন। গ্রীকদিগের ভারতাক্রমণের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা ছিল একথা স্বীকার্য্য। প্রাচীন, উন্নত, শিক্ষিত, সভ্য, রাজনীতিকুশল, রাজ্যশাসনকারী গ্রীকেরা, ভারতের কোনও খবর না লইয়া—ভারতসম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া—এতবড় দেশে জয়পতাকা উড়াইতে আসিয়াছিল, একথা যে বলিবে সে নিতান্ত বালকবুদ্ধির লোক। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রীকদিগের অভিজ্ঞতাবিষয়ে প্রমাণ বহুল গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে পথ দিয়া গ্রীক বীরেরা ভারতে আইসেন, সেই পথে এক পর্ব্বতের সন্নিকটে নানা কারণে তাঁহাদিগকে বিশ্রাম লাভ করিতে হইয়াছিল। ঐ পথের বিবরণ তাঁহারা আহাস্যুরেস্ রাজার পুস্তকে পড়িয়াছিলেন, ঐ আহাস্যুরেসের পুত্রের নাম দরায়ূস (Darius) বাইবেলের (The Book of Daniel Ch. IX. Verse I দেখুন) তুষারাবৃত এবং অত্যুচ্চ গিরিমালা দর্শন করিয়া গ্রীকেরা জিজ্ঞাসা করিল, এই অটল অচলের নাম কি ? সহচরেরা উত্তর দিল "ইহার নাম জানি না"। একজন পুরোহিত উত্তর করিলেন "শুনিয়াছি ইহার এক দিকে হন্‌দ্ দেশের সীমা অপর দেশে ইথিয়োপীয়া রাজ্যের রাজনৈতিক সীমা।" এই ইথিয়োপীয়া রাজ্যের হিব্রুনাম Cush (কুশ)। প্রমাণ—Genesis গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে পড়ুন; "And the Name of the second river is Gihon : the same is it that Compasseth the whole of Ethiopia." মূল হিব্রু শ্লোকে ইথিয়োপীয়া শব্দ নাই, কুশ শব্দ আছে। বাইবেলের টীকায় সর্ব্ববাদী-

সম্প্রতিতে ইথিয়োপীয়ার অপর নাম "Cush"—বৃটীশ এবং ফরেণ বাইবেল্ সোসাইটির 8 Vo. Brevier marg. Ref. বাইবেল পড়িলে, কিণারায়(margin) ঐ অর্থ দেখিতে পাইবেন। গ্রীক ভাষার ব্যাকরণ মতে "কোশ্" শব্দ নপুংসক নহে; য়িহুদীদের cush এবং গ্রীকদের cosh একই শব্দ; গ্রীক ভাষায় os বা osh অন্তক শব্দ পুংলিঙ্গ হয়; প্রমাণ—Adolphos; Herodotos; Theophilos, Prophetos; Fidos; Theos; Cosmiosh, ইত্যাদি। কেবল পুংলিঙ্গ নহে, চৈতন্যবিশিষ্ট পুংলিঙ্গ; রূপকে পুংলিঙ্গ নহে, চৈতন্যে পুংলিঙ্গ। তাহা হইলে cosh শব্দ পুংলিঙ্গ এবং চৈতন্যবিশিষ্ট পুংলিঙ্গ শব্দ; এখন দেখা যাউক cosh শব্দের অর্থ কি? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইহা ইথিয়োপীয়া রাজ্যের নাম। গ্রীক শব্দের যেখানে ওমেগা (omega) অক্ষর পূর্ব্বে এবং সিগ্‌মা (sigma) অক্ষর পরে থাকে, সেথানে ঐ শব্দকে গুণবাচক বুঝিতে হইবে, ইহাই গ্রীক ব্যাকরণের নিয়ম। তাহা হইলে কোশ শব্দও গুণবাচক হইতেছে। হিব্রু ভাষায় কুশ বা কোশ শব্দে অনেক অর্থ বুঝাইতে পারে; 'সীমা" ইহার এইরূপ অর্থও হইতে পারে। য়িহুদাদের ভাষায় কোশ বা কুশ পর্ব্বতের নামও হইতে পারে, এই শব্দেরই অপভ্রংশ "কোঃ" এবং "কোহে"—আরব্য ও পারস্য ভাষায় যাহার অর্থ পর্ব্বত। হিন্দুকুশ তৎকালীয় ভারতবর্ষীয় রাজন্যবর্গের যে শেষ সীমা ছিল তাহাও প্রমাণ করা যাইতে পারে। রঘুর দিগ্বিজয়ে, রাজা মানসিংহের বিজয়-বৃত্তান্তে, মহাভারতে গান্ধারীর বিবাহ বিবরণে, প্রাচীন ভূগোলে, হিন্দুকুশের দূরবর্ত্তী স্থানসমূহে ভারতীয় রাজার অধিকার ছিল ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে সমাগত প্রায় সকল প্রধান প্রধান রাজার উল্লেখ আছে; যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে সমাগত রাজন্যবর্গের বিবরণ পড়িয়াছি; কিন্তু হিন্দুকুশের পরবর্ত্তী রাজাদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং হন্দ্ দেশের সীমা অথবা হন্দ্ দেশের সীমাজ্ঞাপক পর্ব্বত এই অর্থে গ্রীকেরা ঐ পর্ব্বতকে "হন্দ্‌কোশ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, ইহা বেশ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ ভাষায় পর্ব্বত পুংলিঙ্গ এবং চৈতন্যবাচক।

বাঙ্গালায় যাহাকে থানা বলে ইংরাজীতে তাহাকে পুলিশ ষ্টেশন বলে, এই পুলিশ শব্দ গ্রীক Polis শব্দ হইতে উৎপন্ন, অর্থ—"নগর"। হিন্দুকুশ পার হইয়া ভারতের যে নগরে প্রথমে গ্রীকেরা মল্লা নামক বীরপ্রধান জাতিকে পরাস্ত করেন, তাহার নাম দিলেন Polis Kai Handkosh. এই কাই শব্দ গ্রীকশব্দ, ইহাতে ক্যাপ্ ডা, আলফা এবং আইয়োটা এই তিনটি অক্ষর আছে, এই তিনটি অক্ষর মিলাইলে ইহার "এবং" বা "ও" অর্থ হয়, অর্থাৎ পর্ব্বত ও নগর। এই হন্‌দ্-কোশ অপভ্রংশে গ্রীক ভাষার Indikos রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, অনেক গ্রীক লেখকেরা "আন্দাকশ" লিখিয়া গিয়াছেন। এই Indikos শব্দ এক্ষণে বৃটিশরাজত্বকালে India নামে পরিচিত ও পরিণত হইয়াছে। এখন বুঝুন, জেন্দাবস্তার হিন্দব—হিব্রু ভাষায় হইল হন্‌দ। হিব্রু ভাষার হন্‌দ্——গ্রীক ভাষায় হইল Handkosh, Indikos, Indios। গ্রীক ভাষার ইণ্ডিকশ্——ইংরেজি ভাষায় হইল INDIA!

এই খানেই কি শব্দাবর্ত্তন বাদের শেষ হইল? তাহা নহে। পাঠকের বোধ হয় জানা আছে, হিন্দুকুশ হইতে আটকনদের তীর পর্য্যন্ত যে ভাষাটি প্রচলিত তাহার নাম পশ্‌তু (Pushtoo) ভাষা। পশ্‌তু ভাষা-ভাষী লোকদিগের আদি বসাত পারস্য দেশ; বোম্বাইয়ের পার্শীরা যেমন পারস্য হইতে ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, আটক প্রান্তরের পশ্‌তু ভাষা ভাষী লোকদাগের পূর্ব্ব পুরুষেরা পারস্য হইতে আসিয়া ঐ স্থানে বাস নির্দ্ধারণ করেন। পশ্‌তু ভাষার সহিত পারস্য ভাষার খুব সম্বন্ধ আছে। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পূর্ব্বে ইহারা সকলে অগ্নির উপাসক ছিল; ভারতের এই পশ্‌তু ভাষাভাষী লোকেরাই—অর্থাৎ আবার সেই জেন্দাবস্তা মান্যকারী অগ্নির উপাসনাকারী পার্শীকদিগের বংশধরেরাই——হিন্‌দ্ বা হন্‌দ্ শব্দের উত্তর হ্রস্ব উ প্রয়োগ করিয়া হন্‌দু পদ তৈয়ার করিলেন। মাদ্রাজের তেলুগু ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে হ্রস্ব উ প্রত্যয় করিলে যেমন 'যুক্ত' বুঝায় (যথা নীরলু, চালু, কপলু ইত্যাদি), পশ্‌তু ভাষার ব্যাকরণে হন্‌দ হিন্‌দব হিন্‌দ্ শব্দের উত্তর হ্রস্ব উ প্রত্যয় করিলে "যুক্ত" বুঝায়। কিন্তু এই "যুক্ত" শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। হ্রস্ব উ প্রত্যয় হইলে হন্‌দ্ অর্থাৎ শক্তি, গৌরব, বিভব, প্রভাব ইত্যাদি

মহিমাযুক্ত জাতি বুঝিতে হইবে, কারণ পশ্‌তু ব্যাকরণের এই উ "গুণবাচক জাতির বা গুণবাচক পুরুষের উত্তর প্রত্যয় হইয়া থাকে।" প্রাচীন আর্য্য-হিন্দু জাতির গৌরব পবিত্রতা, বিভব, মহিমা প্রভৃতি দর্শন করিয়া পশ্‌তু ভাষাভাষীরা ঐ "উ" প্রত্যয় করিয়াছিল। পশতু ভাষায় হন্‌দ্‌ ও হন্দু শব্দ গৌরববাচক।

আমরা নিম্নে দুইটি পশতু শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি. ইহা পাঠ করিলেই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন।

পুশ্‌রো লবোদে জঙ্গীর ফেজোয়ান্‌।
উরো উরো নন্‌ লাখিয়াল্‌ লদে জঙ্গেরে
হন্‌দু জেল্‌ ফাল্‌গো॥ ১।
দেবাট্টি দেরন্‌জু জরর্‌ উহে রম্‌।
কৎলেবে পত্বে দেশ্‌ তর্‌ গো
হন্‌দু এন্‌ সাঁ উরো॥ ২।

এখন পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত সকল ইস্থগুলির যথাসাধ্য উত্তর দেওয়া হইয়াছে। আর এক কথা, পশ্‌তু ভাষা ভাষীরা 'হন্‌দু" পর্য্যন্ত গিয়া থামিয়াছিলেন। শিখধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বাবা নানকের সময়ে, গুরুমুখী ভাষায় হন্‌দু শব্দ. পাঞ্জাবী সৈনিকদিগের দ্বারা হিন্দু শব্দে পরিণত হয়। পঞ্জাবের গুরুমুখী ব্যাকরণানুসারে এইরূপে পদসিদ্ধ হইয়া থাকে। নানকের পূর্ব্বে হিন্দব, সিন্ধব, হন্‌দ, অন্দশ্‌ হন্‌দু পর্য্যন্ত ছিল; হিন্দুবংশাবতংস শিখেরা শেষে হিন্দু শব্দ প্রচলন করিলেন; যাঁহারা বলেন, হিন্দু শব্দটা সীমাবদ্ধ তাঁহারা বড়ই ভ্রান্ত; কোথায় পারস্য, কোথায় য়িহুদী দেশ কোথায় গ্রীশ, কোথায় অহুসুরসের রাজ্য! সর্ব্বত্রই সেই প্রাচীন হিন্দু নাম!

এখন বুঝাগেল, হিন্দু শব্দের তৈয়ারকারীগণের নাম য়িহুদী, ইহার পরিণতিকারকগণের নাম নানকসাহী এবং ইহার অর্থ—বিক্রমশালী, প্রভাবশালী ইত্যাদি। এখন বল দেখি. হিন্দু নাম পরিত্যাগ করিতে চাহ কি? সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক জাকোলিয়েৎ (Jaquoliette) তাঁহার Krisna et la Christos নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন

"অসাধারণ বিক্রম এবং অসাধারণ বিদ্যাবত্তার জন্য ভারতবর্ষ তখন পৃথিবীর আদরের স্থল ছিল।" যে হিন্দু জাতির সততা, সাধুতা, বীরত্ব, বিদ্বাবত্তা, প্রিয়ভাষণ, সুন্দর মূর্ত্তি, ধর্ম্মপরায়ণতা, স্বাধীনতা, প্রভৃতি দর্শন করিয়া য়িহুদী, পারস্যবাসী, গ্রীক ও রোমানগণ মোহিত হইয়াছিলেন, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা যে দেশকে স্বর্গভূমি বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, সেই দেশের লোকেরা "কাফের্" "কদাকার" "পরস্বাপহারী" প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়াছিল, ইহা কি কখনও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? হিন্দু শব্দে কাফের্ বা কদাকার নহে, হিন্দু শব্দ গৌরব, গরিমা, বিক্রম, বীরত্ব ব্যঞ্জক; তবে কি হিন্দুনাম ছাড়িতে চাহ?

যে সুপবিত্র ও সদর্থক নাম স্মরণ করিলে আদর্শ চরিত্রের মানবকে সম্মুখে দেখিতে পাই, যে নাম স্মরণ করিলে মানসপটের সম্মুখে কর্ম্ম, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভক্তি, উপাসনা প্রভৃতির সম্পূর্ণ আদর্শকে দেখিতে পাই সে নাম ছাড়িতে কুণ্ঠিত হইব না কেন? যে হিন্দুনাম রাম, অর্জ্জুন, জনক, লক্ষ্মণ, কর্ণ, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতির গৌরবের কারণ, যাহা প্রাণশীতলকারী ব্রহ্মতত্ত্বের আকর, যাহা বিক্রম ও বিভবের খনি, সেই পবিত্র ও প্রশস্ত হিন্দুনাম আমাদের মাথার মণি, আমাদের দেশের গৌরব, আমাদের জাতির মহত্বব্যঞ্জক, তাহাই এই অধঃপতিত, অর্দ্ধমৃত, পদানত ভারতীয় আর্য্যজাতির জাতীয়জীবনের পুনরুদ্দীপক। "হিন্দু" এই নাম উচ্চারণে ভগ্ন হৃদয়ে আশা আসে, ক্ষীণদেহে বলের সঞ্চার হয়, হৃদয়ে জাতীয় গৌরবের অভ্যুদয় হয় এবং আত্মায় ব্রহ্মানন্দ ভোগ করি। তবে এনাম ছাড়িব কেন?

বহুদিন পূর্ব্বে আলিগড়ের নবাব সৈয়দ আমেদ বাহাদুর মুসলমান জাতির শিক্ষা ও উন্নতি লইয়া যখন আন্দোলন করিতেছিলেন, সেই সময়ে পঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ মহামতি সার সর্দ্দার হৈয়ৎ খাঁ, সি, এস, আই, বাহাদুর হিন্দু শব্দ সম্বন্ধে এক বৃহতী সভায় যাহা বলিয়াছিলেন, বন্ধুবরের প্রকাশিত এক উর্দ্দু গ্রন্থ হইতে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। সর্দ্দার বাহাদুর বলিয়াছিলেন "কিসি সক্স্ কো কাফের ইয়া মুল্‌হীদ্ কহনা আশ্‌রফীয়ৎ ইয়া লাজিমৎ নেহি হ্যায়। দর্ হকিবৎ ইশ্ দুনিয়ামে কোহি সক্স্ মুন্‌কীরে—

মজুদী-এ-খোদা নেহী হ্যায়, ইশ্‌লিয়ে কিসিকো মুল্‌হীদ্‌ কহণা কিশ্‌তরে মোনাসীব্‌ হো সেক্তা? খুশন্‌, আহেলেহিন্‌দ্‌যো কে মজবে হিন্দুয়ানা কো পয়রবী কর্‌তেহ্যায় ওঃ সব্‌ মেরে পেয়ারে পাক্‌ পর্‌বর্‌দীগার কো বিশ্‌তরে এবাদৎ কর্‌তে হ্যায় ইশীতরে হাম সবো ভি কর্‌তা হুঁ। আস্‌লিয়ৎ ইয়ে হ্যায় কে হিন্দু ইয়ে লকব ইয়া খেতাব ইয়া ইশম্‌ মে যো মানে হ্যায় ওঃ মানে উন্‌কে হেকারৎ কো লিয়ে নেহী হ্যায়, বল্‌কে ওহি লফ্‌জ্‌ মে ওন্‌কা আস্‌রফীয়ৎ, লেয়াকৎ, ইমানদারী, তরিবতে সুলুক, খোদাপরস্তী, দিন্‌দারী বগায়র বখুবী তৌর পর মজুদ্‌ হ্যায়। ইসী ওয়াস্তে হিন্দু আলফাজ হকির নেহী হ্যায়, কেঁওকে সায়েব নে ফোরমায়া—

> ইস্‌ক্‌মামুবে যিস্‌কি দিল্‌ হাঁসিল নেহি।
> লাখোঁ মুমীণ হো, মগর্‌ ইমাণ মে কামিল নেহি ॥
> ইত্যাদি।"

অর্থাৎ, সংক্ষেপতঃ, হিন্দুনামের অভ্যন্তরে হিন্দু জাতির উচ্চ সভ্যতা, যোগ্যতা, বিজ্ঞতা, ভদ্রতা, ধর্ম্মপরায়ণতা, বিক্রমশালীত্ব প্রভৃতি নিহিত রহিয়াছে; হিন্দুনাম ঘৃণাব্যঞ্জক নহে, ইহা হিন্দু জাতির গৌরবের উপাধি। রসিয়ার মাদাম্‌ ব্লাভাট্‌স্‌কি আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া বোম্বায়ে ইহলোক সম্বরণ করেন, মৃত্যুর সময়ে বলিয়াছিলেন "Blessed is the man who calleth himself a Hindu" অর্থাৎ ধন্য সেই পুরুষ যিনি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন।

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

নষ্টনীড়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ভূপতি যখন তাহার খবরের কাগজ হইতে অবসর লইল তখন নিজের ভবিষ্যতের একটা ছবি নিজের মনের মধ্যে আঁকিয়া লইয়াছিল। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল কোন প্রকার দুরাশা দুশ্চেষ্টায় যাইবে না, চারুকে লইয়া পড়া শুনা, ভালবাসা, এবং প্রতিদিনের ছোটখাট গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিবে। মনে করিয়াছিল যে সকল ঘোরো সুখ সব চেয়ে সুলভ অথচ সুন্দর, সর্ব্বদাই নাড়াচাড়ার যোগ্য অথচ পবিত্র নির্ম্মল, সেই সহজলব্ধ সুখগুলির দ্বারা তাহার জীবনের গৃহকোণটিতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাইয়া নিভৃত শান্তির অবতারণা করিবে। হাসি গল্প পরিহাস, পরস্পরের মনোরঞ্জনের জন্য প্রত্যহ ছোটখাটো আয়োজন, ইহাতে অধিক চেষ্টা আবশ্যক হয় না অথচ সুখ অপর্য্যাপ্ত হইয়া উঠে।

কার্য্যকালে দেখিল সহজ সুখ সহজ নহে। যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না তাহা যদি আপনি হাতের কাছে না পাওয়া যায় তবে আর কোনমতেই কোথাও খুঁজিয়া পাইবার উপায় থাকে না।

ভূপতি কোনমতেই চারুর সঙ্গে বেশ করিয়া জমাইয়া লইতে পারিল না। ইহাতে সে নিজেকেই দোষ দিল। ভাবিল বারো বৎসর কেবল খবরের কাগজ লিখিয়া, স্ত্রীর সঙ্গে কি করিয়া গল্প করিতে হয় সে বিদ্যা একেবারে খোয়াইয়াছি। সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতেই ভূপতি আগ্রহের সহিত ঘরে যায়,—সে দুই একটা কথা বলে, চারু দুই একটা কথা বলে, তার পরে কি বলিবে, ভূপতি কোনমতেই ভাবিয়া পায় না। নিজের এই অক্ষমতায় স্ত্রীর কাছে সে লজ্জা বোধ করিতে থাকে। স্ত্রীকে লইয়া গল্প করা সে এতই সহজ মনে করিয়াছিল অথচ মূঢ়ের নিকট ইহা এতই শক্ত! সভাস্থলে বক্তৃতা করা ইহার চেয়ে সহজ।

যে সন্ধ্যাবেলাকে ভূপতি হাস্যে কৌতুকে প্রণয়ে আদরে রমণীয় করিয়া কল্পনা করিয়াছিল, সেই সন্ধ্যাবেলা কাটানো তাহাদের পক্ষে সমস্যার স্বরূপ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চেষ্টাপূর্ণ মৌনের পর ভূপতি মনে করে উঠিয়া যাই—কিন্তু উঠিয়া গেলে চারু কি মনে করিবে এই ভাবিয়া উঠিতেও পারে না। বলে, চারু তাস্ খেল্‌বে?—চারু অন্য কোন গতি না দেখিয়া বলে, আচ্ছা! বলিয়া অনিচ্ছাক্রমে তাস পাড়িয়া আনে, নিতান্ত ভুল করিয়া অনায়াসেই হারিয়া যায়—সে খেলায় কোন সুখ থাকে না!

ভূপতি অনেক ভাবিয়া একদিন চারুকে জিজ্ঞাসা করিল—চারু মন্দাকে আনিয়ে নিলে হয় না? তুমি নিতান্ত একলা পড়েচ!

চারু মন্দার নাম শুনিয়াই জ্বলিয়া উঠিল। বলিল—না, মন্দাকে আমার দরকার নেই!

ভূপতি হাসিল। মনে মনে খুসি হইল। সাধ্বীরা যেখানে সতীধর্ম্মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখে সেখানে ধৈর্য্য রাখিতে পারে না!

বিদ্বেষের প্রথম ধাক্কা সাম্‌লাইয়া চারু ভাবিল, মন্দা থাকিলে সে হয় ত ভূপতিকে অনেকটা আমোদে রাখিতে পারিবে! ভূপতি তাহার নিকট হইতে যে মনের সুখ চায় সে তাহা কোনমতে দিতে পারিতেছে না ইহা চারু অনুভব করিয়া পীড়া বোধ করিতেছিল। ভূপতি জগৎসংসারের আর সমস্ত ছাড়িয়া একমাত্র চারুর নিকট হইতেই তাহার জীবনের সমস্ত আনন্দ আকর্ষণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছে, সেই একাগ্র চেষ্টা দেখিয়া ও নিজের অন্তরের দৈন্য উপলব্ধি করিয়া চারু ভাত হইয়া পড়িয়াছিল! এমন করিয়া কতদিন কিরূপে চলিবে? ভূপতি আর কিছু অবলম্বন করেনা কেন? আর একটা খবরের কাগজ চালায় না কেন? ভূপতির চিত্তরঞ্জন করিবার অভ্যাস এ পর্য্যন্ত চারুকে কখনো করিতে হয় নাই, ভূপতি তাহার কাছে কোন সেবা দাবী করে নাই, কোন সুখ প্রার্থনা করে নাই, চারুকে সে সর্ব্বতোভাবে নিজের প্রয়োজনীয় করিয়া তোলে নাই; আজ হঠাৎ তাহার জীবনের সমস্ত প্রয়োজন চারুর নিকট চাহিয়া বসাতে সে কোথাও কিছু যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না। ভূপতির কি

চাই, কি হইলে সে তৃপ্ত হয়, তাহা চারু ঠিকমত জানেনা, এবং জানিলেও তাহা চারুর পক্ষে সহজে আয়ত্তগম্য নহে।

ভূপতি যদি অল্পে অল্পে অগ্রসর হইত তবে চারুর পক্ষে হয় ত এত কঠিন হইত না—কিন্তু হঠাৎ একরাত্রে দেউলিয়া হইয়া রিক্ত ভিক্ষাপাত্র পাতিয়া বসাতে সে যেন বিব্রত হইয়াছে!

চারু কহিল—আচ্ছা, মন্দাকে আনিয়ে নাও; সে থাক্‌লে তোমার দেখাশুনোর অনেক সুবিধে হতে পার্‌বে!

ভূপতি হাসিয়া কহিল—আমার দেখাশুনো! কিছু দরকার নেই।

ভূপতি ক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবিল, আমি বড় নীরসলোক, চারুকে কিছুতেই আমি সুখী করিতে পারিতেছি না।

এই ভাবিয়া সে সাহিত্য লইয়া পড়িল। বন্ধুরা কখনো বাড়ী আসিলে বিস্মিত হইয়া দেখিত ভূপতি টেনিসন্, বাইরন্, বঙ্কিমের গল্প, এই সমস্ত লইয়া আছে। ভূপতির এই অকাল কাব্যানুরাগ দেখিয়া বন্ধুবান্ধবেরা অত্যন্ত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ভূপতি হাসিয়া কহিল, ভাই! বাঁশের ফুলও ধরে, কিন্তু কখন্ ধরে তার ঠিক নেই!

একদিন সন্ধ্যাবেলায় শোবার ঘরে বড় বাতি জ্বালাইয়া ভূপতি প্রথমে লজ্জায় একটু ইতস্ততঃ করিল—পরে কহিল, একটা কিছু পড়ে শোনাব?

চারু কহিল, শোনাও না!

ভূপতি। কি শোনাব?

চারু। তোমার যা ইচ্ছে!

ভূপতি চারুর অধিক আগ্রহ না দেখিয়া একটু দমিল। তবু সাহস করিয়া কহিল—টেনিসন্ থেকে একটা কিছু তর্জ্জমা করে তোমাকে শোনাই!

চারু কহিল, শোনাও!

সমস্তই মাটি হইল। সঙ্কোচে ও নিরুৎসাহে ভূপতির পড়া বাধিয়া যাইতে লাগিল, ঠিকমত বাঙ্গালা প্রতিশব্দ যোগাইল না। চারুর

শূন্যদৃষ্টি দেখিয়া বোঝা গেল, সে মন দিতেছেনা। সেই দীপালোকিত ছোট ঘরটি, সেই সন্ধ্যাবেলাকার নিভৃত অবকাশটুকু তেমন করিয়া ভরিয়া উঠিল না!

ভূপতি আরো দুই একবার এই ভ্রম করিয়া অবশেষে স্ত্রীর সহিত সাহিত্যচর্চ্চার চেষ্টা পরিত্যাগ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

যেমন গুরুতর আঘাতে স্নায়ু অবশ হইয়া যায় এবং প্রথমটা বেদনা টের পাওয়া যায় না; সেইরূপ বিচ্ছেদের আরম্ভকালে অমলের অভাব চারু ভাল করিয়া যেন উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

অবশেষে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই অমলের অভাবে সাংসারিক শূন্যতার পরিমাপ ক্রমাগতই যেন বাড়িতে লাগিল। এই ভীষণ আবিষ্কারে চারু হতবুদ্ধি হইয়া গেছে। নিকুঞ্জবন হইতে বাহির হইয়া সে হঠাৎ এ কোন্ মরুভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে—দিনের পর দিন যাইতেছে, মরুপ্রান্তর ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। এ মরুভূমির কথা সে কিছুই জানিত না!

ঘুম থেকে উঠিয়াই হঠাৎ বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া উঠে—মনে পড়ে অমল নাই। সকালে যখন সে বারাণ্ডায় পান সাজিতে বসে ক্ষণে ক্ষণে কেবলি মনে হয় অমল পশ্চাৎ হইতে আসিবে না। এক এক সময় অন্যমনস্ক হইয়া বেশি পান সাজিয়া ফেলে, সহসা মনে পড়ে বেশি পান খাইবার লোক নাই। যখনই ভাঁড়ার ঘরে পদার্পণ করে মনে উদয় হয় অমলের জন্য জলখাবার দিতে হইবে না। মনের অধৈর্য্যে অন্তঃপুরের সীমান্তে আসিয়া মাকে স্মরণ করাইয়া দেয় অমল কলেজ হইতে আসিবে না। কোন একটা নূতন বই, নূতন লেখা, নূতন খবর, নূতন কৌতুক প্রত্যাশা করিবার নাই; কাহারো জন্য কোন শেলাই করিবার, কোন লেখা লিখিবার, কোন সৌখীন জিনিষ কিনিয়া রাখিবার নাই।

নিজের অসহ্য কষ্টে ও চাঞ্চল্যে চারু নিজে বিস্মিত। মনোবেদনার অবিশ্রাম পীড়নে তাহার ভয় হইল। নিজে কেবলি প্রশ্ন করিতে

লাগিল—কেন? এত কষ্ট কেন হইতেছে? অমল আমার এতই কি, যে, তাহার জন্য এত দুঃখ ভোগ করিব! আমার কি হইল, এতদিন পরে আমার একি হইল! দাসী, চাকর, রাস্তার মুটে মজুর গুলাও নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিতেছে, আমার এমন হইল কেন? ভগবান্ হরি, আমাকে এমন বিপদে কেন ফেলিলে?

কেবলি প্রশ্ন করে, এবং আশ্চর্য্য হয় কিন্তু দুঃখের কোন উপশম হয় না। অমলের স্মৃতিতে তাহার অন্তর বাহির এমনি পরিব্যাপ্ত, যে, কোথাও সে পালাইবার স্থান পায় না।

ভূপতি কোথায় অমলের স্মৃতির আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে তাহা না করিয়া সেই বিচ্ছেদব্যথিত স্নেহশীল মূঢ় কেবলই অমলের কথাই মনে করাইয়া দেয়!

অবশেষে চারু একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল—নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করায় ক্ষান্ত হইল,—হার মানিয়া নিজের অবস্থাকে অবিরোধে গ্রহণ করিল। অমলের স্মৃতিকে যত্নপূর্ব্বক হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল।

ক্রমে এমনি হইয়া উঠিল, একাগ্রচিত্তে অমলের ধ্যান তাহার গোপন গর্ব্বের বিষয় হইল—সেই স্মৃতিই যেন তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব!

গৃহকার্য্যের অবকাশে একটা সময় সে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইল। সেই সময় নির্জ্জনে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অমলের সহিত তাহার নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘটনা চিন্তা করিত। উপুড় হইয়া পড়িয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া বারবার করিয়া বলিত, অমল, অমল, অমল! সমুদ্র পার হইয়া যেন শব্দ আসিত—বোঠান, কি বোঠান! চারু সিক্তচক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিত—অমল, তুমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলে কেন? আমি ত কোন দোষ করি নাই! তুমি যদি ভাল মুখে বিদায় লইয়া যাইতে, তাহা হইলে বোধ হয় আমি এত দুঃখ পাইতাম না! অমল সম্মুখে থাকিলে যেমন কথা হইত চারু ঠিক তেমনি করিয়া কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া বলিত। অমল, তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই! একদিনও না, এক দণ্ডও না!

আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমস্ত তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার পূজা করিব!

এইরূপে চারু তাহার সমস্ত ঘরকন্না তাহার সমস্ত কর্ত্তব্যের অন্তঃস্তরের তলদেশে সুরঙ্গ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালাসজ্জিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে তাহার স্বামী বা পৃথিবীর আর কাহারও কোন অধিকার রহিল না। সেই স্থানটুকু যেমন গোপনতম, তেমনি গভীরতম, তেমনি প্রিয়তম। তাহারই দ্বারে সে সংসারের সমস্ত ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনাবৃত আত্মস্বরূপে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখস্‌খানা আবার মুখে দিয়া পৃথিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিয়াকর্ম্মের রঙ্গভূমির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

এইরূপে মনের সহিত দ্বন্দ্ববিবাদ ত্যাগ করিয়া চারু তাহার বৃহৎ বিষাদের মধ্যে একপ্রকার শান্তিলাভ করিল এবং একনিষ্ঠ হইয়া স্বামীকে ভক্তি ও যত্ন করিতে লাগিল। ভূপতি যখন নিদ্রিত থাকিত চারু তখন ধীরে ধীরে তাহার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পায়ের ধূলা সীমন্তে তুলিয়া লইত। সেবাশুশ্রূষায় গৃহকর্ম্মে স্বামীর লেশমাত্র ইচ্ছা সে অসম্পূর্ণ রাখিত না। আশ্রিত প্রতিপালিত ব্যক্তিদের প্রতি কোন প্রকার অযত্নে ভূপতি দুঃখিত হইত জানিয়া চারু তাহাদের প্রতি আতিথ্যে তিলমাত্র ত্রুটি ঘটিতে দিত না। এইরূপে সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া ভূপতির উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খাইয়া চারুর দিন শেষ হইয়া যাইত।

এই সেবা ও যত্নে ভগ্নশ্রী ভূপতি যেন নবযৌবন ফিরিয়া পাইল। স্ত্রীর সহিত পূর্ব্বে যেন তাহার নব বিবাহ হয় নাই, এতদিন পরে যেন হইল। সাজ সজ্জায় হাস্যে পরিহাসে বিকশিত হইয়া সংসারের সমস্ত দুর্ভাবনাকে ভূপতি মনের একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া দিল। রোগ আরামের পর যেমন ক্ষুধা বাড়িয়া উঠে; শরীরে ভোগশক্তির বিকাশকে সচেতন ভাবে অনুভব করা যায়, ভূপতির মনে এতকাল পরে

সেইরূপ একটা অপূর্ব্ব এবং প্রবল ভাবাবেশের সঞ্চার হইল। বন্ধুদিগকে, এমন কি, চারুকে লুকাইয়া ভূপতি কেবল কবিতা পড়িতে লাগিল। মনে মনে কহিল, কাগজখানা গিয়া এবং অনেক দুঃখ পাইয়া এতদিন পরে আমি আমার স্ত্রীকে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি!

ভূপতি চারুকে বলিল, চারু তুমি আজকাল লেখা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছ কেন!

চারু বলিল ভারিত আমার লেখা!

ভূপতি। সত্যি কথা বলচি, তোমার মত অমন বাঙ্গালা এখনকার লেখকদের মধ্যে আমিত আর কারো দেখিনি! বিশ্ববন্ধুতে যা লিখেছিল আমারও ঠিক তাই মত।

চারু। আঃ থাম।

ভূপতি, "এই দেখনা" বলিয়া একখণ্ড সরোরুহ বাহির করিয়া চারু ও অমলের ভাষার তুলনা করিতে আরম্ভ করিল। চারু আরক্তমুখে ভূপতির হাত হইতে কাগজ কাড়িয়া লইয়া অঞ্চলের মধ্যে আচ্ছাদন করিয়া রাখিল।

ভূপতি মনে মনে ভাবিল, লেখার সঙ্গী একজন না থাকিলে লেখা বাহির হয় না; রোস, আমাকে লেখাটা অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা হইলে ক্রমে চারুরও লেখার উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারিব।

ভূপতি অত্যন্ত গোপনে খাতা লইয়া লেখা অভ্যাস আরম্ভ করিল। অভিধান দেখিয়া, পুনঃপুনঃ কাটিয়া, বার বার কাপি করিয়া ভূপতির বেকার অবস্থার দিনগুলি কাটিতে লাগিল। এত কষ্টে এত চেষ্টায় তাহাকে লিখিতে হইতেছে যে, সেই বহু দুঃখের রচনাগুলির প্রতি ক্রমে তাহার বিশ্বাস ও মমতা জন্মিল।

অবশেষে একদিন তাহার লেখা আর একজনকে দিয়া নকল করাইয়া ভূপতি স্ত্রীকে লইয়া দিল। কহিল, আমার এক বন্ধু নতুন লিখ্‌তে আরম্ভ করেছে। আমিত কিছু বুঝিনে, তুমি একবার পড়ে দেখ দেখি তোমার কেমন লাগে!

খাতাখানা চারুর হাতে দিয়া সাধ্বসে ভূপতি বাহিরে চলিয়া গেল। সরল ভূপতির এই ছলনাটুকু চারুর বুঝিতে বাকি রহিল না।

পড়িল ; লেখার ছাঁদ এবং বিষয় দেখিয়া একটুখানি হাসিল। হায়! চারু তাহার স্বামীকে ভক্তি করিবার জন্য এত আয়োজন করিতেছে সে কেন এমন ছেলেমানুষী করিয়া পূজার অর্ঘ্য ছড়াইয়া ফেলিতেছে। চারুর কাছে বাহবা আদায় করিবার জন্য তাহার এত চেষ্টা কেন! সে যদি কিছুই না করিত, চারুর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সর্ব্বদাই তাহার যদি প্রয়াস না থাকিত তবে স্বামীর পূজা চারুর পক্ষে সহজসাধ্য হইত। চারুর একান্ত ইচ্ছা, ভূপতি কোন অংশেই নিজেকে চারুর অপেক্ষা ছোট না করিয়া ফেলে!

চারু খাতাখানা মুড়িয়া বালিশে হেলান দিয়া দূরের দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল। অমলও তাহাকে নূতন লেখা পড়িবার জন্য আনিয়া দিত।

সন্ধ্যাবেলায় উৎসুক ভূপতি শয়নগৃহের সম্মুখবর্ত্তী বারান্দায় ফুলের টব পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইল, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

চারু আপনি বলিল, এ কি তোমার বন্ধুর প্রথম লেখা ?

ভূপতি কহিল—হাঁ।

চারু। এত চমৎকার হয়েছে—প্রথম লেখা বলে মনেই হয় না।

ভূপতি অত্যন্ত খুসি হইয়া ভাবিতে লাগিল, বেনামী লেখাটার নিজের নামজারি করা যায় কি উপায়ে ?

ভূপতির খাতা ভয়ঙ্কর দ্রুতগতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। নাম প্রকাশ হইতেও বিলম্ব হইল না।

ক্রমশঃ—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সেরা মালী।

কবি বলিল :—

বসন্তে কানন আজ কুসুমে কুসুম।
এ দুদিন কোকিলের চক্ষে নাহি ঘুম॥

কবিসখা বলিল :—

আরে রাম ! অবিরাম কুহু কুহু কুহু !
কৃপা করি ওহে পিক ক্ষান্ত হও মুহু !
শেষ রাত্রে পঞ্চম সপ্তমে যবে চড়ে,
শিয়রের গোড়ায় ডাকাত যেন পড়ে॥

কবি বলিল :—

হুহু শ্বাস ছাড়িল দক্ষিণ দিগ্বধূ
কুহু স্বরে অমনি উত্তর দিল মধু॥

কবিসখা বলিল :—

তোমার মধুর পায়ে করি আমি গড়।
ফুলকফি কাড়ি নি'ল গালে মারি চড়॥
বদলি দিলেন যাহা—কদলীরই ভাই—
বকুল আম্র-মুকুল, ভস্ম আর ছাই !

কবি বলিল :—

বকুল নয়ন-শূল, কর্ণ-শূল পিক !
চেপেছে বিরহ-জ্বর—ভাল না গতিক !

কবিসখা বলিল :—

কবিরাজ বটো কিন্তু নাড়ি-জ্ঞান নাই।
মোর কাছে বিরহের খাটে না বড়াই॥
বিরহের পিতা যিনি (প্রেম যাঁর নাম)
দূর-হৈতে মোরে তিনি করেন প্রণাম॥

কবি বলিল :—

বিরহের পিতামহ রস অতি গাঢ়।
তাহা যদি ভঙ্গ কর, সঙ্গ মোর ছাড়।
তোমার বচন-শেলে মর্ম্মে পেয়ে ব্যথা,
মৃতপ্রায় কোকিলের ফুরিছে না কথা॥
মনেই রহিল তার মনের বারতা।
নৃত্যগীতে ক্ষান্ত দিল নিকুঞ্জের লতা

কবিসখা বলিল :—

ক্ষান্ত দিবে তুমিও আসিবে যবে জল।
ভরসা আমার এই ছাতাটা কেবল॥
করিয়া আইল মেঘ এযে বিলক্ষণ।
চিকুর হানিছে অই ! ভাল না লক্ষণ !

কবি বলিল :—

জল আসে আসুক ! মরিব আমি ভিজে।
আমার ব্যথার ব্যথী ঋতুরাজ নিজে॥
চারু তরু-লতায় ফুটেছে চেকনাই।
তার পানে তোমার আদবে চোক নাই॥
যখনি উঠিছে জাগি বাতাস দখিনে—
আসিছে বকুল গন্ধ ! গাচ তো দেখিনে !

কবিসখা বলিল ঃ—

জেলের ছেলেটি যেথা ধরিতেছে মাছ ;
ঝিলের ওপারে অই বকুলের গাছ ॥
পাশের কুটীরখানি পড়ি' নাই খালি।
কে যেন গাঁথিছে মালা—বোধ হয় মালী।
হিতবাক্য এ মোর ক'রো না অবহেলা।
অই ঠাঁই চল যাই শীঘ্র এই বেলা ॥
ভেবেছিনু বৃষ্টি হ'বে, ঠিক্ তাই হ'ল।
পারো যদি ছাতা-খানা টেনেটুনে খোলো।
ততক্ষণ আমি গিয়া মালীরে সুধাই—
ঘরে যদি তুই দণ্ড দিতে পারে ঠাঁই ॥

কবির বিপদ।

পড়িল দু-এক ফোঁটা কবির মাথায়।
খোলে না যে ছাতা-খানা, একি হ'ল দায়।
দ্বিতীয় তৃতীয় টানে খুলে' গেল ছাতা।
ভিজিবার দায় থেকে বেঁচে গেল মাথা ॥
ঘোর করি এ'ল মেঘ শ্যামাইয়া তরু।
বাজিয়া উঠিল আর ভেকের ডম্বরু ॥
ঝিলের ওপারে হেরি কুঁড়ে ঘর-খানি,
কবিরে কবির মন করে টানাটানি ॥
ঝিল সে বৃহৎ দীর্ঘী সওয়া কোশ পাকা।
ঘুরিয়া যাইতে হ'লে দু ঘণ্টার ধাক্কা ॥
বাঁকিয়া হ'য়েচে পথ নয়নের আড়।
দ্বীপের করিছে ভান গাছে-ঢাকা পাড় ॥
ক্ষণেক ফিন্‌কি ধারে নামিয়া নিস্তব্ধে,
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ঝুপ ঝাপ শব্দে ॥
তুব্‌ড়িয়া যায় ছাতা বৃষ্টির থাবোড়ে।
ভুঁয়ে লপটায় কোঁচা হ'য়ে লড়্‌বোড়ে ॥
গুটাইয়া ছাতাটা, আঁটিয়া মালকোঁচা।
কোমর বাঁধিয়া কবি দৌড় দিল চোঁচা ॥

আপদঃ শান্তি।

দৌড়িয়া আসিছে কবি ছাতাটি বগলে।
সহাস্য-বদনে সখা দুয়ার আগলে ॥
বলে কবি "বন্ধুর এমনি বটে কাজ !"
হাসে আর কাষ্ঠ-হাসি কষ্টে ঢাকি লাজ ॥
চৌকাট ডিঙা'বে যেই, খাইল হোঁচোট্।
"আরে ! আরে !" বলে সখা "লাগেনি তো চোট্ ?"
পিছলিয়া পড়িতে পড়িতে কবি বাঁচে।
হাসিতে নারিয়া সখা "হেচ্ছো !" করি হাঁচে ॥
বলে আর "কবিত্বের রাম-শাম কীট
জলে ভিজি এইবার হইয়াছে ঢীট্ !
মূর্ত্তি যে হ'য়েছে তব—কেমনে বাখানি !
বাসী হইলেই ফলে কাঙালের বাণী ॥"
কবি বলে "ফলিবার হইলেই ফলে।
বাণীর পিতার লেখা বাণীতে না টলে ॥
যা হো'ক্—এখন আর চিন্তা নাই কোনো।
হস্তে ওটা কি তোমার গুটোনো সুটোনো ?"
সখা বলে "হস্তে মোর দেখিতেছ এ যা—
জীবদ্দশায় ছিল ব্যাঘ্র মহাতেজা ॥
মালীর সহিতে ছিল প্রণয় অত্যন্ত।
নিত্য খাওয়াইত মালী বরাহ জীয়ন্ত ॥

পিঞ্জরের দ্বার খুলি মাঝে মাঝে মালী
ডাকিত আদর করি "করালী! করালী!"
কোলাকুলি হৈত আর স্যাঙাতে স্যাঙাতে।
পিঞ্জরের দ্বার খুলি একদিন প্রাতে
অনেক ডাকিল মালী—না পাইল সাড়া।
ভাবিল 'বাঘার বুঝি লাগিয়াছে জাড়া'॥
গাত্র নাড়াচাড়া দিয়া দেখে শেষে মালী,
শরীর পিঞ্জর-খানা হ'য়ে গেছে খালি॥
তেরাত্রি ত্যজিল মালী নয়নের বারি।
চর্ম্মের হইল শেষে উত্তরাধিকারী॥
ভিজিয়া গিয়াছে ধুতি, ছাড়ো অতএব।
পরি' এই বাঘছাল সাজো মহাদেব॥
বৃষ যদি চাও তবে বৃষচর্ম্ম-দুটি
হ'য়েচে জিয়ন্ত বৃষ, জলে ফুলি উঠি॥
পাঁজোর বেরোনো ছাতা ত্রিশূল মন্দ না।
কবি বলে "অপূর্ব্ব এ শিবের বন্দনা
পাইলে লুফিয়া লয় অন্নদা-মঙ্গল।
পথে হাটে ছড়া'য়ো না রসের সম্বল॥"
এত বলি ব্যাঘ্রছাল কটিতে আঁটিয়া,
করিল কৈলাস-গিরি মালীর খাটিয়া॥
চপলা চলিয়া গেল রাঙাইয়া চোক।
আরম্ভিল অমনি মেঘের ডাকডোক॥
তড়তড় শিলা পড়ি ছেয়ে ফ্যালে মহী।
গলা ছাড়ি ডাকে ভেক গোলাগুলি সহি।
অদৃশ্য হইয়া গেল তৃণ-আস্তরণ।
তবু ছাই জলধারা না মানে বারণ॥

চাহিয়া দেখিল কবি মালী নাই ঘরে।
সখারে সুধায় তাই "এ বৃষ্টি বাদরে
ভিজিতে ভিজিতে মালী গেল কোথা ভাই?
সখা বলে "আমিওতো ভাবিতেছি তাই!
অই আসিতেছে মালী! পুঁটুলিতে কি ও!
তপ্ত মুড়ি এনেচ যে! শতবর্ষ জিও!"
উপস্থিত করে মালী চারি ধামা মুড়ি।
লঙ্কা আর পাড়ি আনে গাম্‌চা দিয়া মুড়ি॥
ঝাঁঝালো সর্ষপ-তৈলে পুরি আনে ভাণ্ড।
কবি বলে "সর্ব্বনাশ! করিছ কি কাণ্ড!
হাতির খোরাক এ যে! হরে হরে হরে!
এ দু-ধামা রাখো তুমি আপনার তরে॥"
এত বলি মুঠামুঠা মুড়ি করে পার।
চারি ধামা হ'য়ে গেল নিমেষে উজাড়॥
পাতিয়া তখন মালী কলা-পত্র থালা,
সাজাইয়া রাখে দুটা নারিকেল-মালা॥
আনিয়া ঘটিতে করি ক্ষণপরে মালী,
সেই দুই পাত্রে দিল গরম চা ঢালি॥
সে চা'র জনম-ভূমি ঝিলের ওধার।
মালঞ্চের মুখ ম্লান সুগন্ধে তাহার॥
চা চাখিয়া বলে কবি "জানো কি গো জাদু?
চা কোথাও পিই নাই এমন সুস্বাদু॥"
মালী বলে, "ক্ষমিবে সহস্র মোর দোষ।"
এত বলি লবঙ্গের দিয়া ঠেস্ ঠোস্,
গুয়া চুণ খএরে তাম্বুল দিল সাজি।
কবি বলে "বাকি কিছু রাখিলে না আজি॥

ছিলে নন্দনের মালী—সেবিতে বাসবে।
ক্ষীণ পুণ্য পুরা'বারে এসেছ এ ভবে॥
সম্বল আঁটিয়া পুন' যাবে সেই ঠাঁই।"
মালী বলে "কৃপায় স্বরগ হাতে পাই॥"
কবিরে বলিল সখা করি পরিহাস,
লেগেচে মালীর গায়ে তোমার বাতাস॥
বড় ভ আজ ফাঁকতালে হাতাইল স্বর্গ!
হাতে যদি রজতের পড়িত বিসর্গ
এই দণ্ডে হইত স্বর্গের পথ-রোধ।
একটু থেমেচে বৃষ্টি, হইতেছে বোধ॥
ভেকের গলায় নাই শকতি সেরূপ।
এবার বুঝিবা হ'ল একেবারে চুপ॥"
এই কথা যেইমাত্র মুহূর্ত্তেক বলা—
সারা উদ্যানের ভেক ছাড়ি দিল গলা॥
মিনিট পোনেরো ষোলো বৃষ্টি হ'ল ঝেড়ে,
নরমিয়া ক্রমশ বাদল গেল ছেড়ে'॥
অবসান হ'য়ে এ'ল বিদ্যুতের রেখা।
কোথায় যে গেল মেঘ নাহি তার দেখা॥
বৃষ্টি গেল ধরিয়া ফরসা হ'ল দিক্।
বৈকালি করিল সুরু নবরাগে পিক॥
পাদুকায় দিতে মালী আগুনের সেঁক।
চর্ম্মের কুটুরী থেকে লম্ফ দিল ভেক॥
ম্যালা আছে দেখি মালী, অবসর বোধে,
ভিজে ধুতি ম্যালাইয়া টাঙাইল রোদে॥
মালীর সৌজন্য হেরি কবির স্যাঙাত,
থাকিতে নারিল আর গুটাইয়া হাত॥

রেসমের রুমালের খুলিয়া পুঁটুলি,
রূপার চারিটি চাকি ধীরে লয় তুলি॥
বলে আর মালীরে "কিঞ্চিৎ এই ধর"।
জোড় হাতে বলে মালী "এবে ক্ষমা কর'।
অধম জনের প্রতি না করিহ রোষ।
পদ-ধূলিতেই মোর পরম সন্তোষ॥"
কবি বলে "অর্থ আগে বোঝো কথাটা'র।
প্রয়োজন হইয়াছে, আমা-দুজনার,
ভাল মালা দুই ছড়া, তারি অই মূল্য।
মালী বলে "নাহি' ধন প্রসাদের তুল্য॥
প্রসাদ বিতরি লহ দাসের প্রণামি।
বহু যত্নে এ দু-ছড়া গাঁথিয়াছি আমি॥"
কবি বলে "আজিকে যা শিক্ষা লভিলাম-
স্মরণে রহিবে গাঁথা! লৈনু ফুল-দাম॥
ফুল যাবে মা'র কোলে, না রহিবে আটক
স্মৃতির সুগন্ধ র'বে চিরদিন টাটকা॥"
এত বলি উদ্যানের শান্তি করি ভোগ,
গৃহে যাইবার কবি করিল উদ্যোগ॥
শুকাইয়া ধুতিখানা করে লটপট্॥
কোঁচাইয়া ফেলিয়া পরিল চট্‌পট্॥
গোষ্ঠ-পথে চলা ভার শৃঙ্গীদের ভিড়ে।
লক্ষ্মী যায় চন্দ্রমায়, পক্ষী যায় নীড়ে॥
শীতল মলয় আনে ফুলের সুবাস।
সোজা চলে দুই সখা ছাড়ি আশ পাশ॥
শাঁক ঘণ্টা বাজিতেছে সন্ধ্যা-দীপ জ্বলে।
দু-সখার মালা যায় দু-সখার গলে॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নাটদর্শন।

সেদিন অপরাহ্নে রাজবাড়ীতে বড় ধুম। দক্ষিণদেশ (মান্দ্রাজ প্রদেশ) হইতে একটি নৃত্যগীতের দল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। রাজা নৃত্যগীতের বড় ভক্ত। ভিন্নদেশ হইতে কোন দল আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহার বাড়ীতে একদিন "নাট" না হইয়া যায় না। তাই আজ মহা আড়ম্বরের সহিত এই দক্ষিণীয় দলের নৃত্যগীত দর্শনের আয়োজন হইতেছে।

পাঠকগণ বোধ হয় জানেন, উড়িষ্যা বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত হইলেও মান্দ্রাজ বিভাগ উড়িষ্যার অধিকতর নিকটবর্ত্তী। অর্থাৎ বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার মধ্যে যে নীল পর্ব্বতায়মান তরঙ্গমালারূপী একটী দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকার বর্ত্তমান, মান্দ্রাজ ও উড়িষ্যার মধ্যে সেরূপ কোন ব্যবধান নাই। বরং পুরী জেলা হইতে গঞ্জাম্‌রোড্ নামক যে সুপ্রশস্ত রাস্তা মান্দ্রাজাভিমুখে গিয়াছে, তদ্দ্বারা বারমাস যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা আছে। এইজন্য উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের মধ্যে অনেক বিষয়ে আদান প্রদান ঘটিয়াছে। (১) মান্দ্রাজ বিভাগের গঞ্জাম্, বহরমপুর প্রভৃতি কয়েকটী জেলাকে উড়িষ্যা বলিলেও চলে। আবার মান্দ্রাজ হইতে অনেক তেলেঙ্গাজাতীয় লোক উড়িষ্যায় আসিয়া বসত বাস করিতেছে। কটকের একটা বাজারের নাম তেলেঙ্গা বাজার। উড়িষ্যায় তেলিঙ্গী বাজনা বলিয়া এক রকম বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত আছে। উড়িষ্যায় রাজ-পরিবারের মহিলাগণ তেলিঙ্গী রমণীগণের ন্যায় বস্ত্র ও আভরণ

(১) বঙ্গদেশের মধ্যে এক মেদিনীপুর জেলার সহিত উড়িষ্যার কতকটা এইরূপ সম্বন্ধ দেখা যায়।

পরিধান করেন। ইহাই তাঁহাদের ফেসন্। এইরূপে উড়িষ্যায় প্রচলিত নৃত্যকলাও মান্দ্রাজ হইতে গৃহীত হইয়াছে। মুসলমান বাদসাহদিগের আমলে উত্তর ভারতে সঙ্গীত-বিদ্যা যে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, মান্দ্রাজ অঞ্চলে প্রচলিত সঙ্গীত কলা তাহার কিছুই গ্রহণ না করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এইজন্য উড়িষ্যায় প্রচলিত রাগ রাগিনী আমাদের দেশে প্রচলিত রাগ রাগিণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তবে আধুনিক সময়ে এদেশ হইতে উড়িষ্যায় অনেকানেক রাগ রাগিণীর প্রচার হইতেছে।

রাজবাটীর বৈঠকখানার সম্মুখভাগে যে বিস্তৃত প্রাঙ্গন আছে, তাহার মধ্যে গানের আসর হইয়াছে। সেখানে পিপ্‌লীর শিল্পকারের হস্তরচিত বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত এক বিশাল চন্দ্রাতপ টাঙ্গান হইয়াছে, তাহার তলে মাদুর ও শতরঞ্চ পাড়া। সামিয়ানার নীচে ৪টী ঝাড় ও কয়েকটী লণ্ঠন ঝুলিতেছে। সন্ধ্যা হয় হয় দেখিয়া ভৃত্যগণ আলো জ্বালিয়া দিল। সন্ধ্যার পরক্ষণেই নাট আরম্ভ হইবে।

দেখিতে দেখিতে আসরে অনেক লোক সমবেত হইল। তাহারা নাট-দলের লোকদিগকে বেষ্টন করিয়া বসিল। বৈঠকখানার বারান্দায় রাজার জন্য একখানা চৌকী রাখা হইল, তিনি সেখানে বসিয়া নৃত্য দর্শন করিবেন।

আমার বোধ হয় এই নৃত্য দর্শনের কথা শুনিয়া কোন কোন পাঠক পাঠিকা পুস্তক বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে এই সৎসাহস (moral courage) দেখাইবার অবসর দিতেছি না। কারণ এই নাট্যে কুরুচির কোন সংশ্রব নাই।

ইহা বালকের নৃত্য, বারবিলাসিনীর লাস্য নহে। "গোটী পেলার" নাচ উড়িষ্যার একটী বিশেষত্ব।

সেই আসরে যথারীতি বেহালা, সেতার, তানপুরা, ডূগী, তবলা, মন্দিরা এই সকল বাদ্য যন্ত্রের আবির্ভাব হইল! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ট্যুং টাং করিয়া তাহাদের সুরসাধা হইল। তবে সকল যন্ত্রের সুর বাঁধিতে সময় অতিবাহিত করিতে হয় না। ডুগী, তবলা, মন্দিরা এগুলি যেন পরিণতবয়স্কা মুখরা ভার্য্যা। তাহাদের সুর পূর্ণমাত্রায় বাঁধা থাকে, একটুও টোকা সয় না, যখন তখন ঘা মারিলেই খরবেগে শব্দস্রোত বহিতে থাকে। কিন্তু সেতার, তানপুরা, বেহালা ইহাঁরা হইতেছেন নবপরিণীতা কিশোরী। ইহাঁদের ব্রীড়াবিমুখ মুখমণ্ডল হইতে কথা বাহির করা বড় শক্ত, অনেক সাধ্য সাধনার প্রয়োজন। তবে প্রভেদের মধ্যে এই, উক্ত বাদ্যযন্ত্রগুলিকে কথা বলাইতে হইলে, তাহাদের কাণ মোচড়াইতে হয়। আর কোন কোন নববধূর মুখচন্দ্র হইতে বিন্দুমাত্র বাক্য সুধা বাহির করিতে হইলে স্বামী বেচারীকে তাঁহাদের ভূমিস্পর্শকারীঅঙ্গবিশেষ ধারণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু এ সকল হইতেছে পাঠকপাঠিকাগণের ঘরের কথা—ইহাতে আমার প্রয়োজন কি?

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাদ্যযন্ত্রগুলির সুর বাঁধা হইলে পর দুইটী সুন্দর মূর্ত্তি কিশোরবয়স্ক বালক নটবেশে সভায় প্রবেশ করিল। তাহাদের সুচিক্কণ গাঢ় কৃষ্ণ কেশপাশ সুঠাম ভাবে কবরীনিবদ্ধ। তাহার উপরে "অলকা," "বেণী," "চন্দ্রসূর্য্য," "কৈতকী" এই সকল উজ্জ্বল রজতাভরণ ঝক্ ঝক্ করিতেছে। তাহাদের কাণে "কর্ণফুল" ও "ঝুমকা" দুলিতেছে। গলায় "কণ্ঠী" ও "সরসিয়া হার" এবং কটি-তটে রূপার চন্দ্রহার ও "কিঙ্কিণী" ঝুলিতেছে। বাহুতে "বাজু-বন্দ,"

"তাড়" "কঙ্কণ" ও "পইছ" এই সকল স্বর্ণাভরণ এবং পায়ে "নূপুর" ও "পাঁহুড়" বাজিতেছে। কিন্তু তাহাদের নাসিকায় নথ ও "বসনি" থাকাতে একেবারে সব মাটি হইয়াছে। এই দুইটী বালকের পরিধানে লালরঙ্গের বহরমপুরের পট্টসাটী—পশ্চাদ্‌ভাগে পুরুষের ন্যায় কাছা দেওয়া ও সম্মুখভাগে ফুলকোচা ঝুলিতেছে।

নটবালকদ্বয় আসরে আসিয়া সকলকে নতশিরে অভিবাদন করিয়া বসিল। তখন সুরতালসংযোগে বাদ্য আরম্ভ হইল। নৃত্য আরম্ভ হওয়ার পক্ষে কেবল রাজার শুভাগমনের অপেক্ষা। ইতিমধ্যে সময় অতিবাহিত করিবার জন্য দলের অধিপতি, এক টিকিধারী বৃদ্ধ বেহালা হস্তে গাত্রোত্থান করিলেন ও বেহালার সুমধুর ধ্বনির সহিত, তাঁহার ভাঙ্গা গলা মিলাইয়া শ্রোতৃবর্গের মনোহরণ করিবার জন্য কিয়ৎক্ষণ বৃথা চেষ্টা করিলেন।

এই সময়ে "রাজা বিজে হউছন্তি" (রাজা বিরাজমান হইতেছেন) বলিয়া একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল ও আটজন বেহারার স্কন্ধে এক খানা সুবৃহৎ তান্‌জানে আরোহণ করিয়া, মশালচি, পাখাবাহক, তাম্বুলকরঙ্কবাহক, পিক্‌দানীধারক, প্রভৃতি ভৃত্যগণ পরিবৃত হইয়া রাজা ব্রজসুন্দর সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তখন সকল লোক উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজা তান্‌জান হইতে অবতরণ করিয়া বারান্দায় সেই চৌকীর উপর বিরাজমান হইলেন। অধিকারী মহাশয় তাঁহার গানটী শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া বসিয়া পড়িলেন ও বালকদ্বয় উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাহারা মস্তক অবনত করিয়া রাজাকে অভিবাদন করিল ও নৃত্য আরম্ভ করিল। বাদ্যযন্ত্র সকল বাজিতে লাগিল। একজন বেহালা-দার বালক দুইটীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বাজাইতে লাগিল। বালকদ্বয়

তালে তালে হস্ত পদ ঘুরাইয়া, ফিরাইয়া, হেলাইয়া, দুলাইয়া নাচিতে লাগিল। সেই নৃত্য এক অদ্ভুত ব্যাপার। যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহাদিগকে বর্ণনা করিয়া বুঝান শক্ত। বালক দুইটী বাদ্যের সহিত মিল করিয়া ও পরস্পরের সহিত ঐক্য করিয়া এরূপ সুন্দরভাবে হস্তপদ সঞ্চালন করিতে লাগিল, যেন বোধ হইল একটী বালক নাচিতেছে। যাঁহারা এই নৃত্যের সমজদার, তাঁহাদের কাছে শুনিয়াছি, নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে যে গান হইতে থাকে, বালকগণ শরীরের নানা স্থানে করস্পর্শ করিয়া সেই গীতের ব্যাখ্যা করিয়া দেয়। এই নৃত্যে লম্ফ ঝম্ফ নাই, কিম্বা অশ্লীলভাব কিছুমাত্র নাই।

এইরূপে কতকক্ষণ নৃত্য করিয়া, বালকগণ কণ্ঠ মিলাইয়া নিম্নলিখিত সংস্কৃত গানটী ধরিল। এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। আমাদের দেশে যেমন কানু ছাড়া কীর্ত্তন নাই, উড়িষ্যায় তেমনি নাচ ছাড়া গান নাই। যে রকম গানই হউক না কেন, তাহা গাইবার সময় নৃত্য করা হয়। বলা বাহুল্য নিম্নলিখিত গানটীর মধ্যেও বালকদ্বয় নৃত্যের অবসর বাহির করিয়াছিল।

(বালকদ্বয় একত্র)

"জয় কৃষ্ণ মনোহর যোগ তরে।
যদুনন্দন নন্দকিশোর হরে॥
জয় রাস রসেশ্বর পূর্ণতমে।
বরদে বৃষভানুকিশোরী রমে॥
জয়তীহ কদম্বতলে ললিতম্।
কলবেণু সমীরিত গানরতম্॥
সহ রাধিকয়া হরিরেব মতঃ।
সততং তরুণীজন-মধ্যগতঃ॥
বৃষভানু সুতে পরম প্রকৃতে।
পুরুষো ব্রজরাজ সুতঃ সুকৃতে॥

ইহ নৃত্যতি গায়তি বাদয়তে।
সহ গোপিকয়া বিপিনে রমতে॥
যমুনা-পুলিনে বৃষভানু সুতা।
তরুণী-ললিতাদি সখী সহিতা॥
রমতে হরিণা সহ নৃত্যরতা।
গতি-চঞ্চল-কুন্তল-হার-লতা॥
বৃষভানু,সুতা সহ কুঞ্জবনে।
যদুনন্দন এতি সুখং বিজনে॥

* * * *

স্ফুটপদ্মমুখী বৃষভানু সুতা।
নবনীত সুকোমল দেহলতা॥
পরিরভ্য হরিং প্রিয়মাত্র সুখং।
পরিচুম্বতি শারদচন্দ্র মুখং॥

* * * *

১ম বালক। জগদাদি গুরুং ব্রজরাজ সুতং।
২য় বালক। প্রণমামি সদা বৃষভানু সুতাং॥

১ম। নবনীরদ সুন্দর নীল তনুং।
২য়। তড়িদুজ্জ্বল কুন্তলিনী সুতনুং॥

১ম। শিখিকণ্ঠ শিখণ্ডক সম্মুকটম্।
২য়। কবরীপরিবদ্ধ কিরীট ঘটাম্॥

১ম। কমলাশ্রিত খঞ্জন নেত্র যুগম্।
২য়। পরিপূর্ণ শশাঙ্ক সুচারুমুখীম্॥

১ম। মৃদুহাস সুধাময় চন্দ্রমুখম্।
২য়। মধুরাধর সুন্দর পদ্মমুখীম্॥

১ম। মকরাঙ্কিত কুণ্ডল গণ্ডযুগম্।
২য়। মণিকুণ্ডল মণ্ডিত কর্ণযুগাম্॥

১ম। কণকাঙ্গদ শোভিত বাহুধরম্।
২য়। মণিকঙ্কণ শোভিত শঙ্খকরাম্॥

১ম　মণি কৌস্তুভ ভূষিত হার যুগম্।
২য়　কুচকুম্ভ বিরাজিত হার লতাম্॥

১ম　তুলসীদল দাম সুগন্ধি পরম্।
২য়　হরি চন্দন চর্চ্চিত গৌর তনূম্॥

১ম　তনু ভূষণ পীত ধটী জড়িতম্।
২য়　রসনান্বিত নীল নিচোল যুতাম॥

১ম　তরুণীকৃত দিগ্গজরাজ গতিম্।
২য়　কল নূপুর হংস বিলাস গতিম্॥

১ম　রতি নাম মনোহর বেশ ধরম্।
২য়　রতিমন্মথ পঙ্কজ কাম হরাম্॥

১ম।　মুরলী মধুর শ্রুতিরাগ পরম্।
২য়।　স্বর সপ্ত সমন্বিত গান পরাম্॥

(উভয়ে একত্র)

নব নায়ক বেশ কিশোর বয়াঃ।
ব্রজরাজ সুতঃ সহ রাধিকয়াঃ॥
স্থিত রেউর (?) বদ্ধ করে স্বকরম্।
কুরুতে কুসুমায়ুধ কেলি পরম্॥
অধিকাধিক মাধব রাধিকয়োঃ।
কৃতরাস পরস্পর মণ্ডলয়োঃ॥
মণি কঙ্কণ শিঞ্জিত তাল স্বনং।
হরতে সনকাদি মুনেঃ সুমনঃ॥

*　*　*　*

ভ্রমন্তং রাসচক্রেণ নৃত্যন্তং তালশিঞ্জিতৈঃ।
গোপীভিঃ সহগায়ন্তং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্॥
রাসমণ্ডল মধ্যস্থং প্রফুল্লবদনাম্বুজম্।
চান্যোঽন্য হৃদয়াসক্তং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্॥
বিদ্যুদ্ গৌরীং ঘনশ্যামং প্রেমালিঙ্গন তৎপরম্।
পরস্পরয়োরর্দ্ধাঙ্গং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্॥

রাধিকারূপিনং কৃষ্ণং রাধাং মাধবরূপিণীম্।
রাসযোগানুরাগেন রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্॥"

বালক দুইটীর কোমলকণ্ঠে গীত এই বিশুদ্ধ পদবিন্যাসসংযুক্ত সঙ্গীত শুনিয়া সভাস্থ সকলে মুগ্ধ হইল। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ইহার অর্থ বোধ হয় কেহই বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু বিশুদ্ধ তান লয় সিদ্ধ সঙ্গীতের এরূপ মোহিনীশক্তি যে তাহাতে মুগ্ধ হইবার জন্য অর্থবোধের আর বড় অপেক্ষা থাকে না। রাজারও সেই দশা হইল। তিনি প্রথম প্রথম দুই একটী পদ শুনিয়া অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার বাল্যকালে অধীত অমরকোষের প্রথম অধ্যায়ে পরি-সমাপ্ত সংস্কৃত বিদ্যায় কোন কূলকিনারা পাইলেন না। তবুও ভাবের আপছায়া যেটুকু তাঁহার মনে প্রতিবিম্বিত হইল, তাহাতেই তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় মুগ্ধ হইয়া সেই সঙ্গীত-সুধা পান করিতে লাগিলেন। আবার তখন তাঁহার আফিমের নেশাটারও বিলক্ষণ ঝোঁক ছিল। সেই সঙ্গীতের মাদকতা ও আফিমের মাদকতায় আত্মহারা হইয়া মনে মনে তিনি নিজেকে ইন্দ্রের অমরাবতীতে অধিষ্ঠিত মনে করিতে লাগিলেন। তিনি মনে ভাবিলেন, তিনিই দেবরাজ ইন্দ্র, আর সেই নট বালক দুইটী দেবসভার অপ্সরা উর্ব্বশী ও রম্ভা। এই সময়ে একটী লোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডবৎ করিল। রাজা চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন সে দৈত্যারি দাস। সে রাজাকে চুপে চুপে বলিল—

"মণিমা! সব প্রস্তুত। পাল্‌কী, বেহারা, পাইক সর্দ্দার লইয়া আমি অপেক্ষা করিতেছি। এখন হুজুরের অনুমতি পাইলেই কল্যাণ-পুরে গিয়া তাহাকে আনিতে পারি।"

রাজা তখন উর্ব্বশী রম্ভার চিন্তায় নিমগ্ন। দৈত্যারি দাসের এই শোভনীয় প্রস্তাবে তাঁহার অমত হইবে কেন? তিনি 'সাবিত্রী দেবীকে আনিবার জন্য তাহাকে আদেশ করিলেন। দৈত্যারি দাস তখন মশালধারী ১০।১২ জন লোক, ৪ জন বেহারা ও পাল্কী লইয়া কল্যাণপুর অভিমুখে যাত্রা করিল। কিন্তু তাহাকে বড় বেশীদূর যাইতে হইল না। সেই অনাথা সতী রমণীর কাতর রোদনে শ্রীশ্রী কল্যাণেশ্বর মহাপ্রভু যথার্থই কর্ণপাত করিলেন।

নট বালকদ্বয় উক্ত সংস্কৃত সঙ্গীতটী শেষ করিয়া নিম্নলিখিত উড়িয়া গানটী ধরিল।

''আহা মো লাবণ্যনিধি!
এবে হরাই বসিলি বুদ্ধি॥
শিব সেবি অনুরন্ধে,　　পাইথিলি ধন তোতে
এবে কেমন্তে মুচ্ছিবি সতে রে।
য়েনিকি রহিলে ধন,　　দিশে তো চন্দ্রবদন,
এবে কেমন্তে বঞ্চিবি দিন রে॥
সখি মু ধরুচ্ছি কর,　　এথিকু উপায় কর,
এবে তো চিন্তা মো হৃদে হার রে।
শ্রীকৃষ্ণ বিরহ বাণী,　　তোষ হেলে রাধা রাণী,
রসে রামচন্দ্র দেবে ভণি॥"

শ্রীকৃষ্ণের বিরহগীতি শুনিতে শুনিতে রাজার বিরহ আবার জাগিয়া উঠিল। আফিমের ঝোঁকে তিনি আবার অমরাবতীর দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই উর্ব্বশী ও রম্ভা নাচিতে নাচিতে ক্রমে তাঁহার সম্মুখে আসিল। তাহারা ক্রমে ক্রমে রাজার কাছে আসিয়া নাচিতে নাচিতে পুরস্কার লাভ প্রত্যাশায় হাত বাড়াইল। তখন রাজা নেশার ঝোঁকে স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া গিয়া, তাহাদিগকে

ধরিবার জন্য সেই উচ্চ বারান্দা হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। যেমন ঝম্প্র প্রদান, অমনি পতন। তাঁহার মস্তক ভয়ানক জোরের সহিত সশব্দে বারান্দার নিম্নে স্থিত একখানা তীক্ষ্ণাগ্র প্রস্তরের উপর পড়িয়া গেল। সমস্ত শরীরের ভার মাথার উপর পড়াতে মাথা ফাটিয়া গেল। রাজা সেই গুরুতর আঘাতে যে চৈতন্য হারাইলেন, তাহা আর ফিরিয়া আসিল না।

রাজার পতন শব্দে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। গান ভাঙ্গিয়া গেল। ভৃত্যগণ ধরাধরি করিয়া রাজাকে বৈঠকখানার মধ্যে লইয়া গেল। তখন অমাত্যবর্গ পরামর্শ করিয়া রাজবৈদ্যকে সংবাদ দিলেন। তিনি আসিয়া অনেকানেক সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া, কস্তুরি, মুক্তা, প্রবাল, সোণা রূপা প্রভৃতি মূল্যবান পদার্থসম্বলিত এক ব্যবস্থাপত্র লিখিলেন। রাজার ব্যারাম, সামান্য গাছগাছড়ার ঔষধে তাহা সারিবে কেন? এই সংবাদ রাণী চন্দ্রকলা দেয়ীর নিকট পৌছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজাকে দেখিবার জন্য অন্তঃপুর হইতে পাল্কীতে চড়িয়া বৈঠকখানায় আসিলেন। তাঁহার আদেশে রাজার মস্তকে জলপটী বান্ধা হইল ও কটক হইতে ডাক্তার আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। কিন্তু কিছুই হইল না। রাজার মাথা ফাটিয়া মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। মাথা ফুলিয়া উঠিল ও অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। সেই নৃত্যগীতপূর্ণ রাজপুরী অল্পক্ষণের মধ্যেই হাহাকার ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই রাণীর আদেশে কটকে নবঘনর নিকট লোক প্রেরিত হইল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

ভারতীয় বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ধ্বংস

পৃথিবীতে আর্য্যজাতি দ্বারা প্রধানতঃ দুইটী ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। একটীর নাম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও অপরটীর নাম বৌদ্ধ ধর্ম্ম। প্রথমটী ভারতবর্ষের লোকের ধর্ম্ম ও দ্বিতীয়টী পৃথিবীর লোকের ধর্ম্ম। সৌভাগ্যের বিষয় উভয় ধর্ম্মই ভারতীয় আর্য্যগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। চীন, জাপান, কোরিয়া, শ্যাম, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, সিংহল, ব্রহ্ম, তিব্বত, নেপাল, বক্ট্রিয়া ইত্যাদি সমগ্র দেশেই বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত মহাসমাদরে পরিগৃহীত হইয়াছিল। যে কাবুল, কান্দাহার, তুর্কিস্থান প্রভৃতি জনপদে অধুনা মুসলমান ধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ পরিলক্ষিত হয় ঐ সকল জনপদই এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান লীলাভূমি ছিল। মধ্য এসিয়ার সুদূর বিস্তীর্ণ ভূভাগ ইদানীং জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু এক সময়ে সাহারা ও গোবি মরুভূমির সন্নিহিত প্রদেশই বৌদ্ধপ্রচারকগণের গতায়াতের প্রধান স্থান ছিল। আজ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের চিহ্নমাত্রও নাই, কিন্তু এক সময়ে হিমালয় পর্ব্বত হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশেই অহিংসা ধর্ম্ম বিরাজিত ছিল।*

* খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে যখন মগধাধিপতি অশোক স্বীয় পুত্র মহেন্দ্রকে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত বহু ভিক্ষুসমভিব্যাহারে সিংহলদ্বীপে প্রেরণ করেন, তখন সিংহলরাজ মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "জম্বুদ্বীপে এরূপ বৌদ্ধ ভিক্ষু আর কয় জন আছেন?" মহেন্দ্র উত্তর প্রদানকালে বলিয়াছিলেন "সমগ্র জম্বুদ্বীপ পীতবসনে বিভূষিত।"

যখন খৃষ্টান্ ও মুসলমান্ ধর্ম্মের সৃষ্টি হয় নাই তখন বৌদ্ধমত পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিল ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই; কিন্তু বর্ত্তমানকালে বহুধর্ম্মের সহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াও উক্ত মত পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোককে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে ইহাই বিশেষ বিস্ময়ের বিষয়। অধুনা পৃথিবীর কোন্ প্রদেশে কতসংখ্যক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোক বিদ্যমান আছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল ঃ—

হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ।

সিংহলে	...	১৫২০৫৭৫
ব্রিটিশ বর্ম্মা	...	২৪৪৭৮৩১
বর্ম্মা	...	৩০০০০০০
শ্যাম	...	১০০০০০০০
আনাম	...	১২০০০০০০
জৈন	...	৪৮৫০২০

সমষ্টি প্রায় ৩০০০০০০০ (তিন কোটী)।

মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ।

ওলন্দাজ শাসনভুক্ত প্রদেশ ও বলিদ্বীপ		৫০০০০
ব্রিটিশ শাসনভুক্ত প্রদেশ	...	৫০০০০০
রুষিয়ার শাসনভুক্ত প্রদেশ	...	৬০০০০০
লিউ খেন্ দ্বীপ	...	১০০০০০০
কোরিয়া	...	৮০০০০০০
ভুটান ও সিকিম	...	১০০০০০০

কাশ্মীর ও লাডাক	...	২০০০০০
তিব্বত	...	৬০০০০০০
মঙ্গোলিয়া	...	২০০০০০০
মাঞ্চুরিয়া	...	৩০০০০০০
জাপান	...	৩২৭৯৪৮৯৭
নেপাল	...	৫০০০০০
চীন	...	৪১৪৬৮৬৯৯৪
	সমষ্টি প্রায়	৪৭০০০০০০০
		(সাতচল্লিশ কোটী)।

হীনযান মতাবলম্বী	৩০০০০০০০
মহাযান মতাবলম্বী	৪৭০০০০০০০

একুনে ৫০০০০০০০০ (পঞ্চাশ কোটী)।

উদ্ধৃত তালিকায় আমরা দেখিতে পাইলাম এখনও জগতের পঞ্চাশ কোটী লোক বুদ্ধদেবের উদ্ভাবিত পথের অনুধাবন করিয়া থাকেন; কিন্তু ভারতবর্ষে একজনও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোক বিদ্যমান নাই। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম কেন ঘটিল তাহা নিরূপণ করিবার জন্য কেহই* বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ধ্বংসের কারণ অনুসন্ধানই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

* কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মত এই যে হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃততত্ত্ব আবিষ্কার করিবার যোগ্য নহেন। ১৮৯৯ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা মহানগরীতে ইংলণ্ড দেশীয় সুবিখ্যাত অধ্যাপক Dr. Rhys Davidsএর সহ সৌভাগ্যক্রমে আমার সাক্ষাৎকারলাভ হয়। অনেক কথার পর তিনি আমাকে বলিলেন "আপনি বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন জানিয়া

ভারতীয় বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ধ্বংসের প্রধানতঃ তিনটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ মুসলমান বিজেতৃগণের অত্যাচার; দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণের অত্যুদারতা ও অনুদারতা; এবং তৃতীয়তঃ তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের ভীষণ দুরাচার।

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। যাহারা সাংখ্য ও ন্যায়দর্শন অধ্যয়ন করিবার পর বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন তাঁহাদের পথ অতি সুগম। আপনি হিন্দুদর্শনের মতসমূহ পরিজ্ঞাত আছেন সুতরাং বৌদ্ধদর্শনের আলোচনা আপনার পক্ষে আয়াসকরী নহে। বস্তুতঃ এবিষয়ে আমাদের অপেক্ষা আপনার বিশেষ সুবিধা আছে।

আপনাদিগের একটী ঘোর অসুবিধাও আছে। আপনি দুঃখিত হইবেন না আমি কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি না। হিন্দু মাত্রেরই একটী অসুবিধা আছে যে তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে পারেন না। যদি কোন গোঁড়া মুসলমান খৃষ্টান ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে বসেন তাহা হইলে তিনি যেমন উক্ত ধর্ম্মের দোষটুকু প্রদর্শন করিয়াই নিবৃত্ত হন, সেইরূপ হিন্দু সমালোচকগণের হস্তে পড়িয়া বৌদ্ধধর্ম্মেরও অনেক সময়ে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। হিন্দু দার্শনিকগণ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রতি চিরকালই অনুদারতা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহগ্রন্থে বৌদ্ধদর্শনের যে মত বিবৃত করিয়াছেন উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। উক্ত গ্রন্থের বৌদ্ধদর্শন পরিচ্ছেদে যে সকল তত্ত্ব উদ্ধৃত হইয়াছে উহার অধিকাংশই পালিগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। মাধবাচার্য্য দুই একটী যথার্থ বৌদ্ধমতেরও উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে ঐ সকল মত নিতান্ত বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছে। হিন্দুদার্শনিকগণ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় যদি আর একটু উদার হইত তাহা হইলে তাঁহারা জগতের আরও অনেক উপকার সাধন করিতে পারিতেন।

আমি পুনরায় আপনাকে আশ্বস্ত করিতেছি যে আমি কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করি নাই। আপনার "নির্ব্বাণ", "প্রতীত্যসমুৎপাদ" প্রভৃতি প্রবন্ধে অনেক পরিমাণে নিরপেক্ষতারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে আপনি সাংখ্যদর্শনের সহ বৌদ্ধদর্শনের তুলনা করিতে যাইয়া যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন উহার অনেক বিষয়ে আপনার সহ আমাদের ঐকমত্য নাই।

চীন, জাপান, নেপাল, তিব্বত, সিংহল, ব্রহ্ম ইত্যাদি সমস্ত দেশ হইতেই আমরা বৌদ্ধদর্শনের মত সংগ্রহ করিয়াছি। ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণ বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে যাইয়া যে সকল তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন উহার অধিকাংশই, আমাদের জানা নাই।

(১) মুসলমান বিজেতৃগণের অত্যাচার—

কেহ কেহ অনুমান করেন মুসলমান ধর্ম্মের আবির্ভাবই ভারতীয় বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ধ্বংসের একমাত্র কারণ।† পূর্ব্বে কাবুল ও কান্দাহার যথাক্রমে উদ্যান ও গান্ধার নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই উভয় স্থানেই বৌদ্ধগণ বহুসংখ্যক বিহার ও চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গান্ধারের তক্ষশিলা নামক স্থানে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল উহার গৌরব খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতেও বিলুপ্ত হয় নাই। চীন দেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ ও হুয়েন্ সাঙ্ যথাক্রমে খৃষ্টীয় ৫ম ও ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারত পর্য্যটন করিতে আসিয়া উদ্যান ও গান্ধারে অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার অবলোকন করিয়াছিলেন। কিন্তু খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর পর হইতেই উক্ত দুই স্থানে মুসলমান ধর্ম্মের প্রভুত্ব সংস্থাপিত হয়। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে মহম্মদ কাশিম ভারত আক্রমণ করেন। তাহার পর হইতেই উদ্যান ও গান্ধার মহম্মদীয় মস্‌জিদ দ্বারা সমাকীর্ণ হয়। তত্রত্য প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার-সমূহ কিরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার প্রকৃত বিবরণ অবগত হওয়া যায় নাই। অধুনা ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অনেক বৌদ্ধকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে।

যদি আপনি সমস্ত হিন্দুদর্শন হইতে মত সংগ্রহ করিয়া Brahmanic account of the Buddhist philosophy নামে একটী প্রবন্ধ London Royal Asiatic Societyর জার্ণালে প্রকাশ করেন তাহা হইলে সংস্কৃত বৌদ্ধমতের অনুসন্ধানে অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে।”

† According to the Tibetan historians, Buddhism was destroyed in India by the Mahomedans. Their account agrees with the descriptions contained in Mahomedan histories, translated by Major Raverty and others.—Journal of the Buddhist Text society Vol I, pt. II.

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহম্মদ অব্ গঝ্নী সপ্তদশবার ভারত আক্রমণ করিয়া অনেক বৌদ্ধ মন্দিরের বিলোপ সাধন করেন। তিব্বতীয় গ্রন্থে লিখিত আছে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজি বিক্রমশিলা প্রভৃতি বৌদ্ধ বিহার-সমূহের বিনাশ সাধন করেন। বিক্রমশিলা গঙ্গানদীর উত্তরতীরে অবস্থিত ছিল। তর্কসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধতার্কিক কমলশীল খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে বিক্রমশিলা বিহারের ধর্ম্মাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। নয়পালের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর অন্তিম সময়ে গৌড়দেশের অন্তর্গত বিক্রমপুরে সুবিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত শ্রীজ্ঞান অতীশের জন্ম হয়। নয়পালের অনুরোধক্রমে তিনি কয়েক বৎসর বিক্রমশিলার ধর্ম্মাধ্যক্ষতার কার্য্য করিয়াছিলেন। বিক্রমশিলা যোগাচার বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রধান স্থান। ১২০৩ খৃঃ অব্দে বক্তিয়ার খিলিজি এই বিক্রমশিলা বিহারের ধ্বংস বিধান করিয়া যোগাচার বৌদ্ধসম্প্রদায়ের নিঃশেষ বিলোপ বিধান করিয়াছিলেন। ওদনন্ত পুরী বিহারও এই সময়ে বিনষ্ট হয়। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে নালন্দা বিহার ভস্মীভূত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে আলাউদ্দিন অনেক বৌদ্ধ কীর্ত্তির বিলোপ সাধন করিয়াছিলেন।

মুসলমান বিজেতৃগণ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিহার, চৈত্য ইত্যাদির ধ্বংস সাধন করিয়াই নিরস্ত হন নাই। কথিত আছে তাঁহারা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিতও করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আজ যে লক্ষ লক্ষ মুসলমান দৃষ্ট হইতেছে উহাদের সকলেরই পূর্ব্বপুরুষগণ কিছু আরবদেশ হইতে আগমন করে নাই, এবং প্রাচীন কালে এতদ্দেশে যে অসংখ্য বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করিত তাহাদের বংশধরগণ সকলেই কিছু ভারতভূমি পরিত্যাগ করে নাই।

প্রকৃত কথা এই ধর্ম্মবিপ্লবের সময়ে নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধগণ মুসলমান ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিজেতৃগণের মনস্তুষ্টি করিয়াছিল।

(২) ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণের অত্যুদারতা ও অনুদারতা—

আবার কাহারও কাহারও ধারণা এই যে ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণই বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ধ্বংসের মূলীভূত কারণ। তাঁহারা বলেন ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধদিগের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করেন নাই। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় আরম্ভ হয়। এই সময় হইতেই সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের নিন্দাবাদ লিপিবদ্ধ হইতে থাকে।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ন্যায়বার্ত্তিকপ্রণেতা উদ্যোতকরাচার্য্য* সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দিঙ্‌নাগাদি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণকে আক্রমণ করেন।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কুমারিলভট্ট দক্ষিণাপথে আবির্ভূত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের নিরাকরণ ও বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মীমাংসাবার্ত্তিকগ্রন্থ পাঠ করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় তিনি কিরূপ অসামান্য নৈপুণ্যের সহ বৌদ্ধ মত খণ্ডন করেন। তিনি বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থসমূহকে অশাস্ত্র বলিয়া অবধারণ করেন। মাধবাচার্য্যকৃত সংক্ষেপশঙ্করজয় গ্রন্থে লিখিত আছে, পুরাকালে কুমার (কার্ত্তিকেয়) যেরূপ অসুরকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন সেইরূপ বৈদিক কর্ম্মপরাঙ্মুখ বৌদ্ধগণকে নিহত করিবার নিমিত্ত তিনিই

---

* যদক্ষপাদঃ প্রবরো মুনীনাং শমায় শাস্ত্রং জগতো জগাদ।
কুতার্কিকধ্বান্ত নিরাসহেতোঃ করিষ্যতে তত্র ময়া নিবন্ধঃ॥ (ন্যায় বার্ত্তিক)।

ইত্যুচিবাং সমথ ভট্টকুমারিলং তম্
ঈষদ্বিকস্বরমুখাম্বুজমাহ মৌনী।
শ্রুত্যর্থ কর্ম্ম বিমুখান্ সুগতান্ নিহন্তুং
জাতং গুহং ভুবি ভবন্তমহং নু জানে॥ (সংক্ষেপ শঙ্করজয়)।

আবার কুমারিলভট্টরূপে অবতীর্ণ হন। বৌদ্ধগণ জগৎ আক্রমণ করিলে বৈদিকধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। বেদমার্গের রক্ষা ও বৌদ্ধগণের পরাজয় সাধন করিবার নিমিত্ত যে সকল পণ্ডিত অগ্রসর হন তন্মধ্যে কুমারিল ভট্ট সর্ব্ব প্রথম। বৌদ্ধগণ তদানানন্তন নৃপতি সমূহকে বলিয়াছিলেন "মহাশয়! আপনারা আমাদের শাস্ত্র গ্রহণ করুন, বৈদিকমার্গের আশ্রয় লইবেন না"। কুমারিল ভট্ট প্রথমতঃ বৌদ্ধ শাস্ত্র জানিতেন না, সুতরাং বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াও তিনি বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাই। পরিশেষে তিনি বৌদ্ধগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাদের শাস্ত্র শিক্ষা করেন।

খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে সুবিখ্যাত শঙ্করাচার্য্য দক্ষিণাপথে অবতীর্ণ হইয়া অসাধারণ কৌশলের বলে বৌদ্ধদিগকে নিরস্ত করেন। তিনি স্বীয় বেদান্তভাষ্যের ২।২।৩২ স্থলে লিখিয়াছেন একমাত্র বুদ্ধদেব বৌদ্ধ শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা অথচ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে বাহ্যার্থবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ এই তিনটী পরস্পর বিরুদ্ধ মত দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ কি? বুদ্ধদেব নিশ্চয়ই অসংবদ্ধ প্রলাপী ছিলেন অথবা মানবজাতির প্রতি তাঁহার ঘোর বিদ্বেষ ছিল। মনুষ্যদিগকে বিমূঢ় করিবার অভিপ্রায়ে তিনি তিনটী পরস্পর বিরুদ্ধ মতের উদ্ভাবন করেন।

শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে তদনুসারে জানা যায় তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবার সময়ে একটী প্রকাণ্ড লৌহ কটাহ সঙ্গে করিয়া লইতেন। তিনি বৌদ্ধগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইবার কালে ঐ কটাহ তৈলপূর্ণ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নির উপর সংস্থাপন করিতেন এবং বিপক্ষদিগের দ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইতেন যিনি বিচারে পরাজিত হইবেন তাঁহাকে ঐ উত্তপ্ত কটাহে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। একদা শঙ্কর মহাচীন (তিব্বত)

প্রদেশে গমন করিয়া তত্রত্য তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তর্ক করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দগিরি তাঁহাকে বলিলেন "প্রভো আর বিচারের প্রয়োজন নাই এবং এতদপেক্ষা দূরতর প্রদেশে গমন করাও আমাদের কর্ত্তব্য নহে। জগতের সীমা নাই, ইহার কোথায় কোন্ অসীম প্রতিভাশালী পণ্ডিত বিদ্যমান আছেন তাহা কে বলিতে পারে?" আনন্দগিরির প্রার্থনা অনুসারে শঙ্কর ঐ কটাহটী ভ্রমণের সীমাস্বরূপ তিব্বতে রাখিয়া আইসেন। তিব্বতের ঐ স্থানটী অদ্যাপি শঙ্করকটাহ নামে প্রসিদ্ধ। নেপাল ও তিব্বতে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তদনুসারে জানা যায় শঙ্কর তিব্বতের লামার নিকট পরাজিত হন। কেহ কেহ বলেন নিজের প্রতিজ্ঞা অনুসারে উত্তপ্ত কটাহে নিমগ্ন হইয়া শঙ্কর দেহত্যাগ করেন। অন্যেরা বলেন লামার তান্ত্রিক মন্ত্রের প্রভাবে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

শঙ্করাচার্য্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কয়েকটী মঠ সংস্থাপন করিয়া বৈদিক ও স্মার্ত্ত সম্প্রদায়ের অভ্যুন্নতি বিধান করেন।

খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে আনন্দগিরি স্বীয় বেদান্তটীকার ২।২।৩২ স্থলে লিখিয়াছেন ইতিহাস পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয় ভগবান্ বাসুদেব স্বয়ংই বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তবে শঙ্কর কেন তাঁহাকে অসংবদ্ধ প্রলাপী বলিলেন? বস্তুতঃ বুদ্ধ অসংবদ্ধ প্রলাপী ছিলেন না। যে সকল লোক বৈদিক মার্গ পরিত্যাগ করে তাহারা পশু। সেই পশুদিগের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ এবং তাহাদিগকে বিমূঢ় করিবার জন্য ভগবান্ বাসুদেব বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনটী পরস্পর বিরুদ্ধ মতের সৃষ্টি করেন। এইরূপ অর্থ প্রকাশ করাই শঙ্করের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্যটীকার

২।১।৬৮ স্থলে লিখিয়াছেন সর্ব্বজ্ঞ জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর কর্তৃক বেদ বিরচিত হইয়াছে এবং মনু প্রভৃতি ঋষিগণ উহার মত অবলম্বন করিয়াছেন, সুতরাং বেদকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। বৌদ্ধগণ স্বয়ংই বলিয়া থাকেন তাঁহাদের শাস্ত্র বুদ্ধদেবের উদ্ভাবিত। বুদ্ধ কিছু সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন না এবং তিনি পৃথিবীর কর্ত্তাও নহেন। কতকগুলি পশুপ্রায় লোক তাঁহাদের শাস্ত্রের মত গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং বৌদ্ধ শাস্ত্রকে কোন প্রকারেই আপ্তবাক্য বলিতে পারা যায় না।

১২শ শতাব্দীতে উদয়নাচার্য্য মিথিলা প্রদেশে আবির্ভূত হইয়া ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা-পরিশুদ্ধি, কুসুমাঞ্জলি ও আত্মতত্ত্ববিবেক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আত্মতত্ত্ববিবেকের অপর নাম বৌদ্ধাধিকার। কেহ কেহ ইহাকে বৌদ্ধধিক্কারও বলিয়া থাকেন। এই গ্রন্থে উদয়ন সমস্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উদয়ন সম্বন্ধে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে "ঈশ্বর আছেন কিনা" এই বিষয় লইয়া একদা বৌদ্ধগণের সহ তাঁহার তর্ক উপস্থিত হয়। উদয়ন নানা যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেন। বৌদ্ধগণ তাঁহার যুক্তিতে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তিনি একজন ব্রাহ্মণ ও একজন বৌদ্ধকে আহ্বান করিয়া কোন একটী পর্ব্বতের উপর আরোহণ করেন। তথায় পরস্পর কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে তিনি ঐ ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধটীকে পর্ব্বতশিখর হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। ভূতলে পতনকালে ব্রাহ্মণ ছাত্রটী বলিল "ঈশ্বরোঽস্তি" এবং বৌদ্ধটী বলিল "ঈশ্বরো নাস্তি"। পরে দেখা গেল ব্রাহ্মণ ছাত্রটী ভূতলে পতিত হইয়াও জীবিত আছে কিন্তু বৌদ্ধ ছাত্রটীর প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। তখন উদয়ন বলিলেন তোমরা দেখ ঈশ্বর আছেন কিনা। তদনন্তর

কেহ কেহ উদয়নকে বলিল "আপনি একজন বৌদ্ধের বধসাধন করিয়া মহাপাতকে লিপ্ত হইয়াছেন অতএব উড়িষ্যায় জগন্নাথদেবের দর্শনলাভ করিয়া পাপক্ষালন করুন"। অনন্তর তিনি জগন্নাথের মন্দিরে তিন দিন তিন রাত্রি উপবাস করিয়া শয়ান থাকিলেন কিন্তু জগন্নাথ তাঁহার সমীপে দর্শন দিলেন না। তৃতীয় রাত্রিতে উদয়ন স্বপ্ন দেখিলেন জগন্নাথ তাঁহাকে বলিতেছেন, "তুমি পাপী অতএব বারাণসীক্ষেত্রে গমন করিয়া তুষানল সম্পাদন কর, তাহা হইলে তোমার পাপক্ষয় হইবে ও তুমি জগন্নাথের দর্শন পাইবে"। উদয়ন সাতিশয় অনুতপ্ত হইয়া বারাণসীতে ধাবমান হইলেন এবং তথায় তুষানলে দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি জগন্নাথকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

ঐশ্বর্য্যমদমত্তঃ সন্ মামবজ্ঞায় বর্ত্তসে।
পুনর্বৌদ্ধে সমায়াতে মদধীনা তব স্থিতিঃ॥

ঐশ্বরিক মদে মত্ত হইয়া তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিলে। কিন্তু বৌদ্ধগণ যখন পুনরায় উপস্থিত হইবে তখন তোমার অস্তিত্ব আমার অধীন হইবে।

জরন্নৈয়ায়িক এই উপনামধারী জয়ন্তস্বামী * স্বীয় ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন :—

বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন কোন নিত্য আত্মা নাই অথচ তাঁহারা মরণানন্তর স্বর্গলাভ হইবে, এই আশা করিয়া চৈত্যপূজা করিয়া

---

* নাস্ত্যাত্মা ফলভোগমাত্রমথচ স্বর্গায় চৈত্যার্চ্চনং
সংস্কারাঃ ক্ষণিকা যুগস্থিতিভৃতশ্চৈতে বিহারাঃকৃতাঃ।
সর্ব্বং শূন্যমিদং বসূনি গুরবে দেহীতি চাদিশ্যতে
বৌদ্ধানাং চরিতং কিমন্যদিয়তী দম্ভায় ভূমিঃ পরা॥ (ন্যায়মঞ্জরী)।

থাকেন। তাঁহারা বলেন সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক অথচ যুগান্তস্থায়ী বিহারসমূহ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহারা বলেন সমস্তই শূন্য অথচ গুরুকে ধন দান করিবার উপদেশ প্রদান করেন। বৌদ্ধগণের চরিত্রের বিষয় আর কি বলিব, তাহারা কেবল দম্ভের আধার।

খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে দক্ষিণাপথে আর একজন দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম রামানুজ। তিনি বেদান্তসূত্রের যে ভাষ্য প্রণয়ন করেন উহার নাম শ্রীভাষ্য। রামানুজই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। রামানুজ বৈষ্ণব ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মূলে কুঠারাঘাত করেন। এই সময় হইতে ভূরি ভূরি বৌদ্ধ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে।

১৩শ শতাব্দীতে দক্ষিণাপথে মধ্বাচার্য্য নামে একজন দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়া বেদান্তসূত্রের অপর একটী ভাষ্য প্রণয়ন করেন। মধ্বাচার্য্যও একটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার খর্ব্ব করেন।

১৪শ শতাব্দীতে মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, জৈমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তর, কালনির্ণয়, পরাশরস্মৃতিব্যাখ্যা ইত্যাদি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য্য মহীশূরে যে শৃঙ্গেরি মঠ সংস্থাপিত করেন, ১৪শ শতাব্দীতে মাধবাচার্য্য সেই মঠের অধিনায়ক-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি স্মার্ত্ত ও বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের অনেক উন্নতিসাধন করিয়া বৌদ্ধগণকে সম্পূর্ণ নির্ম্মূল করেন।

১৫শ শতাব্দীতে বেদান্তের অণুভাষ্য প্রণেতা বল্লভাচার্য্য চম্পারণ্যে অর্থাৎ বর্ত্তমান ভাগলপুর প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে বারাণসীতে অবস্থান করেন। তিনিও একটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। তিনি বেদান্তসূত্রের

২।২।২৬ ব্যাখ্যায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"অভাব পদার্থ হইতে ভাব পদার্থের উৎপত্তি হয়, এই মত খণ্ডন করিয়া ভগবান্ ব্যাস বেদসমূহের প্রামাণ্য সংস্থাপন করেন। তদনন্তর ভগবান্ বুদ্ধ দৈত্যগণকে বিমূঢ় করিবার জন্য প্রবৃত্ত হন। বুদ্ধদেব রুদ্ররূপী মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া বলেন :—

ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়।
অতথ্যঞ্চ বিতথ্যঞ্চ দর্শয়স্ব মহাভুজ ॥
সাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মাদ্বিমুখান্ কুরু ॥

হে মহাবাহো রুদ্র আপনি মোহশাস্ত্রসমূহ বিরচন করুন। হে মহাভুজ আপনি অতথ্য ও বিতথ্য ব্যাপারসমূহ প্রদর্শন করুন। আপনি কতকগুলি কল্পিত শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়া যাহাতে লোক সকল আমার প্রতি বিমুখ হয় তাহা করুন।

বুদ্ধদেবের আদেশ অনুসারে মহাদেব প্রভৃতি স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়া বৈদিকধর্ম্মে প্রবেশপূর্ব্বক লোকের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত বেদসমূহের যথার্থ ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর তাঁহারা অস্তি ও নাস্তির অতীত অবিদ্যা নামক পদার্থকে জগৎপ্রবাহের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এবং সেই অবিদ্যার নিবৃত্তিতেই নির্ব্বাণলাভ হয়, এই কথা বলিয়া কতকগুলি জাতিভ্রষ্ট সন্ন্যাসী ও পাষণ্ডের সৃষ্টি করেন। এই সকল দেখিয়া ব্যাস তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। ব্যাস শঙ্করের সহ কলহ করিয়া উহাঁকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন ও তদনন্তর মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন। মহাদেব এইরূপে জগতকে বিমুগ্ধ করিলেন ও ব্যাস তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন দেখিয়া আমি—অগ্নিদেব—এখানে উপস্থিত হইয়াছি। বৈদিকমার্গের সমুদ্ধারের অভি-

প্রায়ে আমি বেদের সূত্রসমূহ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। বেদ সমূহের উদ্ধার করিয়া আমি সমস্ত মোহ নিবারণ করিয়াছি।”

বিষ্ণুপুরাণের ৩য় অংশের ১৭শ ও ১৮শ অধ্যায়ে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে ঃ—

“পরাশর কহিলেন হে মৈত্রেয় পূর্ব্বকালে একদা দেবগণ ও অসুরগণের পরস্পর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে হ্লাদপ্রমুখ দৈত্যগণ দেবগণকে পরাজিত করে। অনন্তর দেবগণ ক্ষীরসমুদ্রের উত্তরকূলে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুর আরাধনার জন্য তপস্যা ও স্তব আরম্ভ করেন। স্তবের অবসান হইলে তাঁহারা শঙ্খচক্রগদাপাণি গরুড়ারূঢ় পরমেশ্বর হরিকে দেখিতে পাইলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন নাথ! প্রসন্ন হও; আমরা শরণাপন্ন, আমাদিগকে রক্ষা কর। হে পরমেশ্বর হ্লাদ প্রভৃতি দৈত্যগণ ব্রহ্মার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া আমাদিগের ত্রিলোক ও যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছে। হে ভগবন্ যাহাতে আমরা সেই সমুদায় অসুরকে নষ্ট করিতে পারি, তুমি আমাদের এইরূপ কোন উপায় করিয়া দেও। দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় শরীর হইতে মায়া মোহ উৎপাদন করিয়া সুরগণকে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—এই মায়া মোহ সমুদায় দৈত্যকে মোহিত করিবে, পরে তাহারা বেদমার্গ বিহীন হইলে তোমরা অনায়াসে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে। বিষ্ণু এইরূপ কহিলে দেবগণ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহারা মায়া মোহকে সঙ্গে লইয়া যেখানে অসুরগণ অবস্থিতি করিতেছিল, সেই স্থানে গমন করিলেন। মায়া মোহ দেখিল অসুরগণ নর্ম্মদা নদীতীরে তপস্যা করিতেছে। সে অসুরদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, হে দৈত্যপতিগণ তোমরা কেন তপস্যা করিতেছ? যদি

তোমরা ঐহিক বা পারত্রিক ফল ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার বাক্যানুসারে কর্ম্ম কর। আমি যে ধর্ম্মের উপদেশ করিব উহাই মুক্তির উপযোগী। উহা হইতে শ্রেয়োধর্ম্ম আর নাই! এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে স্বর্গ বা মুক্তি যাহা অভিলাষ কর তাহাই পাইবে। মায়া মোহের প্ররোচনায় দৈত্যগণ বেদমার্গ হইতে বহিস্কৃত হইল। এইটী ধর্ম্ম এইটী অধর্ম্ম, এইটী সৎ এইটী অসৎ, ইহাতে মুক্তি হয় ইহাতে মুক্তি হয় না, এইটী পরমার্থ এইটী অলীক, ইহা দিগম্বরদিগের ধর্ম্ম উহা বহুবস্ত্র মনুষ্যের ধর্ম্ম, এইরূপ নানা সন্দেহজনক বাক্য বলিয়া মায়া মোহ দৈত্যগণকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করাইল। মায়া মোহ বলিয়াছিল হে দৈত্যগণ তোমরা মদুক্ত ধর্ম্ম অর্হত অর্থাৎ মান্য কর। এই জন্য যাহারা মায়া মোহ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহারা আর্হত নামে খ্যাত হয়। মায়া মোহের ধর্ম্ম ক্রমে বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। অনন্তর মায়া মোহ অসুরগণকে বলিল যদি নির্ব্বাণ লাভ করা তোমাদিগের বাঞ্ছনীয় হয় অথবা তোমরা যদি স্বর্গ কামনা কর, তাহা হইলে পশুহিংসা প্রভৃতি দুষ্ট ধর্ম্ম ত্যাগ কর। এই জগৎপ্রবাহ বিজ্ঞানময় বলিয়া অবগত হও। এই জগতের কোন আধার নাই, ইহা নিশ্চিত জানিও।

মায়া মোহ দৈত্যগণকে এইরূপ ভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল যে তাহারা তৎক্ষণাৎ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিল। মায়া মোহের প্রভাবে অসুরগণ অল্প কাল মধ্যে বেদাশ্রিত সমুদায় কথা বিস্মৃত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেদের নিন্দা আরম্ভ করিল, কেহ বা দেবগণের নিন্দা করিল, কেহ বা যজ্ঞাদি কর্ম্মকলাপের এবং কেহ বা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতে লাগিল। পশুহিংসা করিলে ধর্ম্ম হয় একথা যুক্তিসঙ্গত নহে; অনলে ঘৃত দগ্ধ করিলে মহা ফল হয় ইহা বালকের যোগ্য কথা।

যজ্ঞস্থলে পশু বধ করিলে যদি সেই পশু স্বর্গে গমন করে, তাহা হইলে যজমান্ আপনার পিতাকে কেন বধ করে না? শ্রাদ্ধকালে এক ব্যক্তি ভোজন করিলে যদি অন্য ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে প্রবাস গমন কালে খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইবার প্রয়োজন কি? হে অসুরগণ তোমরা আমার বাক্যে আস্থা স্থাপন কর। আপ্তবাক্য কিছু আকাশ হইতে পতিত হয় না। তোমার, আমার বা অন্য ব্যক্তির যাহারই হউক না কেন সকলেরই যুক্তিসঙ্গত বাক্য গ্রহণ করা উচিত। মায়া মোহ এইরূপে বহুবিধ উপায় দ্বারা দৈত্যগণকে ঈদৃশ বিকৃত ভাবাপন্ন করিয়াছিল যে তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিরই আর বেদে রুচি থাকিল না। এইরূপে দৈত্যগণ কুপথগামী হইলে দেবগণ পরম উদ্যোগ করিয়া তাহাদের সহ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুনর্ব্বার দেবাসুরের সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তখন দেবতারা সন্মার্গবিভ্রষ্ট অসুরগণকে বিনাশ করিলেন। পূর্ব্বে অসুরগণের ধর্ম্মরূপ যে কবচ ছিল, তদ্দারাই তাহারা রক্ষিত হইত। এক্ষণে সেই ধর্ম্মকবচ নষ্ট হওয়ায় তাহারা বিনাশপ্রাপ্ত হইল। হে মৈত্রেয় এই সময় অবধি যে সকল লোক মায়া মোহ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে তাহারাই নগ্ন, কারণ তাহারা বেদরূপ আবরণ ত্যাগ করিয়াছে।

শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে শতধনুঃ নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। অতি ধর্ম্মপরায়ণা শৈব্যানাম্নী তাঁহার এক পত্নী ছিলেন। একদা তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে উপবাস করিয়া একত্রে ভাগীরথী সলিলে স্নান পূর্ব্বক উৎথান করিলেন এমন সময়ে এক পাষণ্ড নগ্ন তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। রাজা উক্ত পাষণ্ডের সহ আলাপ করিলেন কিন্তু দেবী শৈব্যা বাক্‌সংযতা হইয়া থাকিলেন। স্নানের পর পাষণ্ড দর্শন হওয়ায় দেবীর যে পাপ জন্মিয়াছিল তিনি

সূর্য্যকে দর্শন করিয়া সেই পাপের ক্ষয় করিলেন। কিন্তু রাজা স্বীয় পাপের কোন প্রতিকার করিলেন না। কিছু দিন পরে রাজার মৃত্যু হয়। দেবী শৈব্যা চিতারূঢ় পতির অনুগমন করেন। রাজা স্নানান্তে পাষণ্ডের সহ আলাপ করিয়াছিলেন বলিয়া কুক্কুরযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন কিন্তু তাঁহার পত্নী কাশীরাজের দুহিতা হইয়া উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর রাজা শৃগাল, বৃক, গৃধ্র, কাক, ও ময়ূর যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। এক সময়ে বিদেহরাজ জনক অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কাশীরাজ দুহিতা জানিতেন তাঁহার পতি তখনও ময়ূর যোনিতে বিদ্যমান আছেন। তিনি তাঁহার পতি-ময়ূরকে চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে বিদেহরাজ্যে আনয়ন পূর্ব্বক জনক রাজার যজ্ঞে স্নান করাইলেন। যজ্ঞস্থলে অভিষিক্ত হইয়া ময়ূর স্বদেহ ত্যাগ করিল এবং কিছুকাল পরে জনকের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল। তদনন্তর কাশীরাজদুহিতা তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। হে দ্বিজ! এই আমি তোমার সমীপে পাষণ্ডের সহ ভাষণের দোষ ও অশ্বমেধ যজ্ঞে স্নানের মাহাত্ম্য বলিলাম। অতএব পাষণ্ডদিগের সহিত আলাপ বা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না। বিশেষতঃ কোন নিত্তনৈমিত্তিক ক্রিয়া ও যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার সময়ে তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করা অতীব কর্ত্তব্য।”

ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণ বৌদ্ধমতের অসারতা প্রতিপাদন করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই তাঁহারা অত্যুদারতা প্রকাশ পূর্ব্বক বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ এই তিনকেই সুসংস্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। পৌরাণিকগণ বুদ্ধকে ভগবান্ বিষ্ণুর * অবতার মধ্যে

* মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামন এব চ।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ॥

পরিগণিত করেন। শঙ্করাচার্য্য বুদ্ধের মায়াবাদকে * অদ্বৈতবাদ নাম দিয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত করেন। বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের অনুকরণে রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ বৈরাগী ও বৈরাগিণী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। যখন বুদ্ধদেব বিষ্ণু হইলেন, শূন্যবাদ ব্রহ্মবাদে পরিণত হইল এবং ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ স্বীয় উপাধি ত্যাগ করিলেন, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের কিছুই অবশিষ্ট থাকিলনা †, ক্রমে বৌদ্ধগণ বৈষ্ণব ও শৈব হইলেন।

ব্রাহ্মণগণ তান্ত্রিক সম্প্রাদায়ের সহায়তা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিবার উপায় আরও সহজ করিলেন।' বৌদ্ধগণ তান্ত্রিক ধর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে পুনরাগমন ‡ করিতে লাগিলেন। সমগ্র বৌদ্ধধর্ম্ম কালক্রমে তান্ত্রিক ধর্ম্মে পরিণত হইল, এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ পরিশেষে হিন্দু হইলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম এতদুভয়ের সমবায়ে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুগণ বৌদ্ধধর্ম্মের সারমর্ম্ম স্বীয় ধর্ম্মে গ্রহণ করিয়া যে অত্যুদারতা প্রকাশ

---

* মায়াবাদম্ অসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ।
মায়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ রূপিণা॥ (পদ্মপুরাণ)।

† কতিপয় বৌদ্ধ প্রচারক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া দেশান্তরে গমন করিয়াছিলেন। দক্ষিণাপথের সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধদার্শনিক অনুরুদ্ধ স্থবির দ্বাদশ শতাব্দীতে লঙ্কাদ্বীপে গমন করিয়া তথায় বসতি করেন। তিনি অভিধর্ম্মার্থ সংগ্রহ, নামরূপ পরিচ্ছেদ, পরমার্থ বিনিশ্চয়, শতক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

গৌরদেশের বারেন্দ্রভূমির সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধকবি রামচন্দ্র কবিভারতী ভক্তিশতক বৃত্তমালা প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচন করেন। তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া দ্বাদশ শতাব্দীতে লঙ্কাদ্বীপে পরাক্রম বাহুর রাজ্যে বাস করেন। তথায় লঙ্কাধিপ তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করেন ও একটী বৌদ্ধ সংঘের অধিনায়কপদে বরণ করেন।

‡ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে সুবিখ্যাত হিন্দু কবি ভবভূতি যে মালতীমাধব নাটক প্রণয়ন করেন উহাতে লিখিত আছে সৌদামিনী প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন [illegible] তান্ত্রিকধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজে পুনরাগমন করেন।

করিয়াছিলেন তাহারই ফলে ভারত হইতে "বৌদ্ধ" এই নাম বিলুপ্ত হইয়াছে।*

তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের দুরাচার—

আমাদের বোধ হয় তান্ত্রিকবৌদ্ধগণের ভীষণ দুরাচারই তাঁহাদের ধ্বংসের একমাত্র কারণ। সার্দ্ধ দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার পর অনেক ধর্ম্মের উৎথান ও পতন হইয়াছে এবং মানব জাতির জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী ধর্ম্মের সৃষ্টি হয় নাই। এই বিংশ শতাব্দীতে যদি কেহ পৃথিবীর সমগ্র সভ্য জনপদ হইতে প্রতিনিধি আহ্বান পূর্ব্বক একটী ধর্ম্মমহামণ্ডলের সৃষ্টি করিয়া সমস্ত মানবসমাজের নিমিত্ত কোন আদর্শ ধর্ম্মের উদ্ভাবন করেন তাহা হইলে উহাও বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্মকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। বৌদ্ধ দর্শনের জড়বাদ, বিজ্ঞানবাদ, শূন্যবাদ প্রভৃতি মত জগতের বিদ্বন্মণ্ডলীর মস্তক এখনও আলোড়িত করিতেছে, এবং বোধিসত্ত্বগণ বৌদ্ধ

---

* বর্ত্তমান সময়ে লুপ্ত বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক চিহ্ন বিদ্যমান আছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

"যতদুর দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হইল যে ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধধর্ম্মের ভগ্নাবশেষ। বৌদ্ধেরা ত আপনাদিগকে কখন বৌদ্ধ বলিত না, তাহারা আপন ধর্ম্মকে সদ্ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম বলিত। সেই ধর্ম্ম নামটাই বজায় রহিয়াছে। বৌদ্ধদিগের উপাস্য বস্তু তিনটী, বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ। সংঘ অর্থে সন্ন্যাসীর দল। কালে বুদ্ধদেব লোপ পাইয়াছেন। ধর্ম্ম বজায় আছেন। পাকা বারমেসে সন্ন্যাসীর দল লোপ পাইয়াছে, গাজনী সন্ন্যাসীর দল হইয়াছে।"

(সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থভাগ, ১মসংখ্যা পৃঃ ৬৮)।

দর্শনের উচ্চভাব সমূহ প্রকাশ করিবার জন্য বৌদ্ধসংস্কৃত নামে এক স্বতন্ত্র ভাষার সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোন্ গুলি সৎকর্ম্ম, কোন্ গুলি অসৎ কর্ম্ম, এবং দৈনিক জীবনে কোন্ কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে ইত্যাদি বোঝাইবার জন্য তাঁহারা বিনয়পিটক বিরচন করিয়াছিলেন। কালসহকারে বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয় এবং তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপ উহার স্থান অধিকার করে। এই তান্ত্রিক ব্যাপার সমূহ অতীব ভীষণ। কেহ কেহ বলেন ঐ ক্রিয়াসমূহের আধ্যাত্মিক অর্থ অতীব উচ্চ। উহাদের আভ্যন্তরীণ তাৎপর্য্য যতই মহৎ হউক না কেন, উহাদের বাহ্যভাবসমূহ নিতান্ত নিন্দনীয়। তন্ত্রশাস্ত্রের কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছিল সে রহস্য এপর্য্যন্ত কেহ উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হন নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচলন আছে, কিন্তু কোন্ সম্প্রদায় উহার প্রথম প্রবর্ত্তন করেন তাহা এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই। বৈদিক ধর্ম্মের সহ তান্ত্রিক ধর্ম্মের যেরূপ প্রভেদ, বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহ তান্ত্রিক ধর্ম্মের তাহা অপেক্ষা অধিকতর প্রভেদ দৃষ্ট হয়। পালি ভাষায় তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কলাপের বিন্দুমাত্রও উল্লেখ নাই। যে দিন তান্ত্রিক মতের উদ্ভব হইয়াছে সেই দিনই প্রকৃত বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিলোপ আরম্ভ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণ অথবা মুসলমান বিজেতৃগণ ইহাঁদের কেহই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উন্মূলন করেন নাই। যিনি তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তিনিই প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত এই যে ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য অসভ্য জাতিসমূহ এবং ভারতের বহিঃপ্রদেশস্থিত অশিক্ষিত লোক সকল বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল উহাই তান্ত্রিক ধর্ম্ম। উহারা দেবতার তুষ্টির নিমিত্ত জীব বধ করি

এবং মদ্য ও মাংস উপহার দিত। রক্তবর্ণ, শ্বেতবর্ণ ও শুষ্ক এই ত্রিবিধ মাংসই দেবগণের রুচিজনক। উহাদের মধ্যে বিবাহের প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল না এবং উহারা শুদ্ধি ও অশুদ্ধির প্রভেদ বুঝিত না। সেই জন্য উহারা অনেক বীভৎস ব্যাপারের সংঘটন করিত। বৌদ্ধধর্ম্মের নেতৃগণ অসভ্য লোকসমূহকে স্বীয় ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত রাখিবার জন্য ঐ সমস্ত ঘৃণিত ব্যবহারের প্রশ্রয় দিতেন। অসভ্য লোকসমূহকে সভ্যতার সোপানে আনয়ন করিবার প্রয়াস অবশ্য প্রশংসনীয়। কিন্তু তাহাদের পাশব অনুষ্ঠান-সমূহকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করা অত্যন্ত গর্হিত। যাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যপদেশে মদ্যপান, মাংসভক্ষণ পাশবাচার ইত্যাদির প্রশ্রয় দেন তাঁহারা আপনাদিগকে ধর্ম্মযাজক বলিয়া মনে করিতে পারেন কিন্তু যথার্থতঃ তাঁহারা মানব সমাজের মহা শত্রু। *

---

* ইংলণ্ডদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাক্তার রীজ্ ডেভিড্স্ (Dr. Rhys Davids) তন্ত্র সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

The Tantra literature has also had its growth and its development, and some unhappy scholar of a future age may have to trace its loathsome history. The nauseous taste repelled even the self-sacrificing industry of Burnouf, when he found the later Tantra books to be as immoral as they are absurd. 'The pen', he says, 'refuses to transcribe doctrines as miserable in respect of form, as they are odious and degrading in respect of meaning'.

BUDDHISM, p. 209.

বঙ্গদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত এই :—

Such injunctions would, doubtless, be best treated as the ravings of madmen. Seeing, however, that the work in which they occur is reckoned to be the sacred scripture of millions of intelligent human beings, and their counterparts exist in almost the same words in Tantras which are held equally sacred by men

দুষ্কর ও কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিয়া যে সিদ্ধি লাভ না হয় সর্ব্বপ্রকার কামসুখ উপভোগ * করিয়া সেই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। তন্ত্র গ্রন্থসমূহে কি কি বিষয়ের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তথাগতগুহ্যক নামক একখানি প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থের কিঞ্চিৎ বিবরণ এস্থলে লিখিত হইতেছে। নেপালী বৌদ্ধগণ প্রতিদিন যে নয়খানি গ্রন্থের পূজা করিয়া থাকেন তথাগতগুহ্যক তাহাদের অন্যতম। এই গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত ও অষ্টাদশ পটলে বিভক্ত। প্রথম পটলে বিভিন্ন প্রকার সমাধি, ২য় পটলে বিবিধ ধ্যান, এবং ৩য় ও ৪র্থ পটলে মণ্ডলকরণ বিধি বর্ণিত হইয়াছে। সাধকের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন তাহা ৫ম পটলে বিবৃত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ পটলে বীজমন্ত্র, ৭মে সিদ্ধিলাভের উপায়, ৮ম ও ৯মে তান্ত্রিক ক্রিয়া, অনুষ্ঠান ও বজ্রধরের উপাসনা, এবং ১০মে মহাসিদ্ধিপ্রদায়ক মন্ত্র বিবৃত হইয়াছে। অন্ন আহার না করিয়া হস্তিমাংস, অশ্বমাংস ও কুক্কুরমাংস ভক্ষণ করা সাধকের একান্ত কর্ত্তব্য। ১১শ পটলে ওঁ, আ ও হুং এই তিনের ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী পটলে লিখিত হইয়াছে সমস্ত জাতি ও বর্ণ তান্ত্রিক ধ্যানের অধিকারী। তদনন্তর কায়জপ, বাগ্জপ, চিত্তজপ ও রাগজপ বর্ণিত হইয়াছে।

---

who are by no means wanting in intellectual faculties of a high order, we can only deplore the weakness of human understanding which yields to such delusion in the name of religion, and the villainy of the priesthood which so successfully inculcates them.

(INTRODUCTION TO THE LALITAVISTARA, pp. 16—17)

* দুষ্করৈ র্নিয়মৈ স্তীব্রৈঃ সেবামানো ন সিদ্ধতি।
সর্ব্বকামোপভোগৈস্তু সেবয়ংশ্চাশু সিদ্ধতি॥

১৬শ পটলে হোমের প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিণ্মূত্র, মাংস, তৈল, ইত্যাদি দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। ১৭শ ও ১৮শ পটলে ভগবান্ বুদ্ধ, বজ্রধর, বজ্রপাণি এবং অন্যান্য বোধিসত্ত্বের কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে। ধ্যান, ধারণা, মুদ্রা, ন্যাস. সাধনা ইত্যাদিও এই দুই পটলে বিবৃত হইয়াছে। এই দুই পটলে পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে "ধর্ম্মের অত্যদ্ভুত গুহ্যতত্ত্ব এই যে সর্ব্বদা বিণ্মূত্র ভক্ষণ করিতে হইবে। বিণ্মূত্র, ইত্যাদির জুগুপ্সা করিবে না।"

প্রথমতঃ তান্ত্রিকগণ অতি নিরীহভাবে কার্য্য করিতেন। তাঁহারা বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি এই পাঁচটী ধ্যানীবুদ্ধের উপাসনা করিতেন। মৈত্রেয়, গগনগঞ্জ, সমন্তভদ্র, বজ্রপাণি, মঞ্জুশ্রী, সর্ব্বনাবরণ বিষ্কম্ভী, ক্ষিতিগর্ভ ও খগভ এই আটটী বোধিসত্ত্ব তাঁহাদের উপাস্য। কোন কোন গ্রন্থে কেবল সমন্তভদ্র, বজ্রপাণি, রত্নপাণি, পদ্মপাণি ও বিশ্বপাণি এই পাঁচটা বোধিসত্ত্বের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পদ্মপাণির অন্য নাম অবলোকিতেশ্বর। বিপশ্যী, শিখী, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ ও শাক্যমুনি এই সাতজন তথাগতও তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের উপাসনীয়। রোচনা, মামকী, পাণ্ডুরা, ও তারা এই চারিটীই তান্ত্রিকগণের প্রধান দেবী। বজ্রবরাহী, যামিনী, সঞ্চারণী, সন্ত্রাসনী, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা এই ছয় জন যোগিনী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের বিশেষ পূজা লাভ করিতেন। সর্ব্বপ্রকার বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তান্ত্রিকগণ পাঁচ প্রকার দেবতার জপ করিতেন। ঐ পাঁচটী দেবতা পঞ্চরক্ষা নামে প্রসিদ্ধা। উহাঁদের নাম যথাঃ—(১) প্রতিসরা, (২) মহাসহস্রপ্রমর্দ্দিনী, (৩) মারীচি বা মহামায়ূরী, (৪) মহামন্ত্রানুসারিণী, ও (৫) মহাশীতবতী। ধৃতরাষ্ট্র, বিরূপাক্ষ, বিরূঢ়ক ও কুবের, এই চারিটী প্রধান লোকপালকেও বৌদ্ধগণ

পূজা করিতেন। কিছুকাল পরে তাঁহারা স্বয়ম্ভূ আদি বুদ্ধের আবিষ্কার করেন। এই কয়েকটী দেবতা লইয়া তান্ত্রিকগণ প্রথমতঃ কার্য্য আরম্ভ করেন। অনন্তর উহাঁরা অসংখ্য দেব দেবীর সৃষ্টি করেন। কোন দেবতার দুইটী মস্তক, কোন দেব ত্রিশিরাঃ, কাহারও বা মস্তকের সংখ্যা এক সহস্র। কাহারও এক চক্ষু, কেহ ত্রিনেত্র কেহ বা সহস্রলোচন। কাহারও মুখ বরাহের মত, কেহ বা অশ্বের ন্যায় মুখবিশিষ্ট, কেহ বা খরমুখ। কাহারও শরীরের অর্দ্ধাংশ মানুষের ন্যায়, অপর অর্দ্ধাংশ পশুর ন্যায়। এইরূপে নানা আকার, নানাবর্ণ, ও নানা স্বভাব কল্পনা করিয়া তান্ত্রিকগণ অসংখ্য দেবতার সৃষ্টি করেন। তান্ত্রিক দেবতা সমূহ মদ্যমাংসপ্রিয়। তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ অতীব ভীষণ।

তন্ত্র প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; যথা—উচ্চতন্ত্র ও নিম্নতন্ত্র। উচ্চতন্ত্র আবার দুই ভাগে বিভক্ত; যথা—যোগতন্ত্র ও অনুত্তর তন্ত্র। নিম্নতন্ত্রও দুই ভাগে বিভক্ত; যথা—ক্রিয়াতন্ত্র ও চর্য্যাতন্ত্র। আদি-কর্ম্মপ্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থে জম্ভলজলদানবিধি, চৈত্যকরণবিধি, সর্ব্বক-তাড়নবিধি, গুরুমণ্ডলকরণবিধি, বোধিসত্ত্ববলিবিধি, ইত্যাদি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। গুরুসেবা তান্ত্রিকদিগের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সিদ্ধিলাভই তান্ত্রিকদিগের চরম উদ্দেশ্য। সিদ্ধি শব্দের অর্থ অলৌকিক ক্ষমতা। তাঁহারা সিদ্ধিলাভের জন্য কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ, এবং বর্ত্তুলাকৃতি গৃহ অঙ্কন করেন। ঐ মন্ত্রগুলির নাম ধারণী ও ঐ বর্ত্তুলাকৃতি গৃহের নাম মণ্ডল।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রথম সৃষ্টি হয়। পঞ্জাবের অসঙ্গ বোধিসত্ত্ব যোগাচার্য্য ভূমিশাস্ত্র নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন উহাই বৌদ্ধ তন্ত্র

[শা]স্ত্রের প্রথম গ্রন্থ। আমাদের বোধ হয় বৌদ্ধতন্ত্র খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর [প]ূর্ব্বে বিরচিত হয়। অসঙ্গের ভ্রাতার নাম বসুবন্ধু। কুমারজীব [ন]ামক পণ্ডিত ৪০১ খৃঃ অব্দে বসুবন্ধুর জীবনচরিত চীন ভাষায় অনু-[ব]াদিত করেন। সুতরাং বসুবন্ধু ও অসঙ্গ উভয়েই খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। এই সকল কারণে আমাদের বোধ হয় অন্ততঃ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধতন্ত্রশাস্ত্র পঞ্জাব প্রদেশে প্রথমতঃ আবির্ভূত হয়। সুপ্রসিদ্ধ চাইনীজ্ পরিব্রাজক হুয়েন্সাঙ্ ৬৪৬ খৃঃ অব্দে যোগাচার্য্যভূমিশাস্ত্র গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদিত করেন। অনন্তর তথাগতগুহ্যক প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থসমূহের সৃষ্টি হয়। তদনন্তর বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ অসংখ্য তন্ত্র গ্রন্থ বিরচন করেন। নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন, জাপান ইত্যাদি প্রদেশে অধুনা যে সকল পুস্তক আবিষ্কৃত হইতেছে উহার অধিকাংশই তন্ত্রশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ; এবং পৃথিবীতে ইদানীং যে সকল বৌদ্ধ বাস করিতেছেন তাঁহাদের অধি-কাংশই তান্ত্রিক।

আমি এস্থলে তান্ত্রিক দেবতাসমূহের বিবরণ উদ্ধৃত করিব না। কেবল চামুণ্ডা ও বজ্রবরাহী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

চামুণ্ডা—চামুণ্ডা তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের প্রধান দেবতা। তিনি নাগ, দৈত্য, দেব, মনুষ্য ইত্যাদি লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্রই দুর্দান্ত ও অসংযত জীবন যাপন করিয়াছিলেন এবং এক দিনের মধ্যে তিনবার সমগ্র জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করিতে পারিতেন। যখন তিনি রাক্ষসকুলে অবতীর্ণ হন তখন তাঁহার স্বভাব এতই ভয়ঙ্কর ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিল যে যদি তিনি ইচ্ছা করিয়া নিজের চরণে লৌহ-শৃঙ্খল পরিধান না করিতেন তাহা হইলে সমস্ত রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়া ফেলিতেন। একদিন, যম ইহাঁকে স্বীয় ভবনে আহ্বান করিয়াছিলেন,

কিন্তু ইহাঁর পদ হইতে লৌহশৃঙ্খল খুলিয়া দিতে সাহস করেন নাই। বৌদ্ধগণ কৃতাঞ্জলিপুটে চামুণ্ডার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন "হে দেবি! আপনি তথাগতের ধর্ম্ম রক্ষা করুন।" তদনুসারে তিনি দেব, মনুষ্য, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, রাক্ষস ইত্যাদি লোক হইতে অসংখ্য বুদ্ধোপাসক সংগ্রহ করেন। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের শত্রুগণকে তিনি অনেকবার পরাভূত করিয়াছিলেন। তজ্জন্য বৌদ্ধগণ তাঁহাকে নানা উপহার প্রদান করেন। কোন জনপদ হইতে তিনি শোণিত উপহার প্রাপ্ত হন। কেহ বা তাঁহাকে মদ্য প্রদান করিয়াছিল। কোনও জনপদ হইতে তিনি মুণ্ডমালা উপহার প্রাপ্ত হইয়া বামহস্তে ধারণ করিয়াছিলেন। কোনও কোনও বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে চামুণ্ডা তীর্থিক দেবী ও মহেশ্বরের পত্নী। মহেশ্বর এক সময়ে বুদ্ধের উপাসক হন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মের রক্ষকপদে বরণ করেন, কিন্তু তিনি বোধিসত্ত্বাবস্থা প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার পত্নী চামুণ্ডা দশ প্রকার সিদ্ধিই লাভ করিয়াছিলেন। যখন চামুণ্ডা দশম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন তখন বুদ্ধ তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মের রক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার অপর নাম রণঙ্করী, রেমতী, বিদ্যুন্মেঘসেনা, যশঙ্করী, ইন্দ্রকন্যা ও উমা।

বজ্রবরাহী—ইনিও তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের একটী প্রধান দেবতা। ইহাঁর মুখ শূকরীর ন্যায় কিন্তু অন্যান্য অবয়ব মনুষ্যের মত। ইনি অত্যন্ত কোপনস্বভাবা, ও অধিকাংশ সময়েই শয়ানা থাকেন। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণ ইহাঁর পদতলে বসিয়া কম্পিত কলেবরে প্রার্থনা করেন "হে দেবি! আমাদিগকে সিদ্ধি প্রদান করুন।"

ভারতীয় তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের অবস্থা লামা তারানাথ সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ লামা তারানাথ ষোড়শ শতাব্দীর

শেষভাগে তিব্বতদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ভারতীয় তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের এক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের নাম "কাবাব্ দুন্‌দন্",* বা "সপ্ত অলৌকিক আজ্ঞা"। ১১শ শতাব্দী হইতে ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাঁচশত বর্ষকাল ভারতবর্ষে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। তারানাথ স্বয়ং একজন ভক্তিমান্ তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে মদ্য শব্দ ব্যবহার না করিয়া প্রায়ই "সুধা" ও "পরিশুদ্ধপ্রজ্ঞার পবিত্র জল" ইত্যাদি নাম ব্যবহার করিয়াছেন। কাবাব্ দুন্‌দন্ গ্রন্থের প্রথম আজ্ঞার একটী স্থল নিম্নে অনুবাদিত হইল :—

উড়িষ্যা দেশে রাহুল নামে এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি অষ্টাদশ বিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন ও তাঁহার পাঁচশত ছাত্র ছিল। একদা তিনি ছাত্রগণকে ধর্ম্মশাস্ত্র পড়াইতেছেন এমন সময়ে বজ্রযোগিনী মদ্য বিক্রয়িণীর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন। তখন পরিশুদ্ধ প্রজ্ঞার পবিত্র জলপান করিবার জন্য রাহুলের অত্যুৎকট অভিলাষ জন্মিল। তিনি মদ্য বিক্রয়িণীর নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়া প্রচুর পরিমাণে পান করিলেন। ইহাতে তাঁহার মনোমধ্যে এমন একাগ্রতা উৎপন্ন হইল যে তিনি তৎক্ষণাৎ সমাধিমগ্ন হইলেন। তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইতে না হইতেই এক জনরব উপস্থিত হইল যে রাহুল মদ্য পান করিয়াছেন। তদনুসারে অন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিবার উদ্যোগ করেন। রাহুল

* শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, এই গ্রন্থ তিব্বতীয় অক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ এপর্য্যন্ত কোন ভাষায় অনুবাদিত হয় নাই, এব ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে ২।১ জন মাত্র এই গ্রন্থের বিষয় অবগত আছেন প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে দার্জিলিঙে লামা ওয়াঙ্‌দেনের নিকট আমি এই গ্র অধ্যয়ন করি। লামা ওয়াঙ্‌দেনের জন্মভূমি লাসা (তিব্বত)। তিনি কাবাব্ দুন্‌দন্ গ্রন্থ খানিকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন এবং বলিতেন এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সিদ্ধিলাভ হয়।

তখন যোগপ্রভাবে পাকস্থলী হইতে মদ্য উদ্গিরণ করিলেন। তদনন্তর তিনি একখণ্ড প্রস্তর সমীপস্থিত পুষ্করিণীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "হে ব্রাহ্মণগণ! যদি এই প্রস্তর জলমধ্যে ডুবিয়া যায় তাহা হইলে জানিবে আমি মদ্যপান করিয়াছি, আর যদি উহা জলের উপর ভাসে তাহা হইলে জানিবে আমি মদ্যপান করি নাই, সুধা পান করিয়াছি''। প্রস্তরখণ্ড যথার্থই জলের উপর ভাসিতে লাগিল। তখন রাহুল বলিলেন "হে ব্রাহ্মণগণ! দেখ আমি যাহা পান করিয়াছিলাম তাহা মদ্য কি সুধা। তোমরা এই মদ্য বিক্রয়িণীকে অবজ্ঞা করিও না; ইনি স্বয়ং বজ্র যোগিনী। ইহাঁর হাতে আমি পরিশুদ্ধ প্রজ্ঞার পবিত্র জল লাভ করিয়াছি"। এই বলিয়া রাহুল সেই দেশ ত্যাগ করিলেন এবং কিয়ৎকালপরে মগধদেশে উপস্থিত হইয়া মহাসিদ্ধি লাভ করেন।

কাবাব্‌দুন্‌দন্‌ গ্রন্থের দ্বিতীয় আজ্ঞার একটী স্থল অনুবাদিত করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

ত্রিপুরার পূর্ব্বাংশে বিহিরুক নামে এক রাজা বাস করিতেন। মহাসিদ্ধ বিরূপ তাঁহাকে তান্ত্রিকধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। বিরূপকে দেখিয়া বিহিরুক বলিয়াছিলেন "মহাশয়! আমাকে উদ্ধার করুন"। তদনুসারে বিরূপ তাঁহাকে শিক্ষা ও সিদ্ধি প্রদান করেন। বিহিরুক মহামুদ্রা সিদ্ধিলাভ করেন। এই সিদ্ধির অনুষ্ঠান করিবার জন্য পদ্মানাম্নী দাসীকে নিজের নিকট রাখিতেন; এবং ঐ কথা পৃথিবীর সকল লোককে বলিয়া বেড়াইতেন। প্রজাগণ ইহাতে বিরক্ত হইয়া বিহিরুককে রাজ্যচ্যুত করে। রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি এক বন হইতে অপর বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি মৎস্য, পক্ষী, মৃগ যাহা কিছু সম্মুখে দেখিতে পাইতেন তাহাই বধ করিয়া ভক্ষণ করিতেন। বিহিরুক নিজে কোন্ জাতীয় লোক ছিলেন জানা যায় না কিন্তু তাঁহার দাসী পদ্মা ডোম্ জাতীয়া রমণী। বিহিরুক সর্ব্বদা পদ্মার সাহচর্য্যে বাস করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে ডোম্‌রাজ বলিত। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ছিলেন। স্বরাজ্য হইতে বিদূরিত হইয়া তিনি দেশে দেশে বিচরণপূর্ব্বক ছয় বৎসর অতিবাহিত করেন। কিছুকাল পরে ত্রিপুরার পূর্ব্বাংশে দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় উপস্থিত হয়। জ্যোতিষিগণ প্রজাদিগকে বলিলেন "বিহিরুক অত্যন্ত ভাগ্যবান রাজা ছিলেন, তাঁহাকে বিদূরিত করায় রাজ্যে এই সকল অনিষ্টা-

পাত ঘটিতেছে"! তখন প্রজাগণ বিহিরুককে রাজ্যে পুনরাহ্বান করিল। বিহিরুক ও পদ্মা উভয়ে একটী ব্যাঘ্রীর উপরে চড়িয়া সর্পমালাবিভূষিত হইয়া ত্রিপুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রজাগণ বুঝিতে পারিল বিহিরুক সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তদনুসারে তাহারা তাঁহার পাদবন্দনা করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় প্রশমিত হইল ও প্রজারা তান্ত্রিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। অনেক লোক বিহিরুকের ন্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

এক সময়ে বিহিরুক রাঢ় দেশে গমন করিয়াছিলেন। রাঢ় দেশের রাজা বৌদ্ধধর্ম্মের ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন কিন্তু তিনি ব্যাঘ্র ও সর্প দেখিলে অত্যন্ত ভয় পাইতেন। তিনি বিহিরুককে দেখিয়া বলেন "ওহে দুষ্টযোগী তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও" তখন বিহিরুক সর্পমালা-বিভূষিত হইয়া ব্যাঘ্রের উপর চড়িয়া রাঢ় রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি একটী দৃষ্টিবিষসর্প স্বীয় যষ্টিরূপে গ্রহণ করিলেন। সাতটী বিষাক্তসর্প দ্বারা তাঁহার ছত্র নির্ম্মিত হইল। বিহিরুক আকাশ-পথে বিচরণ করিয়া রাঢ়রাজের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। রাঢ় দেশের লোক সকল ভীত হইয়া বুদ্ধের ধর্ম্মে প্রবেশ করিল। কিছুকালের জন্য রাঢ় দেশ হইতে তীর্থিক ধর্ম্ম বিদুরিত হইল। বিহিরুক তদনন্তর কর্ণাটকদেশে গমন করেন। বিহিরুকের অনেক শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে আলালবজ্র, হেমলালবজ্র, ও রত্নবজ্র এই তিনটী প্রধান শিষ্য মগধে বাস করিতেন। গর্ব্বরিপু, জয়শ্রী, অশক্যচন্দ্র, রাহুল-বজ্র প্রভৃতিও বিহিরুকের সাক্ষাৎ শিষ্য। পদ্মা মহাসিদ্ধা ডোম্বিনী নামে প্রসিদ্ধা ছিলেন। তিনি কালযোগিনী, ডোমযোগিনী প্রভৃতিকে তান্ত্রিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ডোমযোগী ও ডোম্বিনী যোগিনীর অনেক শিষ্যপরম্পরা বিদ্যমান ছিল।

এইরূপে তান্ত্রিকগণ পরিশেষে দুগ্ধকে জলে পরিণত করা, জলকে দুগ্ধে পরিণত করা, শূন্যমার্গে বিচরণ করা, হঠাৎ ভূমিকম্পের উৎ-পাদন করা, শ্মশানে বসিয়া প্রেতসাধন করা, মৃতদেহ পুনরুজ্জীবিত করা ইত্যাদি অস্বাভাবিক ব্যাপারসমূহের সংঘটনে মনোনিবেশ করেন।

হায়! কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের কি দুষ্পরিণাম সংঘটিত হইয়াছে। যে ধর্ম্ম এক সময়ে পরম পবিত্র বলিয়া সমগ্র জগতে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল, কালসহকারে তাহা অপবিত্রতা ও পশুত্বের আধার হইয়া পড়িল। প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম কি ও উহা দ্বারা মানবজাতির কিরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে তাহার বর্ণনা করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর সাতিশয় বৃহৎ হইয়া পড়ে এই আশঙ্কা করিয়া এস্থলে ঐ সকল বিষয় বিবৃত হইল না। এখানে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের সহ তান্ত্রিক মতের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। যে দিন তান্ত্রিকগণ বৌদ্ধধর্ম্ম রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন সেই দিন অবধিই প্রকৃত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিলোপ আরম্ভ হইয়াছে। যতদিন ভারতে যথার্থ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত ছিল ততদিন মহম্মদও জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই এবং ততদিন ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণও লেখনী ধারণ করিতে পারেন নাই। তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের দুরাচার যতই ভীষণ হইতে লাগিল "বৌদ্ধ" এই নাম ততই লোকের বিদ্বেষের বিষয় হইয়া পড়িল। পরিশেষে মুসলমানগণ নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধগণকে স্বীয় ধর্ম্মে গ্রহণ করিলেন। অপেক্ষাকৃত উন্নত বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে প্রবেশ করিলেন। আজিও পঞ্জাব, চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশে কয়েক সহস্র বৌদ্ধ বিদ্যমান আছেন কিন্তু মনুষ্য গণনায় বোধ হয় তাঁহারা হিন্দুজাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন।

শ্রীসতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

ভূগোল পাঠনা।

যাঁহারা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্রবে থাকেন, কিংবা স্কুল কলেজে কাজ করেন, তাঁহারা জানেন এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় অনেক ছাত্র ইতিহাস ও ভূগোল উত্তীর্ণ হইতে পারে না। যাঁহারা শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত, এবং শিক্ষার ফলাফল ছাত্রদিগের বুদ্ধিবিকাশে ও পরিদর্শনক্ষমতায় দেখিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা জানেন বর্ত্তমান সময়ে যে ভাবে ভূগোল শিখান হইয়া থাকে, তাহাতে আশানুরূপ ফল হয় না। ছাত্রগণ এণ্টেন্সের ভূগোল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল কি না, তাহা ইহাঁদের প্রথম লক্ষ্য নহে। যেহেতু শিক্ষার ফল সকল সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদ্বারা বুঝিতে পারা যায় না। ভূগোল শিক্ষা দ্বারা কি ফল আশা করা যায়, অথচ পাওয়া যায় না, এবং না পাইবার কারণ কি, তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমে শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি মূলসূত্রের উল্লেখ আবশ্যক। অনেকের, বিশেষতঃ বি-এ বা এম-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকগণের একটা ধারণা আছে যে, যে সে ব্যক্তি প্রকৃত শিক্ষক হইতে পারেন। অনেকে মনে করেন, এই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকতা করিবার অধিকার জন্মে। ফলে, সংবাদপত্রাদিতে যে সকল বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যে ভাবে স্কুল সমূহের শিক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, তাহাতে বোধ হয় যেন শিক্ষকতা অতি সহজ কাজ; বি-এ কিংবা এম-এ উপাধি পাইলেই শিক্ষকের যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ শিক্ষকতা একটা বিদ্যা

এই বিদ্যার সহিত স্কুলকলেজে প্রদত্ত শিক্ষার সম্পর্ক অল্প। আমি এক সময়ে স্কুলের ও কলেজের ছাত্র ছিলাম, বহুকাল ছাত্রজীবন দেখিতেছি, অনেক গণ্যমান্য শিক্ষকের শিক্ষকতা দেখিয়াছি। এই সমুদয় অভিজ্ঞতার ফলে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, এক শত জন শিক্ষকের মধ্যে কদাচিৎ দুই পাঁচ জন প্রকৃত শিক্ষক দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ জন্মকবি, জন্মশিল্পীর তুল্য জন্মশিক্ষক অত্যল্প আছেন। তবে, চেষ্টা দ্বারা কবিতা রচনার ক্ষমতা লাভ করা যাইতে পারে; যে শিল্পী নয়, শিক্ষা দ্বারা তাহাকে শিল্পী করা যাইতে পারে; যিনি শিক্ষক হইতে চান, তাঁহাকে শিক্ষকতা কর্ম্ম শিখান যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, বিদ্বান হইলেই বিদ্যাদাতা হইতে পারা যায় না। বিদ্যাদানের পূর্ব্বে অবশ্য বিদ্যা সঞ্চয় আবশ্যক, কিন্তু সঞ্চয় হইলেই দানের ক্ষমতা আসে না। ওকালতী করিতে গেলে সে বিষয়ে প্রথমে শিক্ষা আবশ্যক, কোন শিল্প বা কারুকার্য্য করিতে হইলে সে বিষয়ে শিষ্য হইতে হয়। ফলতঃ এমন কোন ব্যবসায় আছে কি, যাহার সুচারুসম্পাদন নিমিত্ত নিজেকে প্রথমে প্রস্তুত করিতে হয় না? ছাত্রকে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্য এই যে, সে তাহার জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিবে; অর্থাৎ যে অবস্থায় তাহাকে পড়িতে হইবে, যাহাতে সে নূতন হইয়া সে অবস্থায় না পড়ে, যাহাতে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া যাইতে পারে, তদ্‌বিষয়ে তাহাকে অভিজ্ঞ করা, স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়া। এই জন্যই শিক্ষকের কর্ম্ম অতিশয় কঠিন, অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ। এমন কর্ম্ম বিনা যত্নে, বিনা অধ্যবসায়ে, বিনা অভ্যাসে সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করা কখনও সম্ভাব্য নহে।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষক হইতে গেলে ছাত্র হইতে হয়। নিজেকে যিনি সর্ব্বদা ছাত্ররূপে রাখিতে না পারেন, সপরিশ্রম আলোচনায়,

নূতন নূতন বিষয়ের অনুসন্ধানে যিনি বিরত থাকেন; তিনি শিক্ষকতা করিতে পারেন, কিন্তু ভাল শিক্ষক হইতে পারেন না। কোন কর্ম্ম করিতে উৎসাহ না থাকিলে সে কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু কর্ম্মের সম্যক্ ফল পাওয়া যায় না। কোন একটা বিষয় শিখাইতে শিখাইতে কাহারও কাহারও এমন অভ্যাস হইয়া যায় যে, তিনি ঠিক কলের মত করিতে থাকেন। কলের প্রাণ নাই, কাজেই অন্য প্রাণে আঘাত করিতে পারে না। গুরুশিষ্যের ঘাত প্রতিঘাতই শিক্ষকতার প্রাণ। উৎসাহহীন শিক্ষকতা প্রাণহীন। উৎসাহ থাকে, যদি শিক্ষক নিজে ছাত্র হইতে পারেন। ব্যবসায়ের ঐক্যে সহানুভূতি জন্মে। শিক্ষকের নিমিত্ত কোন কোন বিজ্ঞাপনে লিখিত থাকে যে, "শিক্ষকতাকার্য্যে অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক।" অর্থাৎ আবেদনকারীর শিক্ষকতা বিদ্যা যেন অভ্যস্ত হইয়া থাকে। এরূপ বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, শিক্ষকতার কুরীতি বিলক্ষণ অভ্যস্ত হইয়াছে। কয়েক বৎসর কেহ শিক্ষকতা করিয়াছেন বলিয়াই যে তিনি প্রকৃত শিক্ষকের গুণ পাইয়াছেন, এরূপ অনুমান করা চলে না। এমন কি, এক এক জন প্রথম হইতেই শিক্ষকতার অযোগ্য। অভ্যাসে তাঁহাদের উন্নতি হয় না, বরং কাঁচা হাতই পাকিয়া যায়, ভবিষ্যতে তাহা সংশোধনের আশা মাত্র থাকে না। যুবা শিক্ষকের কতকটা স্বাভাবিক উৎসাহ থাকে; সবিশেষ অভ্যাসে, অভিজ্ঞতার অভিমানে বৃদ্ধ শিক্ষকের উৎসাহ ত থাকেই না, বিদ্যাদানের পদ্ধতি আলোচনা করিতেও আলস্য জন্মে। এইরূপ কারণে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক "অভিজ্ঞ", শিক্ষক স্কুলে ড্রিল ও ড্রয়িংএর আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন না; নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ঐ দুই কর্ম্মের নিমিত্ত কিছু কিছু সময় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন,

কিন্তু ভাবেন কি আপদ্ আসিয়া জুটিয়াছে। তাঁহারা স্বয়ং যে ক্রমে শিক্ষিত হইয়াছেন, সেই ক্রমের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন দেখিলেই প্রায়ই হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকেন। শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতির যে উন্নতি হইতে পারে, উহাও যে একটা বিজ্ঞান হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিলে বর্ত্তমান কালকে অতীতে টানিয়া লইবার চেষ্টা হয়। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক শিক্ষক পাঠ্য পুস্তক পড়াইতে বিশেষ দক্ষ, অনেক শিক্ষক নৈতিক শিক্ষাদানে পরিপক্ক, অনেকে ছাত্রশাসনে কঠোরহস্ত, অনেকে বাহ্যাড়ম্বরে পরিপূর্ণ, অনেকে লেখাপড়ায় অসাধারণ পণ্ডিত, অনেকে ছাত্রদিগের প্রিয় আছেন সত্য, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষক দুর্লভ। কোন শিক্ষক সম্বন্ধে ছাত্রদিগের অভিমত অনেক স্থলে ঠিক হয় না, তথাপি অনেক ছাত্র যে শিক্ষক সম্বন্ধে যে মত পোষণ করে, বুঝিয়া দেখিলে সে মত তত অগ্রাহ্য নহে। এই লক্ষণ দ্বারাও জানা যায় যে, দশ বার জনের মধ্যে কদাচিৎ এক জন ছাত্রদিগের মনের মত হন।

তৃতীয়তঃ, কোন ছাত্রের শিক্ষক হইতে গেলে শিক্ষককে সেই ছাত্রতুল্য হইতে হয়। যদি ছাত্রের বয়স দশ বৎসর হয়, শিক্ষককে তত বয়সে নামিয়া ঠিক ছাত্রের মত হইতে হয়, ছাত্র যুবা হইলে শিক্ষককে যুবা হইতে হয়। যিনি হইতে না পারেন, তাঁহার শিক্ষকতা-চেষ্টা বিফল। ছাত্র অপেক্ষা শিক্ষক বয়সে বড় হইয়া থাকেন, এই বৈষম্য শিক্ষাদানের একটি অন্তরায়। কাজেই শিক্ষকতা দুরূহ হইয়া পড়ে। বয়োবৈষম্য দূর করিবার উপায় নাই, ছাত্র অপেক্ষা শিক্ষককে বিজ্ঞ হইতেই হইবে। কিন্তু সে বিজ্ঞতার ফলে বয়োবৈষম্য অনেকটা হ্রাস করিতে পারা যায়। অনেক শিক্ষক ছাত্রদিগের

সহিত খেলা করিতে পারেন না, তাহাদিগের নিকট মন খুলিয়া হাসিতে কিংবা তাহাদিগের সুখ দুঃখে সুখ দুঃখ বোধ করিতে পারেন না। এরূপ ব্যক্তি সহস্র বিদ্যায় পণ্ডিত হউন, প্রকৃত শিক্ষক হইতে পারেন না। এক এক শিক্ষককে দেখিলে ছাত্রদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তাঁহারা ছাত্রদিগকে জেলখানায় পূরিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক ছাত্রেরা তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইতে পারে, কিন্তু মোটের উপর তাঁহাদিগের শিক্ষকতা বৃথা। ভক্তির সহিত ভালবাসা যোগ না হইলে কেবল ভক্তিতে কাজ হয় না। ভক্তিও কঠোর শাসনে আনিতে পারা যায় না।

চতুর্থতঃ, শিক্ষকের নামান্তর গুরু; পিতা ও গুরু সমান আসনে উপবেশন করেন। শিক্ষককে পিতৃতুল্য এবং ততোধিক হইতে হয়। পিতা গুরুর হাতে পুত্রকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন; গুরু পিতার প্রদত্ত ধর্ম্মের সহিত গুরুর ধর্ম্ম যোগ করিবেন। শিশু, বালক, যুবা—যেই ছাত্র হউক,—ছাত্র শিষ্য। এমন বয়সের শিষ্য, যে বয়সে তাহাকে ইচ্ছামত ভাঙ্গিতে গড়িতে পারা যায়, যে বয়সে ছাত্র কুম্ভকারের মৃৎভাণ্ডের মৃত্তিকা বিশেষ। কাজেই গুরুর ধর্ম্ম শিষ্যে আসে, গুরুর পাপে শিষ্যের পাপ হয়।

এ বিষয়ের অধিক উল্লেখ অনাবশ্যক। অভিনিবেশ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই এই সকল মূলসূত্র বুঝিতে বাকি থাকে না। যিনি এই সকল মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হন নাই, তাঁহার শিক্ষকতা বিড়ম্বনা। দেশীয় শিক্ষকদিগের আর একটি বিষয় সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক। দেশের ভাইদাদা, বন্ধুবান্ধব, জ্ঞাতিকুটুম্ব, প্রতিবেশী স্বদেশী—ইহাঁদেরই বালকেরা তাঁহাদিগের শিষ্য। যদি

তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া মনের মত গড়িতে না পারেন, তাহা হইলে দেশের সুতরাং নিজেদের অমঙ্গল।

বলিতে পারেন, এত গুণবিশিষ্ট শিক্ষক কতজন দেখিয়াছেন? দেশে শিক্ষা নামেমাত্র হয়, ফলে প্রায় হয় না। আমার কোন বিশিষ্ট বন্ধু কথায় কথায় বলিয়া থাকেন, আমরা যে সকল বি-এ বা এম-এ পাশ করাইতেছি, তাহারা কিছুই শিখেনা, কিছুই করিতে পারে না। তাঁহার মতে, এই সকল যুবক অপেক্ষা যাহারা বয়সে বৃদ্ধ অথচ শিক্ষার অভিমান যাহাদের নাই, তাহাদিগের দ্বারা বেশী কাজ পাওয়া যায়। এই উক্তি একদিকে সত্য, অন্যদিকে একদেশদর্শিতার ফল। আমরা বি-এ পাশ করাইতেছি, কিন্তু তিনি যে শিক্ষা চান, তাহাত দিতেছি না। সুতরাং যাহা শিখাই নাই, যাহা শিখিতে ছাত্রেরা কখন চেষ্টা করে নাই, তাহা পাইবার আশা করা অন্যায়। অন্যদিকে তাঁহার উক্তি সত্য। কিন্তু নিরুপায়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার কলকাঠি ধরিয়া আছেন, যে দিকে ঘুরাইবেন, শিক্ষক ও ছাত্রকে সেইদিকে ঘুরিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছার প্রতিকূলে কাজ করিবার ক্ষমতা তাঁহার অধীনস্থ শিক্ষকের কই? যে শ্রেণীতে দুইজন শিক্ষকের প্রয়োজন, সেখানে একজন দিলে সকল ছাত্রের প্রতি মনোযোগী হইতে পারা যায় কি? যাঁহারা শিক্ষক, তাঁহারা মানুষমাত্র; দেবতার শক্তি লইয়া শিক্ষকতা করিতে আসেন না। তৃতীয়তঃ, বিশ্ববিদ্যালয় ইচ্ছা করেন প্রকৃত শিক্ষা হউক, কিন্তু কার্য্যকালে তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন না।

উপরে যে কয়েকটি অভাবের উল্লেখ করা গেল, তাহাদের প্রত্যেকের ফল ভূগোল পাঠনায় দেখিতে পাওয়া যায়। এণ্ট্রেন্স

রীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার নিমিত্ত ভূগোল শিখান হইয়া থাকে। রীক্ষার নিমিত্ত পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট আছে, আর আছে বিগত সব সমূহে প্রদত্ত প্রশ্নাবলী। ছাত্রদিগের কি প্রকার ভৌগলিক ান বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে চান, তাহা পাঠ্য পুস্তক হইতে জানা যাউক, প্রশ্ন দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। কি প্রকার জ্ঞান?— মন জ্ঞান যাহা কয়েকদিন কণ্ঠে রাখিতে পারা যায়, যাহা ায়ত্ত করিতে একটু স্মৃতিশক্তির প্রয়োজন, যাহা গলাধঃ করিয়া াত্মসাৎ না করিলেও চলে। এতদপেক্ষা সহজসাধ্য বিষয় কি াছে? দশটা নগরের নাম, পাঁচটা নদীর নাম, দুইটা পাহাড় র্বতের নাম, মনে রাখা তত কঠিন কি? শিশুকাল হইতে স্কুলে বৎসর (অনেক স্কুলে ৭ম শ্রেণী হইতে ভূগোল পড়ান হয়) ধরিয়া ই দশটা নাম মুখস্থ করাইতে করাইতে পরীক্ষার সময় বিশ পঁচিশটা ম মনে থাকিয়া যায়। এরূপ স্থলেও যে সকল ছাত্র ভূগোল রীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পাবে না, হয় তাহাদের স্মৃতিশক্তি আদৌ াই, কিংবা সহজ বলিয়া, শিক্ষক মহাশয়েরা মুখস্থ করাইতে ত্রুটি রিয়া থাকেন।

কিন্তু বিশপঁচিশটা নগরের নদীর পর্ব্বতের নাম মনে রাখাই ভূগোল শিক্ষার উদ্দেশ্য? যদি ভূগোল শিক্ষা দ্বারা ভূ-গোল রতল গত আমলকীবৎ বোধ না হয়, যদি প্রত্যেক দেশ প্রত্যেক গর নদী পর্ব্বতের নামের সঙ্গে সঙ্গে তাহা বাড়ীর পাশের জায়গার ত বোধ না হয়, যদি তাহার অবস্থার সহিত, অতীত ও বর্ত্তমান তিহাসের সহিত নিজেকে জড়িত মনে করিতে না পারা যায়, তাহা দলোকে থাকিলে আমার মনে যে ভাব হইত, ভূলোকে াকিলেও সেই ভাবের উদয় হয়, তাহা হইলে ভূগোল শিখা না

শিখা সমান কথা। যদি কোন দিন বাণিজ্য করিতে ফিলিপাই দ্বীপে যাইতে হয়, যদি সখ করিয়া আমেরিকা বেড়াইতে যাইতে চা যদি কারুকর্ম্ম শিখিবার নিমিত্ত জাপানে যাইবার প্রয়োজন হ তাহা হইলে সেই সময় ফিলিপাইন্ যাইবার পথ, আমেরিকার দ্রষ্টব স্থানের নাম, জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় অনায়াসে করি পারিব। এখন এই পঠদ্দশায়, এই বালক জীবনের কিয়দংশ কে বৃথা ক্ষয় করি? অষ্ট্রেলিয়ার সহিত যদি আমার কোন সম্পা নাই, কিংবা ভবিষ্যতে কোন সম্পর্ক ঘটিবার সম্ভাবনা না থা তাহা হইলে কেন এখন সে দেশের চতুঃপার্শ্বের সমুদ্রের নাম তাহার প্রধান নগর নদী পাহাড়, তথাকার মনুষ্যের ধর্ম্মক জানিবার নিমিত্ত সাতবৎসরের প্রতি সপ্তাহের অন্ততঃ দুইবণ্ট করিয়া কাটাইতে থাকি? পৃথিবী গোলাকার হউক, চেপ্ট জানিলেই কাজ চলে, তবে আর তার গোলত্বের প্রমাণের জন মাথা ঘামাই কেন? বাস্তবিক আমি বুঝি না, ভূগোল পা করাইবার নিমিত্ত বালকগণকে এত পীড়া দেওয়ার প্রয়োজন কি জগতের কত অসংখ্য বিষয়ই ত জানি না, ক'টা বিষয়ের জ্ঞা আমার আছে, অথচ দিনের পর দিন এক রকমে চলিয়া যাইতেছে, এরূপ স্থলে মরু হ্রদের অস্তিত্ব জানিয়া অধিক ফল কি?

যে সকল শিক্ষক মহাশয়কে এই সকল প্রশ্ন করিতেছি, আমি বুঝিতেছি তাঁহাদিগের কেহ কেহ ঘাড় নাড়িয়া আমার স্থূলবুদ্ধিত দেখিয়া দুঃখিত হইতেছেন। কিন্তু বলিতে কি, যে ভাবে ভূগোলে যে যে বিষয় শিখান হইয়া থাকে, তাহার গূঢ় উদ্দেশ্য বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তরণ ব্যতীত অন্য কিছুই মনে আসে না পরীক্ষায় উত্তরণের অর্থ, কতকগুলি নাম আবৃত্তি করিতে পারা।

শিক্ষক মহাশয় হাতে পাঠ্যপুস্তক লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ংলণ্ডের চল্লিশটি কাউণ্টির নাম কর"।

ছাত্র নামগুলি আবৃত্তি করিতে লাগিল। অপর ছাত্র নামগুলি হির মত ঠিক পরে পরে বলিতে পারিল না। শিক্ষকের বেত্র-ঞ্চালনে বা তর্জ্জনে ছাত্রের চক্ষুঃস্থির। ভাবিল কি কুক্ষণেই—াহার পিতা মাতা তাহাকে স্কুলে পাঠাইয়াছেন, কি স্বর্গলাভের াশায় তাহাকে ইংলণ্ডের চল্লিশটি কাউণ্টির নাম ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ধ্যে নিবিষ্ট করিতে হইতেছে? কোন কূল কিনারা না দেখিয়া াক্ষক হাল ছাড়িয়া দিলেন, ছাত্র সম্প্রতি বাঁচিল। বাঁচিল বটে, ন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ ঘটিল না। পিতার আজ্ঞা আর এক ৎসর পড়, শিক্ষকের উপদেশ বইখানা মুখস্থ কর।

বাস্তবিক ভূগোলজ্ঞান বলিলে কি তদুপরিস্থ নদ নদী গ্রাম গরাদির নাম বুঝায়? কলিকাতা সহর বলিলে কি কলেজষ্ট্রীট কর্ণওয়ালীসষ্ট্রীট বুঝায়? গঙ্গা বলিলে কি কেবল একটা জল-াত মনে আসে? হিমালয় বলিলে কি প্রস্তরের একটা উচ্চ প মনে হয়? যদি না হয়, তবে বালকগণের নিকট তাহার তিরিক্ত জ্ঞান আশা না করি কেন? সে দিন কোন বালক স্থ করিতেছিল, 'কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী,' আমি জ্ঞাসা করিলাম, 'বাপু রাজধানী কি'?—রাজার বাস। 'কোন্ জার বাস'?—ভারতবর্ষের রাজার। 'ভারতবর্ষের রাজা কে'?— ে রাজা। (এই বালক কোন স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে, স্কুল দ্ধিও নয়)।

এক উচ্চ শ্রেণীর বালককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'দেখ, এবার ড়িষ্যায় প্রচুর বৃষ্টি হইল না, পরে অন্নকষ্ট হইবে। কোন্ দেশ

হইতে ধান আসিলে লোকের খাবার কষ্ট কমিতে পারিবে'? বালক কথাটা শুনিয়া বুঝিতেই পারিল না। শেষে বলিল, এম কথা তাদের বইতে নাই, পড়ান হয় না।

হায়, তোতা, তোমার দোষ কি? আমরাই ত তোমা তোতা করিতেছি। জন্মে মানুষগণ ছিলে, শিক্ষায় তোতাঃ করিতেছি। বলিতেছি, 'বল, বঙ্গদেশে খুব ধান হয়'; তো বলিল, বঙ্গদেশে খুব ধান হয়। 'বল, ইংলণ্ডের একটা নদীর ন টেম্‌স্'—ইংলণ্ডের একটা নদীর নাম টেমস্। ইত্যাদি—

এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কে জানেন? শিক্ষিত পিতা জানেন না কি? না, শিক্ষক জানেন ন না, বিশ্ববিদ্যালয় জানেন না?

তবে প্রতিকার হয় না কেন?

ইহার এক কারণ, উষ্ণ ও আর্দ্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়েরও আল আছে। কি রকম জ্ঞান চাই, তাহা পাঠ্য পুস্তক দেখাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হয়, স্পষ্ট কথায় হুকুম লিখিয়া দিতে আলস্য বোধ হয়।

দ্বিতীয় কারণ, উহার স্বাভাবিক ফল। কোন স্কুলের যে শিক্ষ অন্য কর্ম্মে অপারগ, অর্থাৎ ইংরাজি পড়াইতে বা গণিত শিখাইতে তত পারগ নহেন, তিনি ভূগোল পাঠনা 'গ্রহণ' করিয়া থাকেন।

তৃতীয় কারণ, অধিকাংশ শিক্ষক ভূগোল পাঠনার উপযু নহেন। তাঁহাদিগের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন আমার অভিপ্রা নহে। কিন্তু একথা বলিতে দোষ নাই যে, কোন ব্যক্তির যাবতী কর্ম্মের যোগ্য হওয়া কঠিন। অনেক পড়া, অনেক শুনা, অনে দেখা, আরও অনেক ভাবা চিন্তা না থাকিলে, কল্পনার স্রোত মা বহিতে না পারিলে ভূগোল শিখান যাইতে পারে না। কেবল ক

পড়ানর তুল্য সহজ কাজ আর নাই। এশিয়ার দেশগুলির নাম কি, তাহা বই দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতে কে না পারেন? বস্তুতঃ কোন কোন স্কুলে এইরূপ জিজ্ঞাসাতেই ভূগোল পাঠনার পরিসমাপ্তি। মানচিত্র দেখাইলেও চলে, না দেখাইলেও চলে। মানচিত্র আনিলে বড় গোলমাল হয়, পরীক্ষার সময় ত মানচিত্র আনিবে না!

পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন বিষয়েও দেখিতে পাই, কোন স্কুলের নিম্ন-শ্রেণীতে ক্লার্কের জিওগ্রাফিকাল রিডার পড়ান হইত, বালকেরা মনে রাখিতে পারে না বলিয়া উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং তৎপরিবর্ত্তে কতকগুলি নামের একটি তালিকা—অর্থাৎ ভৌগোলিক নামের একখানি ক্ষুদ্র তালিকা বালকগণকে কণ্ঠস্থ করিতে দেওয়া হইয়াছে। যিনি সেই তালিকার লেখক, তিনি নিজের নাম না দিয়া, বোধ হয় দম্ভের সহিত লিখিয়াছেন, "অভিজ্ঞ শিক্ষকের" রচিত। কিন্তু অভিজ্ঞতার এই লক্ষণ দেখিতে পাইলাম, তিনি তালিকা তৈয়ারি করিতে পারেন। সম্ভবতঃ তিনি সেই তালিকা শিক্ষক-দিগের নিমিত্ত করিয়াছেন, বালকেরা ভুল করিয়া সেই তালিকা মুখস্থ করিয়া থাকে। এই ভুলের জন্য দেখিতেছি প্রায় আধ্ লক্ষ তালিকা মুদ্রিত এবং বিক্রীত হইয়াছে। ভুলই বলিতে হইবে, নতুবা বৃদ্ধের পাঠ্য পুস্তকের নাম শিশুর পাঠ্য বলিয়া লেখা থাকিত না। ভূমিকা পাঠে জানিতেছি, উহা গ্রন্থকারের বৃহত্তর গ্রন্থের সহজ সংক্ষেপ। বড় পুস্তক সংক্ষেপ করিলে যাহা হয়, ঐ তালিকা খানি তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

তালিকাখানি শিশুর জন্য লিখিত। তাই এণ্ট্রান্স স্কুলের ৭ম শ্রেণীর পাঠ্য বলিয়া অনেক শিক্ষক পড়াইয়া থাকেন। মনে রাখিতে হইবে, ৭ম শ্রেণীর বালকদিগের বয়স ৬।৭ বৎসর মাত্র। বাঙ্গালা

অর্থ বলিয়া দিয়া শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদিগকে মুখস্থ করিতে আদেশ করেন। যথা, The Earth seems to turn upon an imaginary line, passing through its centre, which is called its Axis. (২য় পৃঃ)। A Seaport or Port is a town near a harbour where ships receive and discharge their cargoes, as Bombay. (৪র্থ পৃঃ)। ইত্যাদি

এই প্রকার তালিকাপুস্তক বহু শিক্ষক মনোনীত করেন। কারণ, এই সকল তালিকা মুখস্থ করাইতে কোন বালাই থাকে না। বাস্তবিক, ভূগোল জ্ঞান জন্মাইতে গেলে অনেক বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। দেশ ভ্রমণের অভ্যাস থাকিলে ভালই হয়। তদভাবে প্রধান প্রধান পর্ব্বত নদী নগর প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ জানা থাকা চাই, গল্প বলিবার ক্ষমতা, সমুদয় বিজ্ঞানের, ভিন্ন ভিন্ন মানবসমাজের ধর্ম্মকর্ম্ম আচারব্যবহার প্রভৃতি অনেক বিষয় জানা আবশ্যক। যে হেতু পৃথিবীর বিবরণ জানিতে গেলে ঐ সমুদায় জানিতে হয়। প্রত্যেক বিজ্ঞানের স্থূলজ্ঞান থাকিলেই চলে, কিন্তু চিত্রাঙ্কনের ক্ষমতা না থাকিলে আদৌ চলে না। যাবতীয় বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য আমাদের মঙ্গল সাধন, এবং সেই বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্য সমূহ পৃথিবীকে লইয়া প্রতিষ্ঠিত। কাজেই ভূগোলের জ্ঞান জন্মাইতে গেলে বিজ্ঞানের অন্ততঃ স্থূল স্থূল বিষয় জ্ঞাত থাকা আবশ্যক। চিত্রাঙ্কনের অভ্যাস না থাকিলে দেশ বিদেশের আকার, নদী পর্ব্বতের অবস্থান, দেশের উচ্চনীচভূমি প্রভৃতি, দেখাইতে পারা যায় না। আমরা চক্ষু দ্বারা যত বিষয় যত সহজে জানিতে পারি, কানের দ্বারা তাহার অত্যল্পই পারি। ভূগোল পাঠনাকে কেবল সাঙ্কেতিক করিয়া ফেলিলে শিশুদিগের

মনে তাহার ফল প্রসব হয় না। এজন্য ভূগোল শিক্ষার সময় চক্ষুর সাহায্য যতদূর লওয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ ঘরে বসিয়া দেশ ভ্রমণের ফল আনা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মাজিক লণ্ঠন বা ছায়াযন্ত্র অল্পমূল্যে পাওয়া যায়। তাহার সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের, বড় বড় জন্তুর গাছের বনের, নগরের হ্রদের পর্ব্বতের দৃশ্য দেখাইলে বালকেরা যেমন আনন্দ অনুভব করে, তেমনই ভূগোলে জ্ঞান জীবন্তভাব ধারণ করে।

শিক্ষা বিষয়ে কোন কোন উন্নত দেশে স্কুলের পার্শ্বের বিস্তৃত ভূমিতে পৃথিবীর দেশ মহাদেশ প্রভৃতি ক্ষুদ্রাকারে রচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বালকগণকে লইয়া শিক্ষক সেই সকল কৃত্রিম দেশে বেড়াইতে যান। যাইতে যাইতে বালকেরা পথের দ্রষ্টব্য বস্তু যেমন দেখিতে থাকে, তেমনই নদী নগর পর্ব্বতাদির নাম অবস্থান আয়তন উচ্ছ্রায় প্রভৃতি শিখিতে থাকে। কাগজের চিত্রে ভূমির অসমতা, নিম্ন প্রান্তর, উচ্চ পর্ব্বত দেখাইবার সুবিধা নাই। এই অসুবিধা দূর করিবার অভিপ্রায়ে উচ্ছ্রায় চিত্রের (relief maps) উৎপত্তি হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাদের স্বল্পাকার বশতঃ প্রকৃত বিষয়ের যথাযথ জ্ঞান সহজে বালকগণের মনে জন্মাইতে পারা যায় না। এরূপে ভূগোল শিখান বহুব্যয় সাপেক্ষ, এবং আমাদের দেশের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু বহুবিধ মানচিত্র, গোলক, ছায়াযন্ত্র ও চিত্র রাখা ও তাহাদের যথোচিত ব্যবহার করা অনায়াসে চলে। যাঁহারা অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন ভূগোল পাঠনার সময় বালকেরা কত অধীর হইয়া উঠে, বড় বড় বালকেরা হাই তুলিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়াবসানের প্রতীক্ষা করে। কিন্তু গল্প শুনিতে, কৌতূহল প্রকাশে ছোট ছোট ছেলেদের স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে।

সেই ইচ্ছাকে নিয়মিত করিয়া যে কোন বিষয়ের এমন জ্ঞান দিতে পারা যায়, যাহা কোন তালিকা শতবার আবৃত্তি করাইলেও পারা যায় না।

এই সঙ্গে বঙ্গীয় গভর্মেন্টের প্রস্তাবিত নূতন শিক্ষাপদ্ধতি স্মরণ করা আবশ্যক। দুঃখের বিষয় দেশের অবস্থা জানিয়াও গভর্মেন্ট ভূগোল ও ইতিহাস পাঠনা সম্বন্ধে বিস্তৃত মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। প্রাকৃত ভূগোলকে পদার্থ পরিচয়ের (object lessons) অঙ্গ করিয়া সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রাকৃত ভূগোল ব্যতীত যে ভূগোল পুস্তক হইতে শিখাইতে হইবে তদ্‌বিষয়ে গভর্মেন্ট মূল সূত্র বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান জন্মাইতে হইবে বলিলে যদি তদনুরূপ কাজ হইতে পারিত, তাহা হইলে বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক হইত না। আরও আশ্চর্য্য, যে সকল সভাসমিতি, দৈনিক ও মাসিক পত্র সাহিত্যের ভাবী লোপ আশঙ্কা করিয়া ঘোর রোলে দিক্‌ কম্পিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা এ বিষয় আদৌ লক্ষ্য করেন নাই। বোধ হয়, ভাবিয়াছিলেন, এক খানা ভূগোল থাকিলেই হইল। শিক্ষকদিগের নিমিত্ত উপদেশ-পুস্তকে গভর্মেন্টের অভিপ্রায় বিশদ হইতে পারে, কিন্তু গ্রামের বা নগরের বা জেলার মানচিত্র পাইবার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। নতুবা এক্ষণে যেরূপে ভূগোল পাঠনা হইতেছে, তাহার অধিক কিছু হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

যে কোন বিদ্যা শিখান হউক, তদ্দ্বারা দুইটি ফল হইয়া থাকে। (১) সেই বিদ্যাসংসৃষ্ট বৃত্তান্ত জ্ঞান, এবং (২) সেই বিদ্যা শিখিতে গিয়া একটা মানসিক ক্ষমতা লাভ। বলা বাহুল্য যে বিদ্যা যে ভাবেই শিখান হউক না কেন, ঐ দুই ফলের কিছু না কিছু পাওয়া

যাইবেই। যাঁহারা দূরদর্শী, তাঁহারা শেষোক্ত ফল অধিক মূল্যবা মনে করেন। প্রথমটায় বৃত্তান্তের গৌরব, দ্বিতীয়টায় মূলতত্ত্বে গৌরব। একটায় ভূমিপরিমিতি শিখায়, অন্যটায় যুক্তিদের ক্ষেত্রত বুঝায়। একটায় কারু করিতে চায়, অন্যটায় রচয়িতা বা উদ্ভাব সৃষ্টি করে।

এই দুই ফলে এত প্রভেদ, অথচ অনেকে উভয়কে এক ভাবি বসেন। এই প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া নূতন শিক্ষাপদ্ধতি প্রস্তাবের সময় অনেকে ধুচুনি বোনা, পুতুল গড়া দেখিতে পাই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এই প্রকার ভ্রমে পড়িয়া অনেক শিক্ষ স্কুলের চিত্রাঙ্কন ও ড্রিলের প্রবর্ত্তনা সুনয়নে দেখিতে পারেন না ইহাঁরা যে কারুবিদ্যা (manual training) শিখাইতে ইচ্ছা করিবে না, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বস্তুতঃ, যেমনটি চলিয়া আসিতে ছিল, তেমনটির কোন প্রকার পরিবর্ত্তন দেখিলেই আমাদের দেশে বহুব্যক্তি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়েন। তাই আশঙ্কা হইতেছে, নূতন পদ্ধতি প্রচলিত হইলেও ভূগোল পাঠনা বিষয়ে বিশেষ উন্ন হইবে না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

নূতন বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

কিছু কাল গত হইল আমাদের দেশের নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ আকৃষ্ট হইয়াছে। উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত বি, এ, এম্, এ, উপাধিধারীরা আর এখন পূর্ব্বের ন্যায় বঙ্গভাষার প্রতি বীতরাগ নহেন। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ প্রবন্ধ-লেখকের নামের শেষে ও মুদ্রিত পুস্তকের 'টাইটেল পেজে' বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতকার্য্যতার নিদর্শন দুই তিনটি অথবা ততোধিক ইংরেজী বর্ণমালা সংযোজিত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে বলেন "নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় অল্পদিনের মধ্যে আমাদের মাতৃভাষার যেরূপ উন্নতিসাধন করিয়াছেন, এত কাল ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক উন্নতি হইত, যদি সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভীষিকাময়ী ছায়া অস্বাভাবিকরূপে বঙ্গভাষার উন্নতিপথ রুদ্ধ করিয়া না দাঁড়াইত। ঐ ব্যাকরণ সূত্রগুলি যে অবাধে লেখনী চালনার কি ঘোর প্রতিবন্ধক তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব"। বোধ হয় সে সময় অনেকের মনে এরূপ চিন্তারও উদয় হইয়াছিল যে পৃথিবীতে যত প্রকার সঙ্কট উপস্থিত হউক না কেন সকলেরই প্রতিবিধান আছে, এ রোগের কি ঔষধ নাই? বঙ্গীয় লেখকসম্প্রদায়ে এমন কি কোন সাহসী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি এই সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভীষিকাময়ী ছায়াটাকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়া বঙ্গভাষার অধিকার হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিতে পারেন?

কিছুদিন পরেই বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের কতিপয় সভ্য লইয়া একটি শাখা সমিতি গঠিত হয়, উহার নাম ব্যাকরণসমিতি। উহার কার্য্য খাঁটী বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়ন। আশ্চর্য্যের বিষয় উক্ত

সমিতির সভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশ সভ্যেরই রীতিমত সংস্কৃত ব্যাকরণ জানা নাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণও যে ব্যাকরণ, উহাতেও যে সংস্কৃত ব্যাকরণবিদের উপযোগিতা আছে, বোধ হয় ব্যাকরণসমিতি উহা বিশ্বাস করেন না*। এত দিন ব্যাকরণ রচনার কল্পনাই চলিতেছিল, সংপ্রতি উহার সূত্রপাত হইয়াছে। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ১ম সংখ্যা সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কিছুকাল পরে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া আমার মনে যাহা উদিত হইয়াছে, আমি এ স্থলে উহা ব্যক্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছি।

রবীন্দ্র বাবু তাঁহার প্রবন্ধের প্রারম্ভে অতি বিনীত ভাবে লিখিয়াছেন 'আমি বৈয়াকরণ নহি। অতএব শ্রমের দ্বারা যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, পণ্ডিতগণের বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা তাহা সংশোধিত হইবে আশা করিয়াই সাহিত্যপরিষদে বাঙ্গালাভাষাতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধে[র] অবতারণা করিলাম"।

তাঁহার এই কথা দ্বারা বোধ হইতেছে তিনি সমালোচনা[র] একান্ত বিরোধী নহেন। তাঁহার ঐ বাক্যে নির্ভর করিয়াই আ[মি] উহার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্যের বহি[র্ভূত]

* যে সভায় রবীন্দ্র বাবুর "কৃৎ ও তদ্ধিত" শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিত হয়, সেই সভা[য়] প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন "আমাকে ব্যাক[রণ] সমিতির সভ্য করা হয়। ভাবিলাম আমি বৈয়াকরণ নহি আমাকে সভ্য ক[রা] হইল কেন? শেষে ব্যাকরণ সমিতির সভ্যগণের তালিকা পাঠ করিয়া ভ্রম দূ[র] হইল, দেখিলাম যাঁহারা ব্যাকরণ জানেন না তাঁহারাই ব্যাকরণ সমিতির সভ্য।"

ভূত। তবে যে ঐ প্রবন্ধ সংক্রান্ত দুই একটি কথা লিখিতেছি, উহার কারণ রবীন্দ্র বাবু তাঁহার প্রবন্ধের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন "সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা বাঙ্গালা ব্যাকরণে প্রয়োগ করা কিরূপ বিপজ্জনক তাহা মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় ইতিপূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন"। এই কথা দ্বারা বোধ হইতেছে রবীন্দ্র বাবু শাস্ত্রী মহাশয়ের মতদ্বারা পরিচালিত। একটা গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। আমার বিশ্বাস, ইহাতে সমস্ত সাহিত্যসেবীরই কিছু না কিছু বলিবার অধিকার আছে, তজ্জন্যই আমি সাহস করিয়া দুই এক কথা লিখিতেছি। যদি আমার বক্তব্যে কোন ত্রুটি লক্ষিত হয় আশা করি মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় ও কবিবর তজ্জন্য অপ্রসন্ন হইবেন না।

শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রচলিত বাঙ্গালা ব্যাকরণকারদের ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি স্থানে কটাক্ষ করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে ঐরূপ কটাক্ষ করা একান্ত অসঙ্গত নহে, কারণ পুরাতনের দোষ প্রদর্শন না করিতে পারিলে নূতনের আবশ্যকতা সপ্রমাণ করা যায় না। কিন্তু তিনি যে সকল ত্রুটির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন উহা পাঠ করিয়া আমার মনে হইল এ সকল ত্রুটি ত অধিকাংশ বাঙ্গালা ব্যাকরণে নাই, তবে শাস্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করিলেন কেন? তাহার পর বিদ্যালয়ের পাঠ্য একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ খুলিয়া দেখিলাম আমার যাহা স্মরণ ছিল বাঙ্গালা ব্যাকরণেও অবিকল তাহাই আছে। বিষয় কয়টি নিম্নে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

১। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"বাঙ্গালা ব্যাকরণকারেরা বলিলেন অব্যয়ের উত্তর বিভক্তি হয় না। সুবুদ্ধি বালক জিজ্ঞাসা করে রাম রাবণকে মারিলেন, কেশব আম খাইলেন, এ স্থলে রাম, কেশব ও আম কেন অব্যয় শব্দ হইবে না? তাহা হইলেই ব্যাকরণকারেরা অবাক্"।

বাঙ্গালা ব্যাকরণে যেরূপ সূত্র লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ব্যাকরণকারদের অবাক্ হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। কারণ বাঙ্গালা ব্যাকরণের সূত্রগুলি ব্যাকরণকারদের নিজস্ব নহে, উহা সংস্কৃত লক্ষণের বঙ্গানুবাদ মাত্র। সংস্কৃতে যে সকল লক্ষণ করা হইয়াছে উহা হইতে কদাচিৎ দোষ উদ্ভাবন করা যায়। নিম্নে বাঙ্গালা ব্যাকরণের সূত্র দেখুন।

"যে সকল শব্দ সকল লিঙ্গ বচন ও বিভক্তিতে একরূপ তাহাদের নাম অব্যয়"।*

(বাঙ্গালা ব্যাকরণ)

এই লক্ষণ স্বীকার করিলে রাম কেশব আম অব্যয় হয় না। কারণ রাম, কেশব, আম এই তিনটি শব্দ সকল বিভক্তিতে সমান নহে। রাম, রামেরা, রামকে, রামদিগকে। কেশব, কেশবেরা, কেশবকে, কেশবদিগকে। আমের গাছ। আমে পোকা ইত্যাদি। অতএব উদ্ধৃত তিনটি শব্দে অব্যয়ের লক্ষণ না যাওয়ায় এখানে বাঙ্গালা ব্যাকরণকারদের কোনরূপ ত্রুটী হয় নাই।

২। শাস্ত্রী মহাশয় আর একস্থলে লিখিয়াছেন—

"অনেক প্রাকৃত ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক নাই কিন্তু মুগ্ধবোধ প্যাটেণ্টই হউক আর হাইলি প্যাটেণ্টই হউক উভয় প্রকার ব্যাকরণেই সম্প্রদান কারকের অস্তিত্ব বজায় রাখা হইয়াছে। দুই একখানি ব্যাকরণে "ধোপাকে কাপড় দিলাম" সম্প্রদান কারকের উদাহরণ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। "রজকস্য বস্ত্রং দদাতি" যে সম্প্রদান হয় না, আর তা লইয়া যে সংস্কৃত ব্যাকরণকারেরা অনেক মাথা কুটা কুটি করিয়া গিয়াছেন তাহা শোনেই বা কে আর পড়েই বা কে"।

এখানকার লেখার ভঙ্গীতে বোধ হয় শাস্ত্রী মহাশয় ব্যাকরণ

---

* সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্ব্বাসু চ বিভক্তিষু।
বচনেষু চ সর্ব্বেষু যন্নব্যেতি তদব্যয়ম্॥
(দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশকৃত মুগ্ধবোধ টীকা)

প্রণয়ন বিষয়ে সংস্কৃত কিংবা ইংরেজী কোনরূপ ব্যাকরণেরই রীতির অনুসরণ করিতে সম্মত নহেন। কোনও একটি ভাষার ব্যাকরণের রীতির অনুসরণ না করিলে ব্যাকরণ প্রণয়ন সম্ভবপর কি না আমরা এখানে সে কথা লইয়া বাক্যব্যয় করিতে অনিচ্ছুক। কেননা যাঁহারা গ্রন্থ লিখিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বয়ং এ বিষয় চিন্তা করিবেন। আর কোন প্রাকৃত ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক নাই বলিয়া যে বাঙ্গালা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক লিপিবদ্ধ করিলে কোন গুরুতর অপরাধ হয় তাহা বোধ হয় না। শিশুদের পক্ষে পাঁচটি কারক অভ্যাস করায়ও যে আয়াস আবশ্যক, ছয়টি কারকের অভ্যাসেও যে তদপেক্ষা অত্যন্ত অধিক আয়াস আবশ্যক তাহা নহে। বিশেষ বাঙ্গালা পাঠকালে পাঁচটি কারক অভ্যাস করিয়াই দুই বৎসর পরে সংস্কৃতে ছয়টি কারক অভ্যাস করিতে গিয়া তাহাদের মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। আর বাঙ্গালায় ছয়টি কারক ও তাহার লক্ষণ মুখস্থ থাকিলে সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক পাঠ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইতে পারে। অতএব বাঙ্গালায় সম্প্রদান কারক থাকা তেমন দোষের নহে। বাঙ্গালা-ব্যাকরণ খুলিয়া দেখিলাম "ধোপাকে কাপড় দিলাম" সম্প্রদান কারক লেখাত দূরের কথা, ঐ বাক্যটী ছাত্রেরা যাহাতে সম্প্রদান কারকের উদাহরণ বলিয়া না বুঝে তজ্জন্য একটি পৃথক্ সূত্র করা হইয়াছে। এ বিষয়ে বাঙ্গালা ব্যাকরণকারদের কোনই ক্রটী লক্ষিত হয় না। তাঁহারা টীকার কথাটি পর্য্যন্ত মূলে সন্নিবেশিত করিতে বিস্মৃত হন নাই আমরা নিম্নে বাঙ্গালা ব্যাকরণের সূত্র উদ্ধৃত করিলাম।

"যাহাকে কোন বস্তু দানকরা যায় তাহাকে সম্প্রদান কহে"।*

* কর্ম্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্। ১।৪।৩২। (পাণিনিঃ)

"সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয় *। যথা,—দরিদ্রকে ধন দাও"।

"স্বত্বত্যাগ না করিলে, সম্প্রদান কারক হয় না †। যথা,—রজককে বস্ত্র দাও, এ স্থলে স্বত্ব ত্যাগ না হওয়ায় সম্প্রদান হইল না"। (বাঙ্গালা ব্যাকরণ)

এই সকল সূত্র দেখিলেই বোধ হয় শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালা ব্যাকরণকারদের যে সকল ক্রটীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন উহা সকল বাঙ্গালা ব্যাকরণে নাই।

তিনি আর এক স্থলে লিখিয়াছেন—

"বাঙ্গালা ব্যাকরণ খুলিলেই চতুর্থ বা পঞ্চম পত্রেই সন্ধি আরম্ভ—অকারের পর অকার কিংবা আকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়—আকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। সুবুদ্ধি বালক যদি জিজ্ঞাসা করে 'রাম আইস' এস্থলে রামাইস কেন হইবে না, 'তখন অবিনাশ বলিল' তখনাবিনাশ বলিল কেন হইবে না, পণ্ডিত মহাশয় নিরুত্তর"।

এখানে আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের নিরুত্তর হইবার কোনই কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। বাঙ্গালা ব্যাকরণে যে সকল সূত্র আছে উহা পাঠ করিলে সুবুদ্ধি বালকের মনে ওরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইতেই পারে না। নিম্নে বাঙ্গালা ব্যাকরণের সন্ধি সূত্র উদ্ধৃত হইল।

"প্রয়োগ কর্ত্তার ইচ্ছানুসারে সন্ধি হয়। যেখানে সন্ধি করিলে শ্রুতিকটু হয় সেখানে সন্ধি করিবার আবশ্যকতা নাই"।

"সংস্কৃত শব্দের সহিত বাঙ্গালা শব্দের সন্ধি প্রচলিত নাই। যথা,—গরু+আনয়ন=গর্ব্বানয়ন"। (এরূপ স্থলে সন্ধি হয় না)

বাক্যের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন পদে সন্ধি হয় না। যথা,—আমি+আসিতেছি= আম্যাসিতেছি এরূপ হইবে না"।

* চতুর্থী সম্প্রদানে।২।৩।১৩। (পাণিনিঃ)

† দানং চা পুনর্গ্রহণায় স্বস্বত্ব নিবৃত্তি পূর্ব্বকং পরস্বত্বোৎপাদনম্।
অতএব রজকস্য বস্ত্রং দদাতীত্যাদৌ ন ভবতি।
(জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী কৃত পাণিনীয়তত্ত্ববোধিনী টীকা)

এই সকল সূত্র পাঠ করিয়া সুবুদ্ধি বালক দূরে থাকুক, স্থূলবুদ্ধি বালকও 'রাম+আইস রামাইস' কেন হইবে না ইত্যাদিরূপ প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হয় না। শাস্ত্রী মহাশয় প্রধানতঃ এই কয়টি ত্রুটীই প্রদর্শন করিয়াছেন। উহা যে প্রকৃত ত্রুটী নহে আমরা বাঙ্গালা ব্যাকরণের সূত্রের দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন করিলাম। তিনি ইংরেজী ব্যাকরণের কারকের সহিত সংস্কৃত ব্যাকরণের কারকের সৌসাদৃশ্য দেখাইতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন পত্রান্তরে অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাহার সমালোচনা হইয়াছে।

যে দিন বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে রবীন্দ্র বাবুর "বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত" শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিত হয়, সেদিন একজন সভ্য মন্তব্য প্রকাশ কালে বলেন "বাঙ্গালা ভাষায় খাঁটী ব্যাকরণ নাই, মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রথমে খাঁটী বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া সে অভাব দূর করিতেছেন, অতএব ইহারা দুইজন বাঙ্গালা ভাষার পাণিনি"।

এই কথার অনুমোদন করিবার পূর্ব্বে পাঠক সাধারণকে জানান আবশ্যক যে মহর্ষি পাণিনি স্বপ্রণীত সূত্র মধ্যে মহর্ষি শাকল্য, শাকটায়ন, গার্গ্য, কাশ্যপ, গালব, চক্রবর্ম্মন্, আপিশলি, স্ফোটায়ন, ভরদ্বাজ, প্রভৃতি* প্রাচীন উপজীব্য বৈয়াকরণগণের মতের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় ও কবিবর কোনও ভাষার কোনও বৈয়াকরণের মতের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং সম্পূর্ণ

---

* সর্ব্বত্র শাকল্যস্য।৮।৪।৫১। ব্যোর্লঘুপ্রযত্নতরঃ শাকটায়নস্য।৮।৩।১৮। ওতো গার্গস্য।৮।৩।২০। তৃষিমৃষিকৃশেঃ কাশ্যপস্য।১।২।২৪। অড্ গার্গ্যগালবয়োঃ।৭।৩।৯৮। ঈচাক্রবর্ম্মণস্য।৬।১।১৩০। বা সুপ্যাপিশলেঃ।৬।১।১২। অবঙ্ স্ফোটায়নস্য।৬।১।১২৩ ঋতোভারদ্বাজস্য।৭।২।৬৩।

ভিনব ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, 'মুগ্ধবোধ প্যাটেণ্ট' থবা 'হাইলি প্যাটেণ্ট' উভয়েরই ইহাঁরা বিরোধী। ইহা কার্য্যোপ-যাগী হইলে বৈয়াকরণ সমাজে ইহাঁদের প্রতিষ্ঠা পাণিনি অপেক্ষাও চ্চে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রথমেই লিখিয়াছেন ;—

"প্রবন্ধ আরম্ভে বলা আবশ্যক, যে সকল বাংলা শব্দ লইয়া আলোচনা করিব, হার বানান কলিকাতার উচ্চারণ অনুসারে লিখিত হইবে। বর্ত্তমানকালে লিকাতা ছাড়া বাংলা দেশের অপরাপর বিভাগের উচ্চারণকে প্রাদেশিক বলিয়া ণ্য করাই সঙ্গত"।

আমরা এই কথাটির সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারিলাম না। শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছি, নবদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত স্থানের প্রচলিত ভাষাই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা। কলিকাতা রাজধানী হইলেও এখানে কোন নির্দ্দিষ্ট ভাষা নাই। নানা প্রদেশের লোক এখানে বাস করেন, সুতরাং আমরা দেখিতে পাই প্রায় প্রত্যেক পরিবারের ভাষায়ই কোন না কোনরূপ প্রাদেশিকতা সংমিশ্রিত আছে। অতএব কলিকাতার ভাষা যে প্রাদেশিকতাবর্জ্জিত ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।

তাহার পর রবীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—

"নূতন পরিভাষা নির্ম্মাণের ক্ষমতা নাই, অথচ না করিলেও লেখা অসম্ভব।"

এই স্থলে তিনি কি অর্থে পরিভাষা শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন? উহার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি আরও দুইবার পরিভাষা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যেরূপ স্থানে এই শব্দটি লিখিত হইয়াছে তাহাতে সূত্র ভিন্ন অন্য অর্থ কোনক্রমেই বুঝায় না। কিন্তু সূত্র ও পরিভাষা একার্থক নহে। এই দুইটি শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। সূত্রত

করে অর্থাৎ অর্থকে গ্রথিত করে * যে তাহার নাম সূত্র। ব্যাকরণ-শাস্ত্রসম্মত সূত্র শব্দের অর্থ লিখিত হইতেছে। সূত্রবিদ্‌গণ অল্পাক্ষর বিশিষ্ট, অসন্দিগ্ধ, সারবান্‌, সার্থক, নির্দ্দোষ এবং সর্ব্বতোগামী বাক্যকে সূত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন †।

সূত্র ছয় প্রকার যথা ;—সংজ্ঞা, পরিভাষা, বিধি, নিয়ম, অতিদেশ ও অধিকার।

১। সংজ্ঞা। শাস্ত্রে ব্যবহার করিবার জন্য যে সঙ্কেত করা যায় তাহার নাম সংজ্ঞা।

২। পরিভাষা। গ্রন্থের সংক্ষেপ নির্ব্বাহার্থ সঙ্কেতবিষয়কে পরিভাষা বলে।

৩। বিধি। যাহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না তাহার যে প্রাপক উহাকে বিধি বলে। বিধি দুই প্রকার। বর্ণের উৎপাদনরূপ ও অভাবরূপ।

৪। নিয়ম। যাহার সামান্যতঃ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তাহার বিশেষ অবধারণ করাকে নিয়ম বলে।

* সূত্রয়তি (অর্থং গ্রথ্নাতি) ইতি সূত্রম্। সূত্রংক গ্রন্থে পচাদিত্বাদন্। (দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশকৃত মুগ্ধবোধ টীকা)

† তথাচ অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥
তচ্চ ষড়্‌বিধম্ সংজ্ঞাচ পরিভাষাচ বিধির্নিয়ম এবচ।
অতিদেশোঽধিকারশ্চ ষড়্‌বিধং সূত্র লক্ষণম্॥

ব্যবহারার্থং শাস্ত্রে কৃতঃ সঙ্কেতঃ সংজ্ঞা। গ্রন্থস্য সংক্ষেপনির্ব্বাহার্থং সঙ্কেত বিশেষঃ পরিভাষা। অপ্রাপ্ত প্রাপকো বিধিঃ। স চ দ্বিবিধঃ—বর্ণোৎপাদনরূপোঽভাবরূপশ্চ। অভাবোঽপি দ্বিবিধঃ—নাশোনিষেধশ্চ। সামান্য প্রাপ্তস্য বিশেষাবধারণং নিয়মঃ। অন্যধর্ম্মস্য অন্যত্রারোপণমতিদেশঃ। পূর্ব্বপদস্য পরসূত্রেষূপস্থিতিরধিকারঃ।

(দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ কৃত মুগ্ধবোধ টীকা)

৫। অতিদেশ। একের ধর্ম্ম অন্যে আরোপ করাকে অতিদেশ কহে।

৬। অধিকার। পূর্ব্বসূত্রস্থ পদের পরসূত্রে উপস্থিতির নাম অধিকার। অধিকার তিন প্রকার যথা, সিংহাবলোকিতের ন্যায়, মণ্ডুকপ্লুতির ন্যায় ও গঙ্গাস্রোতের ন্যায়।

সূত্রের লক্ষণ সংক্ষেপে বিবৃত হইল। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল, পরিভাষা সূত্র নহে, সূত্রের অন্তর্গত একটি অংশ মাত্র। অতএব এখানে কবিবর যদি পরিভাষা শব্দ প্রয়োগ না করিয়া সূত্র শব্দের ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলেই ঠিক হইত।

তাহার পর তিনি লিখিয়াছেন—

"সংস্কৃত ব্যাকরণে যাহাকে ণিজন্ত ধাতু বলে, বাংলায় তাহাকে ণিজন্ত বলিতে গেলে অসঙ্গত হয়। কারণ সংস্কৃত ভাষায় ণিচ্ প্রত্যয় দ্বারা ণিজন্ত ধাতু সিদ্ধ হয়; বাংলায় ণিচ্ প্রত্যয়ের কোন অর্থ নাই। অতএব অন্য ভাষার আকারগত পরিভাষা অবলম্বন না করিয়া প্রকারগত পরিভাষা রচনা করিতে হয়"।

বাঙ্গালায় ণিচ্ প্রত্যয়ের কোন অর্থ নাই কেন? সংস্কৃত ভাষায় যেমন 'শ্রু' ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া 'শ্রাবি' ণিজন্ত ধাতু নিষ্পন্ন হইয়াছে, উহার উত্তর বর্ত্তমান কালে প্রথম পুরুষের একবচনে লটের 'তিপ্' বিভক্তি করিয়া 'শ্রাবয়তি' পদ সিদ্ধ হয়।—

বাঙ্গালায়ও ঐরূপ শ্রু এই সংস্কৃত ধাতুর অপভ্রংশ 'শুন' ধাতুর উত্তর ণিচ্ করিয়া 'শুনাই' এইরূপ বাঙ্গালা ণিজন্ত ধাতু নিষ্পন্ন হয়। উহার উত্তর বর্ত্তমান কালে প্রথম পুরুষে 'তেছে' বিভক্তি করিয়া 'শুনাইতেছে' ক্রিয়াপদ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

সংস্কৃত 'শ্রাবয়তি' পদের সহিত বাঙ্গালা 'শুনাইতেছে' পদের অর্থগত যে কোনই পার্থক্য নাই উহা প্রমাণ করিবার জন্য অধিক কথা বলিবার আবশ্যক নাই।

তবে যদি রবীন্দ্র বাবুর মনের ভাব এরূপ হয় যে সংস্কৃত ণিচ্ প্রত্যয়ের মূর্দ্ধণ্য ণকার ইৎ যাওয়ার যে ফল, বাঙ্গালায় সে ফল পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব অকারণ 'ণিচ্' এইরূপ প্রত্যয় স্বীকার করিবার আবশ্যক কি? একথা সঙ্গত হইলেও ণিচ্ প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তে অবশ্য 'ই' প্রত্যয় একটি কল্পনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা সাধারণ ক্রিয়াপদের সহিত ণিজন্ত ক্রিয়াপদের কোনই পার্থক্য থাকে না।

তাহার পর তিনি ণিজন্ত ক্রিয়ার একটি অভিনব নাম কল্পনা করিয়াছেন। কবিবর বলেন ;—

"ণিজন্তের প্রকৃতি কি? তাহাতে ব্যবহিত ও অব্যবহিত দুইটি কর্ত্তা থাকে। "ফল পাড়িলাম" পতন ব্যাপারের অব্যবহিত কর্ত্তা ফল কিন্তু তাহার হেতু কর্ত্তা আমি। "কারয়তি যঃ স হেতুঃ" যে করায় সেই হেতু সেই ণিজন্ত ধাতুর প্রথম কর্ত্তা এবং যাহার উপর সেই কার্য্যের ফল হয়, সেই ণিজন্ত ধাতুর দ্বিতীয় কর্ত্তা। "হেতুর" একটি প্রতিশব্দ নিমিত্ত—তাহাই অবলম্বন করিয়া আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে ণিজন্ত ধাতুকে নৈমিত্তিক ধাতু নাম দিলাম"।

ণিজন্ত ধাতুর নৈমিত্তিক ধাতু, এরূপ নামকরণ হইতে পারে না। প্রথম প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতা দোষ। কেন না ণিজন্ত ধাতুর আপামর-প্রসিদ্ধ নামটি ত্যাগ করিয়া কোন অভিনব নামকরণ হইলে যত দিন উহা অভিধানে গৃহীত না হইবে ততদিন কেহ উহার অর্থই বুঝিতে পারিবে না। আর ব্যাকরণের ভাষায় 'হেতু' ও 'নিমিত্ত' এই দুইটি শব্দ একার্থক নহে।

"ফল সাধন করুক বা না করুক, যে ফলসাধনের যোগ্য তাহারই নাম হেতু"।*

---

* ফলং সাধয়তু অসাধয়তু বা ফলসাধনযোগ্যো যঃ স হেতুঃ। (রাম তর্কবাগীশ কৃত মুগ্ধবোধ টীকা)

যেমন "বিদ্যয়া যশঃ" এই কথা বলিলে বিদ্যা যশের হেতু রূপে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ সকল বিদ্বান্ যশস্বী হউন বা না হউন প্রত্যেক বিদ্বানেই যশের হেতু বিদ্যা বিদ্যমান আছে।

আর 'নিমিত্ত' শব্দের অর্থ প্রয়োজন। যেমন "জ্ঞানায় পঠতি" এখানে জ্ঞানই পাঠের প্রয়োজন। এমন কি হেতু ও নিমিত্ত পৃথগর্থক বলিয়া হেতুতে তৃতীয়া ও নিমিত্ত অর্থে চতুর্থী বিভক্তি বিহিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সংস্কৃত কাব্যাদিতে নৈমিত্তিক শব্দটি কার্য্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মহাকবি কালিদাস তাঁহার অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে নৈমিত্তিক শব্দটি কার্য্য অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।* অতএব রবীন্দ্র বাবুর পক্ষে ণিজন্ত ধাতুর নৈমিত্তিক ধাতু এরূপ নামকরণ ঠিক হয় নাই।

ইহার পরই রবীন্দ্র বাবু বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় বিবৃত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধে কোন্ শব্দগুলি কৃৎ প্রত্যয়ান্ত ও কোন্ শব্দগুলি তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত তাহা বলেন নাই। উভয়বিধ শব্দের মধ্যে যে অনেক পার্থক্য তাহা রবীন্দ্র বাবুর অবিদিত নহে। মহর্ষি পতঞ্জলি পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীর যে মহাভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, উহার মধ্যে তিনি স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় সূত্রসকল রচনা করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মহামুনি পাতঞ্জলি স্বপ্রণীত ভাষ্যে শব্দকে নাম বলিয়াছেন এবং ঐ নাম যে ধাতুজ অর্থাৎ ধাতু হইতে সমুৎপন্ন, উহা প্রমাণ করিবার জন্য নিরুক্তকার যাস্ক ও প্রাচীন

---

* উদেতি পূর্ব্বং কুসুমং ততঃ ফলং ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ। নিমিত্ত নৈমিত্তিকয়োরয়ং ক্রমস্তব প্রসাদস্য পুরস্তু সম্পদঃ। (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্)
(নিমিত্ত নৈমিত্তিকয়োঃ কারণকার্য্যয়োরিত্যর্থঃ)

বৈয়াকরণ শাকটায়নের মত পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন *। অতএব রবীন্দ্র বাবুও বোধ হয় তাঁহার কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি যে ধাতুজ উহা অঙ্গীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। তাঁহার অগ্রেই দেখান উচিত, কোন্ শব্দটি কোন্ বাঙ্গালা ধাতু হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। আর তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলিও পৃথক্ করিয়া প্রদর্শন করা উচিত ছিল। তিনি স্থানে স্থানে শব্দসমূহের অর্থের বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ঐ সঙ্গে বাচ্যের কথাও বলিলে ভাল হইত। কৃৎ ও তদ্ধিতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হানি করিয়া "বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত" এইরূপে নাম দেওয়া কি ঠিক হইয়াছে ?

তাহার পর তিনি লিখিয়াছেন—

সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইলেই যে তাহাকে সংস্কৃত বলিতে হইবে, একথা মানি না। সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয় বাংলায় ই প্রত্যয় হইয়াছে, সেই জন্য তাহা সংস্কৃত পূর্ব্বপুরুষের প্রথা রক্ষা করে না। দাগি (দাগযুক্ত) শব্দ কোন অবস্থাতেই দাগিন্ হয় না"।

দাগি (দাগী) শব্দটি ইন্ প্রত্যয়ান্ত বলিলে ক্ষতি কি ? সংস্কৃতে 'আছে অর্থে' শব্দের উত্তর 'ইন্' এই তদ্ধিত প্রত্যয়টা হয়। সংস্কৃত ইন প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে যে পদসিদ্ধ হয়, উহাই বাঙ্গালা বিভক্তিযুক্ত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন গুণ আছে যার এই অর্থে গুণ+ইন্, গুণিন্, বিভক্তি যোগে

* নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে।
নাম খল্বপি ধাতুজম্। এবমাহুর্নৈরুক্তাঃ।
ব্যাকরণে শাকটায়নস্য তোকম্।
বৈয়াকরণানাং শাকটায়ন আহ ধাতুজং নামেতি।
(পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্য)

। নৈকাচাদিন্বা"। অনেকাচোঽবর্গাত্তাদিম্ বা স্যাদস্ত্যর্থে। (বোপদেবঃ)

গুণী। তাহার পর গুণী, গুণীরা, গুণীকে, গুণীদিগকে। অথবা দাগী, দাগীরা, দাগীকে, দাগীদিগকে ইত্যাদি। এখানে অবশ্যই আমরা বলিতে পারি যেমন 'দাগিন্' কোন অবস্থায়ই হয় না তেমন 'গুণিন্' ও কোন অবস্থায়ই হয় না। তবে কেন অকারণ দুই একটি শব্দের জন্য অন্য একটা প্রত্যয় স্বীকার করা যায়। ই প্রত্যয় বলিলে গুণী, দাগী প্রভৃতি শব্দ গুণি দাগি এইরূপ হ্রস্ব ইকারান্ত বলিতে হয় কিন্তু কোন লেখকই ইন্ ভাগান্ত শব্দ ইকারান্ত ব্যবহার করেন না। রবীন্দ্র বাবু কি ব্যবহারের বিরুদ্ধে একটা নূতন বর্ণ-বিন্যাস করিতে চাহেন?

তাহার পর তিনি লিখিয়াছেন—

বাংলা অন্ত প্রত্যয় সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন কিন্তু তাহা শতৃ প্রত্যয়ের অনুশাসন লঙ্ঘন করিয়া একবচনে জিয়ন্ত ফুটন্ত ইত্যাদি রূপ ধারণ করিতে লেশমাত্র লজ্জিত হয় না"।

জিয়ন্ত, ফুটন্ত প্রভৃতি শব্দ যে শতৃ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন, উহা রবীন্দ্র বাবু কি প্রমাণ বলে জানিতে পারিয়াছেন? যদি ঐ সকল শব্দ শতৃ প্রত্যয়সিদ্ধ হইত, তবে কুর্ব্বন্ত গচ্ছন্ত, পশ্যন্ত প্রভৃতি শব্দও বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইতে পারিত, তাহা হয় না কেন? বস্তুতঃ জিয়ন্ত, ফুটন্ত প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ঔণাদিক 'অন্ত' প্রত্যয়ান্ত। সংস্কৃত 'জীব' ধাতু অন্ত প্রত্যয় করিয়া জীবন্ত পদ সিদ্ধ হয় * জীয়ন্ত উহার অপভ্রংশ, ফুটন্তও ঐরূপ। এই দুইটি শব্দ ব্যতীত অন্ত প্রত্যয়ান্ত আরও অনেক শব্দ ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা; বসন্ত,

* জৄ বিশিভ্যামন্তঃ।১২৬। রুহিনন্দি জীবি প্রাণিভ্যঃষিদাশিষি।১২৭। তৃভূবহিবসি ভাসি সংধি গড়িমণ্ডি জিনন্দিভ্যশ্চ।১২৮। দশভ্যোহন্তঃ স্তাৎ স চ ষিৎ। (মুগ্ধবোধ ঔণাদিক প্রক্রিয়া) ।১২৬। জৄ বিশিভ্যাং ঝচ্ ।১২৭। রুহিনন্দি জীবিপ্রাণিভ্যঃ ষিৎ আশিষি।......(সিদ্ধান্ত কৌমুদীবৃত কৃদন্ত ঔণাদিপ্রক্রিয়া)।

হেমন্ত, জয়ন্ত, জলন্ত, ভদন্ত * প্রভৃতি। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ সংশ্লিষ্ট ঔণাদিক প্রকরণে এই প্রত্যয়টি অন্ত নামে অভিহিত। কিন্তু অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বৈয়াকরণ উজ্জ্বলদত্ত তাঁহার স্বপ্রণীত উণাদি সূত্র মধ্যে ইহাকে 'ঝচ্' প্রত্যয় বলিয়াছেন।

তাহার পর রবীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—

"এই প্রবন্ধে বিশেষ্য বিশেষণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। ক্রিয়াবাচক ও পদার্থবাচক। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য যথা ; চলা, বলা, সাঁতরান, বাঁচান ইত্যাদি। পদার্থবাচক যথা হাতি, ঘোড়া, জিনিশ পত্র, ঢেঁকি কুলা ইত্যাদি। গুণবাচক প্রভৃতি বিশেষ্য বিশেষণের প্রয়োজন নাই"।

এখানে রবীন্দ্র বাবু প্রাচীন প্রথাও অবলম্বন করেন নাই নব্য-প্রথাও অনুসরণ করেন নাই। এই উভয় প্রথা পরিহার করায় তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য ও যজুর্বেদীয় কাত্যায়ন প্রাতিশাখ্যের মতে পদ চারিভাগে বিভক্ত যথা ;—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত। † এই 'নামে'র অপর আখ্যা বিশেষ্য। পাণিনি বিশেষ্যকে প্রাতিপদিক নামে আখ্যাত করিয়াছেন ‡। বোপদেব বিশেষ্যকে লিঙ্গ বলেন §। ইহাঁরা কেহই বিশেষ্যের প্রকার ভেদ স্বীকার করেন নাই। যাঁহারা সংপ্রতি ইংরেজী ব্যাকরণ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে বিশেষ্য পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা ;—দ্রব্য-

* সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রে 'ভদন্ত' শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

† নামাখ্যাতং উপসর্গো নিপাতশ্চত্বার্য্যাহুঃ পদজাতানি শাব্দাঃ। (ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য।১২।৫।৮) তচ্ (পদম্) চতুর্ধা নামাখ্যাতোপসর্গ নিপাতাঃ।

(যজুর্বেদীয় কাত্যায়ন প্রাতিশাখ্য ৮।৫২)

‡ অর্থবদধাতুর প্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্। ১।২।৪৫। (পাণিনিঃ)

§ ত্যাদ্যন্তাদন্যোদলী। ত্যাদ্যন্তশব্দোদসংজ্ঞঃ স্যাৎ। অন্যস্তুলিঙ্গসংজ্ঞঃ।

বাচক, গুণবাচক, জাতিবাচক, ব্যক্তিবাচক ও ক্রিয়াবাচক। রবীন্দ্র বাবু যদি আধুনিক প্রথা অবলম্বন করিতেন তাহা হইলেও হানি ছিল না কিন্তু তাহা না করায় তাঁহার লক্ষণ দ্বিরুক্ত দোষাশ্রিত হইয়াছে। পদার্থবাচক বিশেষ্য স্বীকার করিলে যে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য আর স্বীকার করিতে হয় না তিনি তাহা একেবারেই চিন্তা করেন নাই। ন্যায় মতে পদার্থ সাত প্রকার যথা ;—দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ্য সমবায় ও অভাব। * কর্ম্মও যাহা ক্রিয়াও তাহাই। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদার্থবাচকের অন্তর্গত। অতএব এক পদার্থবাচকে বলিলেই চলিত। আবার ক্রিয়াবাচক বলা কেন ?

এক স্থানে রবীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—

"দ্রষ্টব্য এই যে, কেবল এক মাত্রিক ধাতুর উত্তর এইরূপ আ প্রত্যয় হইয়া দুই অক্ষরের বিশেষ্য বিশেষণ সৃষ্টি করে। যেমন ধর্ মার্ চল্ বল্ হইতে ধরা মারা চলা। বহুমাত্রিক বা ক্রিয়াবাচক শব্দের উত্তর আ সংযোগ হয় না।"

এখানে ধর্ মার্ চল্ বল্ প্রভৃতি ধাতু যে কি প্রকারে এক-মাত্রিক হইল উহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ব্যাকরণ শাস্ত্রা-নুসারে হ্রস্ব স্বরের এক মাত্রা, দীর্ঘ-স্বরের দুই মাত্রা, প্লুত স্বরের তিন মাত্রা ও ব্যঞ্জন বর্ণের অর্দ্ধ মাত্রা গণনা করা হয় †। অতএব তাঁহার উদ্ধৃত ধাতুর কোনটিই এক মাত্রিক নহে। আর এই লক্ষণ

* দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্।
সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্তকীর্ত্তিতাঃ ॥
(বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন কৃত ভাষাপরিচ্ছেদঃ)

† একমাত্রোভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু ভবেৎপ্লুতো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্ ॥
(দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ কৃত মুগ্ধবোধ টীকা)

স্বীকার করিলে 'দেখ' ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় হয় না। অথচ "দেখা" পদের ভাষায় অভাব নাই। তিনি একমাত্রিক কথার পর Monosyllabic এই ইংরেজী শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা উক্ত শব্দটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিব না, এক মাত্রিক শব্দের দেশীয় ব্যাকরণ ও অভিধানানুযায়ী অর্থই গ্রহণ করিব। কারণ আমাদের বাঙ্গালা পাঠশালা সমূহে ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ পণ্ডিতগণই অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, এম্-এ, উপাধিধারীরা যে কখনও বাঙ্গালা ব্যাকরণ অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিবেন এরূপ সম্ভাবনা নাই। অতএব বাঙ্গালা ব্যাকরণে ইংরেজী শব্দ ব্যবহারের আমরা অত্যন্ত বিরোধী।

রবীন্দ্র বাবু আর একস্থানে লিখিয়াছেন 'থ্যাঁলো মাংস',—এই থ্যাঁলো শব্দের অর্থ কি? অনেককে জিজ্ঞাসা করিলাম কেহই বলিতে পারিলেন না। কলিকাতার অধিবাসী অথচ যাঁহাদের গৃহে সাহিত্যচর্চ্চাও আছে এবং নির্ব্বিশেষে মৎস্য মাংসের গতি বিধিও আছে, এমন ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসু হইয়াছি তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। অতএব এইরূপ নূতন বাঙ্গালা শব্দাবলীর একখানি খাঁটী বাঙ্গালা অভিধানও শীঘ্র হওয়া আবশ্যক।

রবীন্দ্র বাবু আঁচান প্রভৃতি শব্দকেও তাঁহার কল্পিত আন প্রত্যয়ান্ত লিখিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় 'আঁচান' শব্দটি 'আচমন' শব্দের অপভ্রংশ। তিনি আলাপী রাগী ভারী প্রভৃতি সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলিকে তাঁহার কল্পিত ই প্রত্যয়ান্ত ও হ্রস্ব ইকারান্ত করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল শব্দ ইন্ ভাগান্ত। উহার উত্তর প্রথমার একবচন করিয়া যে পদ হয় উহাতে বাঙ্গালা বিভক্তি যুক্ত করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রবীন্দ্র বাবু 'ছাগল' এই খাঁটী সংস্কৃত শব্দটীকে কি অভিপ্রায়ে বাঙ্গালার অধিকারে টানিয়া লইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা গেল না। তাঁহার মতে ঐ শব্দটী তাঁহার কল্পিত ল প্রত্যয়ান্ত। কিন্তু আমরা বিশেষরূপ জানি ঐ শব্দটি বাঙ্গালা নহে। উণাদি সূত্রকার উজ্জ্বলদত্ত 'ছো' এই সংস্কৃত ধাতুর উত্তর কল্ প্রত্যয় করিয়া 'ছাগল' পদ সিদ্ধ করিয়াছেন *। রবীন্দ্র বাবুব মতে দয়াল্ বাচাল্ প্রভৃতি শব্দ তাঁহার কল্পিত আল্ প্রত্যয়ান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত। কিন্তু স্বয়ং মহর্ষি পাণিনি দয়্ ধাতুর উত্তর আলুচ্ প্রত্যয় করিয়া দয়ালু ও বাচ্ শব্দের উত্তর আল প্রত্যয় করিয়া 'বাচাল' পদ সিদ্ধ কারয়াছেন। † দয়ালু শব্দের অপভ্রংশ দয়াল। এই দুইটি শব্দ ব্যঞ্জনান্ত নহে স্বরান্ত। একলা শব্দটিও তাঁহার কল্পিত ল+আ প্রত্যয়ান্ত নহে উহা একল শব্দের অপভ্রংশ।

রবীন্দ্র বাবু আর একস্থানে লিখিয়াছেন "গির প্রত্যয়টি বাংলায় চলে নাই"।

আমাদের বোধ হয় পারস্য ভাষার 'গির্' প্রত্যয়টি উচ্চারণ ভেদে বাঙ্গালায় 'গিরি' প্রত্যয়ে পরিণত হইয়াছে। তিনি গিরি প্রত্যয়ান্ত শব্দের যে সকল উদাহরণ দিয়াছেন উহার অধিকাংশই অপ্রচলিত, কেবল মুটেগিরি শব্দটি সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু দারোগাগিরি, গুরুগিরি প্রভৃতি সমধিক প্রচলিত শব্দগুলির নামও করেন নাই।

রবীন্দ্র বাবু দীর্ঘ ঈকারের প্রতি একান্ত অপ্রসন্ন। তিনি উহার নির্ব্বাসন দণ্ড ব্যবস্থা করিয়া কালাপানি পার করিয়া দিয়াছেন।

---

* ছো গুক্ষুস্বশ্চ। ছাগলঃ। প্রাজ্ঞাদিত্বাৎ ছাগলঃ (উজ্জ্বলদত্ত কৃত উণাদি প্রক্রিয়া)।

† স্পৃহি গৃহিপতিদয়ি নিদ্রা তন্দ্রা শ্রদ্ধাভ্যআলুচ্।৩।২।১৫৮। (পাণিনিঃ) কুৎসিতং বহু ভাষতে বাচালঃ। (ভট্টোজিদীক্ষিতঃ)

তাঁহার সূত্র অনুসারে পাঁচী, বামনী প্রভৃতি একাদশটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ দীর্ঘ ঈকারের কারাগৃহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। আর কলুনী প্রভৃতিরও ঐ অবস্থা। ঠাকুরাণী, নাপ্তিনী, জেলেনী প্রভৃতিকে আর দীর্ঘ ঈকারের গুরুভার বহন করিতে হইবে না। আর সেই চিরকালের সংস্কৃত 'মালিনী' নূতন আইন অনুসারে হ্রস্ব হইয়া মালিনি হইয়া বসিয়াছেন।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল সুতরাং এখানেই শেষ করা গেল। উপসংহারে নিবেদন, যে দুই মহানুভব বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়নে বদ্ধকর, উভয়েই ক্ষমতাশালী। ইহাঁদের সহায় ও সামর্থ্য যথেষ্ট। ইচ্ছা করিলে ইহাঁরা কোন প্রবল স্রোতকেও ফিরাইয়া অন্য দিগ্‌গামী করিতে পারেন। তবে ঐরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে বিচার করা কর্ত্তব্য বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃতের সাহচর্য্য হইতে বিচ্যুত করায় লাভ ও ক্ষতি কতদূর। যে সকল শব্দ লইয়া অভিনব ব্যাকরণ নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছে, উহা একান্ত অকিঞ্চিৎকর। ঐ সকল শব্দের বহুল প্রয়োগে ভাষার গুরুত্ব ও মাধুর্য্য কতদূর রক্ষিত হইবে তাহা নির্ণয় সহজ নহে। পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর অক্ষয় কুমার দত্ত বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি যে সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের লেখা বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার ভিত্তি, তাঁহারা এইরূপ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মবহির্ভূত যথেচ্ছ বর্ণবিন্যাসযুক্ত অপশব্দবহুল ভাষার একেবারেই পক্ষপাতী ছিলেন না। ইহাঁরা 'বিস্‌মোল্লায় গলদ' প্রভৃতি যে সকল ভাষা বলাইতে ইচ্ছুক উহা একান্তই অশ্রদ্ধেয়। যদি কেহ লেখেন "যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বলিলেন প্রিয়ে তুমি যে কথা বলিতেছ উহার বিস্‌মোল্লায়ই গলদ" তাহা হইলে প্রয়োগটি কি অতিশোভন হইবে?

আর ইহাঁরা চেষ্টা করিলেও কালে যাহাই হউক এখনই যে হঠাৎ ধারার গতি ফিরিয়া যাইবে তাহা বোধ হয় না। আর এক সম্প্রদায় এমন আছেন যাঁহারা ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য একান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সুধু পণ্ডিত লইয়াই যে এ সম্প্রদায় গঠিত তাহা নহে। ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ, এম এ, উপাধিধারীও অনেক আছেন। আর বর্ত্তমান সময়ে যে সকল লেখক ও লেখিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন তাঁহারাও ভাষার বিশুদ্ধি ও মাধুর্য্য রক্ষার পক্ষপাতী। ইংলণ্ডপ্রত্যাগত অনেক কৃতবিদ্যের সহিত বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছে। সুখের বিষয় তাঁহারাও ব্যাকরণসঙ্গত বিশুদ্ধ ভাষারই পক্ষ সমর্থন করেন। আমরাও সমাসহীন বিশুদ্ধ বর্ণবিন্যাসযুক্ত সংস্কৃতশব্দবহুল ভাষার যত অধিক প্রচার বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গলের বিষয় মনে করি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

নষ্টনীড়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বিলাত হইতে চিঠি আসিবার দিন কবে এ খবর চারু সর্ব্বদাই রাখিত। প্রথমে এডেন্ হইতে ভূপতির নামে একখানা চিঠি আসিল তাহাতে অমল বৌঠানকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছে। সুয়েজ হইতেও ভূপতির চিঠি আসিল, বৌঠান তাহার মধ্যেও প্রণাম পাইল। মাল্টা হইতে যে চিঠি পাওয়া গেল তাহাতেও পুনশ্চ নিবেদনে বৌঠানের প্রণাম আসিল।

চারু অমলের একখানা চিঠিও পাইল না। ভূপতির চিঠিগুলি চাহিয়া লইয়া চারু উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া বারবার করিয়া পড়িয়া দেখিল—প্রণাম জ্ঞাপন ছাড়া আর কোথাও তাহার সম্বন্ধে আভাসমাত্রও নাই।

চারু এই কয় দিন যে একটি শান্ত বিষাদের চন্দ্রাতপচ্ছায়ার আশ্রয় লইয়াছিল অমলের এই উপেক্ষায় তাহা ছিন্ন হইয়া গেল। অন্তরের মধ্যে তাহার হৃৎপিণ্ডটা লইয়া আবার যেন ছেঁড়া ছেঁড়ি আরম্ভ হইল। তাহার সংসারের কর্ত্তব্য স্থিতির মধ্যে আবার ভূমিকম্পের আন্দোলন জাগিয়া উঠিল।

এখন ভূপতি এক একদিন অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া দেখে চারু বিছানায় নাই। খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখে চারু দক্ষিণের ঘরের জানালায় বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া চারু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলে, ঘরে আজ যে গরম, তাই একটু বাতাসে এসেছি!

ভূপতি উদ্বিগ্ন হইয়া বিছানায় পাখা টানার বন্দোবস্ত করিয়া দিল, এবং চারুর স্বাস্থভঙ্গ আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বদাই তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিল। চারু হাসিয়া বলিত, আমি বেশ আছি, তুমি কেন মিছামিছি ব্যস্ত হও?

এই হাসিটুকু ফুটাইয়া তুলিতে তাহার বক্ষের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইত।

অমল বিলাতে পৌঁছিল। চারু স্থির করিয়াছিল, পথে তাহাকে স্বতন্ত্র চিঠি লিখিবার যথেষ্ট সুযোগ হয়ত ছিল না, বিলাতে পৌঁছিয়া অমল লম্বা চিঠি লিখিবে। কিন্তু সে লম্বা চিঠি আসিল না।

প্রত্যেক মেল আসিবার দিনে চারু তাহার সমস্ত কাজকর্ম্ম কথা-বার্ত্তার মধ্যে ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকিত। পাছে

পতি বলে তোমার নামে চিঠি নাই এই জন্য সাহস করিয়া ভূপতিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না।

এমন অবস্থায় একদিন চিঠি আসিবার দিনে ভূপতি মন্দগমনে আসিয়া মৃদুহাস্যে কহিল, একটা জিনিষ আছে দেখবে?

চারু ব্যস্ত সমস্ত চমকিত হইয়া কহিল, কই, দেখাও!

ভূপতি পরিহাসপূর্ব্বক দেখাইতে চাহিল না।

চারু অধীর হইয়া উঠিয়া ভূপতির চাদরের মধ্যে হইতে বাঞ্ছিত পদার্থ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। সে মনে মনে ভাবিল, সকাল হইতেই আমার মন বলিতেছে আজ আমার চিঠি আসিবেই—এ কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না!

ভূপতির পরিহাসস্পৃহা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল—সে চারুকে এড়াইয়া খাটের চারিদিকে ফিরিতে লাগিল।

তখন চারু একান্ত বিরক্তির সহিত খাটের উপর বসিয়া চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া তুলিল।

চারুর একান্ত আগ্রহে ভূপতি অত্যন্ত খুসি হইয়া চাদরের ভিতর হইতে নিজের রচনার খাতাখানা বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি চারুর কোলে দিয়া কহিল—রাগ কোরো না! এই নাও!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অমল যদিও ভূপতিকে জানাইয়াছিল যে, পড়াশুনার তাড়ায় সে পত্র লিখিতে সময় পাইবে না তবু দুই এক মেল তাহার পত্র না আসাতে সমস্ত সংসার চারুর পক্ষে কণ্টকশয্যা হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যাবেলায় পাঁচ কথার মধ্যে চারু অত্যন্ত উদাসীন ভাবে শান্তস্বরে তাহার স্বামীকে কহিল—আচ্ছা, দেখ, বিলেতে একটা টেলিগ্রাফ করে জান্‌লে হয় না অমল কেমন আছে?

ভূপতি কহিল—দুইহপ্তা আগে তার চিঠি পাওয়া গেছে সে এখন পড়ায় ব্যস্ত।

চারু। ওঃ, তবে কাজ নেই! আমি ভাবছিলুম, বিদেশে আছে, যদিই ব্যামোস্যামো হয়—বলা ত যায় না!

ভূপতি। নাঃ তেমন কোন ব্যামো হলে খবর পাওয়া যেত। টেলিগ্রাফ করাও ত কম খরচা নয়!

চারু। তাই না কি! আমি ভেবেছিলুম বড় জোর একটাকা কি দুটাকা লাগবে।

ভূপতি। বল কি প্রায় একশো টাকার ধাক্কা!

চারু। তাহলে ত কথাই নেই!

দিন দুয়েক পরে চারু ভূপতিকে বলিল, আমার বোন এখন চুঁচড়োয় আছে আজ একবার তার খবর নিয়ে আসতে পার?

ভূপতি। কেন? কোন অসুখ করেছে না কি?

চারু। না, অসুখ না। জানইত তুমি গেলে তারা কত খুসি হয়!

ভূপতি চারুর অনুরোধে গাড়ি চড়িয়া হাবড়া ষ্টেশন অভিমুখে ছুটিল। পথে একসার গরুরগাড়ি আসিয়া তাহার গাড়ি আটক করিল।

এমন সময় পরিচিত টেলিগ্রাফের হরকরা ভূপতিকে দেখিয়া তাহার হাতে একখানা টেলিগ্রাম লইয়া দিল। বিলাতের টেলিগ্রাম দেখিয়া ভূপতি ভারি ভয় পাইল। ভাবিল অমলের হয় ত অসুখ করিয়াছে। ভয়ে ভয়ে খুলিয়া দেখিল, টেলিগ্রামে লেখা আছে আমি ভাল আছি!

ইহার অর্থ কি? পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ইহা প্রী-পেড্ টেলিগ্রামের উত্তর।

হাওড়া যাওয়া হইল না। গাড়ি ফিরাইয়া ভূপতি বাড়ি আসিয়া স্ত্রীর হাতে টেলিগ্রাম দিল। ভূপতির হাতে টেলিগ্রাম দেখিয়া চারুর মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল!

ভূপতি কহিল, আমি এর মানে কিছুই বুঝ্‌তে পারচিনে। অনুসন্ধানে ভূপতি মানে বুঝিল। চারু নিজের গহনা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিয়া টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছিল।

ভূপতি ভাবিল, এত করিবার ত দরকার ছিল না! আমাকে একটু অনুরোধ করিয়া ধরিলেই ত আমি টেলিগ্রাফ করিয়া দিতাম। চাকরকে দিয়া গোপনে বাজারে গহনা বন্ধক দিতে পাঠানো—এত ভাল হয় নাই!

থাকিয়া থাকিয়া ভূপতির মনে কেবলি এই প্রশ্ন হইতে লাগিল, চারু কেন এত বাড়াবাড়ি করিল! একটা অস্পষ্ট সন্দেহ অলক্ষ্য ভাবে তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে সন্দেহটাকে ভূপতি প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে চাহিল না, ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু বেদনা কোন মতে ছাড়িল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অমলের শরীর ভাল আছে, তবু সে চিঠি লেখেনা। একেবারে এমন নিদারুণ ছাড়াছাড়ি হইল কি করিয়া? একবার মুখোমুখি এই প্রশ্নটার জবাব লইয়া আসিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু মধ্যে সমুদ্র। পার হইবার কোন পথ নাই! নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ, নিরুপায় বিচ্ছেদ, সকল প্রশ্ন সকল প্রতিকারের অতীত বিচ্ছেদ।

চারু আপনাকে আর খাড়া রাখিতে পারে না। কাজকর্ম্ম পড়িয়া থাকে, সকল বিষয়েই ভুল হয়, চাকর বাকর চুরি করে, লোকে তাহার

দীনভাব লক্ষ্য করিয়া নানা প্রকার কানাকানি করিতে থাকে, কিছুতেই তার চেতনা মাত্র নাই।

এমনি হইল, হঠাৎ চারু চমকিয়া উঠিত, কথা কহিতে কহিতে তাহাকে কাঁদিবার জন্য উঠিয়া যাইতে হইত, অমলের নাম শুনিবামাত্র তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইত।

অবশেষে ভূপতিও সমস্ত দেখিল, এবং যাহা মুহূর্ত্তের জন্য ভাবে নাই তাহাও ভাবিল—সংসার একেবারে তাহার কাছে বৃদ্ধ শুষ্ক জীর্ণ হইয়া গেল।

মাঝে যে কয় দিন আনন্দের উন্মেষে ভূপতি অন্ধ হইয়াছিল সেই কয় দিনের স্মৃতি তাহাকে লজ্জা দিতে লাগিল। যে অনভিজ্ঞ বানর জহর চেনেনা তাহাকে ঝুঁটা পাথর দিয়া কি এমনি করিয়াই ঠকাইতে হয়!

চারুর যে সকল কথায় আদরে ব্যবহারে ভূপতি ভুলিয়াছিল সে গুলা মনে আসিয়া তাহাকে "মূঢ়, মূঢ়, মূঢ়" বলিয়া বেত মারিতে লাগিল!

অবশেষে তাহার বহু কষ্টের বহু যত্নের রচনাগুলির কথা যখন মনে উদয় হইল তখন ভূপতি ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলিল। অঙ্কুশ-তাড়িতের মত চারুর কাছে দ্রুতপদে গিয়া ভূপতি কহিল—আমার সেই লেখাগুলো কোথায়?

চারু কহিল, আমার কাছেই আছে!

ভূপতি কহিল—সেগুলো দাও!

চারু তখন ভূপতির জন্য ডিমের কচুরি ভাজিতে ছিল, কহিল—তোমার কি এখনই চাই?

ভূপতি কহিল, হাঁ এখনই চাই।

চারু কড়া নামাইয়া রাখিয়া আলমারী হইতে খাতা ও কাগজগুলি বাহির করিয়া আনিল।

ভূপতি অধীরভাবে তাহার হাত হইতে সমস্ত টানিয়া লইয়া খাতাপত্র একেবারে উনানের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

চারু ব্যস্ত হইয়া সেগুলা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—একি কর্‌লে?

ভূপতি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল—থাক্!

চারু বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত লেখা নিঃশেষে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল।

চারু বুঝিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কচুরিভাজা অসমাপ্ত রাখিয়া ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

চারুর সম্মুখে খাতা নষ্ট করিবার সঙ্কল্প ভূপতির ছিল না। কিন্তু ঠিক সাম্‌নেই আগুনটা জ্বলিতেছিল, দেখিয়া কেমন যেন তাহার খুন চাপিয়া উঠিল। ভূপতি আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রবঞ্চিত নির্ব্বোধের সমস্ত চেষ্টা বঞ্চনাকারিণীর সম্মুখেই আগুনে ফেলিয়া দিল।

সমস্ত ছাই হইয়া গেলে ভূপতির আকস্মিক উদ্দামতা যখন শান্ত হইয়া আসিল, তখন চারু আপন অপরাধের বোঝা বহন করিয়া যেরূপ গভীর বিষাদে নীরব নতমুখে চলিয়া গেল তাহা ভূপতির মনে জাগিয়া উঠিল—সম্মুখে চাহিয়া দেখিল ভূপতি বিশেষ করিয়া ভালবাসে বলিয়াই চারু স্বহস্তে যত্ন করিয়া খাবার তৈরি করিতেছিল।

ভূপতি বারান্দার রেলিঙের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল—তাহার জন্য চারুর এই যে সকল অশ্রান্ত চেষ্টা, এই যে সমস্ত প্রাণপণ বঞ্চনা ইহা অপেক্ষা সকরুণ ব্যাপার জগৎসংসারে আর কি আছে? এই সমস্ত বঞ্চনা, এ ত ছলনাকারিণীর হেয়

ছলনামাত্র নহে; এই ছলনাগুলির জন্য ক্ষতহৃদয়ের ক্ষতযন্ত্রণা চতুর্গুণ বাড়াইয়া অভাগিনীকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত নিষ্পেষণ করিয়া বাহির করিতে হইয়াছে। ভূপতি মনে মনে কহিল —হায় অবলা, হায় দুঃখিনী! দরকার ছিল না, আমার এ সব কিছুই দরকার ছিলনা! এতকাল আমি ত ভালবাসা না পাইয়াও পাই নাই বলিয়া জানিতেও পারি নাই—আমার ত কেবল প্রুফ দেখিয়া কাগজ লিখিয়াই চলিয়া গিয়াছিল—আমার জন্য এত করিবার কোন দরকার ছিল না!

তখন আপনার জীবনকে চারুর জীবন হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া,—ডাক্তার যেমন সাংঘাতিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে দেখে—ভূপতি তেমনি করিয়া নিঃসম্পর্ক লোকের মত চারুকে দূর হইতে দেখিল। ঐ একটি ক্ষীণশক্তি নারীর হৃদয় কি প্রবল সংসারের দ্বারা চারিদিকে আক্রান্ত হইয়াছে! এমন লোক নাই যাহার কাছে সকল কথা ব্যক্ত করিতে পারে, এমন কথা নহে যাহা ব্যক্ত করা যায়, এমন স্থান নাই যেখানে সমস্ত হৃদয় উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া সে হাহাকার করিয়া উঠিতে পারে,—অথচ এই অপ্রকাশ্য, অপরিহার্য্য, অপ্রতি-বিধেয়, প্রত্যহপুঞ্জীভূত দুঃখভার বহন করিয়া নিতান্ত সহজ লোকের মত, তাহার সুস্থচিত্ত প্রতিবেশিনীদের মত তাহাকে প্রতিদিনের গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইতেছে!

ভূপতি তাহার শয়নগৃহে গিয়া দেখিল—জাল্‌নার গরাদে ধরিয়া অশ্রুহীন অনিমেষ দৃষ্টিতে চারু বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে! ভূপতি আস্তে আস্তে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল,—কিছু বলিল না—তাহার মাথার উপরে হাত রাখিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্ধুরা ভূপতিকে জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপারখানা কি? এত ব্যস্ত কেন?

ভূপতি কহিল—খবরের কাগজ—

বন্ধু। আবার খবরের কাগজ? ভিটেমাটি খবরের কাগজে মুড়ে গঙ্গার জলে ফেল্‌তে হবে নাকি?

ভূপতি। না, আর নিজে কাগজ করচিনে।

বন্ধু। তবে?

ভূপতি। মৈশুরে একটা কাগজ বের হবে, আমাকে তার সম্পাদক করেছে।

বন্ধু। বাড়িঘর ছেড়ে একেবারে মৈশুরে যাবে? চারুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চ?

ভূপতি। না, মামারা এখানে এসে থাক্‌বেন।

বন্ধু। সম্পাদকী নেশা তোমার আর কিছুতেই ছুট্‌লনা।

ভূপতি। মানুষের যাহোক্ একটা কিছু নেশা চাই।

বিদায়কালে চারু জিজ্ঞাসা করিল—কবে আস্‌বে?

ভূপতি কহিল—তোমার যদি একলা বোধ হয় আমাকে লিখো আমি চলে আস্‌ব।

বলিয়া বিদায় লইয়া ভূপতি যখন দ্বারের কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিল তখন হঠাৎ চারু ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল—আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও! আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেওনা!

ভূপতি থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া চারুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মুষ্টি শিথিল হইয়া ভূপতির হাত হইতে চারুর হাত খুলিয়া আসিল। ভূপতি চারুর নিকট হইতে সরিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি বুঝিল, অমলের বিচ্ছেদ স্মৃতি যে বাড়িকে বেষ্টন করিয়া জ্বলিতেছে চারু দাবানলগ্রস্ত হরিণীর মত সে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে চায়। কিন্তু আমার কথা সে একবার ভাবিয়া দেখিল না? আমি কোথায় পালাইব? যে স্ত্রী হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত অন্যকে ধ্যান করিতেছে, বিদেশে গিয়াও তাহাকে ভুলিতে সময় পাইবনা? নির্জ্জন বন্ধুহীন প্রবাসে প্রত্যহ তাহাকে সঙ্গদান করিতে হইবে? সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরিব, তখন নিস্তব্ধ শোকপরায়ণা নারীকে লইয়া সেই সন্ধ্যা কি ভয়ানক হইয়া উঠিবে! যাহার অন্তরের মধ্যে মৃতভার, তাহাকে বক্ষের কাছে ধরিয়া রাখা সে আমি কতদিন পারিব! আরো কতবৎসর প্রত্যহ আমাকে এমনি করিয়া বাঁচিতে হইবে! যে আশ্রয় চূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেছে তাহার ভাঙ্গা ইটকাট-গুলা ফেলিয়া যাইতে পারিবনা, কাঁধে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে?

ভূপতি চারুকে আসিয়া কহিল—না, সে আমি পারিব না।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া চারুর মুখ কাগজের মত শুষ্ক শাদা হইয়া গেল, চারু মুঠা করিয়া খাট চাপিয়া ধরিল।

তৎক্ষণাৎ ভূপতি কহিল, চল, চারু, আমার সঙ্গেই চল!

চারু বলিল—না থাক্!

সমাপ্ত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতে জাতিগঠন।

ঊনবিংশ শতাব্দী ভারতে অজ্ঞাতপূর্ব্ব এক সুমহৎ অনুষ্ঠানের সূচনা করিয়া গিয়াছে। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠাদ্বারা বিগত শতাব্দীতে বহুভাষী ও বহুবর্ণাত্মক ভারতের একজাতিত্ব সাধনরূপ অসাধ্যসাধনের বিরাট আয়োজন হইয়াছে। যদি এই আয়োজন ব্যর্থ হইয়া না যায়, ভারতবর্ষ পুনরায় আপনার গৌরবান্বিত আসনের অধিকারী হইবে, সন্দেহ নাই। তাই এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

এ বিষয়ে এই কয়েকটী প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন—১। কি কি লক্ষণাক্রান্ত জনসমষ্টিকে জাতি বলা যায়?—২। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সমাজ মিলিত করিয়া সংখ্যাবহুল বৃহৎ জাতি গঠনের আবশ্যকতা বা উপকারিতা কি?—৩। সমগ্র ভারতবর্ষের একজাতিভুক্ত হওয়ার উপযোগীতা ও আবশ্যকতা কি?—৪। পূর্ব্বে সমুদয় ভারতবর্ষ একজাতিভুক্ত ছিল কি না, এবং না থাকিলে তাহার অন্তরায় কি ছিল?—৫। ইংরেজ রাজত্বে কি প্রকারে সেই সমস্ত অন্তরায় দূরীভূত হইয়া সমগ্র ভারতের একজাতিত্বের সূত্রপাত হইয়াছে? এই স্থলে একে একে এই প্রশ্নকয়টীর উত্তর দিব।

১। প্রথমতঃ জাতির লক্ষণ। যে সকল লোকের বহুব্যাপক কারণ উপস্থিত হইলে সুখ দুঃখ এক ও হৃদয়ের গতি একদিকে হয়; যাহাদিগের আকাঙ্খা ও উদ্যমের লক্ষ্য এক; যাহাদিগের শিক্ষা ও সাহিত্যাদি এক; যাহাদিগের সামাজিক রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানাদি মোটের উপর এক; উপযুক্ত কারণে যাহাদিগের ব্যক্তিগত শক্তি

সমবেত হয়; সেই সকল মানবের সমষ্টিকে একজাতি বলা যাইতে পারে। ভাষা, শোণিত ও ধর্ম্মের একত্ব এবং একদেশ ও এক গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাস জাতিত্বের উপকরণ। মহামতি জন ষ্টুয়ার্টমিলের মতে এক গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাসই জাতিগঠনের সর্ব্বপ্রধান সহায়; যেহেতু তদ্দরুণ ক্রমে ক্রমে একজাতিত্বের অন্যান্য প্রায় সর্ব্ববিধ লক্ষণই বিকশিত হইতে পারে; আর গবর্ণমেণ্টের বিভিন্নতাবশতঃ সমলক্ষণাক্রান্ত মানবমণ্ডলীর বিভিন্ন অংশেরও বৈষম্য ক্রমে গুরুতর হইতে পারে। ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ডের ভূমির প্রকৃতি ও অধিবাসীগণের শোণিত ও ভাষার বৈষম্য সত্ত্বেও একরাজার অধীনত্ববশতঃ দুই মিলিয়া একজাতি হইয়াছে। বর্ত্তমান রুষিয়া ও যুক্ত রাজ্যেও গবর্ণমেণ্টের একত্ববশতঃ বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন জাতির লোক মিশিয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে স্পেন ও পর্টুগাল প্রকৃত প্রস্তাবে একদেশ হইলেও এবং অধিবাসীগণের সর্ব্ববিধ সাম্যসত্ত্বেও রাজনৈতিক ভেদবশতঃ ক্রমে তথায় বিভিন্ন ভাষাভাষী সম্পূর্ণ পৃথক্ দুই জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব জাতিগঠন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের বন্ধন অন্য সকল বন্ধনকে অতিক্রম করে।

শোণিত ও ভাষার একত্বও জাতিগঠন সম্বন্ধে সামান্য প্রভাব বিস্তার করে না। চীনের ন্যায় সংখ্যাবহুল জাতি আর নাই। কিন্তু চীনের সমুদয় অধিবাসী একবর্ণাত্মক, সমশোণিতজ, বা একই *race* হইতে উৎপন্ন। যদি বিভিন্ন বর্ণাত্মক লোক চীনের অধিবাসী হইত, তবে চীন এরূপ পূর্ণ মাত্রায় সুসম্বদ্ধ, সমঞ্জসীভূত জাতিতে পরিণত হইতে পারিত কি না বিশেষ সন্দেহের বিষয়। পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি এতগুলি একবর্ণাত্মক লোক মিলিত হয় নাই; এবং তাহার ফলস্বরূপ এরূপ সংখ্যাবহুল বিস্তৃত জাতিও গঠিত হয় নাই। পূর্ব্বে

জর্ম্মণী বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, বর্ত্তমান সাম্রাজিক গবর্ণমেণ্ট সত্বেও সমগ্র জর্ম্মণ-জাতি এক রাজার অধীন নহে। জাতিত্বের হিসাবে এ বিষয়ে জর্ম্মণী যে কিছু দুর্ব্বল তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের ভাষা ও শোণিতগত একত্ব অত্যন্ত গভীর; এবং ইদানীন্তন তাহাই জর্ম্মণ জাতিকে সম্মিলিত ও বিভিন্ন রাজার অধীনত্বরূপ দুর্ব্বলতার নিরাকরণ করিয়াছে। ইংলণ্ডে পূর্ব্বে ভাষা ও শোণিতের একত্ব ছিলনা বটে; কিন্তু তত্রত্য বিভিন্ন জাতির লোকদিগের মধ্যে আদান প্রদান দ্বারা ভাষা ও রক্তগত সাম্য স্থাপিত হইয়াছে। এখন সকল ইংরেজেরই একমিশ্র রক্ত, সকল ইংরেজেরই একমিশ্র ভাষা; তাই ইংরেজ এরূপ দুশ্ছেদ্য একতাবন্ধনে সম্মিলিত প্রবল জাতি। পক্ষান্তরে অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য বিভিন্ন বর্ণাত্মক লোকের দ্বারা গঠিত। অষ্ট্রিয়া,—জর্ম্মণ, স্লাভনিক, ইটালিয়ান ও তাতার জাতির বাসভূমি। রাজনৈতিক একতা ইহাদের ভাষা ও শোণিতের বৈষম্য দূর করিতে পারে নাই। বোধ হয় সেই কারণেই ফ্রান্স, প্রুসিয়া ও ইটালীর নিকট অষ্ট্রিয়াকে অনেকবার অবনত হইতে হইয়াছে; এবং সেই কারণেই অনেকে মনে করিতেছেন, অদূরবর্ত্তী অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। অতএব জাতিগঠন সম্বন্ধে ভাষা ও শোণিতের একত্ব অত্যন্ত গুরুতর বিষয়।

একদেশে বাস এবং জাতিত্বের মধ্যেও একটা নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। পৃথিবীর স্থলভাগের এক এক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ প্রকৃতিদত্ত সীমা প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য অংশ হইতে পৃথকীকৃত হইয়াছে। সমুদ্র, উচ্চপর্ব্বত ও স্থলবিশেষে প্রশস্ত নদী সেই প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট সীমা। এইরূপ সীমাবদ্ধ স্থানই ভৌগোলিক হিসাবে এক এক দেশ। প্রকৃতিদেবী দেশগুলির উক্তবিধ বাহ্য সীমা নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই;

পরন্তু প্রত্যেক দেশের জলবায়ু ফলমূল, শস্য গুলির মধ্যেও একটা বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্বটুক্ একদেশবাচ্য ভূভাগের প্রায় প্রত্যেক অংশেই দৃষ্ট হয়; এবং সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট মানবমণ্ডলীর বাসের পক্ষে এইরূপ ভৌগোলিক দেশগুলিই বিশেষ উপযোগী। পক্ষান্তরে একদেশে বাস নিবন্ধন প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া বশতঃ মানবগণও তদ্দেশে বাসের উপযোগী ও সমপ্রকৃতিক হইয়া উঠে। অধিকন্তু সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট মানবসমষ্টির বিভিন্নাংশের বিভিন্ন দেশে বাস হেতু তত্তৎ দেশের প্রাকৃতিক বিশেষত্বের অধীনতা বশতঃ কালক্রমে বিভিন্ন প্রকৃতিপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে। এক আর্য্যজাতির বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন দেশে বাস হেতু কতদূর ভিন্ন প্রকৃতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে সকলেই জানেন। আবার আর্য্য ও অনার্য্য নানা জাতি এই বঙ্গদেশে আসিয়া কতদূর সমপ্রকৃতিক হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও আমাদের চক্ষুর সম্মুখেই বর্ত্তমান। অতএব জাতি ও ভৌগোলিক দেশের প্রসার সমান হওয়াই স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়; এবং অনেক স্থলেই তাহা বর্ত্তমান। একদেশে বাসহেতু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন জনসমষ্টির যেমন প্রকৃতিসাম্য ঘটে, তেমন তাহাদের সম্মিলনও অতি সহজসাধ্য হয়। এই কারণেই পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র জাতি ও দেশ সমপ্রসার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পক্ষান্তরে যেখানে ভৌগোলিক সীমা রক্ষিত না হয়, সেখানে জাতীয় বিপদের বীজ নিহিত থাকে। ফ্রান্স ও জর্ম্মণীর মিলনস্থানের সীমা প্রকৃতিদত্ত নহে; বেলজিয়াম ও হলণ্ডের পার্শ্বস্থ পূর্ব্বোক্ত দুই দেশের সীমাও রাজনৈতিক। তাই সেই সীমান্ত স্থলগুলিতে নানা গোলযোগ ইতিহাসের পৃষ্ঠা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাতেই জাতি ও দেশের সমপ্রসারত্বের আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়।

এ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলাও আবশ্যক। দেশের বিভিন্নাং-

শের অধিবাসীদিগের বাসস্থানের নৈকট্যও জাতিগঠনের এক উপাদান; অর্থাৎ, দেশের অতি বিস্তৃতি জাতিগঠনের পক্ষে তত অনুকূল নহে। যদি ভৌগোলিক সীমান্তর্গত ভূভাগ অতি বিশাল হয়, তবে বিভিন্নাংশের কিছু কিছু প্রাকৃতিক বৈষম্য অবশ্যম্ভাবী। তদ্ভিন্ন, দূরত্ব নিবন্ধন অধিবাসীদিগের মধ্যে নানাবিষয়ক আদান প্রদানের অসুবিধাবশতঃ একতাবন্ধনও সুকঠিন হয়। তাই বোধ হয় দেখিতে পাই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রায় সকল মহৎ জাতিই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের অধিবাসী।

তারপর ধর্ম্মের কথা। ধর্ম্মের একত্ব জাতির একটা বন্ধন বটে, কিন্তু অন্যান্যগুলির ন্যায় গুরুতর নহে। ধর্ম্ম আরবকে জাতিত্ব দান করিয়াছে; পক্ষান্তরে ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশেই ন্যূনাধিক ধর্ম্মভেদ আছে। চীন এবং জাপানেও ধর্ম্মের একত্ব নাই। কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক এক জাতির অংশ হইলে পরস্পরের সম্বন্ধে সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, ও ধর্ম্মবিষয়ক উদারতা আবশ্যক; অন্যথা গোলযোগ ও জাতীয় দুর্ব্বলতা অবশ্যম্ভাবী। ইংলণ্ডের ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যাণ্টদের বিবাদই তাহার প্রমাণ।

২। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজসমূহের সম্মিলন দ্বারা এক একটী বড় বড় জাতিগঠনের আবশ্যকতা কি, এই প্রশ্নের এখন আলোচনা করিব।

আত্মরক্ষা সমাজমাত্রেরই কর্ত্তব্য। আত্মরক্ষার জন্য বলের আবশ্যক। এক দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বিভিন্ন সমাজে বিভক্ত থাকিলে, বলবিধান অসম্ভব হইয়া আত্মরক্ষার ব্যাঘাত ঘটে বলিয়াই একদেশবাসী সকলের এক জাতিতে পরিণতি আবশ্যক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে দেশের বিভাগ দুই কারণে দুর্ব্বলতা আনয়ন করে। প্রথম কারণ ক্ষুদ্র মণ্ডলীগুলির পরস্পর কলহ। ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স্‌ ও স্কট-

লণ্ড যতকাল রাজনৈতিক হিসাবে বিভিন্ন ছিল, ততকাল বলহানির কারণ বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু এখন ইহাদের মিলিত শক্তি প্রকাণ্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। রাজপুতগণ নানাপ্রকারে এক জাতিত্বের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে বিভিন্ন রাজার অধীনে বাসহেতু আত্মকলহ দ্বারা দুর্ব্বল হইয়া রহিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের দুর্ব্বলতার দ্বিতীয় কারণ তাহাদের ক্ষুদ্রত্ব নিবন্ধন বৃহত্তর জাতিসমূহের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সামর্থ্যের অভাব। জাতীয় বলের তুলনায় ব্যক্তিদিগের শক্তি অতি সামান্য। বহুসংখ্যক লোকের সামান্য শক্তি মিলিত হইলে প্রবল শক্তির সৃষ্টি হইতে পারে। ক্ষুদ্র সমাজের লোকসংখ্যার অল্পতাহেতু শক্তিসমষ্টিও সামান্য থাকে; কাজেই দুর্ব্বলতা অপরিহার্য্য হয়। ইটালী মধ্যযুগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তখন স্পেন, ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার হাতে তাহাকে কত না লাঞ্ছনা পাইতে হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমান সম্মিলিত ইটালী ইয়ুরোপীয় একটা শক্তি।

একদিকে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে দুর্ব্বলতা অবশ্যম্ভাবী হয়, অপরদিকে তাহাদের সম্মিলন দ্বারা দেশব্যাপী জাতিগঠনে তেমনি বলবৃদ্ধি হয়। পঞ্জাবে মহারাজা রণজিৎসিংহের একছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শিখগণ কিরূপ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ইতিহাসপাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। বর্ত্তমান সম্মিলনের পূর্ব্বে জর্ম্মণী অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছে; কিন্তু সম্মিলিত জর্ম্মণী আজ জগতের ভীতি উৎপাদন করিতেছে। বৃহৎ জাতিগঠনদ্বারা যে কিরূপ শক্তিসঞ্চার হয়, স্পেনের ইতিহাস তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। পূর্ব্বে স্পেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ফার্ডিনাণ্ড ও ইজাবেলার বিবাহদ্বারা আরেগণ ও ক্যাষ্টিল মিলিত হওয়ামাত্র এক অভূতপূর্ব্ব বলের বিকাশ হয়। তৎক্ষণাৎ স্পেনের

মুসলমান রাজ্য গ্রাণাডা উক্ত রাজদম্পতীর অধীন হইল; ক্রমে ন্যাভার প্রভৃতি স্পেনের অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশও বৃহত্তর অংশের অঙ্গীভূত হইয়া গেল। এইরূপ জাতীয় একত্ব সাধনের অব্যবহিত পরেই স্পানিয়ার্ডগণ ইয়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি হইয়া উঠে। আমেরিকার আবিষ্কার ও বিজয় এই যুগেরই কার্য্য। অনেকে মনে করেন আইবিরিয়ান উপদ্বীপের অন্যান্য অংশের ন্যায় পর্টুগালও যদি স্পেনের অন্তর্ভূত হইয়া যাইত, তবে সমধিক বলবৃদ্ধিনিবন্ধন এত অল্পকালে স্পেন এরূপ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িত না।

বড় বড় জাতিগঠন ব্যতীত সভ্যসমাজোচিত সমবেত শক্তিসাপেক্ষ অনেক কার্য্য অসম্ভব হয়। তন্মধ্যে উপনিবেশ স্থাপনের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। জর্ম্মণীর বর্ত্তমান ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য জর্ম্মণীর সম্মিলনের ফলমাত্র। একদেশবাসীগণ বিভিন্ন সমাজে বিভক্ত হইলে অনেক সময়ে বহুব্যাপক ভাষাবিকাশের বিঘ্ন ঘটে; এবং তাহা হইলে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের বিকাশও অসম্ভব হইতে পারে। সমবেত চেষ্টা এবং অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর অভাবজনিত শান্তি, এবং নিরুদ্বেগজাত শিল্প বাণিজ্যাদির উন্নতিও অনেক পরিমাণে জাতির সংখ্যাবাহুল্যের উপর নির্ভর করে। অতএব সংক্ষেপতঃ একদেশবাসী সমস্ত লোকের এক এক প্রবল জাতিতে পরিণতি ব্যতীত সামাজিক আত্মরক্ষা ও সভ্যতাবৃদ্ধির গুরুতর অন্তরায় জন্মে, এবং যেহেতু আত্মরক্ষা ও সভ্যতা এই দুই-ই নিতান্ত আবশ্যকীয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ সমূহের সম্মিলন দ্বারা প্রকৃতিদত্ত সীমাবিশিষ্ট একদেশবাসী সমুদয় জনগণের এক এক সুবৃহৎ জাতিগঠনও নিতান্ত আবশ্যকীয়।

আগামীবারে অবশিষ্ট প্রশ্নগুলির আলোচনা করিব।

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর্য্যদিগের অস্ত্রচিকিৎসা।

অস্ত্র-ক্রিয়াটা পাশ্চাত্য-চিকিৎসাবিজ্ঞানরূপ মহাতরুর অমৃতময় ফল বলিয়াই অনেকের ধারণা। কেহ কেহ বলেন, পাশ্চাত্য চিকিৎসার বহুল প্রচারে বহু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত ও দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। অস্ত্রচিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা, মূত্র-পরীক্ষা প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় চিকিৎসাতত্ত্বসমূহ প্রবীন ইউরোপীয় চিকিৎসকগণের মস্তিস্কপ্রসূত বলিতেও অনেকে কুণ্ঠিত নহেন। বহুদূরদর্শী বিশেষ গবেষণায় এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হইতে পারিয়াছেন যে, শুধু অস্ত্রচিকিৎসাদি কেন, আভ্যন্তরিক রোগনির্ণয়ের প্রকৃষ্ট পদ্ধতিও পাশ্চাত্য চিকিৎসক ব্যতীত অন্য কেহ সম্যক্ পরিজ্ঞাত নহে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অসম্পূর্ণতার পক্ষেও এই সকল যুক্তি অকাট্য! সাহেবদের ইতিহাস পাঠে যাহারা ভারত-তত্ত্বজ্ঞ, অনুকরণপ্রিয়তা যাহাদের মজ্জাগত, তাহাদের এই সকল উক্তি বিস্ময়কর নহে। দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সহিত যাহাদের সামান্যরূপও সম্পর্ক সংস্থাপিত রহিয়াছে, দেশের অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিতে অবশ্যই তাহারা সমর্থ। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের আলোচনা করিলে বিদিত হওয়া যায় যে, যখন রত্নপ্রসূ ভারত ভূমিতে ইংরেজ বণিক্‌গণ শুভ পদার্পণ করেন নাই কিম্বা ভারতগগণে যখন মোগল পাঠানের বিজয়-পতাকা উচ্ছ্রিত হয় নাই, তাহারও বহুশতাব্দী পূর্ব্বে * সুশ্রুত হারীত প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ বিরচিত

---

* বিদেশীয় ডাঃ ওয়াইজ বলেন, "অতি পূর্ব্বকালে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় হইতে নবম কি দশম শতাব্দীর মধ্যে চরক সুশ্রুতাদির গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে।"

রিভিউ অফ দি হিষ্টরী অফ মেডিসিন্, ১ম ভাগ ৩৯ পৃঃ।

হইয়াছে, সেই সকল প্রাচীন গ্রন্থে অস্ত্রচিকিৎসা ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতির বিবরণ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ইহা বলিলে সম্ভবতঃ অত্যুক্তি হইবে না যে, পূর্ব্বকালে আর্য্য-ভিষক্-সম্প্রদায় অস্ত্রচিকিৎসা প্রভৃতির যেরূপ উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন, আধুনিক বিদেশীয় চিকিৎসকগণ তাঁহাদের মতেরই পুষ্টি-সাধন করিতেছেন মাত্র। বহু পরীক্ষা গবেষণা দ্বারা অস্ত্রবিৎ ইউ-রোপীয় চিকিৎসকগণ দিন দিন অস্ত্রচিকিৎসার যে সকল নূতন তত্ত্ব ও অস্ত্র যন্ত্রাদির আবিষ্কার করিতেছেন; বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের সুক্ষ্মদর্শী ভারতীয় অস্ত্রচিকিৎসকগণ তৎসমস্তই আবিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন * বিশেষতঃ তাঁহারা অস্ত্র যন্ত্রাদির প্রয়োগ সম্বন্ধে যে সকল বিধি ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাও আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদিত নহে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। আমরা অন্ধ-বিশ্বাসে বা বিদ্বেষ-বুদ্ধির সাহায্যে অতি-রঞ্জিত করিয়া প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতীত কোন বিষয়েরই অবতারণা করিব না। আমরা তুলনায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অস্ত্রচিকিৎসার যন্ত্রাদির আকৃতি প্রকৃতি ও প্রয়োগ প্রণালীর বিশেষ অবিশ্বাস্য সাদৃশ্য দেখিতে পাই, যথাস্থানে তাহা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিব। কেবল প্রবন্ধবিস্তৃতি ভয়ে এ বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিতে না পারিয়া ক্ষুদ্ধচিত্তে আমরা দিকমাত্র নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইব।

* উদারচেতা ডাঃ ওয়াইজ বলেন "অস্ত্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের অবস্থান, প্রকৃতি এবং শরীরবিজ্ঞান সম্বন্ধে সার্জ্জনদিগের জ্ঞান লাভ করা কিরূপ প্রয়োজনীয়, তাহা প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসকগণ বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন" ডাঃ ওয়াইজ কৃত রিভিউ অফ দি হিষ্টরী অফ মেডিসিন্, ৩২৫ পৃঃ ১ম ভাগ।

যন্ত্রের শ্রেণী সংখ্যা ও গঠন প্রণালী।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অস্ত্র সাধারণতঃ যন্ত্র ও শস্ত্ররূপে দুইভাগে বিভক্ত *। শরীরস্থ শল্য † সকল উদ্ধৃত করিবার নিমিত্ত যাহা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে যন্ত্র বলে। যন্ত্র সকল স্থূলতঃ ছয় প্রকার স্বস্তিক যন্ত্র, সন্দংশযন্ত্র, তালযন্ত্র, নাড়ীযন্ত্র, শলাকাযন্ত্র ও উপযন্ত্র ‡। সূক্ষ্মরূপে আবার এক একটীতে বহুবিধ ভেদ দৃষ্ট হয় §। যন্ত্রগুলি সাধারণতঃ তীক্ষ্ণ লৌহদ্বারা নির্ম্মিত হয়, কিন্তু উৎকৃষ্ট লৌহাভাবে লৌহের ন্যায় গুণবিশিষ্ট দ্রব্যান্তর দ্বারাও প্রস্তুত হইতে পারে। যন্ত্রগুলির অগ্রভাগ সিংহাদি পশু ও কাক প্রভৃতি পক্ষীর মুখাবয়বের ন্যায় কল্পিত হইয়া থাকে এবং ছাত্রদের বোধ-সৌকর্য্যার্থে সাদৃশ্য হেতু তৎ তৎ পশু পক্ষীর নামেই অভিহিত হইয়াছে ¶।

যন্ত্র-সমূহ সুচারুরূপে নির্ম্মিত ও প্রয়োজন ভেদে খর-মসৃণ-মুখ হওয়া আবশ্যক এবং যাহাতে সুদৃশ্য সুদৃঢ় ও অনায়াসে গ্রহণ যোগ্য হয়, তৎবিষয়ে মনোযোগ থাকা কর্ত্তব্য। ||

---

* আয়ুর্ব্বেদে যন্ত্র ও শস্ত্র যদিও ভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, সাদৃশ্য হেতু আমরা এক স্থলেই ইহা সন্নিবেশিত করিলাম।

† শরীর ও মনের কষ্টদায়ক দ্রব্য সমূহকে শল্য কহে, কিন্তু এই স্থলে শরীরের কষ্টদায়ক পদার্থকেই বুঝাইতেছে, যথা—কাচ কণ্টক প্রভৃতি। সুশ্রুত ৭ম অঃ ৩য় শ্লোক (সূত্রস্থান)।

‡ সুশ্রুত ৭ম অঃ ৪ শ্লোক (সূত্র স্থান)।

§ স্বাস্তিক যন্ত্র ২৪, সন্দংশ যন্ত্র ২, তাল ২, নাড়ীযন্ত্র ২০, শলাকা ১৮, উপযন্ত্র ২৫শ প্রকার।

¶ অষ্টাঙ্গ হৃদয় সূত্রস্থান ২৫ অধ্যায় ৫ম শ্লোক, নাম যথা—সিংহাস্য কাকাস্য প্রভৃতি।

|| ৭ম অঃ ৫ম শ্লোক সূত্রস্থান, সুশ্রুত।

স্বস্তিক জাতীয় যন্ত্রের নির্ম্মাণ ও প্রয়োগ প্রণালী।

স্বস্তিক জাতীয় যন্ত্র দৈর্ঘ্যে ১৮ অঙ্গুলী পরিমিত। এই যন্ত্রগুলি পশু পক্ষীর মুখের ন্যায় রচিত হইয়া থাকে। *

এই যন্ত্র দুইখানি পৃথক্ লৌহখণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত এবং ঐ লৌহখণ্ড-দ্বয় একটী ক্ষুদ্রাকৃতি খিলের দ্বারা সংযোজিত থাকে, মূলদেশ কিঞ্চিৎ নত হওয়া উচিত। অস্থির মধ্যে শল্য প্রবিষ্ট হইলে তদুদ্ধরণার্থ এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। †

সন্দংশ যন্ত্র, এই যন্ত্র দ্বিবিধ; কর্ম্মকারের শাঁড়াশীর ন্যায় একটী খিল যোগে গঠিত, দ্বিতীয় চিম্‌টার ন্যায় খিলযুক্ত নহে ‡ উভয়েই ষোল অঙ্গুলী পরিমিত, ত্বক্ মাংস শিরা স্নায়ুগত কণ্টকাদি শল্যোদ্ধার করাই ইহাদের কার্য্য।

তালযন্ত্র। ইহাও দুই প্রকার এবং মৎস্য শল্কের ন্যায় পাতলা মুখ বিশিষ্ট, অপরটী পূর্ব্বোক্তটীর ন্যায় দুই মুখযুক্ত। এই যন্ত্র নাসা-কর্ণাদি-বিবর-প্রবিষ্ট শল্য বহিষ্করণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয় §।

---

* পশুর মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, নেকড়ে, তরক্ষু, ভল্লুক, চিতাবাঘ, বিড়াল, শৃগাল, হরিণ ও এবারুক (হরিণের ন্যায় জন্তু বিশেষ)। পক্ষীর মধ্যে কাক, পেঁচা, চিল, বাজ, বক প্রভৃতি ২৪টীর মুখের ন্যায় রচিত হয়। সুশ্রুত ৭ম অঃ সূত্রস্থান।

† অষ্টাঙ্গ হৃদয় ২৫ অঃ ৭ম শ্লোক সূত্রস্থান। এই দেশীয় স্বস্তিক যন্ত্র যেমন বিভিন্নরূপে রচিত ও ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, ডাক্তারিমতেও তদ্রূপ নানা প্রকার প্রস্তুত হইয়া থাকে। ডাক্তারিতে সাধারণতঃ ইহাদিগকে Bone forceps বলে।

‡ সুশ্রুত, সূত্র ৭ম অঃ। আয়ুর্ব্বেদে ইহা দ্বিবিধ। ডাক্তারিমতে ইহা বহু প্রকার—উভয় মতেই কার্য্যতঃ বড় একটা পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। ডাক্তারি নাম ফরসেপ্স (forceps).

§ অষ্টাঙ্গ হৃদয় ২৫ অঃ ১০ শ্লোক (সূত্র) ডাক্তারি কবিরাজিতে কোন পার্থক্য নাই। ডাক্তারি মতে ইহাকে Ear forceps কহে।

নাড়ী যন্ত্রের গঠন ও প্রয়োগপ্রণালী।

নাড়ী যন্ত্র বহু প্রকার, গঠন বিশেষে কর্ণ-বিবরস্থ শল্যোদ্ধার অর্শ ভগন্দর প্রভৃতি রোগ পরীক্ষা নির্ব্বাহিত হয়। *

শলাকাযন্ত্রের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী।

শলাকাযন্ত্র কার্য্যভেদে নানা প্রকার গঠিত হয় এবং শোথাদির গতি নিরূপণ, শল্যাদির উর্দ্ধোত্তলন এই যন্ত্রের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়। প্রয়োজন বিশেষে ইহা গণ্ডূপদ (কেঁচো) শরপুঙ্খা ও সর্প ফণাদির ন্যায় গঠিত হয়। †

সূক্ষ্মদর্শী সুশ্রুত যন্ত্রাদির ক্রমোন্নতি বিধানের জন্য ভাবি-চিকিৎসকদিগকে সস্নেহবচনে বলিয়া গিয়াছেন, "আমি যাহা বলিলাম, যন্ত্রাদি-চিকিৎসার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাবলে যন্ত্রাদির গঠন ও কার্য্যপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধন করিবেন।" ‡

যন্ত্র সম্বন্ধে একরূপ বলা হইল। § এখন শস্ত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি।

---

* আয়ুর্ব্বেদের নাড়ী যন্ত্রের অন্তর্গত অর্শোযন্ত্র আর ডাক্তারি anal specular এক নয় কি ?

বস্তি যন্ত্র আর Enema syringe একই যন্ত্র।

† সুশ্রুত ৭ম অঃ সূত্র। আয়ুর্ব্বেদের শলাকা যন্ত্রের কার্য্য, ডাক্তারির probe দ্বারা সম্পাদিত হয়। শলাকা যন্ত্রের অন্তর্গত গর্ভ শঙ্কু ও যোগ্য শঙ্কু যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, ইয়ুরোপীয়দের (Crotchet ও Forceps) সেই কার্য্য সম্পাদন করে নাকি ?

অশ্মরী যন্ত্রের ডাক্তারি নাম Stone forceps পাষাণ প্রভৃতি উপযন্ত্র। তাহা লিখিত হইল না।

‡ সুশ্রুত ৭ম অঃ ১৪ শ্লোক (সূত্র)।

§ যন্ত্রের সংখ্যা ১০১ এবং যন্ত্রের দ্বাদশটী দোষ দৃষ্ট হয় যথা,—অতিস্থূল অসার অতিদীর্ঘ অতিক্ষুদ্র অগ্রাহি, বক্র, শিথিল, অত্যুন্নত, মৃদুকীলক, মৃদুমুখ, মৃদুপার্শ্ব ও বিষমগ্রাহী।

শস্ত্র স্থূলতঃ বিংশতি প্রকার, যথা * মণ্ডলাগ্র, করপত্র, বৃদ্ধিপত্র, নখশস্ত্র, মুদ্রিকা, উৎপলপত্র, অর্দ্ধধার, সূচী, কুশপত্র, আটীমুখ, শরারি মুখ, অন্তর্মুখ, ত্রিকূর্চ্চক, কুঠারিকা, ব্রীহিমুখ, আরা-বেতসপত্রক, বড়িশ, দন্তশঙ্কু ও এষণী। এই শস্ত্রগুলিও যন্ত্রের ন্যায় উত্তম লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হয়। মণ্ডলাগ্র লেখন ছেদনাদি (আঁচড়ান, চেরা প্রভৃতি) কার্য্যে ও করপত্র অস্থির ছেদনকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। †

শস্ত্রের সংখ্যা নির্ম্মাণ ও কার্য্যপ্রণালী।

বাহ্বট বলেন, মণ্ডলাগ্র অস্ত্রের ফলা তর্জ্জনীর ন্যায় স্থূল এবং অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ বক্র, বৃদ্ধিপত্র ক্ষুরাকার শস্ত্র, ইহাও ছেদনাদিতে ব্যবহার্য্য। ‡

নরুণের ন্যায় নখ শস্ত্রের গঠন ও কার্য্য, এই অস্ত্র দৈর্ঘ্যে ৯ অঙ্গুলী পরিমিত, বাহ্বটের মতে উৎপল-পত্র ও অর্দ্ধধার-শস্ত্র দীর্ঘ-মুখ-বিশিষ্ট এবং ছেদন ভেদনাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। সুশ্রুতের মুদ্রিকা শস্ত্রই সম্ভবতঃ অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের "অঙ্গুলী শস্ত্র"। ইহার মুখ একটি অঙ্গুরীয়ের মধ্য দিয়া বহির্গত থাকে। ফলা অর্দ্ধ অঙ্গুল আয়ত; ইহার আকৃতি মণ্ডলাগ্র বা বৃদ্ধি পত্রের সমান। চিকিৎসকের তর্জ্জনী অঙ্গুলীর অগ্র পর্ব্বের যে পরিমাণ, তদনুরূপ মুদ্রিকা উহাতে অর্পিত হইয়া থাকে; এই শস্ত্র সূত্রদ্বারা মণিবন্ধে বদ্ধ করিয়া

* বাহ্বটের মতে শস্ত্র সংখ্যা ষড়বিংশতি। উভয় মতেই এই সংখ্যা স্থূলতঃ লিখিত হইয়াছে, বস্তুতঃ শস্ত্র বহুপ্রকার।

† সুশ্রুত ৮ম অঃ। ছেদন ভেদনাদি কার্য্য সম্পাদনের জন্য আর্য্য চিকিৎসকগণ মণ্ডলাগ্র উৎপলপত্র প্রভৃতি শস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন; ডাক্তার মহাশয়েরাও Lancets ব্যবহার করিয়া থাকেন।

‡ বিদেশীয় চিকিৎসকগণ নাড়ী ব্রণাদি ছেদনের জন্য Bistoary নামক যে অস্ত্র ব্যবহার করেন কবিরাজ বর্গের বৃদ্ধিপত্র তদনুরূপ শস্ত্র।

গলস্রোতোগত ব্যাধির ছেদনাদিতে ব্যবহার করা যায়। সূচী, কুশপত্র, আটী মুখ শরারি মুখ এবং ত্রিকূর্চ্চক নামক শস্ত্র দ্বারা পূযাদি বিস্রাবণ কার্য্য সম্পাদিত হয়। সীবন (সেলাই) কার্য্যে তিন প্রকার সূচীর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সূচীসমুদয় গোলাকার এবং ইহাদের সূতা দৃঢ় ও গূঢ়ভাবে থাকে (অর্থাৎ উঁচু হইয়া থাকে না) যে সকল সূচী সম্পূর্ণ গোল ও চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং একটী গোলাকার পিঠের উপরি অবস্থিত তাহাকে কূর্চ্চ কহে। কূর্চ্চ (কুঁচি) সংখ্যায় সাত বা আট ও সুন্দররূপে বদ্ধ। নীলিকা ব্যঙ্গ ও কেশ ছেদন এবং ভেদন করিতে ইহা প্রয়োজনীয়। কুশ-পত্র (বাহ্বটের মতে কুশাটা) মুখের স্রাব কার্য্যে প্রয়োজনীয়। কুশ পত্র ও শরারি মুখ অস্ত্রের ফলা ২ অঙ্গুলি আয়ত। অন্তর্মুখ নামক শস্ত্র কুশ-পত্রের ন্যায় গঠিত, কিন্তু ইহার ফলা অর্দ্ধ অঙ্গুলি দীর্ঘ। আটী মুখ শস্ত্র ও কুশ পত্র সদৃশ। কুঠারিকা ব্রীহি মুখ ও বেতসপত্র-শস্ত্র দ্বারা ব্যধন (বেঁধা) কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। কুঠারি নামক শস্ত্রের সংস্থান-দণ্ড (যে দণ্ডের উপরি উহা অবস্থিত) স্থূল এবং মুখ ভাগ গোদণ্ড সদৃশ ও অর্দ্ধাঙ্গুল; উহার দণ্ড ঊর্দ্ধভাগে ধরিয়া ইহা দ্বারা অস্থির উপরিস্থ শিরা বিদ্ধ করিতে হয়, ব্রীহি মুখ শস্ত্রের ফলা অর্দ্ধাঙ্গুল; * ইহা শিরা ও উদর ব্যধনে প্রযুক্ত হয়। আরা নামক সূচীর মুখ অর্দ্ধাঙ্গুল, গোলাকৃতি এবং প্রবেশ অর্দ্ধাঙ্গুল উপরেও অর্দ্ধাঙ্গুল। কাঁচা কি

* "কুঠারিকা এবং ব্রীহিমুখ শস্ত্র ধমনীর মুখ খুলিয়া দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইত।"

ডাঃ ওয়াইজ কৃত—
রিভিউ অফ দি হিষ্টরী অফ মেডিসিন্‌, ১ম ভাগ, ৩৬৩ পৃষ্ঠা।

পাকা সন্দেহ হইলে ইহা দ্বারা ব্রণ স্ফীতি বিদ্ধ করিয়া জানা যায়।* কর্ণপালী অত্যন্ত মাংসল হইলে ইহা দ্বারাই বিদ্ধ করিতে হয়। বেতস পত্র-শস্ত্র, বেতস-পত্রাকার। ইহা ষড়ঙ্গুল ও ব্যধন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এষনী অষ্টাঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ, অন্বেষণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। আহরণ-ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বড়িষা ও দন্ত শঙ্কু প্রযুক্ত হয়। এই অস্ত্র সকল দ্বারা এই অষ্টবিধ কার্য্য সম্পাদিত হয়। অস্ত্র সকলের ধারণ ও প্রয়োগ রীতি বাহুল্য-ভয়ে লিখিত হইল না। শস্ত্রে ৮ প্রকার দোষ দৃষ্ট হয়,—বক্র, কুণ্ঠ (ভোঁতা) খণ্ড (ভাঙ্গা) খরধার (যাহার ধার খরখরে) এবং অতি স্থূল সূক্ষ্ম এবং ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ। বাঁশ কাচ প্রভৃতি দ্বারাও কখন কখন অস্ত্র কার্য্য সম্পাদিত হইত। শস্ত্র প্রয়োগে যে চিকিৎসক সিদ্ধ-হস্ত, তাঁহার সাধনায় সিদ্ধি লাভ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং শস্ত্র প্রয়োগ যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা করিবে। †

শ্রীঅনুকূল চন্দ্র কাব্যতীর্থ।

* হারীতের মতে ১২ প্রকার যন্ত্র ও শস্ত্র।
হারীত সংহিতা, চিকিৎসাস্থান ভগ্ন চিকিৎসা।

† সুশ্রুত ৮ম অঃ সূত্র স্থান এবং অষ্টাঙ্গ হৃদয় ঐ ২৬ অঃ দ্রষ্টব্য।
আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অস্ত্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বিংশতি প্রকার অস্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। তাহার মধ্যে ছুরী সূচী প্রভৃতি প্রায় সমুদায় অস্ত্রই দৃষ্ট হয়।
ডাঃ ওয়াইজ কৃত গ্রন্থ—৩৫৫ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থ সমালোচনা।

অশোকগুচ্ছ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। কবিতাগুলির অধিকাংশ ইতিপূর্ব্বে "ভারতী", "সাহিত্য" প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং পৃথক পৃথকভাবে সাময়িক সাহিত্যের পাঠকবর্গের নিকট সুপরিচিত। দেবেন্দ্র বাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি।

> "দেবেন্দ্রের চিত্তনন্দনের
> সুন্দরী কবিতা-বধূ,—নয়নে তাহার
> কি ভঙ্গিমা! অঙ্গে অঙ্গে মরি কি মহিমা!
> কি গরিমা! অকপট সরল হাসিতে
> কি রঙ্গিমা! লীলাময়ী গতিতে তাহার
> ছন্দোবন্ধে কি মধুর শিঞ্জিনী-ঝঙ্কার।"

—একথা রসগ্রাহী মাত্রেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু কথাটা এই; গ্রন্থের আরম্ভে পুস্তকের নামকরণ সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রথম কবিতাটিতে গ্রন্থকার স্বয়ং এই কথাগুলি কি করিয়া বলেন? গ্রন্থের স্থানে স্থানে আরও এমন আত্মপ্রশংসা কবির নিজমুখে ঘোষিত হইয়াছে। "নারী মঙ্গল" কবিতাটি আগাগোড়া কবির আত্মযশোকীর্ত্তন। অবোধ শিশু অথবা উন্মাদই এরূপভাবে 'অকপট সরল হাসির' সহিত নিজের কথা বলিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন বয়ঃপ্রাপ্ত লোকে আত্মপ্রশংসা শুনিলে হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে পোষণপূর্ব্বক তাহা হইতে বিমল আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু স্বমুখে তাহা ব্যক্ত করা তাঁহার পক্ষে বিসদৃশ হইবে। এক নিজের অন্তরঙ্গ অভিন্নাত্মা পরিবার পুরিজনের নিকট নিজের সম্বন্ধে পরকৃত প্রশংসা অকপটে ব্যক্ত করা যায়, তাহা মার্জ্জনীয় হয়।

দেবেন্দ্র বাবু তাঁহার পাঠকসমাজকে কতকটা সেইরূপ চক্ষেই দেখেন বটে। তার কাছে তিনি ব্যক্ত না করেন এমন কথাই নাই। সব রকম ছিব্‌লামির সঙ্গে সঙ্গে

তান্ত আদিরসাশ্রিত ভাবের কথাও তাঁহার নিকট ছন্দোবদ্ধ হইয়া এই পুস্তকে প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে।

"কেহ বলে সকৌতুকে—"রবীন্দ্র বাবুর
হয়েছে 'কণিকা' আর হয়েছে 'ক্ষণিকা'
হউক 'গুড়িকা' নাম এ নব কাব্যের।"

তারপর 'প্রুফ সংশোধন' 'ইজিপ্টের মামি, গ্রীকপুরাণের 'ফিনিক্স্ পাখী', 'রেশমী-মলাট', প্রকাশকের নাম, এমন কি বোর্ন শেপাডের বাড়ীর কবির ফটো—ইত্যাদি কিছুরই উল্লেখ তাঁহার কবিতা হইতে বাদ যায় নাই।

'নিরালঙ্কারা'র শেষাংশ ভোগলালসা ও তদ্‌ব্যঞ্জক ভাষায় কুৎসিৎ। এমন আরও অনেক কবিতা আছে যাহার নামটির উল্লেখে ভাবুকের হৃদয়ে রমণী-সম্পর্কে একটি কমনীয় স্নিগ্ধ পবিত্র ভাব জাগিয়া উঠে, কিন্তু আভ্যন্তরীন বিষয়ে তাহা প্রতিহত ও ব্যথিত হয়; যথা—'সদ্যঃস্নাতা'।

দেবেন্দ্র বাবু যথার্থ ই একজন কবি, তাঁর প্রতিভা অপূর্ব্ববিভবশালিনী। কিন্তু যাহা নিত্যসত্য ও নিত্যসুন্দর তাহার সহিত গুটিকত ঝুটা জিনিষ মিশাইয়া তিনি তাঁহার প্রতিভার গৌরব অকাতরে পরিম্লান করিয়াছেন ইহাই আক্ষেপের বিষয়। যে কবিতার প্রথমাংশের অবিনয় প্রভৃতি দোষের উল্লেখ করিয়াছি, তাহারই শেষাংশের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখুন:—

"নামঞ্জুর! নামঞ্জুর! হল না পছন্দ।
পাইনা পাইনা নাম মাথা ঘামাইয়া;—
তার পর এক জন বিজন নিভৃতে
কল্পনার শিল্পশালা নিরালায় বসি
প্রেমচক্ষে শ্রীহরিরে বিশ্বময় হেরি
বর্ণের তুলিতে আঁকি যুগল-মুরতি
শ্রীরাধা কৃষ্ণের;—মগ্না, ভাবিতেছিলেন
কেমনে রাধার ওই অনিন্দ্য বদনে
ফুটায়ে তুলিব যত্নে, ভকতির বর্ণে
প্রতিভার বর্ণ মিশাইয়া, মহাদেবী

ম্যাডোনার সরলতা, পবিত্র মূরতি !
কহিলা, "নামের জন্য কেন রে পাগল
বাছা তোরা ? থাক নাম 'অশোকের গুচ্ছ' ।"
অশোকের গুচ্ছ ?—কই মা ইহাতে কোথা
নব বসন্তের কচি চিক্কণ পল্লব ?
রতির সীমন্ত-শোভী সিন্দূরের মত
অশোক পুষ্পের কই পদ্মরাগ-ছটা ?
নবোঢার ব্রীড়া-দীপ্ত-আরক্ত কপোলে
হাসি সম, কোথায় মা, আনন্দের রাশি ?
পবিত্র বিষাদ কই ? যে মাধুরী হেরি
মুছিয়া চক্ষের জল মলিন অঞ্চলে
হাসিত মধুর হাসি চিরদুঃখী সীতা !
এ যে সুধু মরুরাজ্য, ধূধূ করি উড়ে
অবিশ্রান্ত বালুরাশি, জন্মান্ধ ঝটিকা !
হাসিয়া কহিলা মাতা "নারে বাছা, তোর
অশোকের গুচ্ছে, নাহি সুষমার ওর।"

ইহা শুধু ছন্দে নহে, ভাবে নহে, ভাষায় নহে,—বিনয়েও মধুর রসাপ্লুত। "রাধারাণী", "বিজয়া", "স্বর্ণলতা", "মলিনহাসি", "নীরব বিদায়", "কলঙ্কিনীর আত্মকাহিনী", "আমার প্রিয়তমার দশটি ভগিনী", "অদ্ভুত রোদন", প্রভৃতি কবিতাগুলি উচ্চশ্রেণীর শিল্পীজনোচিত ভাব ও ভাষার মিলনে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

কবি স্বয়ং গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন নাই, তাঁহার একজন প্রকাশক আছেন, এবং "প্রকাশকের নিবেদন" গ্রন্থের দুই পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছে, উহাতে তিনি কবির প্রভূত গুণগান করিয়াছেন। সুতরাং "অশোক গুচ্ছ"র বন্ধনে ব্রতী হইয়া প্রকাশক বঙ্গসাহিত্যসেবীর যেমন ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, তেমনি উহার মধ্যহইতে আগাছাগুলি ঝাড়িয়া না ফেলায় কবির অপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক দোষভাগী বিবেচনা করিলে অন্যায়ও হইবে না।

সঙ্গিনী। শ্রীসুরমা সুন্দরী ঘোষ প্রণীত। সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষতঃ উপন্যাস ও কবিতার ললিতকলায়—বঙ্গমহিলাগণ এখন সুপরিচিত, সুতরাং মহিলারচিত বলিয়াই তাঁহাদের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ এখন আর কোন পুস্তকের দোষ উপেক্ষাপূর্ব্বক গুণভাগ বাড়াইয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই। অতএব আশাকরি স্পষ্ট সমালোচনায় গুণবতী লেখিকা ক্ষুব্ধ হইবেন না। পুস্তকের প্রারম্ভে তিনি তাঁহার কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'পবন দোলায় দুলি
ভাবের কলিকাগুলি
ফুটেনা শিহরি'।

এবং শেষাংশে আক্ষেপ করিয়াছেন—

'মিছে আমি তোরে সেবি
প্রসন্ন হ'লেনা দেবী, (?)
আপনা-প্রকাশ-ভাষা দিলেনা দীনারে।
বিদায়, বিদায় তবে, ডুবিগে অাঁধারে

আমাদের দেশের অধিকাংশ স্ত্রী-কবিগণের (এবং স্ত্রীপ্রকৃতিসম্পন্ন পুরুষকবিগণেরও) এই অল্পেতেই অাঁধারে ডুবিবার প্রবৃত্তি সাহিত্যে বড় শোচনীয় বস্তু। 'নৈরাশ্য' শীর্ষক কবিতাতেও তিনি বলিতেছেন—

'ফ্যাল্ তবে যবনিকা
ঘুমাই ঘুমাই !'

প্রথম বয়সের উদ্যম আশানুরূপ উৎকৃষ্ট না হইলেই যে অাঁধারে ডুবিতে হইবে বা যবনিকা ফেলিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। সকলই সাধনার বিষয়। যাহা কিছু লিখিয়াছি তাহাই ছাপাইতে হইবে এমন কোন আইন নাই—কবি আখ্যা প্রয়াসী বা প্রয়াসিনী একথা স্মরণ রাখিয়া সাধনা করিলে, চর্চ্চা রাখিলে, ক্রমশঃ হাত পাকিয়া আসিবে, এবং কালক্রমে কোন্‌গুলি পরিত্যজ্য কোন্‌গুলি প্রকাশযোগ্য তাহা আপনিই নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

এই পুস্তকে লেখিকার অনেকগুলি কবিতা স্থানপ্রাপ্ত না হইলেও কিছু ক্ষতি হইত না। তাহাদের ভাব জীর্ণ-সুপরিচিত, লেখিকা তাহাদের এমন কোন নূতন সৌন্দর্য্যের জ্যোতিতে মণ্ডিত করেন নাই যাহাতে আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ধূলি' 'দুর্ব্বোধ' প্রভৃতি কবিতার নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। কতকগুলি কবিতা মন্দ নহে—যথা, 'বিজ্ঞান ও কবিতা'; 'আদরিনী' ও 'আনন্দময়ী'তে লেখিকা মাতৃরূপে প্রকটিতা, স্বাভাবিকতার গুণে উহা ভালই হইয়াছে। 'কলঙ্কিনী' নারীর প্রতি লেখিকার উদারতায় তাঁহার কবিসুলভ সহানুভূতি ব্যক্ত, কবিতাটি টমাস্ হুডের Bridge of Sighsএর ভাবে অনুপ্রাণিত বলিতে হইবে। প্রেম সম্বন্ধে লেখিকার উচ্চ ধারণা বঙ্গীয় পাঠিকা—বিশেষতঃ পাঠকসাধারণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইলে বঙ্গীয় গার্হস্থ্য জীবন অনেক পবিত্রতর হইয়া উঠে সন্দেহ নাই ঃ—

লালসার জ্বালাহীন
নির্ম্মল নিষ্কাম,
প্রেম আত্মশুদ্ধি, তৃপ্তি,
চিত্তের বিশ্রাম।
ভালবাসা বাসনার
নহে উদ্বোধন ;
শুধু আত্মবলিদান
শুধু বিসর্জ্জন।

'শ্মশান-সঙ্গীত' কবিতায় লেখিকা তাঁহার পরিচিত আর একটি বালিকা-কবির মৃত্যুতে আক্ষেপ করিতেছেন। আমরা শেষোক্তের কবিতার নমুনা দেখিয়াছি, সুতরাং লেখিকার সহিত সহানুভূতি করিতে সক্ষম। উপসংহারে বক্তব্য, যদিও 'সঙ্গিনী'তে এমন কোন কবিতা নাই যাহার স্থায়িত্ব প্রত্যাশা করা যায়, তথাপি লেখিকা অতিরিক্ত আশায় উৎফুল্ল বা নিরাশায় ভগ্নোদ্যম না হইয়া স্থিরচিত্তে অনুশীলন করিতে থাকিলে কালে নিশ্চয়ই উন্নতিলাভ করিতে পারিবেন।

পুস্তকখানির বাহ্যিক পারিপাট্য খুবই প্রশংসনীয়। এ বিষয়ে কুন্তলীন প্রেস যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহা প্রত্যেক বঙ্গবাসীরই শ্লাঘার বিষয়।

মুকুর। শ্রীরমণীমোহন ঘোষ প্রণীত। জয়দেবের মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের মনোহর প্রেম-গীতির মধ্য দিয়া যে প্রেমের নদী সতেজে প্রবাহিত হইতেছিল, মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার ও পলাসির যুদ্ধে তাহার বেগ কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রজাঙ্গনাকাব্য, মদনপূজা ও অবকাশ-রঞ্জিনী প্রভৃতি কবিতা পুস্তকে একটি ক্ষীণ সূত্রের ন্যায় তাহার অস্তিত্ব প্রতিভাত হইত মাত্র; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাল হইতে সে নদী আবার পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। অনুকারীগণের পরিপোষণায় এখন তাহার উদ্দাম কলকলনাদী স্রোতোবেগ বঙ্গসাহিত্যের দুকুল প্লাবিত করিয়া দিয়া সমগ্র সাহিত্যক্ষেত্র একাকার করিয়া ফেলিতেছে। দেশের পক্ষে ইহা যে বড় মঙ্গলের কথা হইতেছে তাহা নহে। যদি জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় রুচি আশা ও আকাঙ্খার কিঞ্চিৎ পরিচায়কও হয়, তাহা হইলে সে সব বিষয়ে আমরা যে খুব উন্নতি লাভ করিতেছি, নিরবচ্ছিন্ন প্রণয়কবিতার প্রাবল্য সত্ত্বে একথা বলা শোভা পায় না। সুতরাং এই প্রেমপ্লাবিত বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে এই শ্রেণীর একখানি নূতন কবিতা পুস্তকের আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলা যায় না, এবং আবির্ভূত হইলেও উহা কতদূর সাদরে গৃহীত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে, কারণ অবিরত মিষ্টাস্বাদ করিতে থাকিলে মধুর উপরও বিরক্তি জন্মে। সমালোচ্য পুস্তকখানিতে সাধারণ সংগ্যক হা হুতাশ, দীর্ঘশ্বাস; নয়নজল, নিরাশা; অতৃপ্তি, ব্যাকুলতা; কোকিল-কূজন, ভ্রমরগুঞ্জন, মলয় পবন, চাঁদের কিরণ; মাধবী রজনী, বরষা যামিনী, শারদ প্রভাত; তমাল বকুল, কুমুদ কহ্লার, জাতি-যুঁথি-কামিনী; মালাগাথা, প্রেমকথা, প্রথমমিলন, বিরহবেদন; বংশীরব; স্বপন, সুষুপ্তি, ঘুমঘোর; অভিমান, অবহেলা; চখা-চখী, চকোর-চকরী, চাতক-চাতকী ইত্যাদি প্রেমকাব্যের নিত্যব্যবহার্য্য উপাদান কোনটিরই অভাব নাই। কিন্তু এসকল সত্বেও পুস্তকখানিকে আমরা ঠেলিয়া ফেলিতে পারিতেছি না; ইহাতে আমরা যে নবীন কবির আভাস পাইতেছি রবীন্দ্রনাথের শিষ্যবর্গের মধ্যে তিনি অক্ষয়কুমার বড়ালের পার্শ্বেই একটি উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য। তিনি শিষ্যত্ব অতিক্রম করিয়া স্বাধীনভাবে স্বীয়নাম প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয়।

'মুকুরে' যে প্রথম শ্রেণীর কবিতা নাই তাহা বলা বাহুল্য। প্রথম শ্রেণীর

কবিতা বলিতে আমরা সেই কবিতা বুঝি যাহা আমাদিগকে কোন নূতন সত্য শিখাইয়া দেয়, অথবা বাহ্য ও মনোজগতের চিরপরিচিত ও চিরপুরাতন ঘটনারাজি আমাদের নয়নসমক্ষে এরূপভাবে সমাবেশ ও সজ্জিত করিয়া ধরে যে তাহা একটি নূতন সত্যের ন্যায়ই প্রতিভাত হয় এবং আমরা তজ্জনিত একটি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব কাব্যসুখ অনুভব করি। তাদৃশ কল্পনাশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি বর্ত্তমান কাব্যে কোথায়ও অভিব্যক্ত হয় নাই। কিন্তু পক্ষান্তরে ইহাতে কতকগুলি কবিতা আছে যাহা সাধারণ ক্ষণজীবি কবিতাশ্রেণী হইতে অনেকটা উর্দ্ধে, যথা—সাধ, বিকাশ, স্মৃতি, উপমা প্রভৃতি। রমণী বাবুর কবিতায় বর্ত্তমান কবিদের একটি প্রধান দোষ—দুর্ব্বোধ্যতা দেখিলাম না। অনেক কবির পক্ষেই উহা কেবল তাহাদের কাব্যের অসারতা গোপনের নিস্ফল প্রয়াস মাত্র। কিন্তু রমণী বাবু তাঁহার কবিতাগুলি বৃথা শব্দাড়ম্বরে পরিপূর্ণ করিয়া পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তি পরীক্ষার নিমিত্ত তাহাদের নিকট একটি হেঁয়ালি উপস্থিত করেন নাই, তিনি সরলভাবে তাঁহার পণ্যদ্রব্যগুলি তাহাদের নিকট ধরিয়াছেন, সেগুলির সারবত্তা ও উৎকর্ষ্য দেখিয়া যদি পাঠকের পছন্দ হয় গ্রহণ করিবেন, তাহাদের বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া ক্রয় করিয়া অনুতাপ করিতে হইবে না।

রমণী বাবুর শব্দযোজনার ক্ষমতা বেশ আছে, এবং সুললিত ছন্দে তাহাদিগকে গ্রথিত করিতেও তিনি দক্ষ। তিনি বাছিয়া বাছিয়া এমন শব্দসকল প্রয়োগ করেন যে ভাবের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আমরা শব্দমাধুর্য্যেই অভিভূত হইয়া পড়ি; তাহার সহিত যখন আবার কোন সুন্দর সহজ ছন্দের সমাবেশ হয়, তখন ভাবের নূতনত্ব বা মহত্ব না থাকিলেও আমরা মুগ্ধ না হইয়া পারি না। 'উপমা' কবিতাটি ইহার একটি দৃষ্টান্ত, স্থানাভাবে আমরা উহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিলাম।

'জীবনের পথে,' প্রেমের রাণী,' 'মৃত্যু' প্রভৃতি কবিতায় জীবন সংগ্রামের কঠোরতা পরিব্যক্ত। কিন্তু কবির হৃদয় নিরাশামগ্ন নহে, তাঁহার বিশ্বাস আছে 'পূর্ণ হবে জীবনের ব্রত' এবং

> 'আপনি বিজয় লক্ষ্মী আসি
> কণ্ঠে মোর পরাইবে মালা'।

অনুশীলন করিলে তাঁহার এ আশা সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

পৌরাণিকী। "আলো ও ছায়া" প্রণেতৃ প্রণীত। তিনটী পৌরাণিক কাহিনীর সমষ্টিতে রচিত ইহা একখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ। প্রথমটি —একলব্য—একটি ক্ষুদ্র নাটিকা। দ্বিতীয় ও তৃতীয়—ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণ, ও রামের প্রতি অহল্যা,—দুটি ক্ষুদ্র 'মনোলোগ'। মাননীয়া কবির 'মহাশ্বেতা' ও 'পুণ্ডরীকে' আমরা যে স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্য ও পবিত্র উন্নত ভাবাবেশ দেখিয়াছিলাম ইহাতে তাহার কোন ব্যতিক্রম নাই দেখিয়া সুখী হইয়াছি। 'একলব্য' নাটিকাটি ক্ষুদ্র হইলেও বর্ণিত চরিত্রগুলি যথাযোগ্য বিকাশ লাভ করিয়াছে, একলব্যের মাতার ক্ষত্রসুলভ উচ্চাকাঙ্খা, একলব্যের কমনীয় তেজস্বিতা ও একাগ্র অধ্যবসায়, কর্ণের সূক্ষ্মনীতিজ্ঞানবিরহিত বীর্য্য, দ্রোণের তীব্র বর্ণাভিমান, অর্জ্জুনের বীরোচিত গুণগ্রাহিতা, ভীমের অসংযত স্পর্দ্ধা বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে। আত্মাভিমানী ও অজ্ঞাতপিতৃক কর্ণের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যদুটি তাহার পক্ষে কেমন স্বাভাবিক:—

'দয়া মম নাহি সহ্য হয়' (৯ পৃঃ)
'সুখী তুমি, দর্পভরে লহ পিতৃনাম' (১৫ পৃঃ)
'———অতি শ্রান্ত তুমি,
ক্লিষ্টকান্তি, দ্বিপ্রহরে যূথিকার মত।'

এই উপমাটিতে এক কথায় একলব্যের সুশোভন কমনীয়তা ও লাবণ্যময় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য অতি সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু কর্ণের সহিত দ্রোণের নির্জ্জন সাক্ষাতের প্রসঙ্গটি একটু থাপছাড়া হইয়াছে, নাটিকার পরিণতির পক্ষে ইহার কোন আবশ্যকতা নাই।

দ্রুপদরাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অস্ত্রশিক্ষার্থ আচার্য্য দ্রোণের শিষ্যত্ব প্রার্থী। পিতৃশত্রু দ্রোণের মৃত্যু কামনাই যে তাহার লক্ষ্য, তাহা জানিয়াও দ্রুপদের সহিত স্বীয় বাল্যসৌহার্দ্য স্মরণ করিয়া দ্রোণ তাহাকে শিক্ষাদানে সম্মত। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আচার্য্যোচিত গাম্ভীর্য্য সহকারে ব্রাহ্মণের প্রাধান্যের হেতু, দারিদ্র্যের তাড়না, পুরুষের প্রতিজ্ঞা রক্ষা, ও বাল্যস্মৃতির মাধুর্য্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সমস্ত কবিতাটির মধ্যে যেন গতজীবনের সুখস্মৃতির একটি করুন অথচ সংযত খেদগীতি

পরিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা, তেজীয়ান সৈন্ধবি 'অশ্বপৃষ্ঠে যুবদেহ' ধৃষ্টদ্যুম্নকে হঠাৎ দেখিয়া যুদ্ধ বিদ্যাবিশারদ বৃদ্ধ মহারথীর অভ্যন্ত 'নয়নের যে গভীর সুখ' জন্মিতেছে, বার্দ্ধক্যের অবসাদ যাহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিতে পারে নাই, সেটি মনোরম ও স্বাভাবিক হইয়াছে।

'জীবনের মূল্য শুধু যাপন প্রথায়,
সুদীর্ঘ আয়ুতে নহে।'

ইহা দ্রোণোচিত বাক্যই বটে।

দারিদ্র্যপীড়িত দ্রোণের নিম্নলিখিত বাক্যটি নব্যবঙ্গের বিশেষ অনুধাবনীয়:—

'———শূদ্র বৈশ্য বা ব্রাহ্মণ,
যেই হোক্, করুক্ সে জগতের কাজ
যে বিধানে, গৃহস্থ সে হইবার আগে
ভাবে যেন কি উপায়ে করিবে পোষণ
আপন কলত্র পুত্র স্বাধীন গৌরবে।'

'রামের প্রতি অহল্যা'র ক্ষমার প্রয়োজনতা ও উপকারিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। ক্ষমাহীন ধার্ম্মিকের বর্ণনাটি বেশ পরিস্ফুট:—

'ক্ষমাহীন কভু কোন ধার্ম্মিক কঠিন,
খররবিকর দীপ্ত, বৃষ্টিপঙ্কহীন,
উজ্জ্বল মরুর মত, কভু জ্বালাময়,
প্রাণান্ত শীতল কভু, নহে সে আশ্রয়
ভ্রান্ত শ্রান্ত ক্ষতপাদ পথিক জনের
জীবনের দীর্ঘ পর্য্যটনে।'

কবিতা কয়টি উচ্চভাবে পরিপূর্ণ ও একটি সুদূরাগত পৌরাণিক স্মৃতির সৌরভে মণ্ডিত।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থ সাহেব।*

গৌড়ীসুখ—মণীমহল্লা সলোকু। (সুর)

ওঁকার সতি গুরুপ্রসাদি।

ওঁকার সত্য গুরু প্রসাদে।

আদি গুরবে নমঃ। যুগাদি গুরবে নমঃ। সত্য গুরবে নমঃ।

শ্রীগুরুদেবায় নমঃ।

অষ্টপদী।

স্মর স্মরিয়া স্মরিয়া সুখ পাও।
কলি-ক্লেশ তনূ মধ্যে মিটাও॥
স্মর সেই বিশ্বম্ভর একে।
যাঁর অনন্ত নাম জপে অনেকে॥
বেদ পুরাণ স্মৃতি শুদ্ধাক্ষর।
তায় সার রাম নাম একাক্ষর॥
নামের কণিকা যাঁর আসে রসনায়।
তাঁহার মহিমা কভু গণনে না যায়॥
আশা যাঁর একমাত্র দর্শন তোমার।
তাঁর সঙ্গে হে নানক আমারে উদ্ধার॥
সুখমণি সুখ অমৃত প্রভু নাম।
ভগবদ্ জনের তায় মনের বিশ্রাম॥

রহাউ। ১

প্রভুর স্মরণে না হয় গর্ভবাস।
প্রভুর স্মরণে হয় দুঃখ-যম-নাশ॥
প্রভুর স্মরণে (তীব্র) কাল পরিহরে।
প্রভুর স্মরণে শত্রু পলায়ন করে॥
প্রভুর স্মরণে কোন বিঘ্ন নাহি লাগে।
প্রভুকে যে স্মরে সেই অনুদিন জাগে॥
প্রভুর স্মরণে দূরে যায় ভব-ভয়।
প্রভুর স্মরণে দুঃখ নাহি সন্তাপয়॥
প্রভুর স্মরণ হয় সাধকের সঙ্গ।
হে নানক সর্ব্ব নিধান হরিরঙ্গ॥ ২॥

প্রভুর স্মরণে নবনিধি ঋদ্ধি সিদ্ধি।
প্রভুর স্মরণে জ্ঞান ধ্যান তত্ত্ববুদ্ধি॥
প্রভুর স্মরণে জপতপ পূজা হয়।
প্রভুর স্মরণে দ্বৈত জ্ঞান নষ্ট হয়॥

---

* "গ্রন্থ সাহেব" বীরজাতি শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহার অংশ বিশেষ প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক শিখকে পাঠ করিতে হয়। "ভারতী"র পাঠকগণের তৃপ্ত্যর্থ উহার কয়েক ছত্রের অনুবাদ প্রকাশিত হইল। বঙ্গভাষায় গ্রন্থ সাহেবের অনুবাদ-চেষ্টা এই প্রথম।

প্রভুর স্মরণে সদা হয় তীর্থ স্নান।
প্রভুর স্মরণে হয় স্বর্গে অবস্থান ॥
প্রভুর স্মরণে হয় সমস্ত মঙ্গল।
প্রভুর স্মরণে ফলে সমস্ত কুশল ॥
স্মরাও যাহারে প্রভু স্মরে সেই জন।
নানক কামনা করে তা'র শ্রীচরণ ॥ ৩ ॥

প্রভুর স্মরণ হয় উচ্চ সবাকার।
প্রভুর স্মরণে হয় নীচের উদ্ধার ॥
প্রভুর স্মরণে সব তৃষ্ণা নিবারয়।
প্রভুর স্মরণে সর্ব্বদর্শী লোকে হয় ॥
প্রভুর স্মরণে নাহি রয় যম ত্রাস।
প্রভুর স্মরণে সর্ব্ব পূর্ণ হয় আশ ॥
প্রভুর স্মরণ মন সুনির্ম্মল করে।
পশিয়া অমৃত নাম হৃদয় ভিতরে ॥
সাধকের রসনায় প্রভুর নিবাস।
নানক সেই সাধকের দাসানুদাস ॥ ৪ ॥

প্রভুকে যে জন স্মরে সেই ধনবান।
প্রভুকে যে জন স্মরে সেই পতিবান ॥
প্রভুকে যে জন স্মরে সে জন প্রমাণ।
প্রভুকে যে স্মরে সেই পুরুষ প্রধান ॥
প্রভুকে যে স্মরে তার অভাব না রয়।
প্রভুকে যে স্মরে সে সর্ব্বত্র শোভা পায় ॥
প্রভুকে যে স্মরে সে সর্ব্বদা সুখবাসী।
প্রভুকে যে স্মরে সে সর্ব্বদা অবিনাশী।
নিয়ত স্মরে যে, প্রভু, তোমার কৃপায়।
নানক তাহার সঙ্গ-পদরজ চায় ॥ ৫ ॥

*   *   *
*   *

শ্লোক। দীন-দরিদ্রতা-দুঃখভঞ্জন প্রতি
ঘটে অনাথের নাথ।
স্মরণে তোমার আসিয়াছি প্রভু
নানকের সাথ ॥

অষ্টপদী।

মাতা পিতা সুত মিত ভাই নাই যেথা।
সঙ্গের সহায় তব, মন, নাম সেথা ॥
সুভীষণ যমদূত যেথা সবে দলে।
সেখানে কেবল মাত্র নাম সঙ্গে চলে ॥
অত্যন্ত বিপদ যেথা, তথাও নিমেষে।
উদ্ধার নিশ্চয় হয় হরি নামাবেশে ॥
বহু পুণ্যাচরণে যে পাপ নাহি তরে।
হেন শতকোটী পাপ হরি নামে হরে ॥
গুরু দত্ত নাম মুখে জপ মোর মন।
নানক পাইবে সুখঘন সর্ব্বক্ষণ ॥ ১ ॥

সমস্ত সৃষ্টিতে যেই আছে মহাদুঃখী।
হরির নামেতে সেই জন হয় সুখী ॥
লাখ্ কোটী বন্ধনে প'ড়ে করে হাহাকার।
হরি নাম জপি হয় ত্বরিত নিস্তার ॥
মায়ায় অনেক তৃষ্ণা কভু না নিভায়।
সে মায়া হরির নাম জপে দূরে যায় ॥
একাকী যে মার্গে যায়, সঙ্গে নাই সঙ্গী।
হরি নাম হয় তার পথের সুসঙ্গী ॥
সর্ব্বদা এমন নাম কর মন, ধ্যান।
নানক পরমগতি গুরুমুখে পান ॥ ২ ॥

লাখ্ কোটী বাহু নারে ছুটাইতে যাহা।
নাম জপে পলাইয়া দূরে যায় তাহা ॥

যাহারে অনেক বিঘ্ন আসি সংহারয়।
তখনি তাহারে হরি নামে উদ্ধারয়॥
অনেক যোনিতে জন্মে মরে বারম্বার।
নাম জপে একেবারে সহজে উদ্ধার॥
কখনও অহং মল ধৌত নাহি হয়।
শুধু হরি নাম করে কোটী পাপক্ষয়॥
মাতিয়া এমন নাম জপ কর মন॥
নানক সে সাধুসঙ্গ করে আকিঞ্চন॥ ৩॥

অসীম যে পথ যার অগণন ক্রোশ।
সহজেই হরি নামে হয় তার তোষ॥
ঝটিকা-আকীর্ণ পথ আর ধুলিময়।
উজ্জ্বল সে পথ শীঘ্র হরি নামে হয়॥
যে পথের কোন কিছু নাহিক সীমানা।
সহজে হরির নামে যায় তাহা চিনা॥
অত্যন্ত ভয়াল তাপ গরম যথায়।
হরি নাম চন্দ্রাতপ-সুছায়া তথায়॥
তৃষ্ণায় কাতর মন হইবে যথায়।
হরি নামামৃত বর্ষে নানক তথায়॥৪॥

ভক্ত জনেতে বর্ত্তে অমৃত হরিনাম।
সেই হরিনাম সন্ত জনের বিশ্রাম॥
হরিনাম একমাত্র দাসের ভরসা।
হরিনাম কোটীজন উদ্ধারের আশা॥

দিবানিশি করে সন্ত হরি যশোগান।
সাধুর জীবিকা হরি ঔষধানুপান॥
পরব্রহ্ম হরিনাম যেই হরিজন।
নিরন্তর নিজ হৃদে করয়ে ধারণ॥
এক মদে মত্ত হ'য়ে থাকে তনু মন।
বিরতি বিবেক পায় নানক সে জন॥৫।

হরি নাম হয় মুক্তি যুক্তি।
হরি নাম হয় তৃপ্তি ভুক্তি॥
হরিনাম হয় মানবের রূপ রঙ্গ।
হরিনাম জপ কভু হয়না'ক ভঙ্গ॥
হরিনাম লোকের গৌরব।
হরিনাম জনের সৌরভ॥
হরিনাম হয় ভোগ যোগ।
হরিনামে নাহিক বিয়োগ॥
হরিনামে অনুরক্ত যে জন সদাই।
নানক তাহার পূজা সেবা করে ভাই॥৬।

*　　*　　*

*　　*　　*

শ্লোক। বহু শাস্ত্র বহু স্মৃতি বৃথা করিতেছ অন্বেষণ।
অমূল্য হরির নাম কর সদা নানক, সাধন॥

শ্রীসত্যোপেন্দ্র মল্লিক।

পতন।

সুকুমারী আজ দুই দিন তাহার স্বামীর পত্র না পাইয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। সে এ বাটীর ছোটবউ, তাহার শ্বশুর বড়লোক,—তাহাকে কোনও সাংসারিক কায করিতে হয় না;—খালি অনেক উপন্যাস পড়িতে হয়, বড় যায়ের সঙ্গে, ননদ দুইটির সঙ্গে গল্প করিতে হয়, তাস খেলিতে হয়, মধ্যে মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটিও করিতে হয়। সুতরাং স্বামীকে পত্র লেখা ও তাহার পত্র পাওয়া সুকুমারীর দৈনন্দিন জীবনের একটা প্রধান কায। আর একটা কায তাহার আছে, সেটা বড় প্রীতিকর নহে, তাহাকে অনেক ঔষধ খাইতে হয়। মধ্যে মধ্যে কম্প দিয়া তাহার জ্বর আসে।

সুকুমারী যে স্বামীর পত্র পাইতেছেনা, ভাবিতেছে, তাহা বাড়ীর বিড়ালটা পর্য্যন্ত অবগত ছিল। আজ বেলা দশটার সময় সুকুমারী কাপড় ছোপাইবে বলিয়া শিউলি ফুলের বোঁটা কাটিতে বসিয়াছিল, তাহার ছোট ননদ মন্না ছুটিয়া আসিয়া বলিল "ওলো ভেবে মরছিলি, এই নে, তোর বরের চিঠি এসেছে।" সুকুমারী আগ্রহের সহিত চিঠি লইয়া নিজের শয়নঘরে পলায়ন করিল। চিঠি খুলিয়া যাহা পড়িল, তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। চিঠি এইরূপঃ—

"সুকুমারী—আমি নিদারুণ মনস্তাপে দগ্ধ হইতেছি, আমি তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি—আমি আর তোমার ভক্তিযোগ্য স্বামী নহি। আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল,—কুসঙ্গের দোষে, প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছি। সব কথা পত্রে লিখিবার নহে, সাক্ষাতে বলিব। আজ সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী আসিব। অকপটে

তোমার কাছে সব বলিব, তোমার ভালবাসা যদি আমায় ক্ষমা করিতে পারে, তবে আমি আবার আমি হইব,—নচেৎ সব ফুরাইয়াছে।

তোমার হতভাগ্য অবিনাশ।”

পত্রখানি প্রথমবার পাঠ করিরা সুকুমারী বুঝিল একটা কোনও ভয়ানক জিনিষ ঘটিয়াছে, কিন্তু কি ঘটিয়াছে তাহা ভাল উপলব্ধি করিতে পারিল না। বারম্বার পড়িতে পড়িতে একটা অর্থ তাহার মনে হইতে লাগিল। তাহার শরীর শিথিল হইয়া আসিল, আর দাঁড়াইতে পারিলনা। খাটের উপর বসিয়া পড়িল। বসিয়া আবার একবার পত্র খানি পাঠ করিল,—করিয়া সে খানিকে কুচি কুচি করিরা ছিঁড়িয়া ফেলিল। মুষ্টি ভরিয়া ছিন্নপত্র জানালা গলাইয়া বাহিরে বাগানে ফেলিয়া দিল।

পর মূহূর্ত্তে মনে হইল, যদি কেহ ছেঁড়াগুলি কুড়াইয়া লয়, জোড়া দিয়া পড়ে! তৎক্ষণাৎ সে বাগানে গিয়া ছেঁড়া কাগজগুলি একটি একটি করিয়া খুঁটিয়া তুলিয়া লইল। তাহার আঙুলের কচি ডগাগুলিতে শিশির ও কাদা লাগিয়া গেল। কিছু দূরে অন্য বাটীর সদর দরজায় বৈষ্ণব ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছিল, আনমনে একটু দাঁড়াইয়া তাই শুনিল। ছেঁড়া চিঠির কাগজ গুলি আচলের খুঁটে বাঁধিয়া শয়নঘরে ফিরিয়া আসিল।

ভারি শীত করিতে লাগিল। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে যেমন হয়, ঠিক সেই রকম। বিছানায় উঠিয়া লেপ মুড়ি দিয়া সুকুমারী শয়ন করিল। লেপের মধ্যে, প্রথম তাহার চোখের জলের বাঁধ ভাঙ্গিল। একা ঘরে, পরিজনের অলক্ষিতে, চুপি চুপি সুকুমারী অনেক কান্না কাঁদিল।

এই সময় তাহার বড় ননদ বিনোদিনী আসিয়া বলিল “ সুকি শুলি যে? অসুখ করছে না কি?” [illegible]

লেপ খুলিয়া দিল। মুখ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—“একি কাঁদছিস! কি হয়েছে লা? দাদা ভাল আছে ত?”

সুকুমারী তাড়াতাড়ি চোকের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল—“না, কাঁদিনি ত।”

“না কাঁদিসনি বৈ কি! দাদা ভাল আছে ত?”

“হ্যাঁ ভাল আছে”—শুনিয়া বিনোদিনী আশ্বস্ত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—“তবে কাঁদছিস কেন পোড়ারমুখী?”

গালে চোখের জলের দাগ, তথাপি সুকুমারী বলিল—“কৈ কাঁদিনি ত!”

“দাদা বকেছে?”

“দূর!”

“বল না, কি হয়েছে বলনা ভাই।”

সুকুমারী বিরক্ত হইয়া বলিল “কিছু হয়নি, হবে আবার কি!”

“না হয়নি! বলবিনে তাই বল! না বল্লি ভারি বয়ে গেল।” বলিয়া বিনোদিনী রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সুকুমারী একা হইয়া আবার লেপে মুখ ঢাকিল। ভাবিতে লাগিল সত্যই যদি তাহা হইয়া থাকে! তবে ত সবই শেষ হইয়াছে! সবই গিয়াছে! সে স্বামীকে আর কেমন করিয়া স্পর্শ করিবে, যত্ন করিবে, সেবা করিবে?

সে কি করিবে? তাহার এ কি হইল। এ সর্ব্বনাশ তাহার কে করিল!

এই সময়ে তাহার শ্বাশুড়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বলিলেন—“আবার জ্বর করে বসেছ! বেশ করেছ! কি কুপথ্যি করেছিলে? আবার তেঁতুল আচার খেয়েছিলে?”

সুকুমারী লেপের মধ্য হইতে বলিল—“তেঁতুল আচার ত খাইনি মা!”

"খাওনি ত কি করেছিলে? এত করে বারণ করি ভিজে মাথায় শুয়োনা;—তা ত শুনবে না, ভাতটি খেয়েই ঢুপ করে শুয়ে পড়। যা খুসী কর বাছা। গা কি খুব গরম হয়েছে? ভারী শীত করছে? এখনো আমার মালা শেষ হয়নি, বিছানা ছুঁতে পারবনা, যাই মন্না কি বিনিকে পাঠিয়ে দিইগে।" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সুকুমারী আবার ভাবিতে লাগিল। কৈ সে? কোন্ রাক্ষসী তাহার সর্ব্বনাশ করিল? তাহার সুখের ঘরে আগুন লাগাইয়া দিল? তাহাকে যদি পায় একবার, তবে নখে করিয়া তাহার চক্ষু ছিঁড়িয়া ফেলে।

ভাবিল—না জানি সে কেমন সুন্দরী। আমার স্বামী ভূলিল—অবশ্যই সে আমার অপেক্ষা সুন্দরী। আর কেহ নয়, আমার স্বামী? আমার স্বামীকে যে আমি দেবতা বলিয়া ভক্তি করিতাম। কতলোক বলিয়াছে কলিকাতা অতি প্রলোভনপূর্ণ স্থান,—যুবকগণের পক্ষে অতি বিষম স্থান—কিন্তু আমার স্বামীর উপর যে আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সুকুমারীর জ্বর দ্বিগুণ প্রবলতা ধারণ করিল। জ্বরের ঘোরে সে অচেতন হইয়া পড়িল। যখন চক্ষু খুলিল তখন দেখিল ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। ডাক্তার নিকটে বসিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন। তাহার শ্বশুর বসিয়া তামাক খাইতেছেন। মন্না মেঝের উপর বসিয়া খোকাকে ঘুম পাড়াইতেছে।

ডাক্তার বলিলেন—"এই ওষুধ টুকু খেয়ে ফেল দেখি মা।" বলিয়া মুখের কাছে ঔষধ ধরিলেন। সুকুমারী পান করিল।

ডাক্তার বলিলেন—"অনেকটা নরম পড়েছে এখন। কোনও ভাবনা নেই। যতক্ষণ একেবারে জ্বরটা না ছাড়ে, ঐ ফিবার মিক্‌শ্চারটা দু ঘণ্টা অন্তর খাইয়ে দেবেন।" বলিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

ডাক্তার গেলে সুকুমারীর শ্বাশুড়ী আসিলেন। কপালে হাত দিয়া

বলিলেন—"অনেকটা কম বৈ কি! গায়ে একেবারে হাত রাখা যাচ্ছিল না। কেমন আছ মা?"

সুকুমারী চুপি চুপি বলিল—"ভাল আছি।"

তিনি বলিলেন—"বিকেলের গাড়ীতে অবিনাশ এসেছে। মন্না, যা দিকিন তোর দাদাকে ডেকে দে।" স্বামীকে বলিলেন—"তোমার জলখাবার সাজিয়ে রেখেছে, যাও দেরী করো না।"

শুধু সুকুমারীর শ্বাশুড়ী রহিলেন—সবাই চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে অবিনাশ আসিল। তাহার মা তখন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গেলেন।

অবিনাশ বিছানার উপর বসিয়া সুকুমারীর কপালে হাত রাখিল। জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছ সুকু?"

সুকুমারী বলিল—"ভাল আছি।"

"আজ সকালে আমার চিঠি পেয়েছ?—

"পেয়েছি।—সত্যি?"

অবিনাশ বলিল—"সত্যি বৈকি।"

"আমায় মনে পড়ল না?

অবিনাশ চুপ করিয়া রহিল।

সুকুমারী বলিল—"সে কি বড় সুন্দরী?"

অবিনাশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কে?"

"জান না?"

"কি বলছ তুমি? কার কথা জিজ্ঞাসা করছ?"

সুকুমারীর মনে ভারি খটকা লাগিল। বলিল—"কি হয়েছে তবে? কি করেছ?"

অবিনাশ মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝিতে পারিল সুকুমারী কি ভুল করিয়াছে। ভাবিল—কি ভয়ঙ্কর! বলিল—"না না সুকু—তুমি কি ভেবেছ? তা নয়।"

"কি তবে?"

"যা কখনো জীবনে স্পর্শ করতে বারণ করেছিলে, তোমার ভারি ঘৃণা জানিয়েছিলে, তাই খেয়েছি। বার্ডসাই খেয়েছি।

*   *   *   *

*   *   *   *

এই কথোপকথনের এক ঘণ্টা পরে, সুকুমারী র‍্যাপার গায়ে দিয়া খৈ খাইতে খাইতে শ্বাশুড়ীর কাছে গিয়া নালিশ করিতেছিল—"দেখ দিকিন মা, আমি অত করে সকাল বেলা শিউলি ফুলের বোঁটাগুলি কেটে রাখলাম, মন্না সব ঘরময় ছড়িয়ে দিয়েছে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদেশে রাজস্ব বন্দোবস্ত।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসন কাল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজগণ শুধু ইংলণ্ডের ভূম্যধিকার প্রণালীর বিষয়ই অবগত ছিলেন। সেই প্রণালী অনুসারে ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারী ভূমির মালিক, তিনি ইজারাদারকে (Farmer) ভূমি বিলি করেন, ইজারাদার "জন" খাটাইয়া তাহা কর্ষণ করাইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গীয় ভূম্যধিকার প্রণালীর সহিত ইহার কোন সৌসাদৃশ্য ছিল না। বঙ্গে ভূমির মালিক যে কে, তাহা সে সময় স্থিরই ছিল না। কখনও রাজা বলিতেন 'আমি মালিক, যাহাকে ইচ্ছা জমি দিয়া কর লইব',—কখনও জমিদার বলিতেন—'আমি মালিক--রাজাকে কর দিব যত দিন, ততদিন আমার দখল বজায় থাকিবে,'—কখনও বা কৃষক বলিত—'জমি আমার,—জমিদারের সঙ্গে খাজনার সম্পর্কমাত্র'। এই প্রকার গোলযোগের মধ্যে, ভূ-সত্ত্বের প্রকৃত অবস্থা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল, তবে ইহা স্থির ছিল যে

জমিদার পুরুষানুক্রমে জমি ভোগ করিতেন, রাজাকে নিয়মিত রাজস্ব পৌঁছাইয়া দিয়া খালাস। তাঁহাদের জমিদারী একপ্রকার রাজত্বেরই মত ছিল। কৃষ্ণকান্তের মত তাঁহারা সকলেই বলিতেন—"আমিই জজ, আমিই মাজিষ্টর।" আবার কৃষকও শুধু কৃষক মাত্র ছিল না। সে জমিদারকে খাজনা দিত, কিন্তু জমিতে তাহার যে স্বত্ব, তাহা সেও পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিত। বঙ্গের নবাবগণ মাঝে মাঝে জমির পরিমাপ করিয়া রাজস্ব বাড়াইয়া লইতেন, জমিদারও মাঝে মাঝে স্বীয় প্রাপ্য খাজনা বাড়াইয়া লইতেন, কিন্তু প্রণালীটা আসলে অপরিবর্ত্তিতই থাকিত। জমিদারের নিকট রাজস্ব রাজার প্রাপ্য, প্রজার নিকট খাজনা জমিদারের প্রাপ্য, বংশাবলীক্রমে দখলী স্বত্ব প্রজার।

এইরূপ অবস্থায় ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানি বঙ্গের দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তখনি তাঁহারা ভূমিকর সংগ্রহ বা বিচারভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন না। মুর্সিদাবাদে নবাবের গদীতে যে ইংরাজ রেসিডেণ্ট ছিলেন তাঁহার তত্ত্বাবধানে তত্রস্থ মুসলমান কর্ম্মচারী পূর্ব্বমতই রাজস্ব সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত রহিলেন। পাটনা নগরে কোম্পানির এজেণ্টের তত্ত্বাবধানে, সিতাব রায় বিহারের রাজস্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।* শুধু চব্বিশ পর্গনা, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই চারিটি জিলার রাজস্ব কোম্পানি স্বয়ং সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এই কার্য্যপ্রণালী সন্তোষজনক হইল না। যাঁহারা যথার্থ শাসনকর্ত্তা, তাঁহারা হিন্দু ও মুসলমান রাজস্ব সংগ্রহকারীর আড়ালে থাকিয়া টাকাগুলি গ্রহণ করিতেন, কিন্তু শাসন কর্ত্তার দায়িত্বটুকু গ্রহণ করিতেন না। সংগ্রহকারীগণ, নিজেদের কোম্পানির এজেণ্ট মাত্র বিবেচনা করিত, সুতরাং শাসনকারীর দায়িত্ববোধ তাহাদেরও ছিল না। প্রজা, দুই পক্ষেরই দ্বারা উৎপীড়িত হইত, কাহারও দ্বারা রক্ষিত হইত না। ১৭৬৯ সালে

* Select Committee's *Fifth Report*, 1812, p 5.

প্রজার অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য এক তত্বাবধায়ক সভা গঠিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মন্তব্যে প্রকাশ, দেশের শাসনপ্রণালীর অবস্থা তখন অতীব বিশৃঙ্খলতাপূর্ণ। এই সভার সভাপতির ভাষায়,—রাজস্ব সংগ্রহকারীগণ "জমিদারের নিকট যত পারিত আদায় করিত, জমিদারকে স্বাধীনতা দিত যে জমিদারও প্রজার নিকট যথাসাধ্য লুণ্ঠন করুক।" *

১৭৭২ সালে স্থির হইল, দেশের শাসনভার বৃটিশ হস্তে ন্যস্ত হউক। গভর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস্ তাঁহার সভার চারিজন সভ্যকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়া, রাজস্ব সংগ্রহ ও বিচার বিধানের উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। ধনাগার মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল। গভর্ণর ও সভার সভ্যগণে মিলিয়া বোর্ড অব্ রেভিনিউ গঠিত হইল। জেলায় জেলায় কলেক্টর পাঠান হইল। ন্যায় বিচারের জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি দেওয়ানী ও একটি ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হইল। ভূমিকর পাঁচ বৎসরের জন্য ধার্য্য করা হউক, এইরূপ স্থিরীকৃত হইল।

কিন্তু এই রাজস্ব ধার্য্যের ব্যাপার লইয়া অবিচারের অন্ত রহিল না। বংশানুক্রমিক জমিদারগণের অধিকারের প্রতি গভর্ণমেণ্ট ভ্রূক্ষেপ করিলেন না,—নীলামের মুখে জমিদারীর বন্দোবস্ত হইল। পুরাতন জমিদারগণ অধিকাংশই স্থানচ্যুত হইলেন। প্রতিযোগীতায় মত্ত হইয়া, লোকে অসম্ভব রাজস্ব স্বীকার করিয়া ভূসম্পত্তি লইল; কিন্তু যথাসাধ্য প্রজাপীড়ন করিয়াও নিয়মিত রাজস্ব যোগাইতে সক্ষম হইল না। নিরীহ কৃষকশ্রেণীর উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার চলিতে লাগিল। দেশ ছারখার হইবার উপক্রম হইল।

রেগুলেটিং এক্টের অনুসারে ১৭৭৪ সালে হেষ্টিংস্ ভারতের গভর্ণর

* Letter from the President and Council, dated 3rd November 1772.

জেনেরাল হইলেন।—দেশের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি ইংরাজ কলেক্টরগণকে ফিরাইয়া আনিলেন এবং কলিকাতা, বৰ্দ্ধমান, ঢাকা মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর ও পাটনায় প্রাদেশিক সভার তত্ত্বাবধানে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য দেশীয় আমিন নিযুক্ত করিলেন।

তাহার পর কলিকাতায় সভা বসিয়া ন্যায়সঙ্গত ভূমিকর ধার্য্যের বিষয় বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। হেষ্টিংস ও বার্‌ওয়েল প্রস্তাব করিলেন যে ভূসম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হউক এবং ক্রেতার জীবনাবধি ভূমিকর ধার্য্য করা হউক। ইহাঁদের অপেক্ষা দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ, ইংরাজি সাহিত্যে "জুলিয়াসের পত্রপ্রণেতা" বলিয়া পরিচিত, ফিলিপ্‌ ফ্রান্সিস্‌ এ বিষয়ে সমধিক বিবেচনাপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তিনি বলিলেন, ভূমিকর চিরস্থায়ীভাবে ধার্য্য করা হউক। পূর্ব্বাবলম্বিত প্রণালীর ভূরি ভূরি দোষ দেখাইয়া বলিলেন।—

"একবার ধার্য্য জমা, সরকারি খাতায় লিপিবদ্ধ হউক। ইহা চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্ত্তনীয় হউক;—এবং যদি সম্ভব হয়, তবে সাধারণকে সম্যক-ভাবে ইহা জ্ঞাত করা হউক। এই বন্দোবস্ত ভূমিরই প্রতি নির্দ্ধারিত হউক—সে ভূমি বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে যাহারই সম্পত্তি হউক না কেন। যদি সে ভূমিতে আপাততঃ গুপ্ত কোনও ধন বিদ্যমান থাকে, ইহা বাহির করিয়া জমিরই উন্নতিকল্পে নিয়োজিত হইবে, কারণ তাহা হইলে অধিকারী জানিবে সে নিজেরই জন্য পরিশ্রম করিতেছে।" *

এই প্রস্তাব লণ্ডনের ডিরেক্টরগণের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা ইহা অনুমোদন করিলেন না। ফ্রান্সিসের প্রস্তাব ত নয়ই, হেষ্টিংসের প্রস্তাবও নয়।—"অনেক গুরুতর কারণবশতঃ এই দুই প্রস্তাবের কোনটাই ধার্য্য করা আমরা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করি না।"—সুতরাং প্রজার দুর্দ্দশার কোনও প্রতীকারই হইল না।

---

* Philip Francis' *Minute*, published in London, 1782.

১৭৭৭ সালে, পাঁচ বৎসরের বন্দোবস্ত শেষ হইল। অতঃপর নীলামের বিধি একটু পরিবর্ত্তিত হইল। বংশানুক্রমিক জমিদার উচিত মূল্য দিতে চাহিলে আর অন্যকে দেওয়া হইত না। হইলে কি হইবে, সঙ্গে সঙ্গে স্থির হইল, জমি বৎসর বৎসর বিলি হইবে! ১৭৭৮, ১৭৭৯, ১৭৮০ তিন বৎসরে তিনবার জমি বিলি হইল। এই অর্থনৈতিক নির্য্যাতনে সমস্ত দেশ ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল,—রাজস্ব আবার বাকী পড়িয়া গেল।

তথাপি বঙ্গের বণিকরাজ ক্ষান্ত হইলেন না। ১৭৮১ সালে সভা বসিয়া, ভূমিকর ধার্য্যের নূতন নিয়ম প্রণীত হইল। বঙ্গের ভূমিকর ২৬ লক্ষ টাকা বাড়িয়া গেল।

বৎসর বৎসর এই নূতন বন্দোবস্তের জ্বালায়, নিয়ত কর বৃদ্ধি ও তাহা আদায়ের কড়া নিয়মের উৎপীড়নে, সমস্ত বনিয়াদি জমিদারগণ উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। জমিদারগণের চক্ষের উপর তাঁহাদের পৈত্রিক সম্পত্তি কলিকাতার তেজারৎগণের হস্তগত হইয়া যাইতে লাগিল। প্রজাগণ উৎপীড়নে আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল। বঙ্গের তিনটি প্রধান জমিদারীর তৎকালীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এই সময় বঙ্গের তিনটি প্রধান জমিদারীই স্ত্রীলোকের হস্তে ছিল। এই মহিলাগণ নিজ নিজ নাম বঙ্গের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জাজ্বল্যমান রাখিয়া গিয়াছেন।

বর্দ্ধমান বৎসরে ৩৫ লক্ষ টাকারও উপর রাজস্ব দিত। বর্দ্ধমান তখন খ্যাতনামা তিলকচাঁদের বিধবা রাণীর হস্তে। রাজসাহীর বার্ষিক রাজস্ব ২৬ লক্ষ টাকার উপর,—রাজসাহী তখন রাণী ভবানীর হস্তে। রাণী ভবানীর নাম বঙ্গের আবালবৃদ্ধ সকলেই অবগত আছেন। আজিও বালিকারা ভারতবর্ষীয় "নব-নারী"র মধ্যে রাণী ভবানীর জীবন চরিত পাঠ করিয়া থাকে। দিনাজপুরের বার্ষিক রাজকর ১৪ লক্ষ টাকার উপর। ১৭৮০ সালে দিনাজপুরের রাজার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র তখন ৫

বৎসরের শিশু। সুতরাং বিধবা রাণী সম্পত্তি রক্ষার ভারগ্রহণ করেন।

ভূমিকর প্রণালীর এই নির্য্যাতন দিনাজপুরকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহ্য করিতে হইয়াছিল। রাজার মৃত্যুর পর, কোম্পানি দেখিলেন, রাজস্ব বাড়াইয়া লইবার উত্তম সুযোগ উপস্থিত। দেবীসিংহ নামক এক দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি প্রজা নির্য্যাতনের অপরাধে রঙ্গপুর ও পূর্ণিয়া হইতে কোম্পানি কর্ত্তৃকই পদচ্যুত হইয়াছিল। স্বকার্য্য সাধনেরর নিমিত্ত সেই দেবীসিংহকে কোম্পানি কলিকাতা হইতে দিনাজপুরের ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। দেবীসিংহ উপযুক্ত প্রভুর উপযুক্ত ভৃত্যরূপে দিনাজপুরে আবির্ভূত হইল। খাজনা বাড়াইবার জন্য এমন সকল বর্ব্বর নিষ্ঠুরতার উদ্যোগ করিল, বঙ্গের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া ভার। জমিদারগণকে কারাবদ্ধ করিতে লাগিল, প্রজাগণকে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল, স্ত্রীলোকের প্রতি পর্য্যন্ত পাশব অত্যাচার ও অকথ্য অপমান করিতে লাগিল।

তাহার অত্যাচারের চোটে দুঃখী কৃষকেরা গৃহ ও গ্রাম ত্যাগ করিতে সংকল্প করিল। তাহারা জেলা ছাড়িয়া পলায়নের চেষ্টা করিল। কিন্তু দলে দলে সিপাহী বন্দুকের মুখে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিল। অনেকে পলাইয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইল। শেষে অনেকে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যে জাতির কৃষকগণের অপেক্ষা নিরীহ প্রাণী আর পৃথিবীতে নাই,—অত্যাচারের তাড়নায় তাহারাও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বিদ্রোহ ক্রমে দিনাজপুর হইতে রঙ্গপুর জেলায় পরিব্যাপ্ত হইল। অবশেষে কেল্লা হইতে সৈন্য আসিয়া ভয়ঙ্কর বর্ব্বরতার সহিত বিদ্রোহ দমন আরম্ভ করিল। দিনাজপুর জেলার তদানীন্তন শাসন কর্ত্তা মিঃ গুড্ল্যাড্ লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশে এ প্রকার অশান্তি পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। আর সেরূপ বর্ব্বরতা ও নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্তও বঙ্গে অভূতপূর্ব্ব।

বৰ্দ্ধমানের ঘটনা এতদূর শোকাবহ নহে। অত্যাচারের অধিকাংশ জমিদারের উপরই পড়িয়াছিল, প্রজার উপর ততটা পৌঁছে নাই। ১৭৬৭ সালে মহারাজা তিলকচাঁদের মৃত্যু হয়। নাবালক পুত্র তেজচাঁদের উত্তরাধিকারীত্ব কোম্পানি অনুমোদন করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিলকচাঁদ লালা উমির্চাঁদকে বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া যান। কিন্তু এই জেলার তদানীন্তন শাসন কৰ্ত্তা জন গ্রেহাম তাহা রদ করিয়া, ব্রজকিশোর নামক এক ব্যক্তিকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে বাধ্য করিলেন। এই ব্যক্তি অতিশয় দুৰ্দ্দান্ত ও ধৰ্ম্মজ্ঞানহীন। স্ত্রীলোকের যথাসাধ্য, রাণী তাহার লুণ্ঠনবৃত্তিকে বাধা দিতে সচেষ্ট রহিলেন। দপ্তরখানার শীল তাহার হস্তগত হইতে দিলেন না।

পরে ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রতি আবেদনে তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ—

“আমার পুত্রের শীল আমার নিকট ছিল। প্রথমে না পড়িয়া কোনও কাগজে আমি ইহা অঙ্কিত করিতাম না। ব্রজকিশোর ইহা হস্তগত করিতে সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিয়াছিল, আমি কোন মতে দিই নাই। বঙ্গাব্দ ১১৭৯ সালে (১৭৭২ খৃঃ) ব্রজকিশোর চেষ্টা করিয়া গ্রেহাম সাহেবকে বৰ্দ্ধমানে আনাইল। আমার নিকট হইতে আমার নবমবর্ষীয় পুত্র তেজচাঁদকে হরণ করিল। তাহাকে স্থানান্তরে প্রহরীর জিম্মায় আবদ্ধ রাখিল। এই অবস্থায়, ভয়ে ও দুঃখে, সপ্তাহেরও অধিক অনশনের পর, আর কোনও উপায় না দেখিয়া আমি শীল দিলাম।”*

এই পত্রে কথিত হইয়াছে, এই উপায়ে শীল লইয়া ব্রজকিশোর সম্পত্তি উড়াইয়া দিতে লাগিল। বিস্তর টাকা আত্মসাৎ করিল। কোনও প্রকার হিসাব দিতে চাহিত না। রাণী নিজের ও পুত্রের প্রাণসংশয় আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। হেষ্টিংসকে প্রার্থনা করিলেন তিনি যেন পুত্রসহ কলিকাতায় গিয়া নিরাপদে বাস করিতে অনুমতি পান।

* Select Committee's *Eleventh Report*, 1783, Appendix O.

ক্লাভারিং, মনসন এবং ফ্রান্সিস্ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এই তিনজন সদস্য, এই অর্থাপহরণ অপবাদের রীতিমত অনুসন্ধান প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সদস্য তাহাতে মত দিলেন না। অবশেষে সভা স্থির করিলেন,—

"মিঃ গ্রেহাম ও বর্দ্ধমানের দেওয়ানের বিরুদ্ধে ১১ লক্ষ টাকা নাবালক সম্পত্তি অপহরণের যে অভিযোগ রাণী আনিয়াছেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা বিবেচনা করিবার আমাদের আবশ্যক নাই। অপবাদের সত্যতা প্রমাণ করা রাণীরই কার্য্য। প্রমাণ পাইবার পূর্ব্বে কোনও ব্যক্তির সম্মান বা নির্দ্দোষীতার বিরুদ্ধে অভিযোগ বিশ্বাস করিয়া আমরা অন্যায় করিব না। রাণী আবেদনে তাহা প্রার্থনাও করিতেছেন না। তিনি যাহা প্রার্থনা করিতেছেন তাহা মঞ্জুর করা যাউক।" *

সদস্যসভার বিবাদে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান হইতে পাইল না। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ও গ্রেহামের পক্ষাবলম্বন করিলেন।

বর্দ্ধমান জমিদারীর উপর রাজস্ব ভার ক্রমেই গুরুতর হইতে লাগিল। রেভিনিউ বোর্ডের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বর্দ্ধমান পরিবারের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সকল পুরাতন জমিদারীর অপেক্ষা বর্দ্ধমানের রাজকর বেশী করিয়া ধার্য্য করিলেন। বহু বর্ষ ধরিয়া বর্দ্ধমান ইহা সহ্য করিল। বর্দ্ধমানের রাজ্যের অধিনায়কগণ,—যাঁহারা পূর্ব্বে কার্য্যতঃ বর্দ্ধমানের রাজাই ছিলেন, মহারাষ্ট্র আক্রমণের সময় বঙ্গের নবাবগণকে সহায়তা করিয়াছিলেন—তাঁহারা বঙ্গের নূতন প্রভুগণের আর্থিক দেয় দিতে ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইলেন। প্রজাগণের সহিত পত্তনী বিলির ব্যবহার, জমিদারের সঙ্গে প্রজাকে দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করিতে দিয়া এই প্রাচীন বংশ সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা পাইল।

কিন্তু যে মাননীয়া মহিলার বিপন্নতায় অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গবাসিগণ

---

* *Ibid.*

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্তপ্ত হইয়াছিল তাঁহার নাম রাণী ভবানী। আজও তাঁহাকে বঙ্গের কোটি কোটি লোক ধর্ম্মভাবপূর্ণ সম্মানের সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। ক্লাইব পলাশীযুদ্ধ জয় করিবার পূর্ব্বে হইতে তাঁহার অগাধ সম্পত্তি প্রায় সমস্ত উত্তর বঙ্গ ব্যাপিয়া ছিল। তিনি মুসলমান ক্ষমতার বিপুলতা ও অবসান দুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। হিন্দু মহিলার বুদ্ধি ও ক্ষমতা যে কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে তিনি উদাহরণস্থল হইয়াছিলেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রবর্ত্তিত নূতন ভূমিকরপ্রণালী অন্যান্য জমিদারীর ন্যায় রাজসাহীকেও স্পর্শ করিয়াছিল। গভর্ণর জেনেরাল ১৭৭৩ খৃঃ ৩১শে ডিসেম্বরের পত্রে লিখিয়াছিলেন—"রাজসাহীর জমিদার রাণী ভবানী তাঁহার রাজস্বদানে অত্যন্ত বাকী ফেলিতেছেন।" ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চের পত্রে স্থির করিয়াছিলেন যে রাণী ভবানী যদি মাঘ মাসের পর্য্যন্ত রাজস্ব ২০শে ফাল্গুনের মধ্যে দাখিল করিতে না পারেন, তবে তাঁহারা রাণীকে জমিদারী হইতে অপসৃত করিতে বাধ্য হইবেন এবং জমিদারী এমন লোকের হস্তে দিবেন যাহারা গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব যথাসময়ে উপস্থিত করিতে পারে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন—"স্থির হইয়াছে রাণীকে জমিদারীচ্যুত করা হইবে এবং সম্পত্তিতে তাঁহার সকল স্বত্ব লোপ করিয়া তাঁহাকে যাবজ্জীবন মাসিক ৪ হাজার টাকার পেন্সন দেওয়া হইবে। *

এই অমর্য্যাদা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বৃদ্ধা রাণী যে সকল আবেদন গভর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কয়েকখানি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। একখানিতে তিনি তাঁহার সম্পত্তির ইতিহাস, ১৭৭২

* Select Committee's *Eleventh Report*, 1783, Appendix O.

সালের পঞ্চবার্ষিক বন্দোবস্তের পর হইতে গোমস্তা দুলাল রায়ের অত্যাচার এবং তজ্জনিত প্রজাহ্রাসের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"১১৭৯ সালে (খৃঃ ১৭৭২) সরকারী সাহেবগণ আমার ভূসম্পত্তির সমস্ত পুরাতন খাজনা একত্রীভূত করিয়াছিলেন এবং জিলাদারী মাথট ও অন্যান্য সাময়িক খাজনাকে চিরস্থায়ী করিয়াছিলেন। আমি পুরাতন জমিদার, প্রজার দুঃখ দেখিতে না পারিয়া সম্পত্তি বিলিতে লইতে সম্মত হইয়াছিলাম। আমি শীঘ্র সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, রাজস্ব দিবার মত যথেষ্ট আয় নাই।

* * * *

ভাদ্র মাসে নদীর বাঁধ ভাঙ্গিল, প্রজার জমি ভাসিয়া গেল, শস্য হইল না। আমি জমিদার সুতরাং প্রজাকে সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য মনে করিলাম। খাজনা দাখিল সম্বন্ধে তাহাদিগকে সময় দিয়া যথাসাধ্য দুঃখলাঘব করিলাম। সাহেবগণকে অনুরোধ করিলাম আমাকেও ঐরূপ সময় দেওয়া হউক, ক্রমে রাজস্ব পরিশোধ করিব। কিন্তু আমার প্রতি অবিশ্বাস করিয়া তাঁহারা আমার কাছারি আমার গৃহ হইতে মোতিঝিলে স্থানান্তরিত করিলেন। এবং আমার ও দেশের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিবার জন্য দুলাল রায়কে ভৃত্য ও সাজাওল নিযুক্ত করিলেন।

* * * *

তাহার পর আমার বাড়ী ঘেরাও হইল। আমার টাকাকড়ির অনুসন্ধান হইল। আমি জমিদার স্বরূপ যাহা খাজনা আদায় করিয়াছিলাম, যাহা কর্জ্জ করিয়া আনিয়াছিলাম, আমার মাসিক বিত্ত যাহা ছিল, সব লইয়া গেল। সর্ব্বসুদ্ধ ২২৫৮৬৭৪৲ টাকা হইয়াছিল।

নূতন বৎসর ১১৮১ সালে (১৭৭৪ খৃঃ) আমাকে সমস্ত অধিকারে বঞ্চিত করিয়া ২২২৭৮১৪৲ টাকায় দুলাল রায়কে আমার জমিদারী বিলি করিয়াছিল। তখন দুলাল রায় ও পরাণ বোস দেশে নূতন মাথট এবং

আসি জাফর বসাইয়া দিল। যাহারা পূর্ব্বে জমি ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহাদের নিকট যে খাজনা প্রাপ্য ছিল, সেই খাজনা বর্ত্তমান রায়তের নিকট আদায় করিতে লাগিল। এই দুই জন হুকুম জারি করিতে লাগিল, রায়তের যথাসর্ব্বস্ব এমন কি শস্যবীজ ও বলদ পর্য্যন্ত হরণ করিতে লাগিল। এইরূপে প্রজাহ্রাস ও জমিদারী নষ্ট করিল। আমি পুরাতন জমিদার। আমি কোনও দোষ করি নাই। দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে।

এই কারণে এক্ষণে আমি আবেদন করিতেছি, দুলাল রায় এ বৎসর ২২২৭৮১৭ টাকায় জমিদারী লইতেছে,—আমি উহা দিতে প্রস্তুত হইতেছি। সরকারের যাহাতে লোকসান না হয় এবং কর যাহাতে যথা-সময়ে দাখিল হয় সে বিষয়ে যত্ন করিব। *

এই সকল উদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যায়, সে সময়ে বঙ্গে সর্ব্বত্র কি ব্যাপার চলিতেছিল। পুরাতন জমিদার যদি নীলাম-ক্রেতার সঙ্গে পারিয়া না উঠিত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পৈত্রিক জমিদারী হারাইত। কিন্তু এত কাণ্ড এত আঁটাআঁটিতেও যথাসময়ে রাজস্ব আদায় হইত না। বঙ্গের কর্ষিত ভূমির এক তৃতীয়াংশ জঙ্গলে পরিণত হইল।

রাণী ভবানীর পুত্র প্রাণকৃষ্ণ পরে অন্যান্য আবেদন দাখিল করিয়া-ছিলেন। রেভিনিউ বোর্ডে অনেক বাদানুবাদ, অনেক পরামর্শ চলিল। ইংরাজ কর্ম্মচারীরা যে তাহাদের এজেন্ট বা বেনিয়ানের বেনামীতে জমি রাখে, ফিলিপ ফ্রান্সিস এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন—

"দেশ,দেশবাসীর। পূর্ব্বে জেতাগণ ভূমির করগ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত। * * * এই পুরাতন প্রথার যতবারই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তত বারই ফল অনিষ্টজনক হইয়াছে ;—এতদূর, যে সকলের বিশ্বাস অন্ততঃ বঙ্গের

দুই তৃতীয়াংশ জনহীন হইয়া রহিয়াছে। প্রতিবিধানে অসমর্থ হিন্দুগণ অত্যাচারের হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া মুক্তিলাভ করে।" *

অবশেষে ১৭৭৫ সালে সভার অধিকাংশ সভ্যগণ স্থির করিলেন, রাজা দুলাল রায়ের পরিবর্ত্তে রাণী ভবানীকে তাঁহার পূর্ব্ব সম্পত্তির খাজনা আদায় কার্য্যে নিযুক্ত করা হউক। হেষ্টিংস সম্যক্‌রূপে এ মতের কখনও পোষকতা করেন নাই। ইহাঁর উত্তরাধিকারী কর্ণওয়ালিস বঙ্গের জমিদার-গণের বংশমর্য্যাদা বুঝিয়াছিলেন—কিন্তু হেষ্টিংস বরাবরই নীলামবিক্রয়ের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে আমরা কেবল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিই মনোযোগ বদ্ধ রাখিয়াছি এবং সকল অপক্ষপাতী ঐতিহাসিকের সহিত আমাদেরও দুঃখ যে তাঁহার শাসনকালে ভারতবাসীর উন্নতি হয় নাই।

হেষ্টিংসের পক্ষে ভারতবর্ষ বা ভারতবাসী অপরিচিত ছিল না। তিনি বলিতে গেলে বাল্যকালে ভারতে আসেন। জীবনের প্রথমাংশ সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন,—দেশীয় লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রকৃতি অনুধাবন করিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

এরূপ কার্য্যদক্ষ এবং দেশজ্ঞানীর নিকট হইতে অতি সুশাসন আশা করিবারই কথা। তথাপি, যদি শাসনের দোষগুণ প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের পরিমাপে বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে তাঁহার শাসন অতিশয় শোচনীয় হইয়াছিল।

এখন এই এক শতাব্দীর পর, বিনা পক্ষপাতে এই অকৃতকার্য্যতার কারণ অনুসন্ধান সম্ভব। অন্যান্য ইংরাজের মতই হেষ্টিংসেরও ধারণা ছিল, ভারতবর্ষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও তাহাদের ভৃত্যদের জন্য অর্থোপার্জ্জনের প্রশস্ত ক্ষেত্র। ন্যায়বুদ্ধি ও সহানুভূতিকে মন হইতে বিসর্জ্জন করিয়া,

তিনি তাঁহার সবল ক্ষমতা ভারতবর্ষ হইতে অর্থাহরণ করিতে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। প্রজার মঙ্গলের প্রতি তাঁহার যে লক্ষ্য ছিল না তাহা নহে;—তবে এ মঙ্গল গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র। মুখ্য উদ্দেশ্য ধনোপার্জ্জন। রাজা ও প্রজার সম্পর্ক জমিদার ও রায়তের অধিকার সমস্তই এই মুখ্য উদ্দেশ্যের নিকট অবনত করিয়াছিলেন। বারাণসী ও অযোধ্যাকে ভয়ানক করভারে পীড়িত করিয়া, বঙ্গে ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের পরও—যে দুর্ভিক্ষে বঙ্গের এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল—ভূমিকর বৃদ্ধি করিয়া, পুরুষানুক্রমিক জমিদারগণকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, তিনি এই উদ্দেশ্য পালন করিয়াছিলেন। এইরূপে উত্থিত ধনের অধিকাংশই ইংলণ্ডের অংশীদারগণের করতলগত হইল,—সে ধন কোনও আকারে আর দেশে ফিরিতে পাইল না। শাসনকর্ত্তা যত বিজ্ঞ হউন, শাসনপ্রণালী যতই উচ্চদরের হউক, এরূপ অবস্থায় জাতীয় দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ নিবারণ অসম্ভব।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের অকৃতকার্য্যতার ইহাই মূল কারণ। সকল ঐতিহাসিকগণই এই অকৃতকার্য্যতা দুঃখের সহিত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শাসনকর্ত্তার কার্য্যের উপর, ঐতিহাসিকের অভিমতের অপেক্ষা আরও একটা বৃহত্তর অভিমত আছে—তাহা প্রজাপুঞ্জের অভিমত। ভারতবাসী প্রজাপুঞ্জ বড়ই বেদনার সহিত হেষ্টিংসের শাসন সময়ের কথা স্মরণ করে। সে শাসনকাল অনিয়ম, অত্যাচার ও দারিদ্র্যের বিভীষিকাপূর্ণ। তাহার পর কর্ণওয়ালিশ্ আসিলেন। তাঁহার শাসনকালের কথা ভারতীয় প্রজা গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। দেশের দুঃখে দুঃখ অনুভব করিবার তাঁহার হৃদয় ছিল,—তাহাদের মঙ্গলের জন্য কর্ত্তব্য পালন করিবার সাহস ছিল,—তিনি ভারতের সুবিপুল মূকবৎ প্রজাপুঞ্জের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিশ্ বঙ্গদেশে আসিয়া জমিদারদিগের সহিত কিরূপ চিরস্থায়ী রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, দেশের কিরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এবং ইংরাজশাসনকে পূর্ব্বের অপযশ হইতে কিরূপ উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গদেশে জমিদার প্রজা সকলেই অবগত আছেন।

শ্রীরমেশ চন্দ্র দত্ত।

মাহাতা শৈসা।

সততা, ন্যায়পরায়ণতা, বুদ্ধিমত্তা, পরিশ্রমপটুতা, এবং অসাধারণ অধ্যাবসায় বলে জগতে যে সকল ব্যক্তি অতি দীন হীন অবস্থা হইতে অত্যুচ্চ অবস্থায় উপনীত হইয়া অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, মাহাতা শৈসা তাঁহাদের অন্যতম। ধনকুবের শৈসা ইউরোপীয় বা আমেরিকান ছিলেন না; ভারত মহাসাগরের মধ্যস্থিত সিংহল দ্বীপের কোনও দরিদ্র বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পিতার ঔরসে এবং দরিদ্রা বৌদ্ধ মাতার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। মহৎ লোকের বিচিত্র এবং পবিত্র জীবন চরিত আলোচনা করিলে যদি ভগ্ন হৃদয়ে আশা, অধঃপতিত সমাজে উদ্দীপনা, কর্ত্তব্য-বিমুখ মানবের মনে কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং চিরদরিদ্রের মনে ধনবান হইবার ইচ্ছা ও তজ্জনিত চেষ্টা বলবতী হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে মহাত্মা মাহাতা শৈসার বৈচিত্র্যময়ী জীবনী বর্ত্তমানকালের শিক্ষিত যুবক-দিগের নিকটে পঠিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। মাহাতা শৈসার জীবনী আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সিংহলের পুরাতন ইতিবৃত্তের একটু পরিচয় না দিলে এই প্রবন্ধের অন্তর্গত অনেক বিষয় বুঝিয়া উঠা কঠিন হইবে, এই জন্য তদ্বিষয়ে দুই একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল। বহুকালব্যাপী হিন্দুরাজত্বের বিলোপ হইলে মূর নামক অর্দ্ধবর্ব্বর জাতি কিছুকাল সিংহলে শাসন বিস্তার করে; তদনন্তর পর্টুগীজ এবং দিনেমরাগণ স্বল্পকাল রাজত্ব করিবার পরে ওলন্দাজেরা আসিয়া সিংহল আক্রমণ করেন এবং সিংহলের অধীশ্বর হয়েন। ওলন্দাজেরা রোমান কাথলিক খৃষ্টান ছিলেন; সিংহল অধিকার করিয়া তদ্দেশবাসী সমগ্র বৌদ্ধ জাতিকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা তাঁহাদের সঙ্কল্প ছিল। এই সংকল্প সুসিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারা বলপ্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। [illegible] ওলন্দাজেরা

সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যিশুর ধর্ম্মপ্রচার জন্য তাঁহারা যে সমস্ত কঠোর আইন প্রচলন করিয়াছিলেন তাহা এখনও ওলন্দাজ শাসনের দুরপনেয় কলঙ্কস্বরূপে সিংহলবাসীরা স্মরণ করিয়া থাকে। আইনের মর্ম্ম এই :—

"যে কেহ খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইবে, তাহাকে রাজকীয় উচ্চপদে নিযুক্ত করা যাইবে না। এরূপ অ-খৃষ্টান ব্যক্তিকে বাণিজ্য বা ব্যবসা করিবার জন্য পাট্টা (লাইসেন্স) দেওয়া যাইবে না এবং এরূপ ব্যক্তির গৃহ, কৃষিক্ষেত্র, গো, অশ্ব, ছাগ, মহিষ, বালক, বালিকা এবং আয়ের উপরে কর নির্দ্ধারিত করা হইবে। অ-খৃষ্টান ব্যক্তিরা কোনও প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতে অধিকার পাইবে না এবং তাহাদের বিবাহ কালে রাজকীয় ভাণ্ডারে দশটাকা জরিমানা দাখিল করিতে হইবে।" ইত্যাদি।

এরূপ অত্যাচারে অনেকে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল বটে কিন্তু প্রজাপুঞ্জের মনে রাজভক্তির লোপ হইল। যাহারা পুরাতন ও পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই তাহারা রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় সিংহলের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত বহুদিনের গুপ্ত ষড়যন্ত্রণা এক্ষণে ভীষণ বিদ্রোহে পরিণত হইল। ওলন্দাজদিগের সৈন্য সংখ্যা অধিক ছিল না সুতরাং তাহারা বৌদ্ধদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিল। সন্ধির মর্ম্ম এই—

"খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য যে সকল আইন প্রচার করা গিয়াছিল তাহাতে প্রজা সাধারণের ঘোরতর অনিচ্ছা ও অসুবিধা দেখিয়া, ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তা নিয়ম করিতেছেন যে অতঃপর খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করা অথবা না করা প্রত্যেক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর ইচ্ছার অধীনে রহিল, তদ্বিষয়ে কোনও বল বা কঠোরতা প্রকাশ করিবার জন্য ওলন্দাজ রাজপুরুষেরা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইলেন। অদ্য হইতে রাজা এবং প্রজা এতদুভয়ের সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে রাজকীয় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আইন সমূহ ব্যবস্থা-পুস্তক (Statute Book) হইতে স্বতন্ত্র করা হইল এবং ঐ আইন অদ্য হইতে পরিত্যক্ত পত্র (Dead Letter) বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকিবে। কিন্তু ঐ সকল রাজবিধির পরিবর্ত্তে

এক্ষণে এই নিয়ম করা হইল যে, এই দ্বীপে (সিংহলে) যে সকল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পরিণত বয়স্ক পুরুষ আছেন তাঁহাদিগকে এবং অতঃপর তাঁহাদের পুরুষাপত্য (Male issue) দিগকে বৌদ্ধ নামের সঙ্গে একটি করিয়া খৃষ্টান নাম ব্যবহার করিতে হইবে। উভয় পক্ষে লোকেরা এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায়, অদ্যকার দিনে—বৃহস্পতিবারে—সেন্ট্ বার্থলোমিউ গির্জ্জায় খৃষ্টীয় ১৬৬৮ অব্দে জুলাই মাসের চতুর্ব্বিংশ দিবসে রাজা প্রজা এতদুভয়ের প্রধান প্রতিনিধির স্বাক্ষরে এই সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইল।" *

এইরূপে বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেলে প্রজারা সুখে ও শান্তিতে গার্হস্থ ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বৌদ্ধনামের সঙ্গে একটি বা ততোধিক খৃষ্টীয় নাম সংযোজিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে এজন্য এক একটা রেজেষ্ট্রি আপিস ছিল তাহাকে ওলন্দাজেরা তাহাদের ভাষায় "দানশ্চিয়ন" বলিত। বৌদ্ধনামের সহিত কিপ্রকারে কৌতুক-কর খৃষ্টীয় নাম সংযোজিত হইত, তাহার দুই চারিটি নমুনা দিয়া পাঠক মহাশয়কে বুঝাইতে ইচ্ছা করি। তদ্যথা—উইলিয়ম উভয়শেখর; পল যাদুকরীণ; ফ্রেড্রিক যশস্কর; আঞ্জিলো ডি দিবাকরম্; গাম্বোটা হেন্‌রী সূর্য্যাধিকারীন্; রিজাবেলা অনন্তগিরি; ইত্যাদি। এই সকল নামে উভয়-শেখর, যাদুকরিন, যশস্কর, দিবাকরম্, সুরিয়াধিকারীণ এবং অনন্তগিরি এইগুলি পালি, মাগধী ও সিঙ্গালী ভাষা মতে বৌদ্ধ নাম; বাকি নাম গুলি খৃষ্টীয়। অনেক বর্ষ পর্য্যন্ত ওলন্দাজেরা সিংহল শাসন করিয়া হীন বল হইয়া পড়েন এবং অবশেষে বাধ্য হইয়া কয়েক লক্ষ মাত্র রৌপ্য মুদ্রা মূল্যে ইংরাজদিগকে এই দ্বীপটি বিক্রয় করেন, তদবধি সিংহল বা লঙ্কায় বিক্রমী বৃটিশের শাসনারম্ভ হইয়াছে। অনেক কাল ইংরেজের রাজত্ব চলিয়া আসিতেছে; খৃষ্টান হইয়াও ইংরাজেরা ওলন্দাজদিগের ন্যায় পরকীয় ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু তথাপি প্রবীণ ওলন্দাজদিগের সন্ধিপণানুসারে

* "The Ancient History of Ceylon," Trubner and Co., vol. II. chap IX (*Vide* St. Bartholomew's Church.

লঙ্কাদ্বীপে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বৌদ্ধদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬৮ জন খৃষ্টীয় নাম ব্যবহার করেন। অনেকের নাম শুনিলেই খৃষ্টান বলিয়া ভ্রম হয়। যাহাহউক, মাহাতা শৈসার পিতা অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াও পৈত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু তাঁহাকেও খৃষ্টীয় নাম ধারণ করিবার জন্য বাধ্য হইতে হইয়াছিল। শৈসার পিতার নাম ছিল ডেকোস্‌টা দিবাকর শৈসা। দিবাকর অতি দরিদ্র ছিলেন, বৈদ্যগিরি করা তাঁহার ব্যবসা ছিল; দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারে পীড়িত ব্যক্তি-বর্গকে ঔষধ দিয়া তিনি যাহা কিছু সামান্য অর্থ উপার্জ্জন করিতেন তাহাতেই তাঁহার সংসার প্রতিপালন হইত। মাহাতা শৈসা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র, তদ্ব্যতীত আর তিনটি পুত্র এবং ছয়টি কন্যা ছিল। দরিদ্র দিবাকর, মাহাতা শৈসাকে সামান্য মাত্র সিংহলী ভাষা এবং অতি সামান্য ইংরাজি ভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন বৈদ্যশাস্ত্রমতে চিকিৎসা বিদ্যায় অনেকদিন পর্য্যন্ত উপদেশ দিয়া তাঁহাকে "কাজ চলা গোছ"—চিকিৎসক করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রাচীন বৌদ্ধেরা সংস্কৃত ভাষা হইতে সুশ্রুত, বাভট, হারীত, চরক প্রভৃতি বহুল আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থকে পালি, মাগধি এবং সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছিলেন। মালাবার উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া সিংহলের সমুদ্রতট পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র "দেশীয় চিকিৎসার" এখনও খুব প্রচলন। দিবাকর বৃদ্ধবয়সে এবং একপ্রকার নিঃস্ব অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে মাহাতা দেখিলেন, পিতার গচ্ছিত বা পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে ৩৬টি রৌপ্য মুদ্রা, ৪৭টি বোতল, ২৯টি শিশি, দ্বাদশটি মৃণ্ময় পাত্র, তিনযোড়া পরিধেয় বস্ত্র, একখানি কার্পেট, ৫ খানি মাদুর এবং দুইটি উপাধান (বালিশ) ভিন্ন আর কিছুই ছিলনা। অপরাপর দ্রব্যাদি যাহা ছিল, তাহাদের সমুদয়ের একত্রিত মূল্য পঞ্চবিংশতি মুদ্রার অধিক হইবে না। এই সামান্য মাত্র সম্পত্তি রাখিয়া অষ্টাদশ বর্ষীয় মাহাতার পিতা ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অল্পবয়সে পিতার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার শরীরের

মনের এবং গৃহস্থালীর অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, প্রবীণ বয়সে যাহাতা তৎসম্বন্ধে স্বহস্তে যাহা লিখিয়াছিলেন, এস্থলে তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"অনেকগুলি ভাই, ভগ্নি এবং আমাকে ও আমার বিধবা মাতাকে একেবারে নিঃস্বাবস্থায় রাখিয়া আমার পিতা মহাশয় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। সামান্য চিকিৎসা ভিন্ন আমাদের অন্য কোনও আয় ছিল না। সে সময়ে বিলাতী এবং দেশীয় চিকিৎসকের সংখ্যাও কম ছিল না। চিকিৎসা ব্যবসায়ে আমার অতি সামান্য আয় ছিল, কারণ আমার প্রবৃদ্ধ পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসকেরা আমাদের রোগীদিগের নিকট এই বলিয়া আমার নিন্দা করিত, যে, পৈসা ছেলেমানুষ, চিকিৎসার কি জানে। কোনও কোনও দিন আমার হাতে কিছুই আসিত না; যে দিন কিছু পাওয়া যাইত, তাহার পরিমাণও সামান্য ছিল। কিন্তু আমি সহজে দমিত হইবার যুবক ছিলাম না। যে বৎসর আমার পিতার মৃত্যু হয় সে বৎসর সিংহলে খুব দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। লঙ্কার লোকেরা ভাত খায় কিন্তু এ দেশে ধান্যের চাষ ভালরূপে হয় না, এজন্য মাদ্রাজ হইতে চাউল আসিত। সস্তা হইবে বলিয়া অনেকে সে বৎসর চাউলের পরিবর্ত্তে ধান্য আনাইয়া লইয়াছিল; আমার মাতা অনেক গৃহস্থের বাটীতে গিয়া ধান ভানিতেন, তাহাতে আমাদের ছয় আনা লাভ হইত। যে দিন চিকিৎসা চলিত না সে দিন আমি প্রতিবাসীদিগের পুরাতন ছিন্ন পোষাকাদি স্বহস্তে সেলাই করিতাম এবং সময়ে সময়ে চেয়ার টেবিল মেরামত করিয়া দিতাম। এই দুইটি কার্য্য আমার পিতা আমাকে শিখাইয়াছিলেন। ইহাতে কিছু কিছু আয় হইত। আমার ছোট ছোট ভাই ও ভগ্নিগণ পাঠশালা হইতে আসিয়া অবসর মতে ফুল তুলিতে যাইত এবং ফুলের সুন্দর মালা তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করিত, তাহাতেও কিছু লাভ ছিল। অনেক প্রকারের অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করিয়া আমি সংসার চালাইতাম। শরীর ভাল ছিল না, মনে সততই চিন্তা থাকিত, কিন্তু তথাপি কখনই নিরাশ হই নাই। অমিত অধ্যবসায়বলে সকল প্রকার বিপদ এবং অসুবিধা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিলাম। আমি আত্মহত্যার পোষক নহি, আত্মহত্যা করিতে কাহাকেও পরামর্শ দিই নাই, কিন্তু ভিক্ষা করা অপেক্ষা আত্মহত্যা শ্রেয়স্কর ইহা আমার ধারণা ছিল। ভিক্ষা করা আমি ঘৃণিত কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। আমি কেবল পরিশ্রমের উপরে

নির্ভর করিতাম এবং পরিশ্রমও সততাই আমাকে পরিণামে লক্ষেশ্বর পদবীতে অভি-ষিক্ত করিয়াছিল।"

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, একদিন তিনি অকস্মাৎ একখানি পত্র পাইলেন, ঐ পত্রে যাহা লেখা ছিল তাহা এই—

"তোমার পিতা আমাদের পুরাতন চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় আমরা তোমাকে তৎপদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। উপস্থিত কোনও বেতন দেওয়া হইবে না কিন্তু আমাদের কাহারও পীড়া হইলে চিকিৎসার জন্য তোমাকেই আহ্বান করা যাইবে। আমি এক্ষণে যক্ষ্মা রোগে এবং ক্ষয় রোগে কষ্ট পাইতেছি, পত্রপাঠ মাত্র আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইবে।"

পত্র প্রাপ্ত হইয়া ঝটিতি মাহাতা শৈসা প্রেরকের বাটিতে গেলেন। ঐ পত্রের লেথক একজন সম্ভ্রান্ত সিংহলী খৃষ্টান, প্রায় দুই পুরুষ হইতে খৃষ্ট ধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছেন; অবস্থাও খুব উন্নত। তাঁহার নাম লরেটো বেঞ্জামিন অইসা। মাহাতা তথায় পৌছিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আশু কোনও প্রতিকার সম্ভাবনা দেখা গেলনা। লরেটোর বাটীর অল্প দূরে একটী প্রকাণ্ড পুরাতন উদ্যান ছিল, মাহাতা প্রতিদিন প্রাতে তথায় একাকী বেড়াইতে যাইতেন। ঐ উদ্যানের বহুকাল সংস্কার হয় নাই, সুতরাং উদ্যানমধ্যস্থিত অট্টালিকাদি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং সর্প, শৃগাল, গর্দ্দভ প্রভৃতি জন্তুর সতত গমনাগমন হইত। একদিন প্রভাত কালে ঐ বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার পদাঘাতে স্থানবিশেষে এমন সকল লক্ষণ দেখা গেল যাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ঐ মৃত্তিকার নিম্নে কোনও দ্রব্য প্রোথিত আছে। অনেক চেষ্টার পরে শৈসা জানিতে প্যারিলেন, মাটির নীচে কতকগুলি তাম্র নির্ম্মিত কলসে সুবর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রা পোঁতা আছে। অকস্মাৎ এই প্রচুর মুদ্রা দেখিয়া তিনি আনন্দ ও বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু এত টাকা লইয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ নহে, নিশ্চয়ই লোকে ইহা দেখিতে পাইবে; অনন্তর অনেক প্রকারের চিন্তায় নিমগ্ন

হইয়া স্থির করিলেন, "যাঁহার মৃত্তিকামধ্যে এই গুপ্ত ধন পাইয়াছি তাঁহার অনুমতি ভিন্ন ইহা আত্মসাৎ করা মহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হইবে। আমি লরেটোকে একথা ব্যক্ত করিব, তাহার পরে তিনি যেরূপ আদেশ করেন সেইমত কার্য্য করা যাইবে।" শৈসা অতি দরিদ্র ছিলেন, বিশেষতঃ সেই সময়ে তাঁহার অর্থের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা ছিল, কিন্তু যুবা বয়সে অনেকে প্রথমে লোভান্ধ হইলেও স্বল্প সময় মধ্যেই ধর্ম্মজ্ঞানে আলোকিত হইয়া উঠে। শৈসা তাঁহার জীবনে এক সহস্র মুদ্রা একত্রে কখন দেখেন নাই, কিন্তু লোভ সম্বরণ করিয়া তিনি ধর্ম্মজ্ঞানের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। লরেটো এই সকল কথা শুনিয়া রুগ্ন দেহে বল প্রাপ্ত হইলেন, এবং বলিলেন, "আমার আর রোগ নাই। যদি কিছু বাকি থাকে তাহা হইলে অতঃপর বড় বড় ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা করাইব।" টাকার উষ্ণতা এবং প্রভাব এমনই বটে! হাতে লাঠি লইয়া সেই তিন মাস শয্যাগ্রস্ত লরেটো ধীরে ধীরে বাগানে গেলেন এবং ভৃত্যদের সাহায্যে মুদ্রাসমূহ স্বগৃহে উঠাইয়া আনিলেন। শৈসার ভাগ্যে দুই শত সুবর্ণ মুদ্রা এবং পঞ্চশত রৌপ্য মুদ্রা মিলিল। পরদিন লরেটোর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শৈসা বাটী চলিলেন। পথে যাহা ঘটিয়াছিল, তাঁহার নিজের মুখেই শুনুন। তিনি লিখিয়াছেন—

"আমার সঙ্গে আবার হিতৈষী লরেটো তিন জন লোক দিয়াছিলেন। সায়ংকালে আমরা একটা পাহাড়ের পাদদেশস্থিত বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া চলিতেছিলাম এমন সময়ে ভাদুই নামক অসভ্য জাতিরা আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করতঃ যথা সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। আমরা রিক্তহস্তে এবং নগ্নাবস্থায় গৃহে আসিয়া পৌছিলাম। অদৃষ্টে আমি খুব বিশ্বাস করিতাম এবং বৌদ্ধ জাতির মধ্যে পুরাকাল হইতে এই বিশ্বাস খুব প্রবল। ঘরে আসিয়া মাতাকে সকল কথা বলিলাম, তিনি এই কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন, যেখানেই যাও ভাগ্য ভিন্ন অন্য পথ নাই।"

ইহার প্রায় সার্দ্ধৈক বৎসর পরে লরেটো আর একবার শৈসাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেবারে গিয়া শৈসা দেখিলেন লরেটোর

প্রকাণ্ড অট্টালিকা ধন ধান্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে এবং প্রশস্ত দ্বারমণ্ডপে শাণিত তরবারীহস্তে সুসজ্জিত প্রহরী দণ্ডায়মান এবং তাহার পার্শ্বে ঘোড়া ও হাতী বাঁধা আছে! অতি যত্নে লরেটো শৈসাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, যাহা কিছু দেখিতেছ তাহা তোমারই অনুগ্রহে হইয়াছে। কয়েক দিবস পরে, লরেটোর একমাত্র কন্যার সহিত শৈসার বিবাহ স্থির হইল। কন্যা অত্যন্ত রূপবতী ও অত্যন্ত গুণবতী ছিলেন। বৌদ্ধেরা জাতিভেদ মানে না, সুতরাং বহুবর্ষ পূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধ এবং খৃষ্টানে বিবাহ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এই বিবাহ প্রণালীর কথা বর্ণনা করিলে অনেক বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে এবং তজ্জন্য প্রবন্ধও দীর্ঘ হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং সে সকল কথা এস্থলে উল্লেখ করিলাম না। এই বিবাহ সম্বন্ধে শৈসা স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"আমি বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলেও লরেটোর কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতাম, কিন্তু আমার লাবণ্যময়ী ভাবী পত্নীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে ও অনুনয়ে আমি বাধ্য হইয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম, সুতরাং খ্রীষ্ট ধর্ম্মমতেই বিবাহ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। মরুটোয়া নামক স্থানে এক খ্রীষ্টীয় গির্জ্জায় আমার বিবাহ হয়, ঐ নগরেই আমার শ্বশুর বাড়ি এবং ঐ নগরেই এক্ষণে মৎপ্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ শৈসাকলেজ অবস্থিত। যখন আমি খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম তখন খৃষ্টানদের সম্বন্ধে আমি কিছুই বুঝিতাম না, কিছুই জানিতাম না, অথচ আমি খৃষ্টান হইয়াছিলাম! অনেক দেশে অনেক লোকের খৃষ্টান হইবার প্রথমাবস্থা বোধ হয় আমারই মত। বিবাহের পরে আমার শ্বশুর আমার পত্নীকে ছয় হাজার টাকা স্ত্রীধন দিয়াছিলেন এবং আমাকে যাহা দিতে চাহিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে আমি বলিয়াছিলাম "আমি পরের ধনে ধনী হইতে আকাঙ্ক্ষা রাখি না। আমার নিজের হাতে যাহা উপার্জ্জন করিব তাহাই আমার ধন তদ্ভিন্ন সমুদয়ই ভিক্ষার ধন বলিয়া গণ্য করি।"

কথা শুনিয়া লরেটো বিস্মিত হইলেন। শৈসা লিখিয়াছেন "আমি আমার সহধর্ম্মিণীর নিকট হইতে একটি পয়সাও কখনও ঋণ বা সাহায্য স্বরূপে গ্রহণ করি নাই। আমি আমার নিজের চেষ্টায় ধনকুবের ও

লক্ষেশ্বর হইয়াছি, শ্বশুরের সাহায্যে হই নাই।" কি আশ্চর্য্য আত্ম-মর্য্যাদা! ভবিষ্যতে যাঁহারা জগন্মণ্ডলে পুরুষপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়েন, বাল্যকালে এবং যুবাবস্থায় তাঁহাদের এইরূপ আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়। পত্নীকে লইয়া শৈসা গৃহে আসিলেন এবং জননীর সম্মুখে দাঁড়করাইয়া বলিলেন—"অয়ি সহধর্ম্মিণী! তুমি ধনবান ভদ্রলোকের কন্যা তাহা আমি জানি এবং শৈশব কাল হইতে সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইয়া আসিয়াছ তাহাও আমার অজ্ঞাত নহে, কিন্তু আমি দরিদ্র-সন্তান এবং আমার গৃহস্থালীও দরিদ্রের গৃহস্থালী। দরিদ্র হইলেও আমি তোমার স্বামী এবং তুমি আমার স্ত্রী; পতির দুঃখভার বহন করা পত্নীর ধর্ম্ম। আমার গৃহে তুমি সৌখিন ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিবে না, এখানে তোমাকে গৃহস্থের মেয়ের মত কার্য্য করিতে হইবে। ষ্টকীং আঁটিয়া, বুট জুতা পায়ে দিয়া, কোট পরিয়া, আতর গোলাপের আঘ্রাণ লইতে লইতে দিন কাটাইলে চলিবে না; পরিশ্রম কর এবং খাও, ইহাই আমার নীতি। গৃহ কর্ম্ম করা সতীস্ত্রীর ধর্ম্ম; নিরবচ্ছিন্ন অলসভাবে সৌখীনি করা বারাঙ্গনার কর্ম্ম।" অতি সুন্দর নীতি! অতি সুন্দর উপদেশ!

স্বল্পকাল মধ্যে কয়েকখানি বিদেশীয় সম্বাদ পত্র পড়িতে পড়িতে শৈসা নিজের সুতীক্ষ্ণ সূক্ষ্মদর্শিতা জ্ঞানে বুঝিতে পারিলেন, অতি অল্প সময় মধ্যে ইউরোপে এক মহাযুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা, এবং ঐ যুদ্ধ ঘটিলে বহু লক্ষ মুদ্রা মূল্যের "অস্থি" প্রয়োজন হইবে। তিনি নানাস্থানে গমন করিয়া এবং নানা-প্রকার অসুবিধা ও কষ্ট অতিক্রম করিয়া হাড় সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। নরাস্থি, পশ্বাস্থি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইতে লাগিল। প্রায় সার্দ্ধেক মাস কাল মধ্যে ঐ সকল রাশিকৃত অস্থি কলম্বো নগরে আনীত হইয়া প্রায় দ্বাদশটি গুদামে পরিপূরিত হইল। অল্প দিনের পরেই বড় বড় সওদাগর-দিগের নিকটে ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে সমাচার আসিয়া পৌঁছিল "যত টাকা মূল্য চাও দিতে সম্মত আছি, লক্ষ লক্ষ মণ হাড় জাহাজ

ভরিয়া পাঠাইয়া দাও।" ইউরোপ ও আমেরিকার তাগিদের জোর খুব, কিন্তু সওদাগরদিগের কাহারও ঘরে মাল নাই। এ দিকে বর্ষা ঋতুর সূত্রপাত হওয়ায় হাড় সংগ্রহ করা সুকঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিল। মাহাতা শৈসা এই হাড়ের ব্যবসায়ে খরচ খরচা বাদে এক লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা লাভ করিয়াছিলেন। এতদিন পরে তিনি রীতিমত মূলধন প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার কার্য্যের সূচনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তেইশটি নীল কুঠি এবং সতেরটি চা কুঠি প্রতিষ্ঠিত হইল। চতুর্দ্দশ বৎসর মধ্যে মাহাতা শৈসা সিংহল দ্বীপের সমুদয় দেশীয় এবং বিদেশীয় সওদাগর এবং ধনবান জমিদারদিগের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। তখন মহাজনী, তেজারতী ও ব্যাঙ্কের কর্ম্ম, জমিদারী, হুণ্ডির কারখানা, সওদাগরী প্রভৃতিতে শৈসার নাম প্রতি গৃহে গৃহে গার্হস্থ্যশব্দ বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। যে কোনও নগর বা যে কোনও উপনগরে যাও শৈসা ভিন্ন আর কথাটি নাই! অমুক রাজা বিপদে পড়িয়াছেন, অমুক জমিদার রাজস্ব দিতে পারিতেছেন না, অমুক সওদাগরের ইন্‌সল্‌ভেন্ট্‌ হইবার উপক্রম হইয়াছে, অমনই সকলে সেই পতিতপাবন ধনকুবের শৈসার গৃহে গিয়া উপস্থিত! শৈসার নামে ও বিক্রমে বাঘে ছাগে এক ঘাটে জল খাইত; তাঁহার ভয়ে ডাকাইতেরা দেশত্যাগী হইয়া চলিয়া যাইত। শৈসার সুপারিষ পত্রে তখন লোকের ডেপুটীগিরি হইত এবং খুনীর সাত খুন মাফ হইত! গবর্ণরই বল আর পুলীশের কনেষ্টবলই বল, শৈসার প্রাসাদে সকলেই এখন গমনাগমন করেন। পথ দিয়া শৈসার গাড়ি গেলে সহস্র সহস্র লোক দুই হাত তুলিয়া সেলাম করে। কি আশ্চর্য্য উন্নতি! কি অসাধারণ স্বয়ম্ভূ সমুত্থান শক্তি! মাহাতা শৈসার সমগ্র জীবন চরিত আলোচনা করিবার অবকাশ নাই এবং বাঙ্গালা মাসিক পত্রে এতবড় জীবনচরিত্রের সমাবেশ হওয়াও অসম্ভব।

শৈসা এখন ইহলোকে নাই; কিন্তু তিনি মৃত হইলেও জীবিত;

এমন পরোপকারী পবিত্রচেতা মহাপুরুষের কি মৃত্যু হয়? উপনিষদকার বলেন "ইহাঁদের মৃত্যু কেবল দেহান্তর মাত্র; ইহাঁদের অন্তর্দ্ধান কেবল অনন্ত জীবনলাভের উপায় মাত্র।" যত প্রকারের উপাধি দিলে মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ সম্মান করা হইতে পারে, সিংহল গবর্ণমেণ্ট শৈসাকে তাহা দিয়াছিলেন; নাইট, লর্ড, আরল্ প্রভৃতি উপাধি বিলাত হইতে মঞ্জুর হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু শৈসা প্রজাপুঞ্জের প্রদত্ত "লঙ্কেশ্বর" উপাধি ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করেন নাই। সিংহল দ্বীপে খুব বড়লোকদিগকে মাহাতা বলে, বোধ হয় ইহা সংস্কৃত মহাত্মা শব্দের অপভ্রংশ; শৈসা "মাহাতা" উপাধি ভাল বাসিতেন এবং ঐ নামই সতত ব্যবহার করিতেন। অনেক অনুরোধে তিনি গবর্ণরের কৌন্সিলের মেম্বরপদ, জষ্টিশ্ অব্ দি পিস্ পদ এবং কলোনিয়াল গবর্ণমেণ্টের ভাইস্ প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করিয়া অনেক দিন কার্য্য করিয়াছিলেন। নিজের চেষ্টায় তিনি যেমন ধনকুবের হইয়া ছিলেন তেমনি নানা ভাষায় এবং নানা বিদ্যায় অতুল পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। চিকিৎসা ও সংগীত বিদ্যায় তিনি উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং কৃষিবিদ্যার প্রচলন জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান পুরুষদিগের ভক্তিপাত্র হইয়াছিলেন। শৈসার বদান্যতা সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ করিতে গেলে অনেক সময় লাগিবে, সংক্ষেপে আমি তাঁহার কতকগুলি প্রধান প্রধান সৎকীর্ত্তি ও দানের কথা লিখিতেছি।

১। মরুটোয়া শৈসা কলেজ, বার্ষিক ব্যয় বিংশ সহস্র টাকা। ২। নিগম্বো ধীবর বিদ্যালয়, বার্ষিক ব্যয় দুই সহস্র টাকা। ৩। পারাদেনীয়া কৃষি কলেজ ও কৃষিক্ষেত্র, বার্ষিক ব্যয় এক লক্ষ মুদ্রা। ৪। কলম্বোর তিনটি বালিকা বিদ্যালয়, বার্ষিক ব্যয় (একত্রে) ছয় সহস্র টাকা। ৫। কলম্বো শৈসা কলেজ, বার্ষিক ব্যয় চতুর্ব্বিংশ সহস্র মুদ্রা। ৬। মরুটোয়া খৃষ্ট গির্জ্জা ও খৃষ্ট সভা বার্ষিক ব্যয় তের হাজার টাকা।

৭। কলম্বো খৃষ্ট সমাজ, বার্ষিক ব্যয় দশ সহস্র টাকা। ৮। কলম্বো, কাণ্ডি, অনন্তপুর এবং গলবন্দরের রাস্তার জন্য বার্ষিক ব্যয় সার্দ্ধ তিন সহস্র টাকা। ৯। কাণ্ডি কলেজে বার্ষিক দান বার শত টাকা। ১০। ত্রিন-কমলী বন্দরে দীনহীন যাত্রীদিগের দুঃখাপনোদন জন্য সভায় বার্ষিক সাহায্য আড়াই হাজার টাকা। ১১। গলবন্দরে ঐ আড়াই হাজার টাকা। ১২। বৌদ্ধ কাঙ্গালি সভায় বার্ষিক দান বার হাজার টাকা। ১৩। খৃষ্ট কাঙ্গালি সভায় বার্ষিক দান বার হাজার টাকা। ১৪। সমুদয় সিংহলের দরিদ্র খৃষ্টীয়দিগের জন্য পান্থশালার ব্যয় বার্ষিক ৮ হাজার টাকা। ১৫। সিংহলীভাষায় উন্নতিকল্পে বার্ষিক ছয় হাজার টাকা। ১৬। খৃষ্টীয় পুস্তক প্রচার জন্য বার্ষিক ছয় হাজার টাকা। ১৭। চারিটি হাঁস-পাতালের বার্ষিক ব্যয় এক লক্ষ টাকা। ১৮। সংগীত কলেজের বার্ষিক ব্যয় বার হাজার টাকা। ১৯। দেশীয় চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বিদ্যালয়ে বার্ষিক দান এক সহস্র টাকা। ২০। অনাথাশ্রমের বার্ষিক ব্যয় দশসহস্র টাকা। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পাঠক মহাশয়! ধনকুবের শৈসার দানের পরিচয় আর কি পাইতে ইচ্ছা করেন? ভাবুন দেখি, যাহার বৃদ্ধা মাতা ছয় আনা পয়সার জন্য সমস্ত দিন ধান ভানিত, আজ সেই ব্যক্তি লঙ্কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ! সেই শৈসা আজি লঙ্কেশ্বর, আজি ধনকুবের! মৃত্যুর সময়ে মাহাতা নগদ ২৩ কোটি টাকা জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। তদ্ভিন্ন আসবাব, অলঙ্কার, সরঞ্জাম, ভূসম্পত্তি, জমিদারী কুঠি ইত্যাদির ত কথাই নাই! সকল গুলি এক করিলে আরব্যোপন্যাসের উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়। লঙ্কায় এমন বড় স্থান নাই, যেখানে শৈসার সম্পত্তি নাই!

মাহাতার পুত্র কন্যার বিবাহে যাহা ব্যয় হইয়াছিল, তাহার তালিকাটা দেখুন।

প্রথম পুত্র ... ... বিবাহের ব্যয় ১৪ লক্ষ টাকা।

দ্বিতীয় পুত্র	...	...	ঐ	১৪ লক্ষ টাকা।
তৃতীয় পুত্র	...	...	ঐ	৫ লক্ষ টাকা।
প্রথম কন্যা	...	...	ঐ	বিশ লক্ষ।
দ্বিতীয়া কন্যা	...	...	ঐ	৮ লক্ষ।

অন্যান্য পুত্র ও কন্যার বিবাহের হিসাব দিলাম না। ভাবিয়া দেখুন, কি অসাধারণ ব্যাপার! ইহাকেই বলে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ এবং ইহাকেই বলে "স্বনাম পুরুষ ধন্য"! বাঙ্গালার রামদুলাল সরকার কিম্বা মাদ্রাজের জটাচার্লু শৈসার কাছে নগণ্য মাত্র! শৈসার স্ত্রীর গাত্রে ১৩ কোটি টাকার অলঙ্কার! সিংহলের গবর্ণর এবং মহারাণীর পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা তাহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন "এই স্ত্রীলোকের গহনা বিলাতের একটা বড়দরের লর্ডের অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান।"

শৈসা যে দিন মরেন সে দিন কলম্বো নগরে দশসহস্র লোক একত্রে সমবেত হইয়াছিল। সমাধি ক্ষেত্রে সিংহলের গবর্ণর হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য দোকানদারগণ পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চবিংশ সহস্র লোক দণ্ডায়মান ছিল। পথের দুই ধারে সঙ্গীণ নামাইয়া ইউরোপীয় ও দেশীয় সেনাগণ ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া ছিল, দর্শকেরা "আজ সিংহল আকাশের মধ্যাহ্ন রবি অকালে অস্তগত হইল" বলিয়া দর দর ধারায় অশ্রু ফেলিতেছিল। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার পুত্রেরা তিন লক্ষ টাকা দরিদ্রদিগকে দান করিয়াছিলেন। শৈসা আর নাই; কিন্তু সেই পুণ্যচেতা মহাপুরুষের নাম, যশ ও চরিত্র শুষ্ক গোলাপের ন্যায় এখনও সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। তাঁহার পুত্রেরা এখন যোগ্য হইয়াছেন, ধনকুবের শৈসার নাম তাঁহারা রাখিতে পারিবেন কি?

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ভারতে জাতি গঠন।

জাতি কি এবং সংখ্যাবহুল জাতিগঠনের আবশ্যকতা কি, গতবারে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের একজাতিত্বের উপযোগিতা ও আবশ্যকতা আছে কি না, এখন তাহাই আলোচনা করিব। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি জাতি ও ভৌগলিক দেশ সমপ্রসার হওয়া স্বাভাবিক ও আবশ্যকীয়। ভৌগোলিক হিসাবে ভারতবর্ষ এক দেশ। অনেকে ভারতবর্ষকে একদেশ বলিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু হিমালয় হইতে কুমারিকা, বা স্থলেমান হইতে ত্রিপুরার পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে এমন কোনও প্রকৃতিদত্ত সীমা নাই, যদ্দ্বারা ভারতবর্ষকে বিভিন্ন দেশে বিভক্ত করা যায়। কোনও পরাক্রান্ত আক্রমণকারী খাইবার পাশ পার হইতে পারিলে অনায়াসে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারেন, অথবা পণ্ডিচেরীতে পদার্পণ করিতে পারিলে অনায়াসে দিল্লীতে উপস্থিত হইতে পারেন। আর্য্যাবর্ত্তের বিশাল সমতল ভূমি এমন কোনও প্রাকৃতিক দুর্গম স্থানের অধিকারী নহে, যেখানে দাঁড়াইয়া ভারতবাসী নিরাপদে বৈদেশিক শত্রুর প্রতিকূলতা করিতে পারে। মধ্যভাগে বিন্ধ্যাচল দণ্ডায়মান বটে, কিন্তু তাহাও সমধিক উচ্চ নহে। ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ দুই দেশে বিভক্ত করার ক্ষমতা বিন্ধ্যাচলের নাই। এ দেশে প্রধান প্রধান নদীগুলির অবস্থানের বিশেষত্ব এই যে তাহা দ্বারা ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেশে বিভক্ত হইতে পারে না। কাজেই ভৌগোলিক হিসাবে ভারতবর্ষ এক দেশ। বিভিন্ন দেশের জল বায়ুর অনেক তারতম্য সত্ত্বেও মোটের উপর ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান। ঋতুগুলির প্রকৃতিও সর্ব্বত্রই এক। এক প্রদেশের অধিবাসীরা অপর প্রদেশে বাস করিতে বিশেষ অসুবিধা বোধ করে না। শস্যাদিও ভারতের সর্ব্বত্রই মোটের উপর এক রকম। প্রান্তভূমি বাদ দিলে সমগ্র ভারতবর্ষ সুজলা

সুফলা, শস্যশ্যামলা, এক বিশাল সমভূমি। অতএব ভারতবর্ষের এক-দেশত্বই বিধাতার বিধান। ইহাই ভারতবর্ষের একজাতিত্বের উপযোগিতা।

এতদ্ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষের এক জাতিত্ব সাধনের সমধিক আবশ্যকতাও আছে। সাধারণভাবে দেশব্যাপী জাতিগঠনের পক্ষে যে সকল কথা উপরে লিখিত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্য কতকগুলি প্রাকৃতিক কারণ বিশেষভাবে ভারতবর্ষের একত্বের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিতেছে। প্রথমতঃ, সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রতীরবিহীন দেশ কখনও প্রবল জাতির বাস ভূমি হইতে পারে না। যে দেশ বাণিজ্য ও সভ্যতার মুক্ত রাজপথ সমুদ্রে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না, সে দেশের অধিবাসীগণ চিরকালই অপেক্ষাকৃত নির্ধন, দুর্ব্বল ও অন্ধকারময় থাকিবে। পৃথিবীর কুত্রাপি এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। পঞ্জাব, রাজপুতানা, হিন্দুস্থান ও মধ্যদেশ, ভারতের এই চারিটী সুবিস্তীর্ণ উৎকৃষ্ট অংশের নিকট সমুদ্রদ্বার অর্গলিত। তাই সমুদ্র-তীরবর্ত্তী অন্যান্য অংশের সহিত মিলিত না হইলে এই চারিটী প্রদেশ কখনও ইয়ুরোপের ন্যায় শিল্প বাণিজ্য ও উচ্চ অঙ্গের সভ্যতার অধিকারী হইতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, বিস্তৃতির তুলনায় ভারতবর্ষে খনিজ পদার্থের বিশেষ অভাব, কোন কোন প্রদেশে খনিজ পদার্থ নাই বলিলেই চলে। এই কারণে বাণিজ্যের একতা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। প্রকৃতিই যেন বলিয়া দিতেছে বিভিন্ন প্রদেশগুলি মিলিত হইয়া একে অন্যের অভাব পূরণ করিয়া দিবে। তৃতীয়তঃ যদিও ভারতের সমুদ্রতীরের দৈর্ঘ্য নিতান্ত সামান্য নহে, তথাপি বাণিজ্য সৌকর্য্যার্থে মালবার উপকূলের বন্দরগুলির সাহায্য সমস্ত ভারতবর্ষেরই আবশ্যক; কারণ বাত্যাতাড়িত, তরঙ্গাহত পূর্ব্বোপকূলে নিরাপদ বন্দর নাই বলিলেই চলে। কিন্তু এক জাতিত্ব ব্যতীত বাণিজ্য বিষয়ে পরস্পরের এরূপ সাহায্যলাভ সুবিধাজনক হয় না। সর্ব্বোপরি, বিদেশীয় শত্রু হইতে আত্মরক্ষার জন্য ভারতবর্ষের একত্ব নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই সুবিস্তী

সাম্রাজ্যের যে কোন অংশে শত্রু পদার্পণ করিলে সমস্ত ভারতবাসীর সমভাবে তাহার পদদলিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদিগের স্বাভাবিক গুণাবলী পর্য্যালোচনা করিলেও তাহাদের সম্মিলন দ্বারা পূর্ণাঙ্গ একটী জাতিগঠনের আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়। ভারতের কোন প্রদেশ শৌর্য্য বীর্য্য, কোনটী বাণিজ্য তৎপরতা, কোনটী বা ক্ষিপ্রগতি মস্তিষ্কের অধিকারী হইয়াছে। এই সকলের মিলন দ্বারা যেরূপ মহৎ জাতির সৃষ্টি হইতে পারে, পৃথক্‌ভাব দ্বারা তাহা কখনও সম্ভব হইবে না।

অতএব দেখা যাইতেছে সমগ্র ভারতবর্ষের একজাতিত্বের উপযোগিতাও বিলক্ষণ, আবশ্যকতাও গুরুতর। প্রাচীনকালে দুইটী কারণ উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষকে কিছু কিছু একজাতিত্বের উপকরণও দিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম কারণ আর্য্যাধিকার। আর্য্যগণ প্রভূত পরিমাণে সমগ্র ভারতবর্ষের কর্ম্ম, শিক্ষা, চিন্তা ও ভাষার একত্ব সাধন করিয়াছিলেন। সমস্ত ভারতবাসীর সাহিত্য দর্শন ও পরস্পরের সহিত কথোপকথনের জন্য সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি প্রাচীন আর্য্য জাতির এক অদ্ভূত কীর্ত্তি ও এ দেশে একজাতিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যম। এতৎকল্পে দ্বিতীয় উদ্যম মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও তাহার ফলস্বরূপ উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি। আধুনিক সমুদয় ভারতবাসীই ন্যূনাধিক পরিমাণে আর্য্য ও মুসলমান সভ্যতার ফলভোগী। প্রাচীন আর্য্যগণ ভারতীয় অনার্য্যদিগকে ক্রমে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভূত করিয়া লইতেছিলেন; এবং আজ পর্য্যন্ত অনার্য্যদিগের হিন্দুত্ব সাধন ক্রিয়া অবিরাম গতিতে চলিতেছে। (Sir Alfred Lyall's Asiatic Studies দ্রষ্টব্য)। ইহা দ্বারা অনার্য্যগণও উন্নত হইতেছে, জাতীয় ঐক্য বন্ধনেরও সাহায্য হইতেছে। মুসলমানগণও এ বিষয়ে ভারতের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। বহুসংখ্যক অনার্য্য জাতি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমান সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই-

রূপে হিন্দু ও মুসলমানগণ অনার্য্যাদিগের মধ্যে **স্ব স্ব** সভ্যতা বিস্তার দ্বারা মোটের উপর ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের অন্যান্য অনেক পার্থক্য দূর করিয়া এই ত্রিশ কোটী লোককে দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এখনও যে সকল অনার্য্য জাতি এই দুই প্রধান শ্রেণীর বহির্ভূত আছে, শীঘ্রই তাহারাও ইহাদের অন্তর্ভূত হইয়া যাইবে, ইহা একরূপ নিশ্চিত। সামান্য কয়েক জন লোক খৃষ্টান হইতে পারে; কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা সভ্য ভারতসমাজের অঙ্গীভূত হইবে।

অনেকে মনে করেন মুসলমানগণ ভারতে উপস্থিত হওয়াতে ভারতের ঐক্য বন্ধনের ব্যাঘাত হইয়াছে। কিন্তু এই মত সমীচীন বোধ হয় না। প্রধানতঃ পারসীক, আফগান, মোগল ও তুর্কী এই চারি জাতীয় মুসলমান ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। এতন্মধ্যে পারসীক ও আফগানগণ আর্য্যবংশীয়; উচ্চশ্রেণীস্থ হিন্দুগণও তাই। আর মোগল ও তুর্কীগণ মঙ্গোলীয় জাতীয়; ভারতে আদিম অনার্য্য জাতিদিগেরও অনেকেই মঙ্গোলীয়। অতএব রক্ত সম্বন্ধে মুসলমানগণ দ্বারা বড় বেশী বৈষম্য সাধিত হয় নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানে একটা পার্থক্য জন্মিয়াছে বটে; কিন্তু তাহাতে বেশী ক্ষতি হইবে না। এ বিষয়ে পরে কিছু আলোচনা করিব। পরন্তু সাম্রাজ্য স্থাপন, সুদীর্ঘ রাজপথ নির্ম্মাণ, উর্দ্দু ভাষার সৃজন ও অনার্য্যদিগকে মুসলমান সভ্যতা প্রদান প্রভৃতি পূর্ব্বোল্লিখিত নানা উপায়ে মুসলমানগণ তাঁহাদের উপস্থিতিজনিত রক্তগত ও ধর্ম্মগত সামান্য বৈষম্যের ক্ষতি বিশেষরূপে পূরণ করিয়াছেন। মোটের উপর ভেদ অপেক্ষা মিলনেরই অধিকতর সাহায্য হইয়াছে। যাঁহারা মুসলমানদিগের উপস্থিতি একতার প্রতিকূল মনে করেন, বোধ হয় সাময়িক ও স্থানীয় বিবাদ বিসম্বাদ তাঁহাদের চক্ষু ঝলসাইয়া তাঁহাদিগকে ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে দেয় না।

৪। এই সকল সত্ত্বেও সমস্ত ভারতবর্ষ কখনও এক জাতিতে পরিণত

য় নাই। আর্য্য ও মুসলমান সভ্যতার বিস্তার এবং সংস্কৃত ও উর্দ্দু ভাষার ষ্টি জাতিগঠনের চেষ্টা মাত্র। সে চেষ্টার সাফল্য বড় বেশী হয় নাই। অধুনা ইউরোপের ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মণ, ইটালিয়ান প্রভৃতি জাতি যেমন র্ম্ম, শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতিতে অনেক পরিমাণে এক হইয়াও বিভিন্ন জাতি, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলিও সেইরূপ অনেক বিষয়ে ন্যূনাধিক পরিমাণে এক হইয়াও চিরকালই বিভিন্ন সমাজে বিভক্ত ছিল। পঞ্জাবী ও বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী ও হিন্দুস্থানী, রাজপুত ও দ্রাবিড়ী কখনও পরস্পরকে এক জাতির বিভিন্ন অংশ বলিয়া মনে করে নাই, কখনও পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব প্রদর্শন করে নাই।

কতকগুলি প্রবল অন্তরায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলিকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে। প্রথম অন্তরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এক গভর্ণমেণ্টের অধীনে বাস একজাতিত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। কিন্তু ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ কখনও একছত্রাধীন হয় নাই। কনিষ্ক, অশোক, যশোধর্ম্মদেব প্রভৃতি প্রাচীনকালে মধ্যে মধ্যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও সমগ্র ভারতে আধিপত্য লাভ করেন নাই। বিশেষতঃ সে সব সাম্রাজ্য ক্ষণস্থায়ী। মুসলমান সাম্রাজ্যও সমগ্র ভারতব্যাপী নহে। আর প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমান আমলে সুবিস্তৃত প্রতাপান্বিত সাম্রাজ্য মোগলের অধীনে ন্যূনাধিক শত বর্ষ কাল মাত্র বর্ত্তমান ছিল। তখনও বিভিন্ন প্রদেশগুলির পরস্পরের সহিত সম্পর্ক প্রায় কিছু ছিল না। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ কখনও একছত্র রাজত্বরূপ জাতিত্বের সর্ব্বোত্তম উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

দ্বিতীয়তঃ ভাষাভেদ বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদিগকে চিরকাল বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রায় দশটী প্রধান ভাষা বর্ত্তমান। প্রধান ও অপ্রধান সমস্ত ভাষা একত্রে শতাধিক। এত বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক

কখনও পরস্পরের সহিত একীভূত হইতে পারে না। এক গভর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করিতে হইলে রাজনীতির জন্য ভাষার একত্ব আবশ্যক। এ দেশে কখনও একছত্র রাজত্ব স্থাপিত হয় নাই, তাই এক ভাষার প্রয়োজনও হয় নাই, সৃষ্টিও হয় নাই। যখন মোগলগণ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন উর্দ্দু ভাষারও সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও ভারতবর্ষ একভাষা প্রাপ্ত হয় নাই। বাণিজ্য, শিক্ষা ও সাহিত্যের একতার জন্যও এক ভাষার প্রয়োজন। প্রাচীনকালে সংস্কৃত ভাষা বহু পরিমাণে সেই কার্য্য করিয়াছিল ; কিন্তু সংস্কৃতও পণ্ডিতের ভাষা ; জন সাধারণের ভাষা নহে। যাহা হউক বর্ত্তমান সত্য এই যে ভারতবর্ষ বহুভাষী ; এবং বহু ভাষিত্ব এক জাতিত্বের গুরুতর অন্তরায়।

শোণিত ভেদ ভারতবর্ষে জাতিবন্ধনের তৃতীয় গুরুতর প্রতিবন্ধক। একবর্ণাত্মকত্ব চীন ও জর্ম্মণীতে জাতিবন্ধনের যে সুবিধা করিয়াছে, পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন জাতীয় লোকের সমবায় ঘটিয়াছিল বটে ; কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থার সহিত এই সকল দেশের বিস্তর প্রভেদ। ইংলণ্ডের স্যাকসন, জর্ম্মাণ, দিনেমার প্রভৃতি জাতীয় লোকেরা সকলেই টিউটন। অবশিষ্ট ব্রিটনেরা কেল্ট। কিন্তু কেল্ট ও টিউটন, উভয়েই আর্য্যজাতীয়। ভারতবর্ষে শত শত জাতীয় লোক আছে। আদিম ভারতবাসীগণ অনার্য্য। পণ্ডিতদিগের বিবেচনায় ইহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ; ইহার প্রত্যেক শ্রেণী আবার বহু শাখায় বিভক্ত। তারপর ক্রমে আর্য্য, শক ও হূনগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করে। আধুনিক কালে তুর্কি, আরব্য, পারসিক, আফগান, মোগল, এমন কি আবিসিনীয়গণ পর্য্যন্ত ভারতের অধিবাসী শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহুদী, পর্টুগীজ, ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিদের রক্তও ভারতবর্ষে কিয়ৎ পরিমাণে বর্ত্তমান। যেখানে এত রক্ত ভেদ, সেখানে মিলন যে কিরূপ কঠিন তাহা সহজেই বুঝা যায়।

নানা কারণে ভারতের উক্ত বিভিন্ন জাতিগুলির সংমিশ্রণের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে একটী—যাহা ভারতের একজাতিত্ব সাধনের চতুর্থ অন্তরায়—ভারত সাম্রাজ্যের বিশালত্ব। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে বাসস্থানের নৈকট্য না থাকিলে জাতিগঠনের অসুবিধা জন্মে। ভারতের অতি বিস্তৃতি নিবন্ধন বিভিন্ন প্রদেশবাসীদের মধ্যে নানা বিষয়ক আদান প্রদান চলিতে পারে নাই; কাজেই তাহারা পরস্পরের সহিত একীভূতও হইতে পারে নাই। ইদানীন্তন উপনিবেশাদি দ্বারা গঠিত জাতিগুলি ছাড়িয়া দিলে, এক চীন ব্যতীত পৃথিবীর কুত্রাপি ভারতের ন্যায় বিশাল জাতি গঠিত হয় নাই। কিন্তু রক্তসাম্য—বিশেষতঃ প্রায় আড়াই হাজার বৎসরব্যাপী একচ্ছত্রে রাজত্ব চীনকে দুশ্ছেদ্যবন্ধনে এক অবিচ্ছিন্ন প্রকাণ্ড সমাজশরীরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ভারতে এই দুই কারণেরই অভাব; তাই এ দেশে বাসস্থানের নৈকট্যের অভাবজনিত অন্তরায় কখনও অতিক্রান্ত হয় নাই।

রক্তভেদ দূরীকরণের অপর বিঘ্ন ভারতের এক জাতিত্ব সাধনের পঞ্চম অন্তরায়—জাতিভেদরূপ সামাজিক ভেদ। জাতিভেদ দ্বারা অতীত কালে হিন্দু সমাজের যে অনেক উপকার হইয়াছে, তাহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু অপকারও অনেক হইয়াছে; বিশেষতঃ আজ কাল জাতিভেদ দ্বারা অপকার ভিন্ন বড় একটা উপকার হইতেছে না। জাতিভেদের প্রথম সূত্রপাত রক্তভেদ হইতে হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে স্বসমাজভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীতে পরিণত করিয়া তাহাদের উপকার করিতেছিলেন। যদি ক্রমোন্নতির সহিত কালক্রমে ইহারা আর্য্যদের সহিত মিশিয়া যাইত তাহা হইলে নিতান্ত সুখের বিষয় হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রক্তভেদ হইতে স্বাভাবিক জাতিভেদের সূত্রপাত হইয়া ক্রমে আর্য্যদিগের মধ্যেও ব্যবসায়ানুসারে কৃত্রিম জাতিভেদের উৎপত্তি হইল; এবং সেই দিন হইতেই হিন্দুদিগের একতার মূলোচ্ছেদ হইল। অনেকে মনে করেন জাতিভেদ একতার প্রতিবন্ধক নহে। কিন্তু আমার

সমান বিদ্যাবুদ্ধি ও অর্থবিত্তসম্পন্ন হইলেও যাহার সহিত কস্মিন্‌কালেও আমি বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি না, যাহার অন্ন পুরীষবৎ আমার পরিত্যজ্য, যাহার হস্তস্পৃষ্ট জল আমার নিকট মদ্য অপেক্ষাও অধিকতর অপেয়, এমন কি যাহার ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলে আমার শুচিত্বের অপচয় হয়, তাহার সহিত আমার ঐক্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা বুঝিতে পারি না। এরূপ অবস্থায় পরস্পরের মধ্যে হিংসা দ্বেষ, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর হৃদয়ে নিরন্তর ধূমায়মান দাবানল থাকা অবশ্যম্ভাবী। এ সম্বন্ধে দুইটী গল্প বলিলেই যথেষ্ট হইবে। শুনিয়াছি বরিশালের কোন কোন ভদ্রলোক একদা জাতীয় মহাসমিতিতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একজন মুসলমান ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহারা বলিলেন যে, হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই; তাই উভয়েরই সমভাবে জাতীয় মহাসমিতিতে যোগ দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। মুসলমান ভদ্রলোকটী অমনি তারস্বরে সে কথার এইরূপ প্রতিবাদ করিলেন— "মহাশয়, ভাই ভাই কিসে হয়? আমি এক গ্লাস জল দিলে আপনা পানের অযোগ্য হয়, আর বলিতেছেন হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই আপনারা আমাদের ভাই কিরূপে?" দ্বিতীয় ঘটনাটী এই—কয়েক বৎসর হইল কলিকাতাতে বৈদ্যদের একটী সভা হইয়াছিল। তন্মধে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত একটী বৈদ্যসন্তান ছিলেন। তিনি বৈদ্যজাতি শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন উপলক্ষে নানাপ্রকার স্পর্দ্ধা ও আস্ফালন পূর্ব্ব আরক্ত চক্ষু হইয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি খ্রীষ্টান হইয়াছি বটে কিন্তু যতকাল ভারতবর্ষে জাতিভেদ থাকিবে, ততকাল তাহা ভুলিতে পারিব না। বৈদ্যজাতি কোন কালেও ব্রাহ্মণদের নিকট হীন ছি না, কখনও থাকিবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।" যাহা হউক ইহা হই তেই বুঝা যায় জাতিভেদ আমাদের একতার কিরূপ বিঘ্ন।

অনেকে বলিয়া থাকেন, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও সামাজিক ভে

আছে ; এ দেশেও তাই ; তবে জাতিভেদের এত কি দোষ? যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহাদের সূক্ষ্মদর্শন বা চিন্তাশীলতার প্রশংসা করা যায় না। অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক ভেদ সকল দেশেই আছে, এবং বোধ হয় চিরকালই থাকিবে! আমাদের মধ্যেও সেই ভেদ আছে ; কিন্তু তার উপর জাতিভেদ আর একটা কৃত্রিম ভেদ স্থাপন করিয়াছে। ইংলণ্ডের অভিজাত ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি বা একত্র ভোজনের রীতি নাই বটে, কিন্তু একজন মজুরের স্পর্শেও এক জন ডিউকের অন্ন জল নষ্ট হয় না। আমাদের সাহাজাতীয় মহারাজার অন্নও, অন্য লোক দূরে থাকুক, তাঁহার ভৃত্য ব্রাহ্মণেরও অস্পৃশ্য। পরন্তু যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারিলে ইংলণ্ডের একজন সামান্য লোকের পুত্রও অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারে। কিন্তু এ দেশে কেশবচন্দ্র সেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদুলাল দে বা কৃষ্ণদাস পালের জন্মগত মলিনত্ব শত ধৌতি দ্বারাও দূর হইতে পারে না। সংক্ষেপতঃ ইংলণ্ডের আভিজাত্য কাহারও নিকট আশার অতীত নহে ; কিন্তু জাতিভেদ জনিত কৌলিন্য তত্তৎবংশোদ্ভব ব্যক্তি ভিন্ন সকলেরই নিকট আশার অতীত, তাই স্বাভাবিক সামাজিক ভেদবিশিষ্ট ইংলণ্ডে একতা বর্ত্তমান ; আর অস্বাভাবিক জাতিভেদদুষ্ট ভারতবর্ষে সে একতার নিতান্ত অভাব। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মভেদও এ দেশে এক জাতিত্বের কিছু ব্যাঘাত করিয়াছে সন্দেহ নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, একচ্ছত্র রাজত্বের অভাব, বাসস্থানের পরস্পর হইতে দূরত্ব, ভাষাভেদ, শোণিতভেদ, কৃত্রিম সামাজিক ভেদ, ও ধর্ম্মভেদ প্রভৃতি জাতিগঠনের যত অন্তরায় থাকিতে পারে, ভারতবর্ষে তাহার সকলগুলিই বর্ত্তমান। তাই ভারতের একজাতিত্ব সাধন চিরকালই এক অমীমাংসিত সুকঠিন সমস্যারূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আর এতগুলি প্রতিবন্ধক অতিক্রম করা আবশ্যক বলিয়াই ভারতবর্ষের এক

জাতিত্ব সাধনের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। ঊনবিংশ শতাব্দী ভার ইংরেজ রাজত্ব স্থাপন করিয়া এই অসাধ্য সাধনের সূচনা করিয়াছে ইহাই ভারতের ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান।

৫। কি উপায়ে এই অভাবনীয়, অদৃষ্টপূর্ব্ব ক্রিয়া সম্পাদিত হই চলিয়াছে, এখন তাহাই আলোচনা করিব।

প্রথম উপায় সমগ্র ভারতের একচ্ছত্রাধীনত্ব। সত্য বটে এখন ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য বর্ত্তমান; কিন্তু সেগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত। তথাকার প্রকৃতিপুঞ্জও ভারতেশ্বরীর প্রজা বিশেষতঃ ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর প্রভাব দেশীয় রাজ্যগুলিতেও এরূ সতেজ যে, ভারতে রাজনৈতিক একতা সাধন সমাপ্ত হইয়াছে বলি অতিরঞ্জনজনিত কোনও দোষ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ ঊনবিংশ শতাব্দী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের দূরত্ব দূরীভূ করিয়াছে। রেলওয়ে, ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ ও পোষ্টাফিস্ পাশ্চাত্য সভ্যত এই চারিটী অঙ্গ দেবদূতের ন্যায় অপরিচিতকে পরিচিত, বিদেশী প্রতিবেশীতে পরিণত করিতেছে। পূর্ব্বে চট্টগ্রাম হইতে ঢাকা যত ছিল, এখন বোধ হয় লাহোর বা বোম্বেও ততদূর নহে। তাই আ ইচ্ছা হইলে বরিশালে বসিয়া কলিকাতাবাসী বন্ধুর সহিত আলাপ করি পারি; তাই আজ জাতীয় মহাসমিতির আহ্বানে সমগ্র ভারত মিলি হয়; তাই আজ দার্জিলিঙ্গের আধিভৌতিক উৎপাত কঙ্কণবাসীর সহা ভূতির উদ্রেক করে। অতএব ভারতের অতি বিস্তৃতিজনিত বিভি প্রদেশের দূরত্বরূপ এক জাতিত্বের প্রবল প্রতিবন্ধক ঊনবিংশ শতাব্দী সূক্ষ্মতম ভগ্নাংশে পরিণত করিয়াছে বলিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ বিগত শতাব্দীতে ভাষাবৈষম্যঘটিত সমস্যারও মীমাংসা সূত্রপাত হইয়াছে। তিন প্রকারে ভাষাভেদ লঘুতর হইতেছে। প্রথমতঃ দেশীয় ভাষাগুলির ব্যাপকত্ব বর্দ্ধন। আদিম অবস্থায় প্রত্যেক দেশে

সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজগুলিতে মূল ভাষার বিভিন্ন অবান্তর ভেদ বা dialect প্রচলিত থাকে। কালক্রমে রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজগুলির একত্ব সাধনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবলতম অংশের ডায়েলেক্ট প্রাধান্য লাভ করিয়া অন্যান্য ডায়েলেক্টগুলিকে আত্মসাৎ কয়িয়া ফেলে। জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি, শিক্ষা বিস্তার, বিভিন্নাংশের অধিবাসীদিগের পরস্পরের মধ্যে অধিকতর গমনাগমন ইত্যাদি কারণ উক্তরূপ ডায়েলেক্ট ভেদ দূরীকরণের সহায়তা করে। বর্ত্তমান ইংরেজী ভাষা ইংলণ্ডের মধ্য-ভাগের ডায়েলেক্টের পরিণতি মাত্র। ভারতবর্ষের ভাষাগুলির মধ্যেও আজ কাল ডায়েলেক্টগুলির সমীকরণরূপ একটা ক্রিয়া চলিতেছে। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, বিক্রমপুর, শান্তিপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলের চলিত ভাষার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। দীর্ঘকাল বাঙ্গালী জাতি বিভিন্ন সমাজে বিভক্ত থাকিলে কালক্রমে এই সকল ডায়েলেক্ট হইতে বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হইতে পারিত। কিন্তু প্রধানতঃ নদীয়া অঞ্চলের ডায়েলেক্ট অবলম্বনে সুবিস্তীর্ণ বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সকল বাঙ্গালী শিশু সেই সাহিত্যে শিক্ষালাভ করিতেছে। অধিকন্তু এক রাজার অধীনত্ব নিবন্ধন পরস্পরের সহিত মিলামেশার প্রয়োজন এবং রেলওয়ে ইত্যাদি দ্বারা তাহার সুবিধা হওয়াতে বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাষা ক্রমে সমগ্র বাঙ্গলার ভাষা হইয়া পড়িতেছে। সমকারণ বশতঃ অন্যান্য প্রদেশেও ডায়েলেক্টের বিলোপ ও বহুব্যাপক ভাষাগঠন ক্রিয়া চলিতেছে সন্দেহ নাই এইরূপে প্রধান প্রধান ভাষার ব্যাপকত্ব লাভ দ্বারা ভাষাভেদ কিয়ৎ পরিমাণে লঘুতর হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন প্রদেশবাসীদিগের মধ্যে নানাপ্রকারের আদান প্রদান অত্যন্ত বাড়িতেছে এবং ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে। এই হেতু বিভিন্ন প্রদেশবাসীগণ পরস্পরের ভাষা অধিকতর আয়ত্ত করিতে পারিতেছে, ইহাও ভাষাভেদ জনিত অনৈক্য লাঘবের একটা সহায়।

তৃতীয়তঃ সমগ্র ভারতের রাজনীতি বাণিজ্য ও উচ্চ শিক্ষার জন্য আমরা ইংরেজী ভাষা প্রাপ্ত হইয়াছি। অতি দ্রুত পাদবিক্ষেপে দিন দিন এই ভাষা ভারতের দূর হইতে দূরতর, গুহ্য হইতে গুহ্যতর অংশে প্রবেশ লাভ করিতেছে। বিভিন্ন প্রদেশের চিন্তা ও ভাব বিনিময়ের এই উৎকৃষ্ট যন্ত্র বোধ হয় চিরতরে ভারতের ভাষাভেদের মূলোৎপাটনে সমর্থ হইবে। ইংরেজী ভাষা ভবিষ্যতে ভারতের মাতৃভাষা হইবে, এ কথা বলা নিতান্ত দুঃসাহসের কাজ সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে কয়েকটী কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। যদি ঘটনাক্রমে ইংরেজগণ এ দেশ ছাড়িয়াও যান, তথাপি ইংরেজী ভাষা এ দেশ হইতে লুপ্ত হইবে কিনা সন্দেহ; কারণ ইংরেজী ভাষা আজ কাল এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে যে, ইংরেজ রাজত্বের সহিত ইংরেজী ভাষার এখন আর তত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। প্রায় সমস্ত উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকার কোন কোন অংশ, এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সুবিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডসমূহে ইংরেজীই একমাত্র মাতৃভাষা। তাহা ভিন্ন ক্রমেই ইংরেজী অধিকতররূপে জাপানের শিক্ষা ও সাহিত্যের ভাষা হইয়া পড়িতেছে। ইংরেজী, ক্যাণ্টন ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানস্থ অনেক চীনবাসীর মাতৃভাষা হইয়া উঠিতেছে। এ দেশেও ইংরেজী মাদ্রাজ অঞ্চলের অনেকের মাতৃভাষাতে পরিণত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসী বিলাতফেরতগণের সন্তানেরা জন্মাবধি দেশীয় ভাষার সহিত ইংরেজী ভাষায়ও কথাবার্ত্তা বলিতে শিক্ষা করে। যাহা হউক ইংরেজী ভারতের মাতৃভাষা না হইলেও অতীত যুগে যেমন হিন্দু ও মুসলমানী ভাষার সংমিশ্রণে উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল, সেইরূপ কালক্রমে ইংরেজী ও দেশীয় ভাষাগুলির সংমিশ্রণে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী সমগ্র ভারতব্যাপী এক অভিনব ভাষার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নহে; পরন্তু নিতান্ত স্বাভাবিক; কিন্তু তাহা বহু সময় সাপেক্ষ। যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন ইংরেজীই আমাদের ভাষাভেদরূপ অসাধ্য

ব্যাধির মহৌষধির কার্য্য করিতে পারিবে। অতএব দেখা যাইতেছে ঊনবিংশ শতাব্দী আমাদিগকে ইংরেজী ভাষা দান করিয়া আমাদের জাতিত্ব সাধনের এক গুরুতর অন্তরায় দূর করিয়াছে।

ভারতবাসীদিগের শোণিতভেদরূপ স্বাভাবিকভেদ ও জাতিভেদরূপ কৃত্রিম সামাজিক ভেদ, জাতিগঠনের এই দুই প্রকারের অন্তরায় কি প্রকারে অতিক্রান্ত হওয়ার সূত্রপাত হইয়াছে, এখন তাহার আলোচনা কবিব। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দী জাতিভেদের প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছে। এখন যে জাতিভেদ দেখিতে পাই বস্তুতঃ তাহা জাতিভেদের প্রাণহীন কায়া মাত্র। জাতিভেদের মূল দুই—শোণিতভেদ এবং ব্যবসায়ভেদ (বিবাহভেদ ইহার উদ্দেশ্যেও অবলম্বন, অন্নভেদ ইহার সহায়। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের জাতিনির্ব্বিশেষে গুণের সমাদর, ও ইংরেজী বিদ্যালয়ের জাতিনির্ব্বিশেষে বিদ্যাদান, এই দুই ব্রহ্মাস্ত্র চিরতরে ব্যবসায়ভেদের প্রাণসংহার করিয়াছে। উপযুক্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, কামার কি কুমার, বেনে কি বাড়ৈ, যাহাই হউক রাজকর্ম্মে তাহার অধিকার সমান। আগরওয়ালা কি স্বর্ণবণিক, বৈদ্য কিম্বা কায়স্থ, তেলি কিম্বা সাহা, রাজা মহারাজাগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট সমান সম্মানভাজন। ইংরেজী বিদ্যালয়গুলি ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেরই নিকট সমভাবে অবারিতদ্বার। তাই ব্যবসায় ভেদ একেবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। এখন কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার প্রভৃতি জাতি ব্রাহ্মণসন্তানকে শাস্ত্র শিক্ষা দিতেছে। ব্রাহ্মণগণ যজন যাজন ত্যাগ করিয়া সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন ; বৈদ্যসন্তান জুতা বিক্রয় করিতেছে ; বৈদ্যের ব্যবসায় সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছে ; উকীল ও ইঞ্জিনিয়ার শ্রেণীতে সকল জাতি হইতে লোক সরবরাহ হইতেছে ; এবং সর্ব্বজাতীয় ব্যক্তিগণ বৈশ্যের ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করি-

তেছে। জাতিভেদের প্রাণ ব্যবসায়ভেদের উচ্ছেদে অন্নভেদের উচ্ছে-দেরও সূত্রপাত হইয়াছে। রেলওয়ে ও ষ্টীমার এবং তাহাদের অস্তিত্বের ফলস্বরূপ নিরন্তর ইতস্ততঃ গমনাগমন ও পরস্পরের সহিত মেলামেশা অন্নভেদের দ্রুত বিলোপ সাধন করিতেছে। মনুনিষিদ্ধ খাদ্যের প্রতি এখন আর শিক্ষিত লোকদের ততটা অপ্রবৃত্তি নাই। তাহাও যেন মুণ্ডিতগুম্ফ, দীর্ঘশিখ ঠাকুর অপেক্ষা শ্মশ্রুধারী, সচাপ্‌কান্‌ পাচকের হস্তপূত হইলেই অধিকতর উপাদেয় হয়। শ্রদ্ধা হইলে সকলের অন্নই খাওয়া যাইতে পারে, এইরূপ একটা কথা চারিদিকে শুনিতে পাইতেছি। স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলেই সকল পথ্যই বিহিত, ইহা আজকাল অনেক হিন্দু রমণীও বলিয়াও থাকেন। বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে যে স্পর্শদোষের ভয় ছিল তাহাও চলিয়া যাইতেছে। সর্ব্বোপরি বিলাত ফেরতগণ অন্নভেদ একেবারে উঠাইয়া দিতেছেন।

এইরূপে ব্যবসায়ভেদ ও অন্নভেদ সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ ক্রমে ক্রমে এ দেশে বিবাহের বয়স বাড়িয়া যাইতেছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাত্র পাত্রীর মতামত গ্রহণের আবশ্যকতাও উপস্থিত হইতেছে। ইহাতে যে বিবাহভেদ উঠিয়া যাওয়ার গুরুতর কারণ বর্ত্তমান আছে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। ব্যবসায় ভেদের লোক, অন্নভেদের উচ্ছেদ, বিবাহের বয়স বৃদ্ধি, শিক্ষা দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর উন্নতি ও বিভিন্ন জাতির সভ্যতার সমতা সাধন, এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে অধিকতর মেলামেশা, এই কয় কারণে বিবাহভেদ উঠিয়া যাওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক ও সম্ভবপর। তাহা হইলেই রক্তভেদও দূর হইল। কিন্তু তাহা বহু সময়-সাপেক্ষ। আজ কাল বিভিন্ন প্রদেশবাসী এক জাতীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিবাহভেদ উঠাইয়া দেওয়ার কথা শুনিতেছি। ইহা অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য এবং সম্ভবতঃ অদূরবর্ত্তী ভবিষ্যতেই সাধিত হইবে। যদি তাহাই হয়, এবং ব্যবসায়ভেদ ও অন্নভেদ সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যায়, এবং শিক্ষা দ্বারা

বিভিন্ন জাতিসমূহ সভ্যতার এক সমতলে উপস্থিত হয়, তবে বিবাহ বিষয়ে কিছু ভেদ থাকিলেও এক জাতিত্বের ব্যাঘাত ঘটিবে না, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। অতএব উনবিংশ শতাব্দী সকলের নিকট শিক্ষার দ্বারোমোচন ও জাতি নির্ব্বিশেষে গুণের সমাদর প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের একতার প্রবল অন্তরায় শোণিতভেদ ও সামাজিক ভেদের অনৈক্যসাধক শক্তির মূলে তীক্ষ্ণ কুঠারাঘাত করিয়াছে।

এখন ধর্ম্মভেদের কথা। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধর্ম্মভেদ জাতিবন্ধনের তত গুরুতর অন্তরায় নহে। অধিকন্তু ভগবান্ পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিকে এমনি একটু বিশেষত্ব দিয়াছেন যে, এখানকার জলবায়ু ধর্ম্মবিষয়ে সকলেরই মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে সক্ষম। এ দেশে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক দেখিলে কাহারও শোণিত তত অসহন উষ্ণতা প্রাপ্ত হয় না। নামতঃ এক ধর্ম্মাবলম্বী খৃষ্টানগণ যেমন নররক্তে আপনাদের ধর্ম্মান্ধতার তর্পণ করিয়াছেন, ভারতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে তেমন কিছুই ঘটে নাই। বিশেষতঃ যে সকল মুসলমান ভারতবর্ষের অধিবাসী হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দুদের প্রতি বড় বিরূপ হন নাই। এ দেশে ধর্ম্মভেদরূপ সমুদ্রে সেতুবন্ধনেরও কতক চেষ্টা হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে নানক ও কবীরের ধর্ম্মপ্রচার ভারতের দুই প্রধান ধর্ম্মের সমন্বয়ের চেষ্টা মাত্র। আজকাল আমরা মুসলমানপূজ্য সত্যপীর ও গাজীর সিন্নি দেই। মুসলমান ফকিরেরা হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীরই সমান শ্রদ্ধার পাত্র। পক্ষান্তরে, মুসলমানেরাও শীতলা দেবীকে ভয় করে, ঔষধার্থে সময়ে সময়ে হরির ধূলা গায়ে লেপন করে, এবং শুভলগ্নের অনুসন্ধানে হিন্দু জ্যোতিষীর অন্বেষণ করে। সর্ব্বোপরি আজ কাল এমন এক উদারতার দিন আসিতেছে যে, বোধ হয় ধর্ম্মভেদ ভবিষ্যতে কুত্রাপি জাতিগঠনের অন্তরায় হইবে না। ইয়ুরোপে সংস্কৃত ভাষার প্রচার দ্বারা সমগ্র মানবজাতির জ্ঞানের কি প্রকার উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা সকলেই অল্পাধিক জানেন।

সে কথা এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে; যেহেতু এই প্রবন্ধের বিষয় ভারতবর্ষ, সমগ্র মানব জাতি নহে। কিন্তু সংস্কৃতের প্রচার দ্বারা এক বিষয়ে ভারতবর্ষ অত্যন্ত লাভবান্ হইয়াছে। ইয়ুরোপীয়গণ হিন্দু ও বৌদ্ধ সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইয়ুরোপ ব্যতীত অন্যত্রও উৎকৃষ্ট সাহিত্য দর্শন ও সভ্যতার সৃষ্টি হইতে পারে; এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম্মও শয়তানের ছলনা না হইয়া ধর্ম্মনামের যোগ্য হইতে পারে। তাই পাশ্চাত্য জাতিগণ ক্রমেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিতেছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি মহৎ উদারতার দিন আসিয়াছে। তাহার তরঙ্গ ভারতবর্ষেও পৌঁছিয়াছে। মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস এ দেশবাসীদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে এক অপূর্ব্ব উদারতা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেন সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়রূপ নববিধান প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান সমাজেও যে এই সকল জাতীয় আন্দোলনের তরঙ্গ লাগিতেছে না, তাহা নহে। তাঁহারাও ক্রমেই অধিকতর উদার হইতেছেন। শিক্ষাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই উদারতা আরো বৃদ্ধি পাইবে। তাই বোধ হয়, হিন্দু সমাজের জাতিভেদজনিত স্পর্শদোষের ভয় তিরোহিত হইলে উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মবিষয়ক উদারতা ধর্ম্মভেদকে জাতিবন্ধনের প্রতিকূলতা হইতে নিবৃত্ত করিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে উনবিংশ শতাব্দী ভারতকে সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এক সুমহৎ, সুসম্বদ্ধ, অবিচ্ছিন্ন জাতিগঠনের সূত্রপাত করিয়াছে। যে দিন এই প্রারব্ধ মহা ব্যাপার সুসম্পন্ন হইবে, সে দিন ভারতের অতি শুভ দিন; অতীত যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সেরূপ শুভ দিন ভারতভাগ্যে কখনও ঘটে নাই। তাই বোধ হয় ভগবানের বিশেষ বিধানে ইংরেজ জাতি এ দেশে আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। ইহাতে ইংরেজ জাতি লাভবান্ হইতেছেন, সমগ্র জগতের জ্ঞানের প্রসার বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের যে প্রভূত উপকার হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহা অতুল, অপরিমেয়। ঘটনাক্রমে এ দেশ হইতে এক দিন ইংরেজ রাজত্ব লোপ পাইতে পারে। কিন্তু ভারতের ত্রিশ কোটী মানবাণুর যথোচিত সংমিশ্রণ ও সুকৌশল বিন্যাস দ্বারা সর্ব্বাবয়বে সমলক্ষণাক্রান্ত অভিনব একজাতি সৃষ্টিরূপ যে মহদনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে, তাহা সুসম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিলে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ইংলণ্ডের নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

শ্রীপরেশ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাণী চন্দ্রকলা।

"মা! মা!—আর কত কাল এ ভাবে কাটাবে? একবার উঠ দেখি? আমি যে আর পারি না?"

মাতা কিছু বলিলেন না। নীরবে উঠিয়া বসিলেন। নবঘন মায়ের সেই শোকক্লিষ্ট মুখখানি দেখিয়া কি বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গেলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ মায়ের পার্শ্বে নীরবে বসিয়া রহিলেন।

আজ ছয় দিন হইল রাজার মৃত্যু হইয়াছে। নবঘন বাড়ী আসার পরেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অনেকটা বিষয় কর্ম্মের আবর্ত্তে পড়িতে হইয়াছে, তাই পিতৃবিয়োগজনিত শোক তাঁহাকে অধিক কাতর করিতে পারে নাই। কিন্তু রাণী চন্দ্রকলা পতিবিয়োগে নিরতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছেন। নবঘন সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে ও ছোট রাণীকে প্রবোধ দিতে পারিতেছেন না।

রাণী চন্দ্রকলা মূল্যবান বস্ত্র ও রত্নখচিত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার পরিধানে একখানা মোটা সাদা সাড়ী। তিনি তাঁহার কক্ষের মধ্যে মেজের উপর একখানা কম্বল পাতিয়া শুইয়াছিলেন। রাণীর শয়ন গৃহটী সুপ্রশস্ত, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাহার পশ্চিম কোণে একখানা পালঙ্ক, বিবিধ কারুকার্য্যখচিত। পূর্ব্বদিকে সারি সারি সাজান কয়েকটী কাঠের বাক্স ও একটী বড় আলমারী। ঘরের আর একদিকে সিশু কাঠের একটী বড় গোল টেবিল, তাহার চারিদিকে সাজান কয়েক খানা সিশু কাঠের চৌকী ও একখান বড় আরাম চৌকী তাহার কিঞ্চিৎ দূরে দুইটী আলনার উপর নানাবিধ কাপড় সাজাইয়া রাখা

হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রাণীর স্বহস্ত নির্ম্মিত একটা কড়ির আলনার উপর অনেকগুলি কাপড় ঝুলিতেছে। ঘরের চারিদিকের দেওয়ালে কলিকাতার আর্টষ্টুডিওচিত্রিত দেব দেবীর অনেকগুলি ছবি টাঙ্গান রহিয়াছে ও দুইটী বিলাতী তৈল চিত্রও আছে। এ গুলি নবঘন কলিকাতা হইতে আনিয়াছিলেন। ঘরের আসবাবও অনেকগুলি তাঁহার ফরমাস্ মতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

এখন বেলা এক প্রহর। একজন দাসী ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া ঘর ঝাঁট দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আর এক জন দাসী আসিয়া এক খানা ঝাড়ন দিয়া ঘরের মধ্যে সাজান আসবাবগুলি ঝাড়িতেছে। উন্মুক্ত বাতায়ন পথে সূর্য্যের আলোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাণীর গায়ে পড়িয়াছে। তাঁহার শরীরের মধ্যাহ্নপ্রখর গৌরোজ্জ্বল কান্তি যেন উছলিয়া পড়িতেছে। তাঁহার নিবিড় রুক্ষ আলুলায়িত কেশরাশি শরীরের অর্দ্ধাংশ ঢাকিয়া রহিয়াছে। অনেকক্ষণ হইল তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। এখন চক্ষু মেলিয়া শুইয়া কত কি চিন্তা করিতেছেন। এই সময়ে নবঘন আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন।

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া নবঘন আবার বলিলেন, "মা! তুমি এ ভাবে থাকিলে চলিবে না। আমি যে মহা শঙ্কটে পড়িয়াছি, কোন কূল কিনারা দেখি না।"

রাণী ধীরভাবে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "কেন বাবা? কি হইয়াছে?"

"আর কি হবে? তুমি ত সকলই জান! এ দিকে যে সব গোলযোগ উপস্থিত আমি তাঁহা কি করিয়া থামাই? কাল সিন্ধুক খুলিয়া দেখিলাম, নগদ তহবিল মাত্র ১৫৷৶০, শ্রাদ্ধের মাত্র ৪।৫ দিন বাকী। তাহার কি করা যায়?

"কেন বাবা! বড় আশ্চর্য্য দেখিতেছি। যে দিন রাত্রে রাজার মৃত্যু

হয়, সে দিন সন্ধ্যাকালে কলসপুর কাছারি হইতে ৫০০৲ টাকা আসে আমি খবর পাইয়াছি। সে টাকা কি হইল ?”

“চুরি—একদম সব চুরি গিয়াছে। যত আমলা দেখিতেছ, ইহারা সব চোর। এই একটা গোলযোগের সময় হিসাব নিকাশ নেয় কে, তাই যে যাহা পাইয়াছে সব চুরি করিয়াছে।”

রাণী একটু সোজা হইয়া বসিলেন ও মুখের উপর হইতে চুল পশ্চাতের দিকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন :—

“সে কথা কেন বল? হিসাব নিকাশ এখানে কবেই বা ছিল? কেবল আজ বলিয়া নয়, এখানে উহারা বরাবরই এরূপ চুরি করিয়া থাকে। আমি কতবার রাজাকে সাবধান করিয়াছি, কিন্তু তিনি মনোযোগ করেন নাই। গরিব প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া টাকা আনিয়া এই চোরদিগকে বাঁটিয়া দেওয়া এখানে বরাবর চলিয়া আসিতেছে।”

“শ্রাদ্ধের ত মাত্র ৪।৫ দিন বাকী, আর কাহারও নিকট যে টাকা ধার কর্জ্জ পাওয়া যাবে এরূপ সম্ভব নাই। বরং আমি বাটী আসা অবধি দলে দলে পাওনাদারগণ আসিতেছে, কেহ বলে দুশ পাব, কেহ বলে পাঁচশ, কেহ বলে হাজার, কেহ বলে পাঁচ হাজার এই রকম। আমি এ পর্য্যন্ত যাহা হিসাব পাইয়াছি, তাহাতে এই সকল খুচরা দেনাই বিশ হাজার টাকা হবে। আজ আবার পুরীর মোহান্ত চতুর্ভুজ রামানুজ দাসের লোক আসিয়াছে। সেখানে বিশ হাজার টাকা দেনা ছিল, মোহান্ত বাবাজী আজ দুই বৎসর হইল নালিশ করিয়া ৩৫ হাজার টাকার এক ডিক্রি করিয়াছেন। এখন টাকা না দিলে তিনি সেই ডিক্রি জারি করিয়া এই রাজগী ক্রোক দিবেন সংবাদ পাঠাইয়াছেন। ইহা ছাড়া এই বৈশাখের কীস্তির সদর খাজনাও পাঁচ হাজার টাকা এখন দিতে হইবে, নচেৎ মহাল নিলাম হইয়া যাবে। তবে মফস্বলে কি আদায় হইবে বলিতে পারি না।”

রাণী বলিলেন "বাবা! ঐ জানালাটা বন্ধ করিয়া দেও, তোমার মুখে রৌদ্র লাগিতেছে।"

নবঘন উঠিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া বসিলেন। রাণী বলিলেন মফস্বলে বেশী বাকী আছে আমার এরূপ বোধ হয় না। আমি যতদুর জানি, রাজা ঐ সকল দুষ্ট লোকগুলার পরামর্শে ক্রমাগত আগাম খাজনা আদায় করিতেন, তা' না হইলে খরচ কুলাইবে কেন? তাহাতে কত প্রজা কত সময়ে আসিয়া কাঁদা কাটা করিয়াছে, কিন্তু তাহা কিছুই শুনেন নাই।"

"তবে আমাদের এই বিপদের সময় প্রজাদিগের নিকট হইতে যে কিছু আদায় করিতে পারিব সে আশাও নাই?"

"না।"

"তবে এখন উপায় কি? দেনা শোধ পড়িয়া থাকুক এখন এই উপস্থিত ব্যয়, শ্রাদ্ধের কি উপায় হইবে?"

"কিরূপ ভাবে শ্রাদ্ধ করিতে চাও?"

"মা! সে কথা তুমিই ভাল জান আমি কি জানি? আমি ত এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তবে আমি এই পর্য্যন্ত বুঝি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা অনুসারে যাহা না হইলে নয় তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু একথাও আবার দেখিতে হইবে যে এদেশে বাবার নাম যেরূপ প্রসিদ্ধ, তাঁহার নামের সম্মান যাহাতে রক্ষা হয়।"

"তা'ত বটেই? আমার বোধ হয় অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ হাজার টাকার কমে শ্রাদ্ধ হইবে না?"

"কি? পাঁচ হাজার? এত টাকা কোথায় পাইব?"

"বাছা, তুমি ভাবিও না। আমার বাবা আমাকে যে মাসহারা দিতেন, তাহার কিছু কিছু জমাইয়া আমি দুই হাজার টাকা করিয়াছি। আর আমার গহনা গুলি ত আছে? তাহার দামও অন্ততঃ পক্ষে তিন

হাজার টাকা এখন হবে। তুমি ইহা দ্বারা এখন কার্য্য উদ্ধার কর, তুমি বাঁচিয়া থাকিলে সব হবে।”

মাতার কথা শুনিয়া নবঘনের চক্ষে জল আসিল। তিনি চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—

“মা! আমি কোন্ প্রাণে তোমার গায়ের গহনা গুলি লইয়া বেচিয়া ফেলিব? আর কি রকমেই বা তোমার বহু কষ্টে সঞ্চিত এই টাকা গুলি কাড়িয়া লইব? আমি প্রাণ থাকিতে তাহা পারিব না।”

পুত্রের কথা শুনিয়া মাতার চক্ষেও জল আসিল। বহু আয়াসে প্রশমিত অশ্রুধারা আবার প্রবাহিত হওয়াতে তাঁহার গণ্ডদেশ ভাসিয়া গেল। তিনি অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—

“আরে নব! তুই একথা বলিয়া আমার প্রাণে ব্যথা দিস্ কেনরে? আরে তুই আমার অঞ্চলের ধন, আমার আঁধারের মাণিক। আমি অনেক চেষ্টা করিয়া তোকে লেখা পড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছি—তুই আমার উজ্জ্বল রত্ন। তুই বাঁচিয়া থাকিলে আমার আর ভাবনা কি? তুই ইচ্ছা করিলে এরূপ হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবি। তোর কাছে একয়টা টাকা কি?”

নবঘন অশ্রুজল মুছিয়া বলিলেন “আচ্ছা, মা! আমি তোমার কথা শুনিব। বাবার শ্রাদ্ধের জন্য টাকার নিতান্ত দরকার, তাই তোমার সেই দুই হাজার টাকা হাওলাৎ লইব। কিন্তু তোমার গায়ের গহনা আমি কিছুতেই বেচিতে পারিব না।”

“আরে বেচিবি কেন? এগুলি লইয়া বন্ধক দিলে অন্ততঃ পক্ষে দুই হাজার টাকা পাওয়া যাইবে। এই চারি হাজার টাকা নগদ হাতে আসিলে একরকম কাজ চালাইতে পারিবি। তারপর তুই রোজগার করিয়া সেগুলি খালাস করিস্। এ গহনা গুলি ত এখন ঘরেই পড়িয়া থাকিবে? আমাদের ঘরে না থাকিয়া বরং মহাজনের ঘরে থাকুক?”

"আচ্ছা মা! আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি দাসত্ব করিতে হয়, তাহাও স্বীকার কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই আমি তোমার গহনা খালাস করিব।"

"প্রতিজ্ঞার দরকার কি বাছা? তোর নিজের জিনিস তুই যাহা ইচ্ছা তাই করিতে পারিস্।"

"আচ্ছা মা, শ্রাদ্ধের ত যেন এক রকম বন্দোবস্ত হইল। আর ৮।১০ দিন পরে যে বৈশাখের কীস্তির সদর খাজনা দিতে হইবে, তার কি?"

"তার ত কোন উপায় দেখিনা।"

"কিন্তু রাজগী যে বিক্রয় হইয়া যাইবে?"

"এত সহজে নিলাম হইবে না। আমাদের সদর খাজনা ত কখনও বাকী পড়ে নাই, এই প্রথম। তুমি কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া আসিবে। তাঁহাকে বলিবে যে রাজার মৃত্যু হইয়াছে, আমরা ঋণগ্রস্ত। এক কীস্তির খাজনাটা একটু সবুর করিয়া লইতে হইবে। আমার বোধ হয় কালেক্টর সাহেব তাহা শুনিবেন। পরে কার্ত্তিক মাসের মধ্যে একরকম টাকার যোগাড় করা যাইবে।"

রাণীর কথা শুনিয়া নবঘনের মুখে উৎসাহের ছটা ফিরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন—

"তা—মা আমি খুব পারিব। আর কমিশনার সাহেবও আমাকে জানেন, আমাদের বিপদের কথা শুনিলে, তিনিও আমাকে সময় দিবেন।"

"কিন্তু, বাবা! বড়, বেশী ভরসা নাই, তাঁহারাও পরের চাকর, আইন কানুনের বাধ্য। যাহা হউক তুমি ইহার মধ্যে গোমস্তাদিগের ও দেওয়ানজীর হিসাব নিকাশ করিয়া দেখ মফস্বলে কত বাকী বকেয়া আছে। যে রকমে হউক, কার্ত্তিকের কীস্তিতে যোল আনা সদর খাজনা দশ হাজার টাকা না দিতে পারিলে রাজগী রক্ষা করা অসম্ভব হইবে।"

"তার পরে—এই মোহান্ত বাবাজীর পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার কি হইবে ?"

"যে লোক আসিয়াছে তাহাকে বলিয়া দেও, আমাদের এই বিপদ উপস্থিত, এখন টাকা দেওয়ার সাধ্য নাই। মোহান্ত বাবাজী ছয় মাসের সময় দিন, পরে কতক টাকা নগদ দিয়া একটা কীস্তিবন্দী করা যাইবে।"

"যদি মোহান্ত বাবাজী না শুনেন ?"

"না শুনিলে আর উপায় নাই—এ রাজগী নিলাম করিয়া নিবেন তাহা ঠেকাইবার সাধ্য নাই।"

"আর মা, অন্যান্য খুচরা পাওনাদারগণকেও কিছু কিছু না দিলে তারাও ত নালিশ করিয়া ডিক্রি করিবে ও মহল ক্রোক দিবে ?"

"তা'ত দেবেই।"

"তবে এরূপ স্থলে মোহান্ত বাবাজীই ত আগে ক্রোক দিবেন, কারণ তাঁহার ডিক্রি আগে করা আছে। আর যে আগে ক্রোক দিতে পারিবে, তাহার টাকাই আগে আদায় হইবে। এজন্য, বোধ হয় মোহান্ত বাবাজী আমাদিগকে আর সময় দিবেন না।"

"বাবা ! এ সংসারে সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ খোঁজে। আর তাঁহাকেই বা কি বলা যায় ? আজ দুই বৎসর হইল তিনি ডিক্রি করিয়া বসিয়া আছেন ইহার মধ্যে একটী পয়সা তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। তিনি যদি ছয় মাস সময় দেন, তবে তাঁহার মহত্ত্ব, না দিলে তাঁহার দোষ দিতে পারি না।"

"কিন্তু ছয় মাসের পরেই বা সে টাকা কোথা হইতে আসিবে ?"

"সে ভাবনা পরে ভাবিও।"

"তবে আমি গিয়া তাঁহার লোককে বলি, দেখি সে কি বলে। আচ্ছা মা ! ছোট মা এসব কথা কিছু জানেন কি ?"

"না বাছা ! তাহাকে এসব কথা বলিয়া লাভ কি ? তার হাতে নগদ

টাকা কিছু নাই। আর দেখ, বাবা, তুমি আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক আছ, কিন্তু তার তো সান্ত্বনা পাওয়ার আর কিছুই নাই? তা বড় দুর্ভাগ্য!”

“কেন মা! আমি যেমন তোমার ছেলে, তেমন তাঁরও ছেলে— আমি যতদূর সম্ভব তাঁর কষ্ট দূর করিব। ছোট মাকে তবে এসব কথ কিছু বলিবার দরকার নাই। তবে আমি এখন যাই, সে লোকটা অনেক ক্ষণ বসিয়া আছে।”

নবঘন বাহিরে আসিলেন।

এই ঘটনার পর দিন রাণী একজন বিশ্বাসী লোকের হস্তে গোপনে তাঁহার গহনার বাক্স পুরীতে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া দুই হাজার টাকা কর্জ্জ করা হইল। রাণীর দুই হাজার ও এই দু হাজার এই চারি হাজার টাকায় রাজার শ্রাদ্ধ একরকম নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বা করা হইল। কিন্তু দেনার জন্য নবঘন অস্থির হইয়া পড়িলেন। সম্পা রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

মিথিলা-সন্দেশ।

পাঠ্যাবস্থায় বারাণসী নগরে অবস্থানকালে নানাদিগ্‌দেশীয় সহধ্যায়ি দের মুখে নানাদেশের কৌতুকাবহ বৃত্তান্ত শ্রবণে সেই সকল জনপ সন্দর্শনের নিমিত্ত ঔৎসুক্য জন্মিত। ১২৯৯ (১৮৯২ খৃঃ) বঙ্গাব্দে সুযো লাভ করিয়া মিথিলা সন্দর্শনার্থ যাত্রা করি। মিথিলায় দেখিবার ও জানি বার অনেক পদার্থ বিদ্যমান আছে। আমরা ভারতীর পাঠকবর্গকে উহার কিঞ্চিৎ উপহার প্রদান করিতেছি।

বর্ত্তমান ত্রিহুত রাজ্য পুরাকালে মিথিলা নামে অভিহিত হইত। কথিত আছে—চন্দ্রবংশে মিথি নামে এক নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় নামে যে নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন উহার নাম মিথিলা। সেই নগরীর নামানুসারে এই জনপদ মিথিলা নামে আখ্যাত হইয়াছে। প্রখ্যাতনামা রাজর্ষি জনক মিথির বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিথিলা রাজ্যের অধীশ্বর হইলেও ঋষির ন্যায় কালাতিপাত করিতেন। নানা দেশ হইতে সমাগত বিদ্যার্থিগণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা বা উপনিষদ্ শিক্ষা করিতেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই রাজর্ষির শিষ্যগণের অন্যতম। সাধ্বীগণের আদর্শ ভুবনবিখ্যাতা সীতাদেবী এই রাজর্ষি জনকের দুহিতা। ইহাঁর অধস্তন পুরুষগণ কতকাল মিথিলায় রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহার সবিশেষ কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মিথিলায় অনেক রাজবংশের অভ্যুদয় ও বিলয় সংঘটিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য জনপদের ন্যায় উহার কোন ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত নাই। চন্দ্রবংশীয় রাজর্ষিগণের রাজ্যাবসানে যদুবংশীয় নরপতিগণ একসময় মিথিলার শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় যদুবংশীয় নৃপতিগণের রাজ্যশাসনকালে বলরাম মিথিলায় আগমন করিয়াছিলেন। ইদানীন্তন কালে যে সকল রাজা মিথিলারাজ্য শাসন করেন তন্মধ্যে কর্ণাট হইতে সমাগত প্রমরবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতিদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীনের সময় হইতে ২২৬ বৎসর পর্য্যন্ত মিথিলা বা ত্রিহুত রাজ্য শাসন করেন। এই বংশের প্রথম রাজা নান্যদেব। তিনি অনুমান ৯৬৮ শকাব্দে নান্যপুরে আপন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসন কাল ৩৬ বর্ষ। তাঁহার পুত্র গঙ্গদেব ১৪ বর্ষ মাত্র মিথিলা রাজ্য শাসন করেন। তাহার পর গঙ্গদেবের অধস্তন নরসিংহদেব, রামসিংহদেব, শক্রসিংহদেব ও হরিসিংহদেব যথাক্রমে মিথিলা রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। যবন আক্রমণে বিত্রস্ত হইয়া হরি-

সিংহদেব ত্রিহুত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া নেপালের অরণ্যে প্রবেশ করিলে এই রাজ্য রাজশূন্য হয়। অনন্তর দিল্লীর সম্রাট ফিরোজসা ত্রিহুতের জগৎপুর নিবাসী ওএন ঠাকুরের বংশসম্ভূত পণ্ডিত কামেশ্বর ঠাকুরকে ত্রিহুত রাজ্য প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন। কামেশ্বর ঠাকুর একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁহার পার্থিব সম্পদে তত আস্থা ছিল না সুতরাং তিনি সম্রাটের দান গ্রহণে সম্মত হন নাই।

অনন্তর কামেশ্বর ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র ভোগীশ্বর ঠাকুর সম্রাটের নিকট হইতে ত্রিহুত রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। কামেশ্বরের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ রাজা ভোগীশ্বর, দ্বিতীয় সমেশ্বর, তৃতীয় রাজা ভবসিংহ। তৃতীয় পুত্র ভবসিংহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট হইতে রাজ্যের আপন অংশ ভিন্ন করিয়া লন। শেষে অপর দুই ভ্রাতার বংশলোপ হইলে সমুদয় ত্রিহুত রাজ্যাই রাজা ভবসিংহের করগত হয়। এই রাজা অতি প্রকৃষ্ট প্রণালীতে ত্রিহুতরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার মহিষী হাসিনী দেবী এই রাজার বড় প্রেয়সী ছিলেন। তিনি স্বামীর চিতারোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ভবসিংহের পরলোকগমনে তদীয় পুত্র রাজা দেবসিংহ ত্রিহুতের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। এই যুবা নরপতি পৈতৃক-রাজধানী ওএনপুর পরিত্যাগ করিয়া স্রোতস্বতী বাগ্মতীর তটে দেবকুলী নামে রাজধানী স্থাপন করেন। এক সময় ঐ দেবকুলী রাজধানী সমুন্নত প্রাসাদমালা, মনোহর উদ্যানরাজি এবং জলাশয়-সমূহে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিত। দেবসিংহের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ রাজা শিবসিংহ। এই রাজার অবদানপরম্পরা লোকপ্রসিদ্ধ। ইঁহার সমুদয় গুণের বর্ণনা করিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। ইনি অতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ইঁহারই জীবৎকালে বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনার সূত্রপাত হয়। প্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের দ্বারস্থ পণ্ডিত ও বয়স্য ছিলেন। বিদ্যাপতি যে সকল পদাবলী রচনা করেন, উহা মৈথিলী ও বাঙ্গালা-

মিশ্রিত এবং ঐ সকল রচনাই বাঙ্গালা কবিতার ভিত্তি। কবি বিদ্যাপতি সংস্কৃত ভাষায়ও অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি 'পুরুষ-পরীক্ষা' 'কীর্ত্তিলতা' 'শৈবসর্ব্বস্বসার' প্রভৃতি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিয়া এই কবির অসাধারণ কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা শিবসিংহ লক্ষ্মণাব্দের ৩৯৩ সম্বৎসরে শ্রাবণ মাসে কবি বিদ্যাপতিকে ত্রিহুতের অন্তর্গত বিসপী নামক গ্রাম দান করেন। ঐ সংস্কৃত দানপত্রখানি তাঁহার অধস্তন পুরুষদিগের নিকট আছে এবং পুরুষপরীক্ষা নামক সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত ঐ দানপত্রখানি মুদ্রিত হইয়াছে। রাজা শিবসিংহ অসাধারণ পরাক্রম-শালী ছিলেন। তিনি যেমন সংগ্রাম-নিপুণ সেইপ্রকার বদান্য ছিলেন। সিংহাসনে অধিরোহণের সময়ই তাঁহার প্রথম পরাক্রমের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজা শিবসিংহ বোধ হয় পিতার জীবদ্দশাতেই ক্রমে ক্রমে দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা-পাশ হইতে বিমুক্ত হইতে চেষ্টা করিতে-ছিলেন। তাঁহার পিতৃবিয়োগের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে আর তিনি সম্রাট্‌কে কর প্রদান করিতেন না। দিল্লির সম্রাট্ উহাতে বিরক্ত হইয়া সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। যে দিবস রাজা শিবসিংহের পিতা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, সেই দিবসেই সম্রাটের সৈন্যগণ দেবকুলী রাজধানী আক্রমণ করে। এই স্থলে একজন মৈথিল কবি লিখিয়াছেন ;— "যমরাজসেনা ও যবনরাজসেনা এক সময়েই দেবকুলী রাজধানী আক্রমণ করে, কিন্তু রাজা দেবসিংহের যোগ্যতনয় রাজা শিবসিংহ পিতার সদ্গতি করিয়া যমরাজসেনাকে পরাঙ্মুখ করেন এবং স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যবনরাজসেনাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন"। এইরূপে অতিশয় পরাক্রম সহকারে তিনি ত্রিহুত রাজ্য শাসন করেন। রাজা শিবসিংহের মহিষীর নাম রাণী লছিমা। এই রাণী নাকি বড় সুন্দরী ও রসিকা ছিলেন। কিম্বদন্তী আছে ;—কবি বিদ্যাপতি রাণী লছিমার প্রণয়াসক্ত

ছিলেন। প্রথমে রাণী কবির কবিতায় অনুরাগিণী হন, শেষে সেই কাব্যরসের পিপাসা প্রণয়রসে পরিণত হয়। ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইলে কথাটা রাজার কর্ণগত হয়। রাজা এই সংবাদে অতিশয় কুপিত হইলেন। অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন ঘটনা যথার্থ। শেষে কবিকে দুই তিন বার সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল কিন্তু কোন ফল হইল না। শেষে বিদ্যাপতি রাজার আদেশে কারারুদ্ধ হইলেন। রাণীর ভালবাসায় বিদ্যাপতির পক্ষে সেই কারাগৃহও প্রমোদগৃহে পরিণত হইল। রাণীর ইঙ্গিতে কারাগৃহের রক্ষীরা বিদ্যাপতির জন্য সুচারু শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিত এবং তাঁহার পরিচারিকারা উপাদেয় খাদ্য সকল প্রদান করিয়া যাইত। রাণী প্রত্যহ গোপনে প্রাসাদের অগ্রভাগে আরোহণ করিয়া বিদ্যাপতিকে দেখা দিতেন। রাণীকে দেখিলেই বিদ্যাপতির কবিতার উৎস খুলিয়া যাইত। তিনি তখন অজস্র কবিতা আবৃত্তি করিতেন। সেই সকল কবিতাই নাকি বড় সরস ও চিত্তাকর্ষক হইত। অসম্ভব কি? কারণের গুণ কার্য্যে সংক্রমিত হইয়া থাকে।

এই সকল জনশ্রুতির মূলে কোনরূপ সত্য আছে কিনা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। জনশ্রুতি ভিন্ন এ বিষয়ের কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে এই মাত্র জানা যায় শেষবার যখন রাজা শিবসিংহ যবন সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইয়া নেপালের অরণ্যানী আশ্রয় করেন তখন রাণী লছিমাও বিদ্যাপতির সহিত পলায়ন করিয়া গিয়া জনকপুরের সন্নিহিত বনৌলী গ্রামে রাজা শিবসিংহের বন্ধু রাজা পুরাদিত্যের গৃহে কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া ছিলেন। এই পলায়ন ব্যাপার হইতে অনেকে অনেকরূপ অনুমান করেন। তাহার পর বহু স্থানে রাজা শিবসিংহের অনুসন্ধান করা হইয়াছিল. কোথায়ও তাঁহার সংবাদ পাওয়া গেল না। শেষে রাজা শিবসিংহের মন্ত্রী চন্দ্রকর কায়স্থের পুত্র অমৃতকর কায়স্থ পাটনায় গমন করিয়া তত্রত্য শাসনকর্ত্তার নিকট অভয় প্রার্থনা করেন। তিনি অভয় দান

করিয়া রাজা শিবসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পদ্মসিংহকে ত্রিহূত রাজ্য প্রদান করেন। তিনি একবৎসর আপন পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পরলোক গমন করেন। রাজা শিবসিংহের কোন সংবাদ না পাওয়ায় রাণী লছিমা দ্বাদশ বর্ষান্তে কুশপুত্র দাহ করিয়া রাজার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া বা শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেন। রাজা পদ্মসিংহের পরলোক গমনান্তে তদীয় যোগ্যতমা মহিষী সুপ্রসিদ্ধা বিশ্বাসদেবী ত্রিহূতের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বিশ্বাস-দেবীর রাজ্যশাসন কালেও কবি বিদ্যাপতি জীবিত ছিলেন। তিনি বিশ্বাসদেবীকে বধূরাণী বলিতেন। সংস্কৃত "কীর্ত্তিলতা" ও "শৈবসর্ব্বস্বসার" প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় রাণী বিশ্বাসদেবীর ন্যায় গুণবতী মহিলা ভারতবর্ষে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যেমন অসাধারণ লাবণ্যবতী সেইরূপ সাধ্বী পতিব্রতা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিদুষী ধীরা প্রতিভাশালিনী বুদ্ধিমতী রমণী সে সময়ে কেহই ছিলেন না। তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, জোতিষ, স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিতা ছিলেন। তাঁহার নিজের একটি রাজকার্য্যের জন্য সভা ছিল। উহাতে কতিপয় মহিলা কর্ম্মচারী ছিলেন, তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র মন্ত্রি-সভা ছিল। তিনি পণ্ডিতগণকে সমবেত করিয়া শাস্ত্রীয় তর্ক শুনিতেন এবং অনেক দুরূহ বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন। তিনি দৈনিক কার্য্যের জন্য সময়ের বিভাগ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বাহ্নে স্নান, ইষ্টপূজা জপ, তপ, ধ্যান ধারণা সমাপ্ত করিয়া মধ্যাহ্নে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অতিথি ও সাধু সন্ন্যাসীদিগকে আহার প্রদান করিতেন। তাহার পর অন্ধ, খঞ্জ ও অন্যান্য রোগগ্রস্ত দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে আহার্য্য ও প্রচুর অর্থদান করিতেন। পরে রাজধানীর সন্নিহিত দরিদ্র প্রজাবর্গের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়া তাহাদের অভাবের বিষয় অনুসন্ধান করিতেন এবং তৎক্ষণাৎ যে যাহা প্রার্থনা করিত তাহা প্রদান করিতেন, তাহার পর গৃহে আগমন পূর্ব্বক আহার শেষ করিয়া অবশিষ্ট সময় রাজ-

কার্য্য করিতেন। বিশেষ বিশেষ পুণ্য তিথিতে সংস্কৃত রামায়ণ মহা· ভারত ও পুরাণকথা শ্রবণ করিতেন। তিনি অপরাধীকে যেমন শিক্ষা দিতেন সেইরূপ বিদ্বান্ ও গুণবান ব্যক্তিদিগকে পুরস্কৃত করিতেন। তাঁহার জীবনে কেহ বিলাসিতার চিহ্নমাত্রও দেখিতে পায় নাই। তিনি সকল স্থলেই স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেন কিন্তু তাঁহার এমনই তেজ· স্বিতা ছিল যে কেহ স্বপ্নেও তাঁহার প্রতি মন্দভাবে দৃষ্টিপাত করিতে সাহসী হইত না। তাঁহার সময়ে ত্রিহুতরাজ্যের সর্ব্বাংশে সুখশান্তি বিরাজমান ছিল। তিনি ত্রিহুত রাজ্যের পানীয় জলের অভাব নিরা· করণের জন্য অনেক জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং পথিকগণের জন্য অনেক উদ্যান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

এই পুণ্যবতী রাণী বিশ্বাস দেবীর পর যথাক্রমে তাঁহার পুত্র ধীরসিংহ ও পৌত্র ভৈরবসিংহ ত্রিহুতের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। রাজা ভৈরবসিংহ দেবকুলী রাজধানীর অনতিদূরে এক অতি বৃহৎ জলাশয় উৎসর্গ করিয়া ছিলেন। ইহা অতীব সুগভীর। এই জলাশয় সংক্রান্ত অনেক কিম্ব· দন্তী মিথিলায় প্রচলিত আছে। এই জলাশয়োৎসর্গে নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি (কাণাভট্ট) আগমন করিয়াছিলেন। তাহার পর ভৈরবসিংহের পুত্র রামভদ্র ও পৌত্র লক্ষ্মীনাথ যথাক্রমে ত্রিহুতের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই রাজা লক্ষ্মীনাথ হইতেই পণ্ডিত কামেশ্বর ঠাকুরের বংশের রাজ্যলক্ষ্মী বংশান্তর আশ্রয় করেন।

মধ্যভারতবর্ষ হইতে থাণ্ডেবালা ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত চাঁদঠাকুর পূর্ব্বোক্ত রাজবংশের রাজা ভবসিংহের পৌরহিত্যে ব্রতী হইয়া ত্রিহুতে বাস করেন। তাঁহার পুত্র মহেশ ঠাকুর একজন অতিশয় বিদ্বান্ অধ্যাপক ছিলেন। ত্রিহুতের রামপুর গ্রামনিবাসী রঘুনন্দন রায় নামক একব্যক্তি মহেশ ঠাকুরের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। তিনি অধ্যয়ন শেষ করিয়া দেশ

[illegible] ধর্ম্ম-

শাস্ত্রের বিচার শুনিতেন। তজ্জন্য ভারতবর্ষের বহু জনপদ হইতে পণ্ডিতগণ আগমন করিয়া আকবরের সভায় সমবেত হইতেন। অবসর ক্রমে রঘুনন্দনও আকবরের সহিত পরিচিত হন এবং একদিন আকবরের সভাস্থ সমুদয় পণ্ডিতকে শাস্ত্রীয় বিচারে পরাস্ত করিয়া সম্রাট্‌কে বিস্মিত করেন। ইহাতে সম্রাট্ নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া ৯৬৫ ফসলী সালে (১৫৬৮ খৃঃ) রঘুনন্দনের পাণ্ডিত্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে পণ্ডিত উপাধি ও ত্রিহুতের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ হাতীপরগণার জমিদারী প্রদান করেন। রঘুনন্দন দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি ঐ জমিদারী স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া তাঁহার অধ্যাপক মহেশ ঠাকুরকে গুরু-দক্ষিণাস্বরূপ অর্পণ করিলেন। মহেশ ঠাকুর প্রথমতঃ শিষ্যের দান গ্রহণে সম্মত হন নাই, শেষে বহু অনুনয়ে শিষ্যের বাসনা পূর্ণ করিলেন। অনন্তর মহেশ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র গোপাল ঠাকুর পিতার নামীয় দানপত্র বলে দিল্লির সম্রাটের নিকট হাতীপরগণায় আপন স্বত্ব স্থির করিবার জন্য গমন করেন। দরবারের বিচারে মহেশ ঠাকুরের স্বত্ব স্থিরীকৃত হয় এবং তিনি কৃতকার্য্য হইয়া দেশে প্রত্যাগমন কালে কাশীতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তাহার পর মহেশ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র পরমানন্দ ঠাকুর জমিদারী প্রাপ্ত হন। অপুত্র অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার কনিষ্ঠ (মহেশের ৫ম পুত্র) শুভঙ্কর ঠাকুর ঐ জমিদারীর অধিকার লাভ করেন। এই শুভঙ্কর ঠাকুর হইতে বর্ত্তমান দরভঙ্গা রাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছে। শুভঙ্কর ঠাকুরের প্রপৌত্র (মহেশ ঠাকুরের অধস্তন ৫ম পুরুষ) রঘুসিংহ এই বংশে প্রথম রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহেশ ঠাকুর হইতে অধস্তন একাদশ পুরুষ মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর কে, সি, আই, ই, মহোদয় দরভঙ্গার রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে তদীয় সহোদর

মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছেন। দরভঙ্গা রাজবংশের কীর্ত্তি অনন্ত। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উহার সবিশেষ উল্লেখ সম্ভবপর নহে। এখন বঙ্গ বিহার উড়িষ্যায় যে সকল ভূম্যধিকারী বিদ্যমান আছেন তন্মধ্যে ধনে মানে ও ঐশ্বর্য্যে দরভঙ্গার মহারাজই সর্ব্বপ্রধান।

মিথিলায় বহুবিধ প্রাচীন দৃশ্য বিদ্যমান। ইহার মধ্যে জনকপুর একটি বিশেষ গণনীয়। এই স্থান সন্দর্শন করিতে হইলে দরভঙ্গার ঈশান কোণে যে রেলপথ গিয়াছে উহা অবলম্বন পূর্ব্বক সীতামাঢ়ি হইয়া কামতৌল ষ্টেসনে অবতীর্ণ হইতে হয়। এই স্থান হইতে ৬ মাইল দূরে জনকপুর অবস্থিত। ঐ স্থানে রাজর্ষি জনকের রাজধানী ছিল। এখন এখানে অনেক জলাশয় ও দেবমন্দির বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে রামসীতার মন্দিরই প্রসিদ্ধ। কথিত আছে সীতামাঢ়ি নামক স্থানে যখন রাজর্ষি জনক হলদ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে ছিলেন, সেই সময় সীতাদেবী তাঁহার হলের অগ্রভাগ হইতে উত্থিতা হন। কেহ কেহ বা জনকপুরই সীতাদেবীর উৎপত্তি স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অন্যেরা বলেন সীতামাঢ়ির সন্নিহিত পণৌরা নামক স্থান হইতে সীতার উৎপত্তি হইয়াছিল। এই সকল মতভেদের মীমাংসা অসম্ভব। তবে সীতামাঢ়িই যে সীতার উৎপত্তি স্থান ইহা বহু বিজ্ঞ ব্যক্তির সম্মত। পণৌরায় মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্বিমস্তক অতি বৃহৎ এক রাক্ষসমূর্ত্তি ও উহার পার্শ্বে ঐরূপ মৃণ্ময় বৃহদাকার এক হনূমানের মূর্ত্তি আছে। ইহা হনূমান ও রাবণের যুদ্ধের দৃশ্য বলিয়া খ্যাত। মুসলমান রাজত্বকালেও জনকপুরে অনেক ক্ষত্রিয়ের বাস ছিল এখন এই স্থান নামশেষ মাত্র। প্রতি বৎসর অনেক তীর্থযাত্রী জনকপুর সন্দর্শন করিতে আগমন করেন।

আর একটি দ্রষ্টব্য আহিয়ারী বা অহল্যাস্থান। ইহা কামতৌল গ্রামের অগ্নিকোণে অবস্থিত। কথিত আছে গৌতমের শিষ্য ইন্দ্র ছদ্ম-

বেশে গোতমপত্নী অহল্যার ধর্ম্ম নষ্ট করেন। মহর্ষি গোতম উহা অবগত হইয়া অভিসম্পাত করেন, তাহাতে অহল্যা পাষাণী হইয়া বহুকাল এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। যখন রাম লক্ষ্মণ মিথিলায় গমন করেন, তখন বিশ্বামিত্রের উপদেশে রাম সেই পাষাণময়ী স্ত্রীমূর্ত্তিতে চরণদ্বারা স্পর্শ করিলে অহল্যা শাপমুক্তা হন। বৈশাখ মাসে এখানে বহু যাত্রী সমাগম হয়। এখানে যে কুণ্ড আছে, উহাতে যাত্রীরা স্নান করে এবং একখণ্ড পাষাণে রামের পদচিহ্ন সন্দর্শন করিয়া থাকে। পদচিহ্নের নিকট একটি প্রাচীন মন্দির আছে। আর উহার অনতিদূরে দরভঙ্গার মহারাজের একটি ঠাকুর বাটি আছে।

আর একটি দৃশ্য হরধনু বা ধনুষা। এই প্রাচীন স্থানটি সীতামাঢ়ির তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কথিত আছে জামদগ্ন্য পরশুরাম এইস্থানে হরধনু রক্ষা করিয়াছিলেন। অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের পুত্র ভগবান্ রামচন্দ্র সেই অলৌকিক ধনুর্ভঙ্গব্যাপার সম্পন্ন করিয়া জগৎপূজ্যা সীতা-দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এইস্থানে সেই হরধনুর অর্দ্ধাংশ বিদ্যমান আছে। উহা পাষাণময়। অপর অর্দ্ধ জনকপুরে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যে সকল পৌরাণিক প্রাচীন ক্ষেত্রের কথা উল্লিখিত হইল, উহা ব্যতীত ভরৌরা, ঝঞ্ঝারপুর, মধেপুর প্রভৃতি স্থানে দরভঙ্গারাজবংশের বহুবিধ কীর্ত্তিচিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন সময়ে ঐ সকল স্থলে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। অদ্যাপি অনেক প্রাচীন প্রাসাদ, দেবমন্দির, জলাশয় উদ্যান প্রভৃতি দর্শনীয় পদার্থসমূহ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ভরৌরায় বর্ত্তমান দরভঙ্গারাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ পরাক্রান্ত রাজা মধুসিংহ কর্ত্তৃক একটি বৃহৎ মৃণ্ময় দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন মধুবনীতে রাজতুল্য দরভঙ্গারাজের জ্ঞাতিগণ বাস করেন। তত্রত্য অট্টালিকা, দেবমন্দির, জলাশয়, উদ্যানরাজি প্রভৃতি উক্ত রাজজ্ঞাতিগণের সমৃদ্ধির পরিচায়ক।

এতক্ষণ আমরা মিথিলা বা তীরভুক্তি রাজ্যের প্রাচীন স্থলসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। এক্ষণে বর্ত্তমান রাজধানী দরভঙ্গা-নগরীর কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই সুন্দর নগরী বাগ্মতী নদীর পূর্ব্ব ও পশ্চিমতীরে অবস্থিত। এই নগরটি চতুর্দ্দিকে প্রায় তিন ক্রোশ ব্যাপী হইবে। অত্রত্য অধিবাসীর অধিকাংশই হিন্দু। মুসলমানের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। সহর হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে গঙ্গাসাগর নামে একটি অতিবৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। এই দীর্ঘিকাটি দেখিতে অতি মনোহর। কথিত আছে প্রমরবংশীয় রাজা গঙ্গদেব যে সময় ত্রিহুত রাজসিংহাসনে বিরাজিত ছিলেন, সেই সময় এই দীর্ঘিকা খনিত হইয়াছিল। এই জলাশয়টি এতই বিস্তীর্ণ যে পূর্ব্বতীরে দণ্ডায়মান হইলে পশ্চিমতীর দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার জল কাকচক্ষুর ন্যায় বিমল। ইহাতে শৈবালাদি কোন পদার্থই নাই। একদিন অপরাহ্ণে একটি বন্ধুর সহিত এই গভীর জলাশয়ের তীরে বসিয়া ইহার অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিলাম। তখন সান্ধ্যসমীরণে এই জলাশয়ের স্তরে স্তরে তরঙ্গ-মালা উঠিতেছিল, কয়েকটি হংসশ্রেণী দুলিতে দুলিতে ঐ তরঙ্গোপরি ভাসিয়া বেড়াইতে ছিল। বন্ধু বলিলেন দরভঙ্গানগরীতে এরূপ শান্তিময় স্থান বিরল। চতুর্দ্দিকে কিঞ্চিদ্দূরে দূরে অসংখ্য আম্রকানন। উত্তরতীরে বহুদূরব্যাপী অতি উচ্চ একটি মাটীর জাঙ্গাল। জাঙ্গালের নীচে সুরঙ্গ। একটি সাধু সুরঙ্গমধ্যে অবস্থিতি করেন। আমরা সুরঙ্গদ্বারে গিয়া বারংবার আহ্বান করিলাম, সাধু আসিলেন না। বন্ধুটি বলিলেন বোধ হয় সাধু এখন ধ্যানমগ্ন আছেন।

প্রমরবংশীয় অন্যতম নৃপতি শক্রসিংহ কর্ত্তৃক আর একটি সরোবর খনিত হইয়াছিল, উহার নাম সুখীদীঘী। উহা দরভঙ্গা সহরের অনতিদূরে অবস্থিত। ঐ বিস্তীর্ণ সরোবরেও গভীর জল বিদ্যমান আছে। ষ্টেসনের নিকটে যে সরোবরটি সহরবাসীর পিপাসা শান্তি করে, উহার নাম হরাই।

উহা প্রমরবংশীয় রাজা হরিসিংহ কর্ত্তৃক খনিত। উহাও সুগভীর এবং বিমলজলপূর্ণ। সায়ংকালে নগরবাসীরা ইহার তীরে ভ্রমণ করেন এবং এই জলাশয়টিও ভাসমান হংসমালায় সুশোভিত দেখা যায়। দরভঙ্গাস্থ ইংরেজ আদালতের অনতিদূরে দক্ষিণদিকে প্রাচীন দেবকুলী রাজধানীর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। অত্রত্য দেবমন্দির ও হর্ম্ম্যমালার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি সুপ্রসিদ্ধ রাজা শিবসিংহ এবং তদীয় ভ্রাতৃজায়া পুণ্যবতী রাজ্ঞী বিশ্বাস-দেবীর পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিতেছে।

দরভঙ্গার আধুনিক দর্শনীয় পদার্থের মধ্যে রাজবাটীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই রাজবাটীর উত্তর সীমা বাগ্মতীতীর ও দক্ষিণসীমা রেলপথ। রাজ-বাটীর আয়তন প্রায় এক ক্রোশের অধিক হইবে। দক্ষিণ দিগ্‌বর্ত্তী আনন্দবাগে মহারাজ অবস্থিতি করেন। উত্তর দিগ্‌স্থ রামবাগে অন্তঃপুর। ঐ অংশে রাজমহিলারা বাস করিয়া থাকেন। রামবাগ হইতে আনন্দবাগ পর্য্যন্ত ক্রোশাধিক স্থান কেবল সৌধ, জলাশয় ও উদ্যানরাজিতে পরি-শোভিত। রাজভবনের পশ্চিম দিক্ দিয়া বাগ্মতীতীর পর্য্যন্ত যে সুপ্রশস্ত রাজপথ বিদ্যমান উহা হইতে বাটীর বহির্ভাগের সৌন্দর্য্যমাত্র লোকের নয়নপথে পতিত হয়। রাজবাটীর অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ না করিলে উহার প্রকৃত সুষমা অনুভব করা যায় না। দরভঙ্গানগরীতে উপস্থিত হইয়াই প্রথমে রাজধানীর প্রধান নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ ঝাঁ মহোদয়ের সহিত পরিচিত হই। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। একদিন পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময় বলিলেন "ওহে বাঙ্গালী পণ্ডিত! চল তোমাকে রাজবাটীর অভ্যন্তরভাগ দেখাইয়া আনি"। আমি আপত্তি না করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম। এই বৃদ্ধ অধ্যাপক প্রতিদিন ঐ সময়ে রাজান্তঃপুরে বিষ্ণুর সহস্র নাম শুনাইতে গমন করেন। তাঁহার সহিত গমন করিলে রাজবাটীর অন্তঃপুর ব্যতীত অপর সমুদয় অংশই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সহিত যাইতে যাইতে আনন্দবাগ রাজপ্রাসাদ

হইতে রামবাগ পর্য্যন্ত কত মনোহর অট্টালিকা, মনোজ্ঞ জলাশয় এবং বিবিধ পুষ্পশোভিত উদ্যান ও নবদুর্ব্বাদল মণ্ডিত ক্ষেত্র সকল অবলোকন করিলাম উহার ইয়ত্তা নাই। কোন স্থানে কেবল বেলফুলের উদ্যানে গজমুক্তার ন্যায় শুভ্র অসংখ্য বেলফুল বিকসিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে। কোথায় কেবল গোলাপ ফুলের বাগান। তাহাতে নানা জাতীয় লোহিত, পীত, পাণ্ডুবর্ণ প্রভৃতি গোলাপফুল শোভা পাইতেছে। গন্ধরাজ, টগর, মল্লিকা, কামিনী, যূথিকা, জবা, করবীর প্রভৃতি দেশীয় পুষ্পের ত সংখ্যা করা যায় না। মধ্যে মধ্যে বিদেশীয় পাতাবাহারের গাছ। এই উদ্যান শোভিত রাজভবনের সর্ব্বত্রই নানা দিগ্‌গামী রাজপথ সকল বিদ্যমান। ঐ সকল রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থ রেলিংএ বিবিধ কুসুম-শোভিত লতাগুলি জড়াইয়া জড়াইয়া রহিয়াছে, উহাতে রাজপথের উভয় দিক্ যেন চিত্রিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। স্থলভাগের ন্যায় জলেও পুষ্প সমৃদ্ধির অভাব নাই। প্রত্যেক জলাশয়েই বিকসিত শ্বেতপদ্ম ও রক্তপদ্ম সলিল-তরঙ্গে বিকম্পিত হইয়া ভৃঙ্গপংক্তির হৃদয়ে ব্যাকুলতা উৎ-পাদন করিতেছে। তীরের সমীপে হংসেরা নিজ নিজ আহার অন্বেষণে তৎপর। জলাশয়ের ঘাটগুলি পাষাণনির্ম্মিত! জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে তীরে আম, নীচু, দাড়িম, জামরুল, আনারস, জাম, খেজুর প্রভৃতি তরু-রাজি বিরাজিত। প্রত্যেক তরুই নানাবিধ ফলে সুসজ্জিত। দুই চারিটি গাছে আম, নীচু পাকিয়া সিন্দূরবর্ণ হইয়া আছে। দুই চারিটি জামগাছ পরিণতফলে আচ্ছাদিত হইয়া মেঘের মত নীলবর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সুদৃশ্য বাঁশ, ও তেজপত্রের গাছ, সুপারি নারিকেলের তরু সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে শোভা পাইতেছে। বৃদ্ধ অধ্যাপক যাইতে যাইতে পরিশ্রান্ত হইয়া একটি পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটের নিকট দাঁড়াইলেন। সেই স্থানটি যেমন বিজন, তেমনই মনোহর। চৌদিকে পুষ্পের সৌরভ বিকীর্ণ হইতেছে। একটি [illegible] শাখা হইতে কোকিল

কুহু কুহু ধ্বনি করিতেছে। সে সময় সেই স্থানটি বড়ই মনোরম বোধ হইল। বোধ হয় সমুদয় বসন্ত ও গ্রীষ্মকালই এই স্থানটির রমণীয়তা এইরূপই থাকে। উত্তর তীরের ঘাটটি প্রায় অর্দ্ধ পুষ্করিণী পর্য্যন্ত সুন্দর কাষ্ঠফলকে ঘেরা। উপরিভাগও জালদ্বারা আবৃত। অধ্যাপক মহোদয় বলিলেন কখন কখনও অন্তঃপুর মহিলারা এখানে স্নানার্থ আগমন করেন। তখন সমুদয় দ্বার বন্ধ হইয়া যায়। এই রাজপথের প্রত্যেক সন্ধিস্থলে সশস্ত্র প্রহরিসকল দণ্ডায়মান। আর অশ্বযানে আরোহণ করিয়া ইহার সর্ব্বত্র বিচরণ করা যায়। এইরূপে নানাবিধ পুষ্পশোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে অন্তঃপুরের দক্ষিণ সীমায় উপনীত হইলাম। অধ্যাপক মহোদয়ের জন্য কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। তাহার পর তিনি আগমন করিলে প্রায় ১১ ঘটিকার সময় বাসায় প্রত্যাগত হইলাম।

এক দিন অপরাহ্নে আর একটী বন্ধুর সহিত নগরীর উত্তর দিকে বাগ্মতী তীরে ভ্রমণ করিবার জন্য গমন করিলাম। বাগ্মতী অতীব বেগবতী নদী। এই নদী নেপালের কাষ্ঠমণ্ডল (কাটা মাণ্ডু) নগরীর সন্নিহিত হিমালয় প্রস্থ হইতে বহির্গত হইয়া বিহার প্রদেশস্থ গণ্ডকনদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ইহার আয়তন অল্প কিন্তু বেগবত্তা এত অধিক যে কেহই এই নদীর প্রবাহ মধ্যে মুহূর্ত্ত মাত্র স্থির পদে দণ্ডায়মান হইতে পারেন না। এই নদীর উভয় তীরে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বাঁধা ঘাট। প্রত্যহ অপরাহ্নে নাগরিক মহিলারা বৈকালিক স্নানের নিমিত্ত এই নদীতে আগমন করিয়া থাকেন। বোধ হয় নিদাঘ ঋতুতেই বৈকালিক স্নানের ঘটা অধিক হইয়া থাকে। একসঙ্গে প্রায় ৩০।৪০টি করিয়া সমবয়স্কা পুরমহিলা রঙ্গিল বস্ত্র হস্তে নূপুর ধ্বনিতে রাজপথ মুখরিত করিতে করিতে আগমন করিতেছেন। এক দল আসিতেছেন, এক দল ঘাটের উপরিভাগে দাঁড়াইয়া আছেন, এক দল জলে সন্তরণ করিতেছেন। ইহাদের নানাবিধ বিচিত্র বসন ভূষণে স্নানঘাটের এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। কোন কোন

যুবতী দুই একটী কিশোরী অথবা বালিকাকে উপর হইতে জলে নিক্ষেপ করিতেছেন, অপরা তরুণীরা জলে পড়িতে না পড়িতে উহাঁদিগকে লুফিয়া লইতেছেন। মধ্যে মধ্যে হাস্যধ্বনি উত্থিত হইতেছে। ত্রিহুতবাসিনী মহিলারা বেশ সৌখীন। ইহাদের বস্ত্র পরিধানের প্রথা বাঙ্গালীর চক্ষে রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। কাশী অথবা প্রয়াগবাসিনীরা যেমন নাভির নিম্নে বস্ত্র পরিধান করিয়া 'কুম্ভোদরী সাজেন ইঁহারা সেরূপ করেন না। ভট্টির ন্যায় যদি কোন কবি এই স্নানঘাটে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতেন এই ঘাটে এমন মহিলাই বিরল, যিনি তরুণী নহেন, এমন তরুণী বিরল, যিনি সুন্দরী নহেন, এরূপ সুন্দরী বিরল যিনি হাস্যমুখী নহেন। বাগ্মতী নদী এই সকল সীমন্তিনীর একটি আবশ্যকীয় আমোদের স্থান। এখানে আসিয়া সকলেই পরস্পর পরস্পরকে পরিহাস করিয়া থাকেন। কতিপয় নাগরিক যুবা বাগ্মতী সেতুর নিকটে দাঁড়াইয়া পুর-সুন্দরীদের স্বাধীন হাবভাব সন্দর্শন করিয়া কৌতূহলী হইতেছিলেন পুর-মহিলারা ঐ সকল যুবকের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেছেন না। আমরা মুহূর্ত্ত মাত্রও সেখানে বিলম্ব করিতে পারিলাম না এবং আমার সঙ্গীটী ইংরেজী ভাষায় ঐ সকল যুবাকে বলিলেন "আপনাদের এই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকা বিশুদ্ধ নীতির অনুমোদিত নহে।" যুবকগণ প্রত্যুত্তরে কথঞ্চিৎ বিদ্রূপ করিতেও ক্রটী করিলেন না। অবশ্য তাঁহারা ইংরেজীতেই জবাব দিলেন। তাহার পর আমরা আরও কয়েকটী স্থান সন্দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলাম। দরভঙ্গার রাজবাটী ব্যতীত রাজার কার্য্যালয়, ডাক্তারখানা ও ইংরেজী বিদ্যালয় প্রভৃতি অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। সমুদয় স্থানই পুষ্পোদ্যান পরিশোভিত। রাজবাটীর সন্নিহিত বাজারটিও বহুদূরব্যাপী। রাজবাটীর নিকটেই একটি সুবৃহৎ বরফের কল আছে। আর একটি শান্তিময় স্থান আছে, উহা রাজকীয় সংস্কৃত চতুষ্পাঠী। এই চতুষ্পাঠী বা ছাত্রনিলয় রাজবাটী [illegible] জন

অধ্যাপকও অবস্থান করেন। নৈয়ায়িক মহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিশ্বনাথ ঝাঁ। ইনি ন্যায়দর্শনে অত্যন্ত কৃতী। মীমাংসক পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় চিত্রধর মিশ্র। ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার প্রভৃতির অধ্যাপক কবিবর চন্দ্র পণ্ডিত। ইনিই মৈথিলী ভাষায় বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ, কাব্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ প্রায় তিন শত অধ্যাপক দরভঙ্গার মহারাজার সভা পণ্ডিত। প্রতি সোমবারে আনন্দবাগ রাজপ্রাসাদে সভার অধিবেশন হয়। কাশী, দ্রাবিড়, কান্যকুব্জ, কাঞ্চী, কাশ্মীর, সিন্ধু, বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশ হইতে সমাগত পণ্ডিতগণ এখানে শাস্ত্রার্থের বিচার করেন। মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর সবিশেষ বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি সমাগত পণ্ডিত মণ্ডলীর সম্মানার্থ পাথেয় প্রদান করিতেন। আমি যে সপ্তাহের সভায় উপস্থিত ছিলাম, সেই সভায় কাশ্মীরী, দ্রাবিড়ী, বাঙ্গালী ও কাশীবাসী প্রায় ২৫ জন নবাগত পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের পাথেয়ের পরিমাণ ১২৫৲ টাকার উর্দ্ধ নহে এবং ৩০৲ টাকার ন্যূন নহে। বিদ্যাবত্তা অনুসারে স্থানীয় অধ্যাপকবর্গই উহার পরিমাণ নির্ণয় করিয়া থাকেন।

মিথিলা ভারতবর্ষের অতি গৌরবের স্থান। এই স্থান পুরাকালে শত শত পুণ্যাত্মা মহর্ষির তপস্যা দ্বারা পরিপূত হইয়াছিল। ন্যায় সূত্রকার মহর্ষি গোতম হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থকারগণ পর্য্যন্ত অনেক মহানুভব জ্ঞানী ব্যক্তি এখানে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। গঙ্গেশোপাধ্যায়, বাচস্পতি মিশ্র, পক্ষধর মিশ্র, বর্দ্ধমান উপাধ্যায়, বিদ্যাপতি প্রভৃতি ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এই স্থান গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। উপসংহারে বক্তব্য মিথিলায় গিয়া আমরা পরলোকগত মহারাজ লক্ষ্মীশ্বরের সদয় ব্যবহার সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীতি অনুভব করিয়াছিলাম।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

সৌরজগতের গতি।

প্রবন্ধের আরম্ভেই পাঠকদিগের নিকট ক্ষমা চাহিতে বাধ্য হইতেছি। পঞ্চাধিক বৎসর গত হইল, (১৩০৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতী দ্রষ্টব্য) আমি এই প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তাহার পূর্ব্ববৎসর বৈশাখের ভারতীতে 'ছায়াপথ' শীর্ষক প্রবন্ধে সৌরজগতের গতি বিষয়ে প্রথম উল্লেখ করিয়াছিলাম। ১৩০৩ সালের জ্যৈষ্ঠের ভারতীতে প্রবন্ধের সূচনামাত্র করা হইয়াছিল। প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের আলোচনা বাকী রহিয়াছে।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছিলাম, এখন পাঠকদিগকে তাহা পড়িয়া দেখিতে বলা, কিম্বা স্মরণ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করাও, একান্ত ধৃষ্টতা হইবে। এই কারণে ঐ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সারাংশ এস্থলে দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি।

নক্ষত্রজগতে যে সকল বিভিন্ন প্রকারের গতি দেখা যায় তাহার অধিকাংশই আমরা এক্ষণে পৃথিবীর নানাবিধ গতিসম্ভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াছি। প্রতিদিন নক্ষত্রদিগের যে উদয়াস্ত দেখা যায় তাহা পৃথিবীর দৈনন্দিন গতিসম্ভূত বলিয়া সকলেই জানিতে পারিয়াছে। নক্ষত্রদিগের উদয়কাল প্রত্যক্ষ করিলে দেখা যায় যে তাহারা কাল যে সময়ে উদয় হইয়াছিল আজ তাহার আগে উদয় হইতেছে; অর্থাৎ কাল যে নক্ষত্রকে সন্ধ্যাকালে উদয় হইতে দেখা গিয়াছে আজ তাহা তদগ্রেই উদয় হইয়া বসিয়া আছে। ইহা হইতে আপাততঃ মনে করা যাইতে পারে যে সূর্য্যের অবস্থিতির তুলনায় সমস্ত নক্ষত্রজগৎ যেন প্রতিদিন কিয়ৎ পরিমাণে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। ইহা হইতে প্রাচীন পণ্ডিতেরা ধারণা করিয়াছিলেন যে নক্ষত্রজগতের সহিত তুলনায়

সূর্য্যই স্বয়ং পশ্চিম হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে অল্প অল্প চলিয়া এক বৎসরে পুনরায় স্বস্থানে আসিতেছে। এই আপাতঃ দৃষ্ট সৌরাবর্ত্তন কালকেই বৎসর বলিয়া গণনা করা যাইত। এক্ষণে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে প্রথমে যাহাকে নক্ষত্রের গতি ও তৎপরে সূর্য্যের গতি বলিয়া অনুভব করা গিয়াছে, বাস্তবিক তাহা মানবের দৃষ্টির ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃতপক্ষে তাহা পৃথিবীর সৌরপরিক্রমে আবর্ত্তন সম্ভূত।

এই দুই প্রকারের গতি বাদ দিয়া নক্ষত্রদিগের অবস্থিতি জানিতে হইলে তাহার একটি ঠিকানা থাকা আবশ্যক। পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তকে আপন সমতলে বিস্তৃত করিয়া অনন্ত আকাশে সম্পাতিত করিলে আকাশমার্গে যে বৃত্ত পাওয়া যায় তাহা 'বিষুবদ্বৃত্ত'। ঐ বৃত্তের সহিত, পৃথিবীর গতি-পথের আকাশমার্গে বিস্তৃতির (অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তের) যে দুই বিন্দুতে ছেদন হয় তাহাদের নাম 'বিষুবদ্বিন্দু'। ইহারই এক বিষুবদ্বিন্দু ও বিষুবদ্বৃত্তের তুলনায় নক্ষত্রদিগের ঠিকানা হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর এই ঠিকানা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া জানা গিয়াছে যে সমস্ত নক্ষত্রজগৎ কোন নির্দ্দিষ্ট বিধানবলে বিচলিত হইতেছে, অর্থাৎ বিষুবদ্বিন্দু ও বিষুবদ্বৃত্তের তুলনায় নক্ষত্রদিগের যে অবস্থিতি গণনা করা যায় প্রতি বৎসর তাহাতে বৈষম্য দেখা যাইতেছে। ইহার দুই কারণ মনে করা যাইতে পারে ;—যথা, (১) নক্ষত্রগণ স্বতঃই গতিশীল, অথবা (২) বিষুবদ্বিন্দু ও বিষুবদ্বৃত্ত নিয়ত বিচলিত হইতেছে।

গণনাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্দ্ধাপেক্ষা উত্তর গোলার্দ্ধে স্থলাধিক্য থাকাতে, তাহা অধিকতর ভারী প্রতিপন্ন হয় ; একারণে পৃথিবীর ভারকেন্দ্র ঠিক পৃথিবীর আয়তনের কেন্দ্রে অবস্থিত না হইয়া ঈষৎ উত্তরভাগে অবস্থিতি করে। ইহার ফলে পৃথিবী নিয়ত লাটিমের ন্যায় শিরঃকম্পিত করিতে করিতে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি করিয়া চলিতেছে। পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্দ্ধের জলীয় ভাগকে যদি মৃত্তিকার

ন্যায় গাঢ় করিয়া লওয়া যাইতে পারিত তবে দেখা যাইত যে তাহা আয়তনে সঙ্কুচিত হইয়া নিম্নদিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া পড়িত। এরূপাবস্থায় পৃথিবীকে ঠিক একটা লাটিমের মতন দেখাইত। ইহা হইতে পৃথিবীর লাটিমের অনুরূপ গতির কারণ অনায়াসে বুঝা যাইবে।

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে পৃথিবীর উক্তবিধ গতির ফলে তাহার নিরক্ষ-বৃত্ত বিচলিত হইয়া নিয়ত পিছাইয়া চলিতেছে। একারণেই বিষুবদ্বৃত্তও বিচলিত হইতেছে এবং বিষুবদ্বিন্দু পিছাইয়া চলিতেছে। অতএব নক্ষত্র-দিগের অবস্থিতিতে প্রতিনিয়ত বৈষম্য লক্ষিত হইতেছে।

এইরূপে পৃথিবীর নানাবিধ গতি ও বিচলনসম্ভূত নক্ষত্রদিগের যত প্রকার আপাতঃ দৃষ্ট গতি অনুভব করা যায় তাহা সমস্তই নির্দ্ধারিত ও বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। এমন কি ভিন্ন ভিন্ন পরিদর্শকের ক্ষিপ্রতার তারতম্যহেতু পরিদর্শনফলে যে সকল বৈষম্য ঘটিতে পারে সে সমস্তও গণনা করিয়া নক্ষত্রদিগের স্থিতিকে বিশোধিত করা হইয়াছে। এই বিশোধনীকে ইংরাজিতে "personal equation" বলা যায়। (কিরূপে এই বিশোধন সাধিত হয় তাহা জানিতে হইলে M. F. Gonnessiat প্রণীত "Recherches Sur L'Equation Personnelle" নামক ফরাসি গ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যক।)

নক্ষত্রদিগের যে স্থিতি আছে তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ; মুক্ত নেত্রে অথবা যন্ত্রাশ্রিত নেত্রে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের গতি আছে কিনা তাহা জানিতে হইলে গণনার প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ কারণ হইতে যে সকল স্বতন্ত্র গতি লাভ করা যায় সে সমুদায়ের সমন্বয় করিয়া নক্ষত্রদিগের একপ্রকার স্থিতিবিপর্য্যয় জানা যায়। কিন্তু ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে পৃথিবীর নানাবিধ গতিবিপর্য্যয় হইতেই ঐ সকল আপাতদৃষ্ট নাক্ষত্রিক গতির উৎপত্তি হইয়াছে। সে সমুদায় একে এ[illegible]

[illegible] নক্ষত্রদিগে[illegible]

প্রকৃত অবস্থিতি জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শতাব্দী ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় ঐ সাধিত এবং পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার গতি-বিশোধিত অবস্থিতিতেও বৈষম্য ঘটিতেছে। ইহা আপাততঃ "অকারণ-লব্ধ" মনে হয় বলিয়া ইহার নাম "নক্ষত্রদিগের আপেক্ষিক গতি" রাখা হইয়াছে। এই গতি অতিশয় সূক্ষ্ম; এমন কি একজন মানুষের জীবিত কালে যন্ত্রসাহায্যেও ইহার অস্তিত্ব অনুভব করা কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার অস্তিত্ব বিষয়ে জ্যোতির্ব্বিদসমাজে কোন মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয় না। নক্ষত্রদিগের যে উক্তবিধ একটী 'আপেক্ষিক গতি' আছে তাহা স্থির নিশ্চয়। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে তাহা প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্রের স্বকীয় গতি কি না? অথবা পূর্ব্বোক্ত গতিসমূহের ন্যায় ইহাও অন্য কোন গতি, আমাদের দৃষ্টির ভ্রান্তিবশতঃ নক্ষত্রে আরোপিত হইতেছে?

১৭১৮ খৃঃ অব্দে হ্যালি নামক জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত (যাঁহার নামে সৌরজগৎস্থ একটী ধূমকেতু নামাঙ্কিত হইয়াছে,) সর্ব্বপ্রথমে নক্ষত্রদিগের 'আপেক্ষিক গতি' আবিষ্কার করেন। তৎপরে ১৭৪৮ খৃঃ ব্রাড্‌লি নামক অপর একজন জ্যোতির্ব্বিদ বহু গণনা দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত করেন যে ঐ আপেক্ষিক গতির দুইটী কারণ থাকা সম্ভব;—(১) হয়ত নক্ষত্রগণ স্বতঃই গতিশীল, সেই কারণে তাহাদের স্থান বিপর্য্যয় ঘটিতেছে; (২) নতুবা সৌরজগৎ অনন্ত বিমানে ছুটিয়া চলিতেছে, তাই দৃষ্টি ভ্রমবশতঃ আমাদের ধারণা হয় যেন নক্ষত্রজগৎ ছুটিয়া চলিয়াছে। এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন্‌টী ঠিক তাহা তৎকালে নির্দ্ধারিত হয় না। এমন কি ১৭৬০ খৃঃ অব্দে মেয়ার নামক জনৈক বিখ্যাত জর্ম্মণ জ্যোতির্ব্বিদ্ গণনাদ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে সৌরজগতের একটা দিগ্গাহী গতি থাকিলে নক্ষত্রদিগের আপেক্ষিক গতিদ্বারা তাহা নির্দ্দেশিত হইত; কিন্তু তিনি যে সকল গণনা করিয়াছিলেন তাহাতে সেরূপ কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না।

১৭৮৩ খৃঃ অব্দে উইলিয়ম হর্শেল প্রথম গণনা দ্বারা সৌর জগতের গতি স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচার করেন। সেই বৎসর প্রিবোস্ত নামক অপর একজন জর্ম্মণ পণ্ডিত মেয়রের গণনার পুনরাবৃত্তি করিয়া, তাহার ভুল দেখাইয়া দেন। এই উভয় গণনার ঐক্য দেখিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজ প্রথম সৌরজগতের গতি বিষয়ে আস্থাবান হইয়াছিলেন।

নক্ষত্রদিগের আপেক্ষিক গতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে অনেক স্থলেই কতকগুলি করিয়া নক্ষত্র যেন দল বাঁধিয়া চলিয়াছে। ইহাদের সকলগুলিরই গতি এক দিঙ্মুখী। এইরূপ দলবন্ধন দেখিয়া জনৈক জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের ইতিহাসলেখক বলিয়াছেন যে নক্ষত্র জগতে "সামাজিকতার" লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহা দ্বারা এই বুঝিতে হইবে না যে এক একটী মণ্ডলের সকল নক্ষত্রই একই দিকে চলিতেছে;—সপ্তর্ষি মণ্ডলের পাঁচটী নক্ষত্র এক দিগ্বাহী এবং অপর দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিগ্বাহী; যেন কোন মত বৈষম্য ঘটাতে ঐ দুইজন 'ঋষি' দল ছাড়িয়া বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলের অধিকাংশ নক্ষত্রের গতি সমন্বয় করিলে দেখা যায় যে আকাশের এমন একটী স্থান রহিয়াছে যাহার দিকে, আকাশের সেই অংশের অধিকাংশ নক্ষত্রই 'উন্মুখ' হইয়া চলিতেছে। এবং ঐ স্থানের ঠিক বিপরীত দিকে অপর একটী স্থান রহিয়াছে যাহা হইতে আকাশের সেই অংশের অধিকাংশ নক্ষত্রই 'বিমুখ' হইয়া চলিতেছে। এতদ্ভিন্ন ইহাও দেখা যায় যে আকাশের যে অংশে নক্ষত্রদিগের উক্তবিধ 'উন্মুখ' গতি রহিয়াছে সে অংশের নক্ষত্রগণ যেন পৃথিবী হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে; এবং যে দিকে 'বিমুখ' গতি রহিয়াছে সেই দিকের নক্ষত্রগণ যেন ক্রমে অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

রেলপথে চলিবার সময় ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, যে দিকে

চলিয়া যাইতেছে এইরূপ অনুমান হয়; এবং গাড়ীর পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করিলে ঐ দিকস্থ বৃক্ষ সকল পরস্পরের সন্নিহিত হইতেছে মনে হয়। এই দৃষ্টিভ্রম ঠিক নক্ষত্রদিগের 'বিমুখ' এবং 'উন্মুখ' গতির অনুরূপ। ইহা হইতে অনুমান করা হইতেছে যে নক্ষত্রদিগের ঐরূপ আপেক্ষিক গতি, পৃথিবীর সৌরপরিক্রম-গতি ভিন্ন অপর এক গতির পরিচায়ক। কিন্তু ইহাও জানা গিয়াছে যে পৃথিবী সৌরজগৎ ছাড়াইয়া দূরে পলায়ন করিতেছে না। এই কারণে ইহা ধারণা করা হইয়াছে যে সৌরজগৎ গতিশীল। রেলগাড়ীর গতির সহিত মিলাইয়া লইলে দেখা যায় যে, যে দিকে সৌরজগৎ চলিতেছে সেইদিকের নক্ষত্র সকল 'বিমুখ' গতি সম্পন্ন; এবং তাহার পশ্চাদ্দিকস্থ নক্ষত্র সকল 'উন্মুখ' গতিসম্পন্ন।

'সৌর জগতের গতি' বলিলে ইহা বুঝাইবে যে, যেমন গ্রহগণ তাহাদের সহচারী উপগ্রহ সমূহকে লইয়া সূর্য্যের চারিদিকে চলিতেছে সেইরূপ সূর্য্য তাহার গ্রহ উপগ্রহাদিসমন্বলিত "ক্ষুদ্র" পরিবার লইয়া অনন্ত আকাশে ছুটিয়া চলিয়াছে। এ স্থলে অনন্ত নক্ষত্ররাজ্যের সহিত তুলনায় সৌরজগৎকে একটী "ক্ষুদ্র" সৌরপরিবার বলা হইল।

জ্যোতির্ব্বিদ সমাজে এই একটী সাধারণ কার্য্যপ্রণালী দেখা যায় যে তাঁহারা নক্ষত্রজগতে যেখানে দলবদ্ধ গতি দেখিতে পাইয়াছেন সেখানেই ঐ গতির অন্য কারণ আছে কি না তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহার প্রধান কারণ এই যে নক্ষত্রদিগের মধ্যে পরস্পর হইতে দূরত্ব প্রায়ই এত অধিক যে তাহাদের কোন কারণে দলবদ্ধ হইয়া চলা সম্ভব মনে করা যায় না। যে নক্ষত্র সৌরজগতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্ত্তী জানা গিয়াছে, গণনা দ্বারা দেখা যায় যে তাহার দূরত্ব সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের ২৭৫০০০ গুণ। ঐ নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে ৪১/৩ বৎসর লাগে; এ দিকে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে কিঞ্চিদধিক ৮ মিনিট সময় লাগে। আকাশে

কাংশ জাতির মধ্যে বর্ত্তমান। দশ পাঁচ জন জাত কুটুম্বের সমক্ষে, মনোনীতা বিধবা বা পরিত্যক্তভর্তৃকা নারীর সীমন্তে সিন্দূর বিন্দু দিতে পারিলেই বিবাহ হইয়া গেল। ইহাদের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে দাম্পত্যশৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন করাও যেরূপ সহজ, বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়াও তদ্রূপ অনায়াসসাধ্য।

কিন্তু আমাদের কলাবতীর বিবাহটা কিছু বয়স হইয়া হইয়াছিল। তাহার বয়ঃক্রম যখন বার বৎসর, তখন তাহার বিবাহ হয়। কলাবতীর পিতামহ বৃদ্ধ রামরূপের সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ইংরেজী স্কুল উত্তীর্ণ খুল্লতাত শিউনন্দন, ভ্রাতৃকন্যা কলাবতীর দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম না হইলে বিবাহ দিতে দেয় নাই। বিবাহের কথাবার্ত্তা প্রায়ই হইত, শিউনন্দন নানারূপ ওজর আপত্তি করিয়া টালমাটাল করিয়া রাখিত। কিন্তু এবার শিউনন্দন সম্মতি দিল। পাটনা-মিঠাপুরের এক সম্ভ্রান্ত গোপগৃহস্থের পুত্র বাল্ মুকুন্দের সহিত কলাবতীর বিবাহ হইবে। 'আগুয়া' (ঘটক) আসিয়া কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া গেল। 'নৌয়া ব্রাহ্মণ' (নাপিত) দ্বারা বরকন্যার 'জনম্ পত্রিকা' আনাইয়া পাঁড়েজীর (পণ্ডিতের) দ্বারা মিলান হইল। পাঁড়েজী দেখিয়া বলিলেন, "অতি সুন্দর! রাজ যোটক হইয়াছে।" শিউনন্দন পাত্র দেখিতে গিয়া 'বরতুহি (খোঁজ) কে ভাত,' বরের গৃহে প্রথম অন্নাহার করিয়া 'দায়েজ' (যৌতুকাদি) সম্বন্ধে কতক স্থির করিয়া আসিল।

ইহার এক পক্ষ পরে পাত্রের 'তিলক' (আশীর্ব্বাদ) হইবে। সেই দিন হইতে কলাবতীর পিতৃগৃহ রমণীকণ্ঠনিঃসৃত বৈবাহিক মঙ্গলগীতিতে সতত মুখরিত হইতে লাগিল। সরস্বতী, প্রতিবাসিনীগণ-মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া, কি পূর্ব্বাহ্ণে, কি সায়াহ্ণে, ওড়নাবগুণ্ঠনে, কখন গৃহপ্রাঙ্গণে, কখন পল্লীপথে, কখন নারীগণকে লইয়া চক্রাকারে দাঁড়াইয়া, সম্মুখাবনত দেহে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া, গীতধ্বনি করিয়া ক্ষুদ্র খগোল গ্রামখানি প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। রাম অবতারের গৃহবধূগণ, নিশাবসানে. আটা পিষিতে পিষিতে, সেই শব্দের সহিত বিবাহগীতি মিশাইয়া, অপূর্ব্ব সংগীতের সৃষ্টি করিতে লাগিল।

অদ্য বাল্-মুকুন্দের তিলক বা আশীর্ব্বাদ। কলাবতীর পিতা রাম অবতার স্বয়ং, কয়েক জন বন্ধু বান্ধবের সহিত, আশীর্ব্বাদ করিতে

গিয়াছে। মিঠাপুরের গোপপল্লীর যত প্রবীণ লোক আসিয়া, কন্যা-পক্ষীয়দিগকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। অনেক কথাবার্ত্তা, বাক বিতণ্ডা, দিব্য-দিলাসের পর 'দায়েজ' (প্রাপ্য যৌতুকাদি) স্থির হইয়া বাক্‌দান হইয়া গেল। তখন লোহিতবস্ত্রপরিহিত, ধৃতকুণ্ডল, বলয়কলয়িত, স্বর্ণকণ্ঠি-বিভূষিত, অঞ্জনশোভিতনয়ন, পাত্র বাল-মুকুন্দ আসিয়া সেই আভীর সভার শোভা বর্দ্ধন করিল। রাম অবতার পাত্রের 'তিলক দান' করি-লেন। তিনি একখানি ছিপিয়া (থালা) তে নারিকেল, সুপারি, হরিদ্রা, ও কয়েকটি মুদ্রা রাখিয়া বাল্-মুকুন্দের হস্তে দান করিলেন। এই ক্রিয়াকে 'তিলক' বা 'ফলদান' কহে। সেই সময়ে বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

তৎপরে পাত্রের পিতা এক দিন খগোলে আসিয়া, রামঅবতারের আত্মীয়গণের সম্মুখে, কলাবতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল। কন্যার আশীর্ব্বাদ 'মাড়বা'র (বিবাহমঞ্চের) নিম্নে হইল।

এই মাড়বা বা বিবাহমঞ্চের একটু বিস্তৃত বর্ণনা করিতে হইবে। ইহা প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে, চারি দিকে চারিখানি বাঁস পুতিয়া, উপরে লোহিতবর্ণের বস্ত্রাবরণ দিয়া নির্ম্মিত করা হয়, এবং চারিদিকে আম্রপত্র ও বিবিধ পুষ্পমালা দ্বারা সুশোভিত করা হয়। সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরা উপরে বিচিত্র নক্ষত্রখচিত লোহিত বর্ণের চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া, নানা বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতাকা, বেললণ্ঠন, দেওয়ালগিরি, তশবির প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত করিয়া থাকে।

বাঙ্গালা দেশের ছান্‌লাতলার সহিত মাড়বার সামান্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কিন্তু ছানলাতলায়—ধুতুরা ফলের খোলার দ্বারা নির্ম্মিত দীপ দিয়া বরকে বরণ করা, "হাতে দিলাম মাকু, একবার ভ্যা করত বাপু" বলিয়া শ্বশ্রু ঠাকুরাণী কর্ত্তৃক জামাতার হস্তে মাকু দিয়া পূর্ব্বোক্ত বশী-করণ মন্ত্র বলা, এবং "উঠ্ বস্" করান, কন্যার "সাত পাক দেওয়া"-রূপ বর প্রদক্ষিণ, বর কন্যার প্রথম শুভদৃষ্টি, বরের "হাত বন্ধন," ঠান্‌দি ও শ্যালীসম্পর্কীয়া রমণীগণকর্ত্তৃক বরের নাসিকা কর্ণ মর্দ্দনাদিরূপ লাঞ্ছনা, এবং বিবাহ রাত্রির পরদিন প্রভাতে 'বাসি বিবাহ,' বরকন্যার "চুলোচুলী" করিয়া স্নান প্রভৃতি কয়েকটি স্ত্রী আচার ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে ; শাস্ত্রোক্ত বিবাহ পদ্ধতির প্রায় কোন কার্য্যই ছান্‌লাতলায় সম্পাদিত

হয় না। কিন্তু বিহারী বিবাহের ফলদান (তিলক বা আশীর্ব্বাদ) হইতে আরম্ভ করিয়া, স্ত্রী আচার, কন্যা সম্প্রদান প্রভৃতি বৈবাহিক সমস্ত কার্য্যই এই মাড়বার নিম্নে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

বিবাহের কয়েক দিন পূর্ব্বে পাত্রের পিতা এক দিন রামঅবতারের গৃহে আসিল। তখন উভয় ভাবী বৈবাহিকে এক মুষ্টি করিয়া ধান্য লইল। উভয় ধান্য মিশ্রিত করিয়া, এক জন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিভক্ত করা হইল। এই ক্রিয়াকে 'ধান বাঁট্‌টী' (ধান্য বিভাগ) কহে। এই ধান্যের খৈ প্রস্তুত হইয়া বৈবাহিক হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইবে।

ইহার পর 'চুমৌনা' ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। ইহাতে পাঁচজন স্ত্রীলোক প্রত্যেকে উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা চাউল তুলিয়া লইয়া, কলাবতীর পদদ্বয়ে, জানুতে, স্কন্ধে, স্পর্শ করিয়া, তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিল। মহারাষ্ট্র প্রদেশে চাউলের পরিবর্ত্তে গম ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং মস্তকে নিক্ষেপ না করিয়া, বালিকার ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত হয়; ইহার তাৎপর্য্য এই যে কন্যা শীঘ্র ফলবতী হইয়া সন্তান প্রসব করিবে।

বিবাহের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সরস্বতী প্রভৃতি বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ, কয়েকজন প্রতিবাসিনীকে সঙ্গে লইয়া 'মাট্‌ কোড়বা' (মৃত্তিকা খনন) ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। তাঁহারা উত্তম উত্তম বেশ ভূষায় সজ্জিতা হইয়া, কজ্জলপূরিত লোচনে, ওড়নাবগুণ্ঠনে বৈবাহিক মঙ্গলগীতি গাহিতে গাহিতে, পল্লীমধ্যস্থ সুবৃহৎ ইন্দারার পার্শ্বে গিয়া, তাহার কিয়দংশ স্থান লাল মৃত্তিকা দ্বারা প্রলেপিত করিলেন, এবং তাহা হইতে এক চাপ মৃত্তিকা খুঁড়িয়া লইয়া, সঙ্গিনী কোন রমণীর মস্তকে দিয়া, বিবাহ বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। এই মৃত্তিকার উনান প্রস্তুত করিয়া, বিবাহমঞ্চের এক পার্শ্বে রাখা হইল।

পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়ার সহিত আমাদের দেশের জল-সহার সামান্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কিন্তু বঙ্গকুলকামিনীরা মৃত্তিকার পরিবর্ত্তে জল আনয়ন করিয়া থাকেন, ঐ জল 'ঘর মঙ্গলা'র সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভাগলপুর অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বিবাহমঞ্চের পরিবর্ত্তে প্রাঙ্গন পার্শ্বে কলাগাছ ও বাঁশ পুতিয়া পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকাখণ্ড রক্ষিত হইয়া থাকে।

সেই দিনই কুম্ভকার আসিয়া 'চৌমুখ' দিয়া গেল। ইহা মৃন্ময় ঘট সংলগ্ন চারিমুখবিশিষ্ট প্রদীপবিশেষ। পাঁচ জন পুরুষ একটা লাঙ্গলের

ঈষ আনিয়া, কয়েকটি ক্ষুদ্র বংশ খণ্ডের সহিত, সেই 'চৌমুখ' বিবাহ মঞ্চের এক পার্শ্বে স্থাপিত করিল।

তৎপরে 'ঘিচারী' ও মন্ত্রীপূজা করা হইল। রাম অবতার, বিবাহমঞ্চ-চতুষ্কোণস্থিত বংশখণ্ডচতুষ্টয় ঘৃতদ্বারা লেপিত করিল—ইহাকেই 'ঘিচারী' কহে। এই সময়ে গার্হস্থ্য দেবতার পূজা দেওয়া হইল—তাহার নাম 'মন্ত্রীপূজা'।

বিহার প্রদেশে গাত্রহরিদ্রাকে 'উঠবন্' বলে। প্রথমে পূর্ব্বকথিত পাঁচজন পুরুষে হরিদ্রা, তৈল ও দূর্ব্বা লইয়া কলাবতীর ললাটে স্পর্শ করিয়া দিল; তাহার পর স্ত্রীলোকেরা তাহাকে তৈল হরিদ্রা দ্বারা আপাদমস্তক উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া 'উঠবন্' ক্রিয়া সম্পন্ন করিল।

পরদিন 'বরিয়াৎ' (বরযাত্রী) আসিবার পূর্ব্বে, পূর্ব্বকথিত 'ধানবাঁট্টী' হইতে রক্ষিত ধান্য লইয়া, বিবাহমঞ্চের নিম্নে, পূর্ব্বোল্লিখিত উনানে, খৈ প্রস্তুত করা হইল। তখন উনানটি এক পার্শ্বে ত্যাগ করা হইল। এই আচারলাজদ্বারা ইহার পর বিবাহ হোমাগ্নিতে আহুতি দান করা হইবে।

তৎপরে আম্রপত্র-শিরাগলাধঃকরণ ক্রিয়া করা হইল। ইহা এক বিচিত্র প্রথা :—সরস্বতীর জ্যেষ্ঠ সহোদর, ভগিনীর বামহস্তে একখানি অলঙ্কার উপহার দিল। তখন নাপ্‌তিনী বিবাহমঞ্চ-বিলম্বিত আম্রপত্র মালা হইতে একটি পাতা ছিড়িয়া লইয়া, তাহার মধ্য শিরাটি সরস্বতীর সহোদরকে দিল। জ্যেষ্ঠ উহা লইয়া, ভগিনীর মুখের নিকট ধরিলে, সরস্বতী তাহার কিয়দংশ দাঁতের দ্বারা ছিন্ন করিয়া লইয়া, স্বীয় দক্ষিণ হস্তে রক্ষা করিলেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে একটু জল দিলে, জননী কলাবতীর মস্তকে সেই সজল খরিকাটি স্পর্শ করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা গলাধঃকরণ করিলেন। তখন জ্যেষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিল, "জুড়ৈলী (শীতল হইলে) ?" সরস্বতী বলিলেন, "জুড়ৈলুঁ (শীতল হইলাম)।"

এ দিকে মিঠাপুরে জামাতৃগৃহে পূর্ব্বকথিত ক্রিয়া সকল সম্পাদিত হইল—কেবল তথায় বিবাহমঞ্চ নির্ম্মিত হইল না। মৃত্তিকা খনন, উনান নির্ম্মাণ, লাঙ্গলাদি ও আম্রশাখা প্রোথিতকরণ, চুম্বন, গাত্রহরিদ্রা, প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়া যথাযথ সম্পাদিত হইল। আচারলাজ প্রস্তুত করিয়া, পাত্রীর গৃহে প্রস্তুত লাজের সহিত মিশ্রিত করিয়া হোমাগ্নিতে আহুতি দিবার জন্য, সঙ্গে করিয়া লওয়া হইল। কিন্তু পাত্রের ক্ষৌরকার্য্যের

সময় একটি বড় হাস্যোদ্দীপক কর্ম্ম হইল—নাপিতের পরিবর্ত্তে 'হাজামিন্' (নাপিতানী) যখন পাত্রের ক্ষৌরকার্য্য করিয়া দেয়, তখন বরের মাতৃ-ঠাকুরাণী পুত্রের সম্মুখে 'মৌর' (টোপর) মস্তকে দিয়া বসিয়া রহিলেন!

তৎপরে পাত্রকে স্নান করাইয়া, ললাট ও মুখমণ্ডল চন্দনচর্চ্চিত করিয়া দেওয়া হইলে, পাত্র 'বরিয়াতের' (বরযাত্রীর) সমভিব্যাহারী হইল। পাত্রের স্নানজলের কিয়দংশ সঙ্গে করিয়া লওয়া হইল। বরযাত্রী কন্যার গৃহে আসিয়া পৌঁছিলে, ঐ স্নানজল কন্যার মাতাকে দেওয়া হইবে। জননী কন্যার স্নানজলের সহিত তাহা মিশ্রিত করিয়া দিলে, নাপ্‌তিনী তাহার ক্ষৌরকার্য্য করিয়া দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, সেই জলে পাত্রীকে স্নান করাইয়া দিবে।

অদ্য বৈকালে 'বরিয়াৎ' (বরযাত্রীর দল) বাহির হইবে। বিহারের বরিয়াৎ একপ্রকাণ্ড ব্যাপার। বাঙ্গালা দেশে একজন জমীদার পুত্রের বিবাহে যতদূর জাঁকজমকের সহিত-বরযাত্রীর দল না যাইয়া থাকে, এদেশে একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীর বিবাহে তদপেক্ষা অধিক কাণ্ডকারখানা হইয়া থাকে। এ দেশের লোকে পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধাদি অন্য ক্রিয়া উপলক্ষে সাধারণতঃ অতি সামান্য ব্যয় করিয়া থাকে; কিন্তু পুত্র কন্যার বিবাহে, এত অধিক ব্যয় করে যে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। বাঙ্গালা দেশের মত, পাশকরা পাত্রকে, বিদ্যার মর্য্যাদা ও যৌতুকাদি দিতে তত ব্যয় হয় না; কিন্তু বাহ্যিক আড়ম্বর, বাইনাচ, তামাসা, বাদ্য-ভাণ্ড, হাতি, ঘোড়া, উট, গাড়ি, এক্কা, লোকলস্কর, বাঁধা রোসনাই, বাজি পোড়ান, খাওয়ান দাওয়ান প্রভৃতি ধূমধামেই অধিক ব্যয় হয়। বরযাত্রীগণকে একটী আলাদা প্রকাণ্ড বাড়ী (জন্‌বাসা) দেওয়া হয়। তাহার উঠানে সুবৃহৎ সামিয়ানা খাটাইয়া, আলোক মালায় সুসজ্জিত করিয়া, তিন দিন চারি দিন, কখন বা এক সপ্তাহ কাল, প্রত্যহ রজনী-যোগে বাইনাচ, লৌণ্ডার নাচ, রাশধারীর নাচ, ভাঁড়ের তামাসা প্রভৃতি, বরযাত্রীগণের এবং সমাগত কন্যাযাত্রীগণের মনোরঞ্জনার্থ দেওয়া হইয়া থাকে। কখন কখন দুই তিন শত বরযাত্রী, হাতী, ঘোড়া, উট, লোকলস্কর লইয়া, প্রায় এক সপ্তাহ কাল সেই স্থানে বাস করিয়া, ক্রমাগত চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় করিয়া ভোজন করিয়া কন্যাকর্ত্তাকে একেবারে ফতুর করিয়া দেয়। বরযাত্রীর আহার বিহার ও বাই নাচ ইত্যাদি আমোদ

প্রমোদের খরচ, অধিকাংশ স্থলে বরকর্ত্তাই বহন করিয়া থাকে। সে স্থলে কন্যাকর্ত্তাকে কেবল একটী সুবিধামত সুবৃহৎ বাড়ী ঠিক করিয়া দিতে হয়। বিবাহবাড়ীতে কুটুম্ব, কুটুম্বের কুটুম্ব, তস্য কুটুম্ব পর্য্যন্ত আহূত হইয়া, মাসাবধি অবস্থান করিয়া থাকে। স্কুলের ছাত্রগণ, কোন জাত ব্রাদারের বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষ্যে গমন করিলে, ১৫।২০ দিন স্কুল কামাই করিয়া থাকে। ধোপা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকগণকে, তাহাদের জাতীয় 'বিবাহ-লগনে' ২।৩ মাস পর্য্যন্ত জাতব্রাদারের বাড়ী অবস্থান করিতে হয়। ঐ সময়ে ভদ্রলোকদিগকে ধোপানাপিত বন্ধ করা 'একঘোরের' মত থাকিতে হয়।

কলাবতীর বিবাহের বরিয়াৎ আসিতেছে; ক্ষুদ্র খগোল গ্রামখানি একবারে সজীব হইয়া উঠিল। গ্রামস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা কাতার দিয়া গিয়া বিস্তৃত রাজপথপার্শ্বে দাঁড়াইল। প্রথমে কতকগুলি বালক বালিকা ও স্ত্রীলোক, শ্বেত পতাকা, নীল পতাকা ও রক্ত পতাকা, পত পত শব্দে উড্ডীয়মান করিতে করিতে, দুই সারি দিয়া চলিয়াছে। তদ্দর্শনে কুলকামিনীগণ গবাক্ষদ্বার অবলম্বন করিয়া রাজপথের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পতাকাশ্রেণীর পশ্চাতে বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত হস্তীযূথ, কোনটী হাওদাযুক্ত, কোনটীর পৃষ্ঠে কেবলমাত্র 'গদ্দী' আঁটা, গজেন্দ্রগমনে শুণ্ড দোলাইতে দোলাইতে চলিয়াছে। তাহার পশ্চাতে কয়েকটী উট, তৎপশ্চাতে শ্বেত অশ্বশ্রেণী—পৃষ্ঠে 'গদ্দী' আঁটা, তদুপরি ঝালর ঝলমলায়-মান—রেকাবশূন্য। বিহারী অশ্বারোহীরা কখন জীন কিম্বা রেকাব ব্যবহার করে না। তৎপরে ১০।১২ খানি এক্কা—একখানি এক্কার সংলগ্ন করতাল-সমষ্টি শব্দে অস্থির করিয়া দেয়, এককালীন ১০।১২ খানি এক্কার সেই ভীষণ ঝন্‌ঝন্ শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল। তাহার মধ্যে ২।৩ খানি রব্বা আছে—এক্কা সাধারণত এক চূড়াযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু রব্বার বিশেষত্ব এই যে তাহা 'তি মন্দিল' (তিন মন্দির বা চূড়াযুক্ত)। তৎপশ্চাতে টম টম, বয়েল গাড়ি, ঘেরাটোপ দেওয়া গাড়ি, একচূড় দ্বিচূড় ত্রিচূড় বয়েল গাড়ি ও 'বাহল' (খাটিয়াযুক্ত খোলা গরুর গাড়ি), বড় বাহল ইত্যাদি। পূর্ব্ব কথিত যান সমূহে বরযাত্রী বোঝাই—বিচিত্র বিচিত্র বর্ণের কোর্ত্তা আঁটা, মস্তকে মুরেঠা (পাগড়ি) বাঁধা, কাহারও মস্তকে যাত্রাদলের ভিস্তির মত টুপি, কাহারও মস্তকে জরির তাজ। অধর তাম্বুল

রাগ রঞ্জিত ; গুম্ফ ঊর্দ্ধ দিকে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি আকারে পাক দেওয়া ; তাহাদের অনেকের অঙ্গে অলঙ্কারের অভাব নাই ; কণ্ঠে মোহন মালা, হস্তে বজুল্লা (স্বর্ণের বাজু বিশেষ) ; কাহারও গলদেশে কণ্ঠি (হারবিশেষ) কাহারও গুঞ্জমালা। এই সমস্ত অলঙ্কার ও শালদোশালার অধিকাংশই ধার করা জানিতে হইবে।

বরযাত্রীগণের পশ্চাতে ইংরাজী বাদ্য বাজিতেছে। তৎপরে লালরঙ্গের কোর্ত্তাপরিহিত বেহারাবাহিত পালকীতে 'দুলহা' (বর)—দুই দিকে দুই জন 'হাজাম' (নাপিত) চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে চলিয়াছে। (তাহার পার্শ্বে মশালচী আলো ধরিয়া যাইতেছে। তৎপশ্চাতে বরকর্ত্তার ও গুরু পুরোহিতের পাল্‌কী। তাহার পশ্চাতে খোলা গরুর গাড়ীতে বরযাত্রীগণের আহারোপযোগী চিঁড়ার বস্তা, কোন গাড়ীতে তদুপযুক্ত দহি, কোন খানিতে শালপত্র বোঝাই। বরিয়াতের দুই পার্শ্বে খাসগেলাসের সারি। মধ্যে মধ্যে কয়েকজন লোক কেরোসীন তৈলে ভিজান ঘুঁটে লইয়া, তাহা এক এক খণ্ড বংশদণ্ডের অগ্রভাগে সংযোজিত করিয়া জ্বালিয়া চলিয়াছে, এবং সর্ব্বপশ্চাতে কয়েকজন লোক ঝুড়ি করিয়া বাজি লইয়া পোড়াইতে পোড়াইতে যাইতেছে। এইরূপে সেই বরিয়াৎ প্রায় তিন মাইল রাস্তা ব্যাপিয়া চলিয়াছে।বেহারী বরিয়াতের বর্ণনা করিতে গিয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম, তাহার সম্যক বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যাহা হউক, এক কথায়, সেই জনস্রোতের কোলাহল, সেই হস্তীযূথের বৃংহতি, সেই অশ্ববৃন্দের হ্রেষারব, সেই উষ্ট্র সমূহের তূর্য্যধ্বনি, সেই আতসবাজীর শব্দ, সেই বোমপটলের গভীর নিনাদ, সেই এক্কাব্রজের তুমুল ঝনঝনি, সেই দর্শকবৃন্দের কলরব, সমস্ত একত্রীভূত হইয়া, সেই ক্ষুদ্র খগোল গ্রামখানিকে একেবারে তোলপাড় করিতে লাগিল। অদূরে সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া সরস্বতীর মাতৃহৃদয় বিমল আনন্দধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—এবং অচিরাৎ তাঁহার নয়নপ্রান্তে কয়েক বিন্দু মুক্তাফলের সৃজন করিল। আর সেই ভীরুস্বভাবা বালিকা কলাবতীর ক্ষুদ্র হৃদয়খানি, কি এক অনির্ব্বচনীয় বিষাদ মিশ্রিত আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল।

তখন বরযাত্রীর পক্ষ হইতে একজন নরসুন্দরকে 'আইপন বারি' (সংবাদ) লইয়া, কন্যাপক্ষকে জানান হইল যে, বরিয়াত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যেন বরযাত্রীর শুভাগমন কেহ জানিতে পারে নাই, অতি

গোপনীয় ভাবেই হইয়াছে! আইপন বারি প্রাপ্তি মাত্রে, কন্যাপক্ষীয়েরা মশাল লইয়া 'আগুয়ান্' হইয়া, বরযাত্রীকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিল। কন্যাপক্ষীয়েরা বরপক্ষীয়দিগের প্রথম দর্শনে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ করিতে লাগিল, এবং তাহাদিগের বাসস্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট 'জনবাসা'তে লইয়া গেল।

এ দিকে পাত্রের পাল্‌কী রাম অবতারের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে, রমণীগণ তাহার উপর চাউল ও গোবুর প্রভৃতি বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন দুইজন স্ত্রীলোক, সরবৎপূর্ণ কলসোপরি, একখণ্ড তাম্র-পাত্রাধারে একটী ঘৃত প্রদীপ জ্বালিয়া, বহির্দ্বারের সম্মুখে রাখিল; এবং রাম অবতার এক খণ্ড কাগজে লগন্ (লগ্ন) পত্রী লিখিয়া একটি টাকার সহিত বরকর্ত্তার হস্তে দিল। এ দিকে শিউনন্দনের স্ত্রী, একখানি কাংস্য নির্ম্মিত থালার উপর প্রদীপ রাখিয়া, বরের হস্তে দিলেন এবং স্বীয় বস্ত্রাঞ্চ-লের অগ্রভাগদ্বয় ধারণ করিয়া, প্রথমে থালায়, পরে পাত্রের ললাটে এবং পরিশেষে স্বীয় কপালে স্পর্শ করিলেন।

তখন সরস্বতী একটী নোড়া লইয়া, স্বীয় করতলে ঘর্ষণ করিয়া, পাত্রের কপোলদেশে স্পর্শ করাইলেন। এই সময়ে একটি অপরিচিতা নারী বিচিত্র বসন ভূষণে সমাচ্ছাদিতা হইয়া, এক পূর্ণকুম্ভ মস্তকে * লইয়া, রমণীমণ্ডলে আসিয়া পরিচয় দিল যে, সে কামরূপ হইতে এই কন্যা কলাবতীকে পাত্রস্থ করিবার জন্য আসিয়াছে। ইহা বলিয়া সেই কুম্ভ হইতে জল লইয়া, পাত্রের গাত্রে ছিটাইয়া দিল। তখন সকলে আশ্চর্য্য হইয়া চিনিল যে এ আর কেহ নহে, শিউনন্দন কামরূপ-রমণীর বেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছে। তখন স্ত্রীলোক মহলে একটা মহা হাসির রোল পড়িয়া গেল। ইত্যবসরে রাম অবতারলাল স্বয়ং আসিয়া পাত্রের ললাটদেশ চন্দন তিলক রঞ্জিত করিয়া দিল। এই তিলকদান আশীর্ব্বাদকালীন তিলকদানের সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

কন্যার পিতার দ্বারদেশস্থ এই ক্রিয়াত্রয়কে 'দুয়ার পূজা' (দ্বারদেশে পাত্রের পূজা) কহিয়া থাকে। পাটনা জেলাস্থ সম্ভ্রান্ত গোপবংশীয়েরাই

* বিহারী রমণীগণ কক্ষের পরিবর্ত্তে মস্তকে জল বহন করিয়া থাকে, একথা প্রায় সকলেই অবগত আছেন।

'দুয়ার পূজা' করিয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য জাতিদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রীতি প্রবর্ত্তিত আছে। ব্রাহ্মণ, ছত্রী, বাভন্ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর লোকেরা, পাত্রকে দ্বারদেশে কিছু উপঢৌকন দেয়, এবং তাহাদের গৃহস্থ রমণীগণ গোবরের পরিবর্ত্তে পাত্রের গাত্রে গুড় মিশ্রিত চাউল বর্ষণ করিয়া থাকেন।

তদনন্তর বরযাত্রীরা তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট "জনবাসা"তে বিশ্রাম করিতে লাগিল। এ দিকে শিউনন্দন কামরূপরমণীর বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, এক গ্লাস সরবৎ একখানি লোহিত বস্ত্রখণ্ডে আচ্ছাদিত করিয়া, বরযাত্রীর দলের মধ্যে আবির্ভূত হইল। তৎপরে স্বীয় বস্ত্রমধ্য হইতে একটি পুঁটুলি বাহির করিল; তাহা হইতে কড়াইয়ের দাল ও লঙ্কাচূর্ণমিশ্রিত ধূলিরাশি বাহির করিয়া, বরযাত্রীগণের মধ্যস্থলে শূন্যপথে উড়াইয়া দিল। তখন বরযাত্রীগণ চারিদিকে এককালীন পরস্পরের গাত্রে হাঁচিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে শিউনন্দন "ঠাণ্ডা কিজিয়ে! ঠাণ্ডা কিজিয়ে!!" বলিয়া, সেই গ্লাস হইতে সরবৎ লইয়া চারিদিকে বরযাত্রীর গাত্রে ছড়াইয়া দিতে লাগিল। ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশেই "ভারতী"র পাঠক পাঠিকা আছেন, কিন্তু বিহারের মত এমন সৃষ্টিছাড়া বরযাত্রী-সম্ভাষণ কোথাও দেখিয়াছেন কি?

এ দিকে 'দুয়ার পূজা' ও 'তিলক দান' হইয়া গেলে, পাত্রকে আনিয়া, 'জনবাসায়' বিবাহ সভাতে বসান হইল। তখন পাত্রীপক্ষীয় নাপিত আসিয়া পাত্রের মস্তকের 'মৌর'টি চাহিয়া লইয়া গেল।

বিবাহের সমস্ত ঠিক হইয়া গেলে বরযাত্রীদিগের মধ্যে যাহারা পাত্রের নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়, তাহারা 'জনবাসা' হইতে পাত্রকে লইয়া, পাত্রীর জন্য বস্ত্রালঙ্কারাদি উপঢৌকন সহিত বিবাহমঞ্চে আসিল। তন্মধ্যে এক খানি মূল্যবান সাটী কন্যাকে পরিধান করাইবার জন্য, পুরস্ত্রীগণের নিকট অন্তঃপুরে পাঠান হইল। তৎপরে কন্যাকে আনাইয়া বিবাহমঞ্চে বসান হইল। বরপক্ষীয় কর্ত্তৃক বিবাহসভায় এই প্রথম কন্যাদর্শনকে 'নিরীচ্ছন' (নিরীক্ষণ) বলে। এদিকে কন্যাকর্ত্তা 'পচিয়া' নামক হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র, এবং পাদরিদের গাউনের মত আকৃতিবিশিষ্ট, কিন্তু লোহিত বর্ণের, একটি ঘাঘরা পাত্রকে পরিধান করিতে দিলেন। এই ঘাঘরাকে 'জামা' বলে।

তৎপরে কঙ্কন পরিধানের ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ইহাতে বর, সাত জন লোকের সহিত, উদখলে কিয়ৎ পরিমাণে ধান্যের তুষ তুলিয়া, ২।৪টী চাউল

আম্র পত্রমধ্যে রাখিয়া, এক প্রকারের কঙ্কণ প্রস্তুত করিল। এই কঙ্কণের মধ্যে দুইটি বাছিয়া লইয়া, একটি বরের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে, অপরটি কন্যার বাম প্রকোষ্ঠে, বন্ধন করিয়া দেওয়া হইল।

তাহার পর কন্যাপূজা নামক ক্রিয়া—ইহাতে বরের জ্যেষ্ঠ সহোদর কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন, গুড়, এবং অলঙ্কারাদি আনিয়া পাত্রীকে উপহার দিল। তৎপরে কয়েকটি পান ও কিঞ্চিৎ দধি দক্ষিণ হস্তে লইয়া, বাম হস্তে কন্যার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ ধরিয়া, তাহার কপালে জোরে টিপিয়া দিল।

উপরোক্ত ক্রিয়াকে 'বন্দন' (বন্দনা) বলে। ইহা ভাসুরের ভাদ্র-বধূকে শেষ স্পর্শ—তিনি আর ভ্রাতৃবধূকে জীবনে কখন স্পর্শ করিতে পারিবেন না, করিলে পাপস্পর্শ হইবে।

তৎপরে সরস্বতী কলাবতীকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহার কটীদেশ স্বীয় হস্ত দ্বারা ঘেরিয়া, বিবাহমঞ্চে গিয়া বসিলেন—তখন 'কামান' আরম্ভ হইল। জনবাসা হইতে আনীত বরের মৌর লইয়া, সরস্বতী মস্তকে ধারণ করি-লেন। আর কলাবতীর মস্তকে খর্জ্জুর পত্র নির্ম্মিত 'মৌরী' (পাতিমৌর) দেওয়া হইল। বিহারে সোলার পরিবর্ত্তে খেজুর পাতার পাতিমৌর প্রস্তুত হয়। তখন হাজামীন্ (নাপিতানী) মাতা ও কন্যার উভয়রে নখ কাটিয়া ক্ষৌর কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দিল। পাত্রের কামান, পূর্ব্বে তাহার স্বীয় গৃহে হইয়া গিয়াছে। তাহাতে বালমুকুন্দের:জননীও মৌর মস্তকে দিয়া ক্ষৌরকার্য্য করাইয়াছিলেন।

তাহার পর বর পক্ষীয়েরা জনবাসায় ফিরিয়া গেলে, কলাবতীকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া, কৌমারী বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া 'পৈয়রী' নামক হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করাইয়া দেওয়া হইল। তৎপরে বরকে আনয়ন করাইয়া বিবাহমঞ্চে বসান হইল, এবং রাম অবতার কলাবতীকে আনিয়া জামাতার বামভাগে বসাইয়া দিল। তখন শিউনন্দন অন্তঃপুরে গিয়া সরস্বতীর নিকট হইতে 'মৌর' লইয়া আসিয়া, পাত্রের মস্তকে পরাইয়া দিল। এবার 'সুমঙ্গলী' (বিবাহ ক্রিয়া) আরম্ভ হইল। পাত্র, বিবাহমঞ্চে কন্যার সম্মুখে বসিল ; আর রাম অবতার এক হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, অন্য হাঁটুতে কন্যাকে বসাইল। ইহাই আসল বিবাহ বা কন্যাদান। তখন পুরোহিত বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং গৌরীপূজা করিয়া অগ্নিতে আহুতি দান করিলেন। কন্যার পিতার হস্তে জলপূর্ণ শঙ্খে

পুষ্প ও মুদ্রা দিয়া, পূর্ব্ববর্ণিত 'চৌমুখ' প্রদীপের চতুর্দ্দিকে, সেই জল নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। এইরূপ সাতবার করিলে, কন্যাদান কার্য্য সম্পন্ন হইল। কন্যাদানের পর, কন্যার পিতা মাতা জল খাইতে পাইল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে উপবাস করিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

তৎপরে বরকন্যার বস্ত্রে 'গাঁইট বন্ধন' করিয়া দেওয়া হইল। ইহাকে 'জনম্ গাঁইট' বলে—ইহা আর জনমেও খুলিবে না। সেই সময়ে পুরোহিত কন্যার বস্ত্রাঞ্চলে একটি সুপারি ও কয়েকটি পয়সা বাঁধিয়া দিলেন।

তৎপরে বৈবাহিক হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ ও তাহাতে পূর্ব্ববর্ণিত বিবাহ মঞ্চের উনানে প্রস্তুত লাজ নিক্ষেপ কার্য্য হইল। বাঙ্গলাদেশে কুশণ্ডিকার সময় যেরূপে হোমাগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাতে লাজ নিক্ষেপ করে, ইহাও অনেকটা সেইরূপ—অগ্রে কলাবতী লাজপরিপূর্ণ শূর্প হস্তে, পশ্চাতে জামাতা পত্নীর দেহ বেষ্টন করিয়া, দুই হস্তে সেই শূর্প ধারণ করিল, এবং অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাহাতে লাজ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। লাজ ফুরাইয়া গেলে, শিউনন্দন তাহা পুনরায় পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিল। সেই আচারলাজধূমে নব কিশোর কিশোরী বর কন্যার নয়নকমল অরুণিত হইয়া উঠিল। এ দিকে সুযোগ পাইয়া কলাবতীর ভগিনীসম্পর্কীয়া রমণীগণ, সেই হোমধূমপীড়িত বদ্ধহস্ত ভগিনীপতিকে কর্ণমর্দ্দন, চপেটাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত প্রভৃতি দ্বারা অভিবাদন করিয়া, নব পরিণীত বরকে অধিকতর পীড়িত করিতে লাগিল। ইত্যবসরে একজন শ্যালকপত্নী বালমুকুন্দের কর্ণদ্বয় ধারণ করিয়া তাহাকে 'উঠবস্' করাইল।

তৎপরে বর একটি ক্ষুদ্র বাটীতে সিন্দূর লইয়া, এক টুকরা শনের দ্বারা কন্যার সীমন্তে সিন্দূর দিয়া 'সিন্দূর দানকার্য্য' সম্পন্ন করিল। তখন বর কন্যা বিবাহ মঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া ঠাকুরঘরের দ্বারে উপস্থিত হইল। সেই গৃহদ্বারে কলাবতীর ভগিনীসম্পর্কীয়া একটী রমণী দ্বার আগলাইয়া দাঁড়াইয়া বরকে নির্দ্দিষ্ট কবিতা উচ্চারণ করিতে বলিল। তখন জামাতা কিছু উপহার পাইলে সেই নির্দ্দিষ্ট কবিতা পাঠ করিল।

তৎপরে শ্যালিকাগণকর্ত্তৃক হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রাবৃত জুতাকে দেবতা বলিয়া, বরকে প্রণাম করান হইল। বাঙ্গলাদেশে কোন কোন স্থানে বরকে ঠকাইবার জন্য হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রাবৃত খ্যাংরা রাখা হয়। বর

তাহা প্রণাম করিলে, রমণীগণ তৎক্ষণাৎ তাহা অনাবৃত করিয়া, হাসির লহরী তুলিয়া থাকে।

ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিবে, সুতরাং জামাতাকে দ্বারদেশে জুতা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল; এদিকে কোন রমণী জুতা জোড়াটি লুকাইয়া রাখিল। এই কার্য্যকে 'জুতাচোরাই' কহে। এই তামাসার তাৎপর্য্য এই যে নির্ব্বাক 'তুলহা' (জামাতা) কথা কহিয়া কামিনীগণের নিকট জুতা ভিক্ষা করিবে। তৎপরে বরকন্যা নতজানু হইয়া উত্তরপূর্ব্বমুখে দেবতাকে প্রণাম করিল। সেই সময়ে উভয়ের বস্ত্রাঞ্চলে পুনরায় 'গাঁইট-বন্ধন' করিয়া দেওয়া হইল! এই গাঁইট বন্ধন হইলেই বিবাহ শেষ হইয়া গেল। তখন সরস্বতী জামাতাকে মহাযত্নে স্বীয় প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া 'ক্ষীর' (পায়স) ভক্ষণ করাইলেন।

এদিকে রামরূপ, রাম অবতার ও শিউনন্দন বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণকে সযত্নে ভোজন করাইল। শালপত্রোপরি বড় বড় বৃহদাকার 'পুরী' (লুচি) যাহাকে 'পাবন ছক' বলে, আমাদের দেশের রাধাবল্লভী লুচির মত। তৎপরে ১০।১২ রকমের তরকারী—বঙ্গদেশের সহিত বিহারের তরকারীর এই বিভিন্নতা যে, বাঙ্গালা দেশে ৩।৪ প্রকারের তরকারী একত্রিত করিয়া এক একটী ব্যঞ্জন পাক করা হয়, কিন্তু বিহারে তাহা নয়—কপি, আলু, পটল, বেগুন, রামতরুই, পরোর (ধুঁধুল) প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন তরকারী এক একটি আলাদা করিয়া রসুই করা হয়। নম্বরে যত অধিক তরকারী হইবে, কর্ম্মকর্ত্তার তত সুখ্যাতি। তারপর পেড়া, বরফী, জিলেবী, লাড্ডু প্রভৃতি নানারূপ মিষ্টান্ন ও দধি, মাট্টা (ক্ষীর) প্রভৃতি দ্বারা সকলকে তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করান হইল।

সেই বরিয়াৎ রাম অবতারের গৃহে চার দিন রহিল। দ্বিতীয় দিবসে বরযাত্রীগণকে অন্নাহার করান হইল—ইহাকে 'কাচ্চা রসুই' কহে। তৃতীয় দিবসে পুনরায় পুরী খাওয়ান হইল। ইহাকে 'বারহার' বলে। ঐ দিন বৈকালে জামাতাকে জনবাসা হইতে আনাইয়া, শ্বশুর গৃহে কতকগুলি অল্পবয়স্ক বালকের সহিত আহার করিতে বসান হইল, এবং বালকদিগের ও জামাতার পাত্রে রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করা হইল। তৎপরে জামাতাকে খাটিয়ায় বসাইয়া, গৃহস্থ রমণীগণ, মেওয়া ও অলঙ্কার পূর্ণ থলিয়া প্রদান করিল, সেই থলিয়া বন্ধ করিবার সূতা জরীর দ্বারা

নির্ম্মিত ও ঘুণ্টিযুক্ত। চতুর্থ দিবসে, দুই প্রহরের সময়, বরকন্যাকে আনাইয়া, বিবাহমঞ্চের নিম্নে, পাশাপাশি বসান হইল, এবং বরযাত্রীরা সকলে আসিয়া চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে দুই টাকা করিয়া মর্য্যাদা দেওয়া হইল এবং বরকে দান সামগ্রী বাসন কোসন ও খাট পালঙ্ক এবং শয্যা প্রভৃতি দেওয়া হইল—ইহাকে 'বরদান' কহে। আমাদের দেশে কন্যাদানকালীন বিবাহরাত্রিতে এই সমস্ত দানসামগ্রী দেওয়া হইয়া থাকে।

তৎপর দিন 'রোকসতী' (বরকন্যা বিদায়)। সেইদিন রামঅবতার জামাতাপক্ষ হইতে যে যে দ্রব্য উপহার পাইয়াছিল, তাহা সমস্ত প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে একত্র করিল। পল্লীস্থ বন্ধু বান্ধব আসিয়া তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত করিল। সেই সময়ে বরপক্ষীয় কেহ তথায় উপস্থিত থাকিবার প্রথা নাই। তখন রামঅবতার পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসমূহের নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষাও কিঞ্চিদধিক মূল্যের দ্রব্য লইয়া জনবাসায় বরকর্ত্তার হাতে দিল। তখন বরের পিতা কন্যার পিতাকে এক খণ্ড বস্ত্র উপঢৌকন করিল। কন্যার পিতাও তৎক্ষণাৎ সেই বস্ত্রখণ্ডের মূল্য দান করিল এবং আরও কিছু উপহার দিল। তৎপরে "রাম রাম" (নমস্কার) বলিয়া উভয় 'সম্বন্ধী' (বৈবাহিক) পরস্পরকে সেলাম করিল। বরকন্যা বিদায়ের অব্যবহিত পূর্ব্বের এই ক্রিয়াকে 'রাম রাম্মী' কহে। আমাদের দেশে শ্যালককে সম্বন্ধী, কিন্তু বিহারে বৈবাহিককে সম্বন্ধী কহে। বিহার প্রদেশস্থ নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বরকন্যা বিদায়কালীন বরযাত্রীদিগকে মদ্যপান জন্য কিছু টাকা দেওয়া রীতি আছে। তৎপরে বরিয়াৎ বরকন্যা লইয়া মিঠাপুর অভিমুখে প্রতিগমন করিল।

বরকন্যা পাত্রের দ্বারদেশে পৌঁছিলে, কলাবতীকে পাল্‌কী হইতে নামাইয়া শ্রেণীবদ্ধ কয়েকটি ঝুড়ির উপর পদ বিক্ষেপ করাইয়া, গৃহদ্বারে লইয়া যাওয়া হইল—ইহার তাৎপর্য্য এই যে নব বধূর শুভাগমনে স্বামীর গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। তখন বাল্‌মুকুন্দের জ্যেষ্ঠা ভগিনী এক গ্লাস সরবৎ আনিয়া কন্যাকে পান করাইলেন—কন্যাও তাঁহাকে একটী রৌপ্য মুদ্রা উপঢৌকন দিল। তখন শুভক্ষণ দেখিয়া বরকন্যাকে ঘরে তোলা হইল। কিন্তু গৃহদ্বারে বাল্‌মুকুন্দের ভগিনীগণ পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল—বৌকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিবে না, তখন তাহাদিগকে

'দুয়া ছেঁকাই' জন্য কিছু উপঢৌকন দিলে, তাহারা গৃহে প্রবেশ করিতে দিল। বাঙ্গালা দেশে এই উপহারকে 'ননদথামী' কহে। পাত্রীর ননন্দাগণকে ঘুস দিয়া, কনেবৌকে স্বামীগৃহে প্রবেশ করিতে হয়। এই সময় দেবর আসিয়া নিজস্বত্বলোপ ভয়ে, বউ দিদিকে ক্ষুদ্র কুলের ডালের দ্বারা মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া থাকে, তখন নববধূ দেবরকেও কিছু মিষ্টান্ন উপহার দিয়া, এবং দেবর অল্পবয়স্ক হইলে, তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া আশ্বাস করিয়া থাকেন যে, তাহাকে মাতৃবৎ যত্ন ও প্রতিপালন করা হইবে। তাহার পর ঠাকুর ঘরে লইয়া গিয়া, নবদম্পতীকে ঠাকুর প্রণাম করান হইল। এবং বিবাহের পর অদ্য প্রথম স্নান করাইয়া পরস্পরের হাতের কঙ্কন খোলা হইল। বাঙ্গালা দেশে এই সময় বরকন্যা পরস্পরের হাতের সূতা খুলিয়া, মাঙ্গল্য দ্রব্য (গুলিভাঁড়) লইয়া, হরিদ্রারঞ্জিত চাউলের সহিত কড়ি খেলিয়া থাকে। ঐ কড়ি লুকোচুরি লইয়া, বরকন্যাও তাহাদের তামাসার সম্পর্কীয় রমণীগণ মধ্যে মহা হাস্য কৌতুক হইয়া থাকে। কিন্তু বিহার অঞ্চলে এই প্রথা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

তৎপর দিন 'বাসন ছয়াই' (পাকস্পর্শ বা বৌভাত) ক্রিয়া হইলেই বিবাহের আনুষঙ্গিক সমস্ত ক্রিয়া শেষ হইয়া গেল। ইহাতে কন্যাকে স্বহস্তে পাক করিয়া নিমন্ত্রিত আত্মীয় কুটুম্বকে আহার করাইতে হয়। নব পরিণীতা কন্যা অল্পবয়স্কা হইলে, বাঙ্গালা দেশের ন্যায়, অপরা রমণীগণ কর্তৃক পাক করা অন্নব্যঞ্জন স্পর্শ করিয়া দিয়াই নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। আমাদের কলাবতীও পাকস্পর্শ করিয়া দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছিল।

ভারতীয় অশেষ ভাষাবিদ্ পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার গ্রিয়ারসন সাহেব 'বিহারে কৃষীজীবন' নামক গ্রন্থে বিহারের ত্রিহূত প্রদেশের কয়েকটী বিশেষ বিবাহপ্রথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মাননীয় বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া, আমি তাহা হইতে কিছু অনুবাদ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব ঃ—

উত্তর পূর্ব্ব ত্রিহূতে কোন কোন জাতি মধ্যে বিশেষতঃ 'বিকৌয়া' ব্রাহ্মণদিগের বিবাহে কন্যা নিম্ন জাতীয়া হইলে, পাত্রীর পিতাকে কিছু 'পণ' দিতে হয়। তদ্রূপ পাত্রী উচ্চজাতীয়া হইলে পাত্রের পিতাকে পণ দিতে হয়।

ত্রিহুতের পূর্ব্বাংশে সোতী (শ্রোত্রী) ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কতকগুলি বিচিত্র প্রথা বহু শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহা দ্বারা বেশ স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, পূর্ব্বকালের অসবর্ণ বিবাহ আজিও ত্রিহুতে কোন কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের পাঁজী (বংশতালিকা) অতি সাবধানে পুরুষ পরম্পরাগত রাখা হইয়া থাকে। পাঁজীয়ার (পাঁজীকার) গণ বংশ পরম্পরা এই কার্য্য করিয়া আসিতেছে। অন্ততঃ বৎসরের মধ্যে একবার, মধুবনীর নিকটবর্ত্তী সৌরাষ্ট্র নামক স্থানে তাহাদের সম্মিলনী হইয়া থাকে। তথায় পাঁজীয়ারেরা একত্রিত হইয়া, তাহাদের দলস্থ ব্রাহ্মণের তালিকা লিখিয়া, মিলাইয়া লইয়া থাকে। সেই সময়ে তাহারা, বরকন্যার পিতা মাতাকে, বিবাহের এরূপ 'বিধান পত্রিকা' দিয়া থাকে, যাহাতে বরকন্যা সগোত্র বা সপিণ্ড না হয়। এই ব্যবস্থাপত্রকে 'অধিকার মালা' বা 'অস্বুজন পত্র' কহে। বিবাহ যে সর্ত্তে স্থিরীকৃত হয়, তাহাকে 'সিদ্ধান্ত' বলে।

আর একটি ক্রিয়াকে 'দসৌত' বলে। ইহাতে একজন 'নটৌয়া' (নর্ত্তক) নাচিতে নাচিতে বরের নিকট আসিয়া তাহাকে কাষ্ঠচূর্ণ ও গুড় মিশ্রিত লাড্ডু (মিঠাই) দেয়, তাহার পরিবর্ত্তে সে বরের নিকট হইতে কিছু বকশিশ পাইয়া থাকে। ইহার পর গৃহদেবতা পূজা করিতে বরকন্যা বাড়ীর ভিতরকার ঠাকুর ঘরে গমন করে। এ দিকে গৃহপ্রাঙ্গনে বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুন্দর সুন্দর দ্রব্যের দোকান সাজাইয়া বসে, পাত্রকে সেই দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হয়।

আর একটী ক্রিয়া আছে, তাহাকে 'ঘাসকাট্টী' বলে—ইহাতে পাত্রকে কন্যার পিতার জন্য ঘাস কাটিয়া 'groom' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হয়। ইহার পরিবর্ত্তে পাত্রীর পিতা পাত্রকে একটি ঘোড়া পুরস্কার দিয়া থাকে।

শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেব দরশন।

ভগ্নকণ্ঠে ভক্ত কহে—“এত দুখে আজ
দীনে নাহি হল দয়া? ওগো রাজরাজ!
দিয়েছি কালের গ্রাসে ছিল যে ক'জন
বন্ধুহীন পৃথ্বীমাঝে বলিতে আপন—
ভুলাইতে পরবাসে; যে অমূল্য নিধি
দিয়েছিলে দাসে, আজি বিদলিছে হৃদি
তাহারি কাঙ্গাল স্মৃতি। যে ক'খানি মুখ
হৃদিমাঝে জাগাইত অহরহ সুখ,—
দীন মর্ত্ত্যধামে কভু আনিত টানিয়া
তোমারি স্বর্গের ভাব—ল'য়েছে হরিয়া
কাল সবে তব আজ্ঞাবশে দেব! লহ
স্মৃতি, হে অনিন্দ্যজ্যোতি! ঘুচাও বিরহ,
লহ কোলে তাপদগ্ধ কিঙ্করে টানিয়া,
লহ তব বক্ষে আজি করুণা করিয়া।”
দেবতা কহিল—“অবোধ অজ্ঞান ওরে!
দুঃখমাঝে নাহি পাও মোরে? হেথা তোরে
মুগ্ধ ক'রে রেখেছিল কোন্ যাদুকর?—
গেহ তোর ক'রেছিল সঙ্গীত মুখর
কোন্ কণ্ঠ? চিন নাই আজিও তাহারে?
সে আমি;—প্রেয়সী হ'য়ে সেবেছি তোমারে,
পুত্ররূপে ভক্তি করিয়াছি;—ভাই হ'য়ে
ভালবাসা বিলায়েছি তোমার হৃদয়ে।
বিরহের তাপে আজি কোমল মধুর
চিত্তে ঢালি অবিশ্রান্ত প্রেম,—হে বিধুর!
বিষদিগ্ধ পৃথ্বীতলে প্রেম-প্রস্রবণ—
দিয়াছি তোমায় দেহ ধরিতে নয়ন।”

সচ্চরিত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যে বুধবারের গেজেটে খবর বাহির হইল সুরেন্দ্রনাথ সম্মানের সহিত বি,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার পরের বুধবারেই ভাগলপুর হইতে তাহার কাকার মৃত্যুসংবাদ আসিল।

সুরেন্দ্রনাথ বাল্যকালেই পিতৃহীন হয়। তাহাকে ও তাহার দুই দাদাকে এই কাকাই ভাগলপুরে রাখিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন;—সুতরাং কাকার মৃত্যুতে সুরেন্দ্র দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইল।

কাকা ভাগলপুরের একজন বড় উকীল ছিলেন। সুরেনের দাদারা ভাল করিয়া লেখা পড়া শেখে নাই—তাহাদের তিনি সামান্য চাকুরি জুটাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল আইন পাস করিয়া সুরেন ওকালতী করে;—সুরেনও নিজের জীবনের গতি ঐ পথেই আঁকিয়া রাখিয়াছিল। হঠাৎ দেখিল আইন পড়ার খরচ যোগাইবার আর কেহ নাই।

সুরেনের মাকে সকলে পরামর্শ দিলেন—"ছেলের বিয়ে দাও—শ্বশুর পড়ার খরচ যোগাবে।" কিন্তু সুরেন বলিল—"কৃতী না হয়ে বিয়ে করব না।"

আইন পড়িয়া উকীল হইবার মৎলবও সুরেন ছাড়িতে পারিল না। মাকে বলিল—"কল্‌কাতায় যাই,—ছেলে পড়িয়ে কিছু উপার্জ্জন করব, তাইতে আমার বাসা-খরচ চলে যাবে।"

[illegible] সুরেন্দ্র

...টাকা বেতনের একটি প্রাইভেট্ টিউসনও জুটিল ; আর দশটি ...লেই কোনও রকমে বাসা খরচের সংস্থানটা হইয়া যায়।

...ন্তু এই দশটি টাকা জুটিতে বড় বিলম্ব হইতে লাগিল। বাড়ী ... টাকা যাহা আনিয়াছিল, তাহা ফুরাইল, সুরেন্দ্র মহা চিন্তিত হইয়া উঠিল।

শ্রাবণ মাস, কয়েকদিন বৃষ্টি বন্ধ হইয়া অত্যন্ত গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর আহারান্তে সুরেন তাহার বাসার ছাদে উঠিয়া পদচারণা করিতে লাগিল,—আর ভাবিতে লাগিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘড়িতে ক্রমে নয়টা বাজিল, দশটা বাজিয়া গেল। ছাদের অন্যত্র বাসার অন্যান্য যুবকেরাও পদচারণা করিতেছে। কেহ সিগারেট খাইতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কেহ বা গুণ গুণ করিয়া থিয়েটারের গান গাহিতেছে।

হঠাৎ নিম্নে সুরেন্দ্র একটা কণ্ঠ শুনিতে পাইল—"সুরেন বাবু হ্যায় ?"

সরমন্ চাকর বাসন মাজিতেছিল, সে উত্তর দিল—"বাবু ছাদমে আছে, দেখা হোবে।" বঙ্গভাষায় আলাপ করা সরমনের উচ্চাভিলাষ ; কেহ তাহাকে হিন্দীতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেও সে বাঙ্গালাতেই উত্তর দিত।

আগন্তুক তখন খট্ খট্ করিয়া সিঁড়ি উঠিতে লাগিল। সুরেন্দ্র উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষায় রহিল।

"কেও—রজনী দাদা যে!"

"সুরেন, ভাল আছিস্ ?"

রজনী দাদা সুরেনেরই গ্রামের লোক। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বৎসর। মার্চ্চেণ্ট আপিসে চাকরি করেন। অনেক টাকা উপার্জ্জন। হ্যারিসন্ রোড্ হইতে বিদ্যুতের আলোক আসিতেছিল,—সে

করিতেছে—তদুপরি পম্প্‌শু। গায়ে রেশমী পঞ্জাবীর উপর দেওয়া কোঁচান চাদর। চুল হইতে সেণ্টের ও মুখ হইতে • আসিতেছে।

"সুরেন ভাল আছিস্?"

"ভাল আছি। হঠাৎ যে রজনী দাদা? খবর কি?"

রজনী বলিল—"একটা কথা আছে। এখানে বলব? তো ঘরে চল্ না।"

সুরেন স্বর নামাইয়া বলিল—"ঘরেও ত লোক আছে।"

রজনী বলিল—"তবে আয়,—আমার সঙ্গে আয়। পথে বলব। নে চট্ করে জামা পরে একটা চাদর নে।"

এই বলিয়া রজনী চুরুট বাহির করিয়া দেশলাই জ্বালিল। সুরেন নামিয়া গেল।

পাঁচ মিনিট পরে দুইজনে রাস্তায় নামিল। দরজার কাছে একখানা ঠিকা গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, উঠিয়া রজনী বলিল—"আয়।"

সুরেন উৎসুক হইয়া বলিল—"কোথা নিয়ে যাচ্চ আমায়? কি বলবে এইখানেই বল না।"

গ্রামে রজনীর সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে বিশেষ সুখ্যাতি নাই। সুরেনের মা তাহাকে কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে বারম্বার করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যেন "রোজোটার" সঙ্গে মিশিয়া বিগ্‌ড়াইয়া না যায়। সেই কথা সুরেনের মনে পড়িতে লাগিল।

রজনী বলিল—"আমি যাচ্চি থিয়েটারে। এখানে দাঁড়িয়ে বল্লে আমার দেরী হয়ে যাবে। পথে বলব। এইটুকু আর হেঁটে আস্‌তে পার্‌বিনে? ভারি লবাব হয়েছিস্ যে দেখছি। আয় আয়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গাড়ী চলিলে সুরেন জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার খানা কি ?"

"তোর জন্যে একটা প্রাইভেট্ টিউশন্ ঠিক করেছি।"

সুরেন খুসী হইয়া বলিল—"কোথায় ? কত ?"

"সুকীয়া ষ্ট্রীটে। পঁচিশ টাকা।"

সুরেন শুনিয়া মহা খুসী। বলিল—"পঁচিশ টাকা! বল কি রজনী দাদা! কখন ?"

"বিকেলে দু'ঘণ্টা।"

"কি পড়াতে হবে ?"

"এক ঘণ্টা বাঙ্গালা, এক ঘণ্টা ইংরিজি।"

হঠাৎ সুরেনের মনে হইল, যখন অত বেশী টাকা, তখন বোধ হয় একাধিক ছাত্র ; সুতরাং জিজ্ঞাসা করিল—"কটি ছেলে ?"

রজনী বলিল—"একটিও না।" বলিয়া জোরে জোরে চুরুট টানিতে লাগিল।

সুরেন বলিল—"একটিও না! তার মানে কি ?"

"ছেলে একটিও না। মেয়ে একটি।"

"মেয়ে ? কত বড় মেয়ে ?"

রজনী হাসিয়া বলিল—"তোর সে খোঁজে কাজ কি! তুই যাবি,—পড়াবি। বয়স যতই হোক না।"

সুরেন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

রজনী তখন উদার ভাবে বলিল—"বয়স পনেরো বছর।"

সুরেন বয়স শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ব্রাহ্ম ?"

"না।"

"ক্রিশ্চান ?"

"তবে কি ? হিন্দু নাকি ?"

"তাই।"

"হিন্দু! অত বড় মেয়ে, পড়বে ? কার মেয়ে, বাপের নাম কি ;-

রজনী হাসিয়া বলিল—"খোদা জানে। মার নাম জিজ্ঞাসা করি ত বল্‌তে পারি।"

সুরেন উত্তরোত্তর অধিক আশ্চয্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি ?"

"মার নাম আমোদিনী। বেঙ্গলের আমোদিনী। নাম শুনেছিস্ ?"

কিন্তু এ সংবাদে সুরেনের সমস্ত উৎসাহ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"শুনেছি।"

রজনী বলিল—"কি বলিস্ ?"

সুরেন্দ্র দৃঢ়ভাবে বলিল—"আমার দ্বারা হবে না।"

রজনী জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ?"

সুরেন্দ্র উত্তেজিতভাবে বলিল—"বেশ্যার মেয়েকে পড়াব, কখন নয়।"

রজনী বলিল—"অতি গর্দ্দভ তুই! কেন ? আপত্তিটা কি শুনি ?"

সুরেন বলিল—"আপত্তি অনেক।"

"কি ? এ উপার্জ্জন অনেষ্ট্ নয় ?"

"অনেষ্ট্ হবে না কেন!"

"তবে ? নিজে পাছে প্রলোভনে পড়ে যাস্ ?"

সুরেন গর্ব্বিতভাবে বলিল—"সে ভয় করিনে।"

"তবে ? তবে কি আপত্তি বল্।"

"বেশ্যার মেয়েকে পড়াব! লোকে শুনলে বলবে কি!"

রজনী একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিল। বলিল—"অতি গর্দ্দভ তুই

ে চুপ করিয়া রহিল। রজনী বলিল—"শোন্। ও আপত্তি ও কাজের নয়। আর, লোকের জানবার দরকারই বা কি? তে যাচ্চিস্ না পড়াতে যাচ্চিস্। কাকে পড়াতে যাচ্চিস্, কোথায় পড়াতে যাচ্চিস্ এত খবর তোর লোকের কাছে দেবার দরকার কি! তবে হ্যাঁ, যদি বুঝিস্ নিজের মনে যথেষ্ট বল্ নেই—চরিত্র রাখতে পারবিনে—তাহলে অবিশ্যি নেওয়া উচিত নয়। সেইটে বেশ করে বুঝে দেখ্ নিজের মনে।"

নিজের চরিত্রের বলের প্রতি সুরেন্দ্রের অগাধ বিশ্বাস ছিল। এ কথায় তাহার আত্মাভিমান আঘাত প্রাপ্ত হইল। সগর্ব্বে বলিল—"সে জন্যে ভেব না।"

রজনী বলিল—"তবে নে। টাকা নিয়ে কথা রে ভাই! যে টাকা দেবে তার কাজ করব। অমনি ত আর টাকা নিচ্চিনে।"

সুরেন ভাবিয়া বলিল—"বাড়ীর লোকে যদি শোনে ত কি বলবে?"

রজনী বলিল—"অতি গৰ্দ্দভ তুই! বাড়ীর লোকে জানবে কি করে! এ কলকাতা সহর সমুদ্দুর! কে কার খবর রাখে—তুইও যেমন!"

গাড়ী এই সময়ে থিয়েটারে পৌছিল। রজনী বলিল—"তা হলে, কি বলিস্? আজ আমোদিনীর সঙ্গে দেখা হবে আমার,—কি বলব?"

সুরেন একবার মনে করিল বলি—"না।" আবার ভাবিল,—"এত তাড়াতাড়ি কি,—না হয় দু'দিন পরেই বল্‌ব।" বলিল—"রজনীদা, ভেবে তোমায় দুই এক দিন পরে বল্‌ব।"—বলিয়া বিদায় চাহিল।

রজনী বলিল—"আচ্ছা, তা যে রকম হয় আমায় লিখিস্; কিন্তু ঐ

কতকগুলি
মনে এক চুল এদিক্ ওদিক্ হবে না,—তবেই নিস্। আমরা ইহা গিয়েইছি। তোরা এখন ছেলে মানুষ আছিস্,—গোড়া থেকে স্জিও হওয়া ভাল।" বলিয়া রজনী থিয়েটারে প্রবেশ করিল,—ধীরপদে ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রি সুরেনের ভাল নিদ্রা হইল না,—অনেক ভাবিল। পরদিনও সারাদিন ভাবিল। তাহার মনে হইতে লাগিল যদি কাযটা অস্বীকার করি তবে রজনী দাদা ভাবিবে, নিজের চরিত্রবলের প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাস নাই বলিয়াই অগ্রসর হইল না। এই ভাবের সহিত,—অর্থকৃচ্ছ্রতাও মনে প্রবলরূপে আধিপত্য করিতে লাগিল। পঁচিশ টাকা। দশ টাকা আর পঁচিশ টাকা পঁয়ত্রিশ টাকা। যদি মাসে কুড়ি টাকা করিয়া খরচ করি, তাহা হইলে পনেরো টাকা করিয়া জমিবে। তিন বৎসর যদি মাসে পনেরো টাকা করিয়া জমে, তাহা হইলে পাঁচশত টাকারও উপর হাতে হইবে; ওকালতী পাস করিলে, তাহা লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারিব।

আবার ভাবিল, তিন বৎসর ধরিয়া যদি আমি ঐ বেশ্যার মেয়েটাকে পড়াই, তাহা হইলে কি জানাজানি হইতে বাকী থাকিবে! ছি ছি ছি—সে বড় কেলেঙ্কারি হইবে।

অবশেষে স্থির করিল এক কায করা যাউক্। এখন কাযটা লই। এ দিকে অন্য প্রাইভেট্ টিউসন জুটাইবার জন্য চেষ্টাও করিতে থাকি। আর একটা সুবিধামত জুটিলেই ওটা ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। রজনী দাদা যাহা বলিয়াছে ঠিকই বটে,—পরিশ্রম করিব, টাকা লইব,—কিরূপ লোকের টাকা অত আমার হিসাব করিবার দরকার কি!

কমিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহারও ঔষধ রজনী দিয়া

'কলকাতা সহর সমুদ্দুর,—কে কার খবর রাখে!'

ভাবিয়া চিন্তিয়া রজনী দাদাকে চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠি শেষ করিয়া, খামে ভরিয়া সতর্ক সুরেন্দ্রনাথ ভাবিল,—কাগজে কলমে এর সাক্ষী সাবুদ রাখি কেন! যাই, মুখেই গিয়া রজনী দাদাকে বলিয়া আসি।

চিঠি ছিঁড়িয়া, আগুন জ্বালিয়া পুড়াইয়া ফেলিল। বাহির হইয়া বউবাজারে রজনী দাদার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে রজনী পাশা খেলিতেছে ও মদ খাইতেছে।

সুরেন খানিক বসিয়া খেলা দেখিল। একটা বাজি শেষ হইলে রজনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কিরে, খবর কি?"

সুরেন বলিল—"খবর ভাল। একটা কথা বলতে এসেছিলাম।"

রজনী বলিল—"ওঃ, আচ্ছা দাঁড়া।" বলিয়া তাহার গেলাসের মদটুকু নিঃশেষ করিয়া বলিল—"আয়।"

দুই জনে একাকী হইলে রজনী বলিল—"কি ঠিক করলি?"

সুরেন বলিল—"নেওয়াই ঠিক করলাম।"

রজনী বলিল—"তা বেশ; কিন্তু খুব সাবধান রে ভাই! ধরি মাছ না ছুঁই পানি, বুঝেছিস্ ত! তোকে জানি ছেলে বেলা থেকে তুই অতি সৎ ছোক্‌রা, তাই সাহস করে তোকে এ কাযে যেতে দিচ্চি। আমি আমোদিনীকে গর্ব্ব করে বলেছি, যে তুই অতি সৎচরিত্র, কোনও রকম কিছু খেলাপ হবে না।"

সুরেন বলিল—"কেন রজনী দাদা—সচ্চরিত্রতা নিয়ে এত মারামারি কেন এ সব লোকের?"

রজনী বলিল—"আঃ—এইটুকু বুঝতে পার্‌লিনে, বি, এ, পাস করেছিস্! অতি গর্দ্দভ তুই। কেন, বলি শোন্। আমোদিনী একজন

হয়। সেই জন্যে ভাল রকম লেখা পড়া শেখাচ্চে। ওরা ও ইহা মেয়ে পড়াবার জন্যে বুড়োগোছ পণ্ডিত টণ্ডিত রাখত; কিন্তু ও হলে হবে কি,—বুড়োদের প্রাণে আবার বেশী সখ্। পড়ায় ব. খালি ইয়ার্কি দেয়। কেউ কেউ মেয়ে নিয়ে চম্পটও দিয়েছে। তা ওরা এখন ভাল লোক চায়। কলেজের সচ্চরিত্র দেখে লোক রাখ কোনও ভয় থাকবে না—এই জন্যে আর কি,—বুঝেছিস্ ?"

সুরেন বলিল—"ওঃ—তা বটে।" ভাবিতে তাহার মনে বেশ এক গর্ব্ব হইতে লাগিল যে, সে একজন কলেজের ভাল সচ্চরিত্র শ্রেণী লোক,—নিজে যাহারা পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন, তাহারাও এই বিশুদ্ধত মূল্য বুঝে।

রজনী বলিল—"তবে ঠিকানা দিচ্চি। কাল কি পরশু একা যাস্,—গিয়ে সব ঠিক ঠাক করে নিস্।"

সুরেন বলিল—'না রজনী দাদা, আমি একলা যেতে পারব না।"

"কেন? সুকিয়া ষ্ট্রীট্ চিনিস্ নে?"

"তা চিনি, কিন্তু একলা আমি যেতে পারব না রজনী দাদা।"

"অতি গর্দ্দভ তুই! আচ্ছা আসিস্ কাল বিকেলে, নিয়ে যাব এ সঙ্গে করে।"

পরদিন রজনী সুরেনকে লইয়া গিয়া সমস্ত ঠিক ঠাক করিয়া দিল

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুরেনের ছাত্রীর নাম নলিনী। পড়ে মেঘনাদবধ, সীতার বন আর রয়্যাল্ রীডার নম্বর থ্রি। মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী। আর এ শান্ত ও শিষ্ট—যেন গৃহস্থঘরের মেয়ে। ইংরাজী কি পড়ে জিজ্ঞ করায় প্রথমে নলিনী বলিয়াছিল "রয়্যাল রীডার নম্বর থার্ড

গিয়ে নীতভাবে "নম্বর থ্রি" বলিয়া নিজেকে বালিকা সংশোধন এবং।

শনিবার অবধি নিয়মিতভাবে সুরেন তাহাকে পড়াইল। তাহার মা আসিয়া মাঝে মাঝে পড়া শুনিয়া যাইত।

রবিবারে ছুটি—রবিবারে আর পড়াইতে যাইতে হইবে না। সুরেন মনে মনে বলিল—"আঃ বাঁচা গেল, আজ আর বেরুতে হবে না।" যতটা খুসী হইবার কথা, মন কিন্তু ততটা খুসী হইতে রাজি হইল না। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি মেয়েটি পরমা সুন্দরী।

পরের সপ্তাহে,—পাঠের মাঝে মাঝে সুরেন একটু আধটু গল্প করিল। ভাগলপুরের গল্প, আরও নানাদেশের গল্প, নানা বিষয়ের গল্প। গল্পের আধিক্যবশতঃ এক একদিন পড়ার কামাই হইয়া যাইত; সে অপব্যয়টুকু পূরাইয়া দিবার জন্য সেদিন সুরেন দুই ঘণ্টার একটু অতিরিক্তও থাকিত।

দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে যে রবিবার আসিল, সেটা নিতান্তই নীরস মনে হইতে লাগিল। সেদিন নলিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে করিল—আহা! এ মেয়েটির অদৃষ্টে কি আছে? এখনও অনাঘ্রাত কুসুমের মত নির্ম্মল, বিধাতার স্বহস্তনির্ম্মিত একটি শুভ্র আত্মা। এও কি পাপে পঙ্কিল হইবে—ইহা ধ্রুব বিধান? ইহার বিশুদ্ধতা রক্ষার কোন উপায় নাই?

সে রাত্রে সুরেন স্বপ্ন দেখিল যেন নদীর ধারে একটা শালবন, সেই শালবনে যেন নলিনীর সঙ্গে বেড়াইতেছে।

পরদিন পড়াইতে পড়াইতে স্বপ্নের গল্পটা নলিনীকে সুরেন বলিল।

নলিনী বলিল—"কি করে স্বপ্ন দেখে বলুন দেখি?"

সুরেন বলিল—"এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেউ কেউ

আবার—কারো কারো মতে আমাদের আত্মা আছে ইহা ও একজনকার আত্মা যদি আর একজনকার আত্মার কাছে যায়, তবে দুইজনেই স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ঘুম ভাঙলে শুধু একজনকার মনে থা. একজন ভুলে যায়।"

এ থিওরিটা সুরেনের মস্তিস্কে তৎক্ষণাৎ উদ্ভূত হইল।

নলিনী বলিল—"বাঃ বেশত!"

মাষ্টার বাবু আসিলে ঝি রোজ টেবিলের উপর কয়েক খিলি পা রাখিয়া যাইত। একদিন সুরেন বলিল—"আজকের পাণটা খুব ভাল হয়েছে, অন্য দিনের চেয়ে।"

নলিনী বলিল—"ভাল হয়েছে আজ?—আমি সেজেছি আজ মাষ্টার মশায়!"

সুরেন বলিল—"বটে! তুমি এমন পাণ সাজতে পার? আমাদে বাসায় যে পাণ সাজে, রাম রাম।"

পরদিন পাঠান্তে বিদায় লইবার সময় নলিনী সুরেনকে বলিল- "আপনাদের বাসায় পাণ ভাল হয় না বলেছিলেন, গোটাকতক পা তৈরি করেছি নিয়ে যাবেন?"

সুরেন পাণ লইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল,—"ভারি লক্ষ্মী তুমি।"

নলিনীকে তাঁহার মাতা একটু স্বতন্ত্র রকমে পালন করিয়াছিল তথাপি সুরেনের কাছে নলিনী যে জগতের সংবাদ পাইত, সে জগৎ নলিনীর কাছে সম্পূর্ণ নূতন; তাহার জগৎ, যে জগৎ আবাল্য তাহাকে ঘিরিয়া আছে, সে জগতে এ জগতে কত প্রভেদ। সুরেন তাহার মা গল্প, কাকীমার গল্প, কাকার মেয়েদের বিবাহের গল্প যখন করিত, একটা কি অনির্দ্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষায় নলিনীর হৃদয় ভরিয়া উঠিত। সুরেনের জগতের সংবাদ নলিনীর কাছে পিপাসার শীতল জলের মত লাগিত

[illegible]ীর কণ্ঠস্বরের মধুরতায়, যৌবনের নবীনতায়, ও অন্তরের [illegible]গি[illegible] [illegible]য় সুরেনও যেন একটা নূতন জগৎ আবিষ্কার করিল। কিছু দিনে এবং [illegible]ঙ্গের মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল; কিন্তু কোনও প্রতিকার [illegible]ষ্টা করিল না। বুঝিল মন তাহার বশের অতীত হইয়া গিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে সুরেনের মনের অবস্থা এমন হইল যে নলিনীকে তাহার মন্দসংসর্গ হইতে উদ্ধার করাই তাহার একমাত্র পুরুষার্থ স্থির করিল। ইহাতেই তাহার মানব জন্মের সফলতা জ্ঞান করিল। প্রেমের নির্দ্দেশে কর্ত্তব্যের পথ অতি সরল বোধ হইল। নলিনীর কাছে মনোভাব ব্যক্ত করিতেও বিলম্ব হইল না। তাহাকে শ্রদ্ধায়, আশায়, ও সুখে পুলক-কম্পিত ও উচ্ছ্বসিত করিয়া বলিল—“আমি তোমার স্বামী, তোমায় না পেলে আমি সুখী হব না; আমায় না পেলে তুমিও সুখী হবে না। তোমাকে আমার ধর্ম্মপত্নী করব, লোকের কথার জন্য ভয় করব না। পৃথিবী কি যথেষ্ট বৃহৎ নয়? আমরা এমন কোথাও যাব যেখানে লোকগঞ্জনা আমাদের অনুসরণ করবে না। কি খাব? পরিশ্রম করব;—দুজনে পরিশ্রম করব। দুবেলা না জুটে, এক বেলা খেয়ে থাকব। তাতেও আমরা সুখে থাকব।—”

অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। ঝি আলো আনিল। সুরেনের সম্মুখে নলিনীর অনুবাদের খাতা ছিল, তাহা সংশোধনের জন্য দক্ষিণ হস্তে কলম ধরিয়াছিল। কিন্তু তাহার বাম হস্ত নলিনীর হস্তে সংযুক্ত ছিল। যখন ঝির পদধ্বনি শুনা গেল, তখন দুই জনেই ত্রস্ত হইয়া হাত সরাইয়া লইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ইহার পর চারিটি সপ্তাহ সুরেন ও নলিনী পরস্পরের নেশায় ভরপুর

সোমবার বৈকালে পড়াইতে গিয়া সুরেন শুনিল নলিনী ইহাও সে তাহার মাসীর বাড়ী গিয়াছে। আমোদিনী আসিয়া বলিল নলিনী এখন মাস কতক সেখানে থাকিবে, কলিকাতার জলবায়ু তাহার সহ্য হইতেছিল না। আবার যখন আসিবে, যদি প্রয়োজন হয়, তবে আবার আমোদিনী, সুরেন্দ্রকে সংবাদ পাঠাইবে। এই বলিয়া সুরেনের প্রাপ্য আমোদিনী চুকাইয়া দিল।

সুরেন চলিয়া গেল, কিন্তু বাসায় গেল না। গড়ের মাঠে গিয়া একটী নিভৃত স্থান খুঁজিয়া, ঘাসের উপর বসিয়া রহিল।

ভাবিতে লাগিল—এ কি হইল! বিনা মেঘে বজ্রাঘাত কেন! শনিবারে যখন নলিনীর কাছে বিদায় লইয়াছে, তখন নলিনী কিছুই জানিত না, জানিলে অবশ্যই সুরেনকে বলিত। সহসা এ কি হইল!

গিয়াছে, তাহাও দুই চারি দিনের জন্য নয়। কয়মাস থাকিবে তাহার অবধি স্থিরতা নাই। কলিকাতার জলবায়ু সহ্য হইতেছিল না! —বাজে কথা। আজ দুই মাস প্রতিদিন তাহাকে দেখিতেছি, একদিনও ত সেরূপ মনে হয় নাই।

অন্ধকার হইল; আকাশে নক্ষত্র, অদূরে গ্যাস্ জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি হইল।

নলিনী একদিন তাহাকে বলিয়াছিল, তাহার সম্মুখে অনেক বিপদ। সুরেনের এখন মনে হইতে লাগিল, সেই কথার সঙ্গে এ ঘটনার কোথাও সংযোগ আছে। হয়ত তাহার মাতা তাহার উপর কোনও জুলুম করিতেছে। নলিনী এখন কি অবস্থায় কোথায় আছে মনে করিতে সুরেনের চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

গি ড়িতে লাগিল। কত স্বপ্ন দেখা—সেই স্বপ্নের জাগ্রত অনুকরণ, ম নাভিমান মনে পড়িতে লাগিল। যত মনে পড়ে, তত যেন বুক য়া যায়।

আর দেখা হইবে না।

ক্রমে ঘাসের উপর সুরেন শয়ন করিল। রাত্রি দশটা অবধি বালকের মত কাঁদিল। দশটা বাজিলে উঠিয়া ধীরে ধীরে বাসায় আসিল।

সপ্তাহ কাটিল; সপ্তাহ পরে শোক অনেকটা লাঘব হইল। তখন মনে হইল—"উঃ, খুব বাঁচিয়া গিয়াছি।"

"কোথায় ভাসিয়া যাইতেছিলাম!"

"কি সর্ব্বনাশটাই হইতে বসিয়াছিল!"

"কি মোহেই পড়িয়াছিলাম। ভগবান এ জাল কাটিয়া দিলেন—এ পরম সৌভাগ্য। নিজে কাটিতে পারিতাম না।"

"কোথায় গিয়া দাঁড়াইতাম কে জানে! যদি শুনিতাম তাহার মাতা তাহার প্রতি অত্যাচার করিতেছে, তাহা হইলে হয়ত তাহাকে লইয়া সত্যই কোথাও চলিয়া যাইতাম। তাহা হইলে জন্মের মত যাইতাম আর কি! এ জীবনে সে ভাঙ্গা আর যোড়া লাগিত না।"

দুই সপ্তাহ পরে সুরেন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল।

পূজার ছুটির আর দুই সপ্তাহ বাকী। বৈকাল বেলা সুরেন বাসার ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে বঙ্কিম বাবুর "ধর্ম্মতত্ত্ব" পড়িতেছিল, ঝি আসিয়া তাহার হাতে এক খানি চিঠি দিল। শিরোনামা দেখিয়া সুরেনের বুক কাঁপিয়া উঠিল,—নলিনীর হস্তাক্ষর!

চিঠি খুলিল। তাহা এইরূপ।

"৪৪।১ নং নীলমণি বসুর ষ্ট্রী,
ভবানীপুর।

প্রিয়তম!

আজ একমাস তোমায় দেখি নাই, কিন্তু বাঁচিয়া আছি। বড় কষ্টে আছি। বেশী লিখিবার সময় নাই। এখানে আমি অত্যন্ত কড়া পাহারায় আছি। যে বৃদ্ধা আমার রক্ষয়িত্রী তাহার কন্যা আসিয়াছে। আমি তাহার সহিত ভাব করিয়া তাহারই সাহায্যে এ পত্র ডাকে দিবার আয়োজন করিয়াছি।

যেদিন তোমার সঙ্গে শেষ দেখা, সেদিন সন্ধ্যাবেলা মা আমার প্রতি ভারি অত্যাচার করে। আমি অনেক কাঁদি। মা আসিয়া তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে,—আমি স্বীকার করি যে আমি তোমায় ভালবাসি। মা বলিল—তুমি ভিক্ষুক, নিজে খাইতে পাওনা ইত্যাদি। আরও বলিল, আমি আর তোমায় দেখিতে পাইব না, তোমায় ভুলিতে হইবে। পরদিন প্রাতে আমায় এইখানে আনিয়া রাখিয়া গেল।

আমি এ একমাস অনেক ভাবিয়াছি। তোমার সঙ্গে যে আমার চিরবিচ্ছেদ হইল এ কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে স্থান পায় নাই। একদিন আমাদের মিলন হইবে এ আশা এক মুহূর্ত্তের তরে আমি ত্যাগ করিতে পারি নাই।

আমাদের মিলন হইলে তোমার অবস্থা কি হইবে তাহাও আমি ভাবিয়াছি। লোকে তোমায় কি বলিবে তাহা মনে করিতে আমার বুক ফাটিয়া যায়। আমার একার সুখের জন্য হইলে আমি তোমার জীবনের পথ হইতে সরিয়া যাইতাম. কিন্তু কে [illegible] সাথী আমার

লাগিয়াছি। তোমার সুখের ও আমার সুখের জন্য আমাদের মিলনই এখন আকাঙ্ক্ষা করি।

আমার এ পত্রের উত্তর তুমি ডাকে দিও না। কাল সন্ধ্যাবেলা চিঠি হাতে করিয়া আসিও। ভবানীপুরে যে পদ্মপুকুর আছে তাহার উত্তর পশ্চিম কোণে দাঁড়াইয়া থাকিও। একজন স্ত্রীলোক তোমার নাম করিয়া ডাকিবে, তাহার হাতে পত্র দিও, তাহা হইলে আমি পাইব।

তোমারই নলিনী।

ঠিক সাতটার সময় আসিও।"

পত্র পড়িয়া সুরেন নীচে নামিয়া গেল। ঝিকে ডাকিয়া দুই আনার জলখাবার আনিতে দিল। নিজের জিনিষ পত্র গুছাইতে আরম্ভ করিল। বাসার লোককে বলিল—"বাড়ী হতে এই মাত্র চিঠি পেলাম, মার ভারি ব্যারাম, এখনি আমায় রওনা হতে হবে।"

জলখাবার আসিলে চাকরকে বলিল—"সরমন্ একখানা গাড়ী ডাক জল্‌দি।" গাড়ী আসিলে, জিনিষ পত্র লইয়া হাওড়ায় গেল। রাত্রি এগারোটার সময় বাড়ী পৌঁছিল।

মাকে বলিল—"কলকাতায় ভারি কলেরা হচ্ছিল তাই পালিয়ে এলাম।"

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা।

অবিমিশ্র সন্তোষের সহিত না হউক, কিয়ৎ পরিমাণ সহিত ইংরাজেরা ভারতবর্ষে তাঁহাদের শাসনফল পর্য্যালোচনা করিবার অধিকারী। লোকসমাজে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক,—শান্তি—তাহা তাঁহারা ভারতে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা এমন একটি শাসনতন্ত্র গঠন করিয়া তুলিয়াছেন, যাহাতে সংস্কারের আব শ্যকতা থাকিলেও, তাহা দৃঢ় ও কার্য্যকর। তাঁহারা উত্তম আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। দেশময় বিচারালয় সংস্থাপন করিয়াছেন—যাহাঃ দেশীয় ও বিদেশীয় বিচারকর্ত্তাগণ নিরপেক্ষিতায় ও সাধুতায় কোনও দেশের তুলনায় ন্যূন নহেন। এই ফলসমন্বয় প্রত্যেক সমালোচকেরই প্রশংসার যোগ্য।

অপর পক্ষে, কোনও নিরপেক্ষ ইংরাজই, ভারতবাসীর অর্থগত অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে, সে সন্তোষটুকু লাভ করিতে পারেন না বর্ত্তমান সময়ে ভারতের দারিদ্র্যের তুলনা পৃথিবীর আর কোনও দেশে নাই। বিগত শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসরে যে সকল দুর্ভিক্ষ ভারতবে আক্রমণ করিয়াছে তাহার বিস্তার ও তীব্রতার তুলনাও ইতিহাসে নাই।

অর্থনীতিবিদ্ কোনও দেশের আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান করিতে হইলে সচরাচর কি কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন? জিজ্ঞাসা করেন,—কৃষিকার্য্য কি উন্নতিলাভ করিতেছে? শিল্পাদির অবস্থা কিরূপ? শাসনকর্ত্তাগণ দেশের ধনবৃদ্ধির পথ বিস্তৃত করিতেছেন ত রাজকোষের আয়ব্যয়প্রণালী কি প্রকার—প্রজাগণ যে পরিমাণ রাজকর দেয়, তাহার অনুরূপ উপকার প্রাপ্ত হয় কি?—ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক

...গিতে বলবতী,—ভারতেও তাহাই। অন্যান্য দেশে যে সকল কারণে ধনবৃদ্ধি হয়, ভারতেও সেই সকল কারণ বর্ত্তমান থাকিলে ধনবৃদ্ধি হইবে, যে সকল কারণ অন্যদেশে দারিদ্র্য আনয়ন করে, সেই সকল কারণ ভারতবাসীকেও দরিদ্র করিয়া তুলিবে।

ব্রিটিশ শাসনকালে যে ভারতবাসীর ধনাগমের পথ নানাপ্রকারে সঙ্কীর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা কোনও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ভারতীয় রাজ-কর্ম্মচারীই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারত-বর্ষ শুধু একটি সুবৃহৎ শস্যপ্রসূ ভূমি ছিল না,—ভারতীয় শিল্পজাত এসিয়া ও ইউরোপখণ্ডের নগরে নগরে বিক্রয় হইত। ইংরাজের স্বার্থান্ধতায় ক্রমে ক্রমে আমাদের সে শিল্প কেমন করিয়া নাশপ্রাপ্ত হইল, তাহা আমরা "ভারতী"তে প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি। তাহার পর, আমরা যখন ইউরোপের অনুকরণে বস্ত্রাদি বয়নের বাষ্পযন্ত্র সংস্থাপন করিলাম,—তখন ইংলণ্ডীয় তন্তুবায়গণ মহা ভীত হইয়া উঠিল। ১৮৯৮ সালে তাহাদের প্ররোচনায় গভর্ণমেণ্ট আমাদের স্বনির্ম্মিত তুলা-জাতের উপর কর বসাইয়া দিলেন। জাপান ও চীনের সঙ্গে আর আমরা প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

কৃষিই এখন ভারতবাসীর একমাত্র ধনাগমের পথ। শতকরা ৮৫ জন লোক এখন স্বতঃ বা পরতঃ কৃষির উপর নির্ভর করে। অথচ ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশেই ভূমিকর শুধু যে অত্যধিক তাহা নহে, আবার অনিশ্চিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ভূমিকর এক পাউণ্ডে এক সিলিং হইতে চারি সিলিং পর্য্যন্ত ছিল,—অর্থাৎ জমিদারের প্রাপ্য খাজানার উপর শতকরা ৫৲ হইতে ২০৲ অবধি ছিল। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে এই কর স্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন হইয়াছে। কিন্তু ১৭৯৩ হইতে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বঙ্গদেশে জমিদারের প্রাপ্য খাজনার উপর শতকরা ৯০৲

কর ধার্য্য বিষয়ে ব্রিটিশরাজ যে মুসলমান বাদশাহগণের অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহা সত্য বটে, কিন্তু বিভিন্নতা এই যে মুসলমান রাজ যাহা চাহিতেন তাহা সম্পূর্ণ আদায় করিতেন না, কিন্তু ব্রিটিশ রাজ যাহা চাহিলেন তাহা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইলেন। বঙ্গের শেষ মুসলমান রাজা তাঁহার রাজত্বের শেষ বৎসরে (১৭৬৪ খৃঃ) ভূমিকর স্বরূপ ৮১,৭৫,৫৩৩৲ টাকা আদায় করিয়াছিলেন;—সে সময় হইতে ত্রিশ বৎসরে ইংরাজরাজ বঙ্গের বার্ষিক ভূমিকর ২,৬৮,০০,০০০৲ টাকা করিয়া তুলিয়াছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব এলাহাবাদ ও অন্য কতিপয় জেলা ইংরাজকে হস্তান্তরিত করেন। এই সকল জেলার মুসলমান নবাব বার্ষিক ১,৩৫,২৩,৪৭০৲ টাকা দাবী করিতেন। তিন বৎসরের মধ্যে ইংরাজ সেই জেলাগুলি হইতে বার্ষিক ১,৬৮,২৩,০৬০৲ টাকা আদায় করিলেন। এই দাবী ও আদায়গত পার্থক্য ছাড়া আরও একটী বিশেষ পার্থক্য ইংরাজ ও মুসলমান রাজ্যের মধ্যে রহিয়াছে মুসলমান যাহা আদায় করিতেন তাহা ভারতবর্ষেই ব্যয় করিতেন—দেশের লোকের হস্তে আবার ফিরিয়া যাইত; ইংরাজ যাহা আদায় করেন, তাহার একটি বৃহৎ অংশ ইংলণ্ডে আসিয়া ব্যয়িত হয়। কালিদাস বলিয়াছেন—

প্রজানামেবভূত্যর্থং সতাভ্যোবলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুং আদত্তে হি রসং রবিঃ।

সকল জাতিই আশা করে যে দেশ হইতে সংগৃহীত কর দেশে ব্যয়িত হইবে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সিংহাসনে সর্ব্বাপেক্ষা উৎপীড়নকারী রাজার সময়েও ভারতবাসী যাহা দিত তাহা ফিরিয়া পাইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন তখন হইতেই পরি

াগিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায় বন্ধ হইল, এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু তাঁহাদের অবলম্বিত "পলিসি" অক্ষুণ্ণ রহিল। ভারত গভর্ণমেণ্ট ঋণ গ্রহণ করিয়া ইংরাজ ব্যবসায়ীদের মূলধন ফিরাইয়া দিলেন। সেই ভারতের জাতীয় ঋণের সূত্রপাত। ব্রিটিশরাজ বণিকগণের নিকট হইতে ভারতরাজ্য ক্রয় করিলেন,—কিন্তু মূল্য কে দিল? ভারতবাসী দিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সে ঋণের পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি টাকা। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাহা প্রায় দ্বিগুণিত হইল। তাহার পর ৪০ বৎসর ধরিয়া অবিরাম শান্তি, অথচ ঋণের পরিমাণ বর্ত্তমান সময়ে ৩০০ কোটি টাকা। হোমচার্জ্জ যাহা বৎসর বৎসর ভারত গভর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন, তাহার পরিমাণ ২৪ কোটি টাকা। উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণের বেতন—উচ্চ রাজকর্ম্ম বলিতে গেলে সবই ইংরাজগণ কর্তৃক অধিকৃত—তাহারও পরিমাণ দশ কিম্বা বার কোটি টাকা। ভারতের বার্ষিক রাজস্ব (Net Revenue) ৬৫ কোটি টাকা—তাহার অর্দ্ধাংশ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। ভারতের রাজসূর্য্য যে অর্থবাষ্প শোষণ করিতেছেন, তাহা ভারতে বৃষ্টি স্বরূপ না পড়িয়া অন্য দেশে পড়িতেছে—অন্য দেশকে ফলশালী ধনশালী করিয়া তুলিতেছে।

প্রত্যক্ষভাবে যাঁহারা ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, তাঁহাদেরই সব দোষ যে তাহা নহে। লর্ড ওয়েলেস্‌লি, লর্ড মিণ্টো, লর্ড হেষ্টিংস্—উপর্য্যুপরি তিনজন গভর্ণর জেনারল ভারতবর্ষের ভূমিকর স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাহা মঞ্জুর করেন নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি উঠিয়া যাইবার পরও তিনজন গভর্ণর জেনারল—লর্ড ক্যানিং, লর্ড লরেন্স, লর্ড রিপণ এ প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু ভারতসচিব তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।—

কারিগরগণের আজ্ঞানুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শুধু যে ভারতবাসী অমতে, তাহা নহে,—গভর্ণর জেনারলের সদস্যসভার অধিকাংশ সভ্যের অমতে। আসাম চা বাগানের কুলিগণের দুরবস্থার বিষয় সকলেই অবগত আছেন। যাহাতে তাহাদের কষ্টলাঘব হয়, তিনবার গভর্ণমেণ্ট সেরূপ উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি আসামের চীফ্ কমিশনর অনরেবল্ মিষ্টার কটন এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন—আইনও পাস হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজ চা-করগণের প্রবল প্রতিবন্ধকতায় লর্ড কর্জ্জন দুই বৎসর সে আইন বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় গভর্ণর জেনারেলগণ নাচার। তাঁহারা যাহা করিতে চান তাহা করিয়া উঠিতে পারেন না।

ভারতীয় শাসনকর্ত্তাগণ ভারতবাসীদিগের নিকট হইতেও যথেষ্ট অবলম্বন ও সাহায্য প্রাপ্ত হন না। প্রজার সহিত গভর্ণমেণ্টের আন্তরিক যোগ নাই। ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট অর্থে ভাইসরয় ও তাঁহার সদস্য সভার ছয় জন সভ্য। সকলেই গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী—গভর্ণমেণ্টের স্বার্থসাধনে যত্নবান, প্রজার স্বার্থের প্রতিনিধি কেহ নাই। সকল সভ্যই, কোন না কোনও ব্যয় বিভাগের শীর্ষস্থানীয়। এই সভ্যগণ উচ্চ রাজকর্ম্মচারী। প্রজার স্বার্থের প্রতি যে তাঁহাদের কতকটা দৃষ্টি আছে তাহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা যে যে বিভাগের অধিপতি, সেই সেই বিভাগের স্বার্থরক্ষা,—অস্বচ্ছলতা নিবারণ করিবার চেষ্টাও তাঁহাদের স্বাভাবিক। শক্তিগুলি সমস্তই ব্যয়ের মুখে নিয়োজিত। ব্যয় সঙ্কোচের মুখে কোনও শক্তিই নিযুক্ত নাই। এই সভায় যাহা কিছু ধার্য্য হয়, তাহা আদালতে "একতর্ফা ডিক্রীর" মত। সভার সভ্যগণ পারদর্শী, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, কিন্তু বিজ্ঞতম বিচারকও, শুধু এক তরফের [illegible] শুনিয়া [illegible] করেন। সুতরাং অনেক

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি, জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন—

"The Government of a people by itself has a meaning and a reality, but such a thing as the government of one people by another does not and cannot exist. One people may keep another for its own use, a place to make money in, a human cattle firm to be worked for the profit of its own inhabitants."

এই তীব্র উক্তির মধ্যে, প্রথমে যতটা সত্য আছে বলিয়া মনে হয়, তাহার অপেক্ষাও গভীরতর সত্য নিহিত আছে। এক জাতি অন্য জাতিকে শাসন করিতেছে, অথচ শাসিত জাতির স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে বজায় থাকিতেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন উদাহরণ একটিও নাই। মনুষ্যজাতি এখনও পর্য্যন্ত এমন কোনও উপায়ের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই যাহাতে শাসিতের স্বার্থ বিপদশূন্য হয়।—সে স্বার্থকে বিপদশূন্য করিতে হইলে, বিজীত জাতিকে শাসনভারের কিয়দংশ বহন করিতে দিতেই হইবে—ইহাই একমাত্র প্রতিকার।—এই প্রকার জেতৃশাসন শুধু যে বিজীতের পক্ষে হানিজনক তাহা নহে,—জেতৃগণ নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বাধ্য। ভারতবর্ষের সংস্রবে, বাণিজ্যই ইংলণ্ডের প্রধান স্বার্থ। গত দশ বৎসর ধরিয়া, এই বাণিজ্য প্রায় বৃদ্ধিহীন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে যে পঞ্চবর্ষের শেষ হইয়াছে, সেই পঞ্চবর্ষে ভারতের বার্ষিক গড়পড়তা আমদানি (যদিও সমস্ত নহে—তথাপি অধিকাংশই ইংলণ্ড হইতে) চারিকোটি সত্তর লক্ষ পাউণ্ড হইয়াছিল। তাহার পরবর্ত্তী পঞ্চবর্ষের বার্ষিক গড়পড়তা চারি কোটি নব্বই লক্ষ পাউণ্ড মাত্র হইয়াছে। হিসাবে দাঁড়ায়, প্রত্যেক ভারতবাসী, ইংলণ্ডের নিকট, বৎসরে আন্দাজ তিন সিলিংয়ের মাল খরিদ করিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট যদি এমন উপায় অবলম্বন করেন যে ভারতবাসী ধনশালী হয়, তবে প্রত্যেক

ক্রয় করিতে পারে। দরিদ্রতা দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে, দুর্ভিক্ষে যেরূপ প্রবলতা দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইংলণ্ডের ভারতীয় বাণিজ্য যে ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিবে, ইহা স্পষ্টই অনুমান করা যায়।

বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের অনেকগুলি সমৃদ্ধিসম্পন্ন উপনিবেশ। এই উপনিবেশগুলি এতাদৃশ সমৃদ্ধ হইবার পূর্ব্বে ইংরাজগণ ভারতবর্ষ নিজস্ব করিয়াছেন। এখনি সহজে অনুমান করা যায়—সময়ক্রমে এই উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডের সিংহাসনের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইবে—কিন্তু ভারতবর্ষ তখনও ইংরাজেরই থাকিবে। বিজ্ঞ জনেরা উপনিবেশকে বৃক্ষের ফলের সহিত তুলনা করিয়াছেন,—যথা সময়ে পাকিয়া পড়িয়া যাইবে। ইংলণ্ডের উপনিবেশ গুলির ধনজনবল যেরূপ দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া চলিতেছে—তাহাতে, যদি কোনও ভবিষ্যৎবক্তা বলেন যে অষ্ট্রেলিয়া কিম্বা কানাডা বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তও ইংলণ্ডের অধীনে থাকিবে—তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত সাহসী। ভারতবর্ষ কিন্তু বাস্তবিকই এখন দীর্ঘকাল ধরিয়া ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক রাখিবার জন্য সমুৎসুক। "আমাদের শাস্ত্রে আছে রাজভক্তি পরম ধর্ম্ম," ইত্যাদি ইত্যাদি, সেণ্টিমেণ্টের জন্য নহে—স্পষ্ট বলিতে সঙ্কোচ নাই,—স্বার্থেরই জন্য। পাশ্চাত্য সভ্যতার সাধুসঙ্গমে আমাদের অনেক শিক্ষালাভ করিবার আছে। আমরা ইংলণ্ডের সহিত আমাদের অদৃষ্ট মিলাইয়াছি—আমরা বাস্তবিকই ইচ্ছা করি বৃটিশ শাসন ভারতে স্থায়ীত্বলাভ করুক। তবে আমরা বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর পক্ষপাতী নহি। এ প্রণালী ৭২ বৎসর পূর্ব্বে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। এই ৭২ বৎসরে দেশে শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে; দেশের শিক্ষিত লোক ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছে। তাহারা তাহাদের স্বদেশের উচ্চ রাজকর্ম্মে যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে চাহে। সাম্রাজ্যের উচ্চতম কর্ত্তৃসভায় তাহারা

করা সহজ। এইরূপে এই ক্ষমতাবান্ জনাংশের অসন্তোষ বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে দূরে রাখা সহজ। তাহাদের সাহায্য না লইয়া—সাম্রাজ্যের এই শক্তিকে অবহেলা করিয়া—ক্ষীণভাবে শাসন করা সহজ। কিন্তু এরূপ না করাই বিজ্ঞের কার্য্য হইবে। এতটা শক্তি অপচয় হইতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। ভারতবাসীকে তাহাদের স্বার্থ, তাহাদের শিল্প, তাহাদের কৃষির প্রতিনিধিত্ব দেওয়া উচিত। তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধন বিষয়ে তাহাদিগকেই দায়ী করা উচিত, তখন যদি দুর্ভিক্ষ হয়, আর ভারতবাসী বলিতে পাইবে না 'রাজার দোষে দুর্ভিক্ষ হইল।'

ভারতবাসীরা হঠাৎ পরিবর্ত্তন বা বিপ্লবের পক্ষপাতী নহে। একটা অসাধারণ কিছুর আবদার তাহাদের নাই। তাহারা বর্ত্তমান প্রথারই কিঞ্চিৎ সংস্কার চাহে মাত্র। তাহারা চাহে যে রাজশক্তির সহিত প্রজা-শক্তি মিলিত হইয়া রাজতন্ত্র দৃঢ়তর হউক; রাজায় প্রজায় আন্তরিক যোগ স্থাপিত হউক। তাহারা গভর্ণর জেনারেলের সদস্য সভায় কতিপয় ভারতবাসীকে সদস্যরূপে দেখিতে চাহে। তাহারা প্রত্যেক প্রদেশের সদস্য সভায় ভারতবর্ষীয় সদস্য দেখিতে চাহে। শাসন বিষয়ক সমস্ত বাদানুবাদে তাহারা স্বীয় মত প্রকাশ করিতে চাহে।

প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া ব্যবস্থাপক সভা আছে; ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে এই সভাগুলিতে কতিপয় নির্ব্বাচিত ভারত-বাসী প্রবেশ লাভ করেন। এ প্রণালী সন্তোষজনক ফল উৎপাদন করিয়াছে। এই ব্যবস্থাপক সভাগুলি যদি আরও বিস্তৃতিলাভ করে, তবে রাজতন্ত্র দৃঢ়তর হইবে এবং রাজায় প্রজায় আন্তরিক যোগ বৰ্দ্ধিত হইবে। প্রত্যেক প্রদেশে কুড়ি হইতে চল্লিশটি করিয়া জেলা আছে। এক এক জেলায় দশ লক্ষ বা তাহারও অধিক জনসংখ্যা।—

ক্রয় করিতে পারে। দরিদ্রতা দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে, দুর্ভিক্ষের যেরূপ প্রবলতা দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইংলণ্ডের ভারতীয় বাণিজ্য যে ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিবে, ইহা স্পষ্টই অনুমান করা যায়।

বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের অনেকগুলি সমৃদ্ধিসম্পন্ন উপনিবেশ। এই উপনিবেশগুলি এতাদৃশ সমৃদ্ধ হইবার পূর্ব্বে ইংরাজগণ ভারতবর্ষ নিজস্ব করিয়াছেন। এখনি সহজে অনুমান করা যায়—সময়ক্রমে এই উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডের সিংহাসনের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইবে—কিন্তু ভারতবর্ষ তখনও ইংরাজেরই থাকিবে। বিজ্ঞ জনেরা উপনিবেশকে বৃক্ষের ফলের সহিত তুলনা করিয়াছেন,—যথা সময়ে পাকিয়া পড়িয়া যাইবে। ইংলণ্ডের উপনিবেশ গুলির ধনজনবল যেরূপ দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া চলিতেছে—তাহাতে, যদি কোনও ভবিষ্যৎবক্তা বলেন যে অষ্ট্রেলিয়া কিম্বা কানাডা বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তও ইংলণ্ডের অধীনে থাকিবে—তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত সাহসী। ভারতবর্ষ কিন্তু বাস্তবিকই এখন দীর্ঘকাল ধরিয়া ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক রাখিবার জন্য সমুৎসুক। "আমাদের শাস্ত্রে আছে রাজভক্তি পরম ধর্ম্ম," ইত্যাদি ইত্যাদি, সেণ্টিমেণ্টের জন্য নহে—স্পষ্ট বলিতে সঙ্কোচ নাই,—স্বার্থেরই জন্য। পাশ্চাত্য সভ্যতার সাধুসঙ্গমে আমাদের অনেক শিক্ষালাভ করিবার আছে। আমরা ইংলণ্ডের সহিত আমাদের অদৃষ্ট মিলাইয়াছি—আমরা বাস্তবিকই ইচ্ছা করি বৃটিশ শাসন ভারতে স্থায়ীত্বলাভ করুক। তবে আমরা বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর পক্ষপাতী নহি। এ প্রণালী ৭০ বৎসর পূর্ব্বে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। এই ৭০ বৎসরে দেশে শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে ; দেশের শিক্ষিত লোক ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছে। তাহারা তাহাদের স্বদেশের উচ্চ রাজকর্ম্মে যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে চাহে। সাম্রাজ্যের উচ্চতম কর্ত্তৃসভায় তাহারা

করা সহজ। এইরূপে এই ক্ষমতাবান্ জনাংশের অসন্তোষ বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে দূরে রাখা সহজ। তাহাদের সাহায্য না লইয়া—সাম্রাজ্যের এই শক্তিকে অবহেলা করিয়া—ক্ষীণভাবে শাসন করা সহজ। কিন্তু এরূপ না করাই বিজ্ঞের কার্য্য হইবে। এতটা শক্তি অপচয় হইতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। ভারতবাসীকে তাহাদের স্বার্থ, তাহাদের শিল্প, তাহাদের কৃষির প্রতিনিধিত্ব দেওয়া উচিত। তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধন বিষয়ে তাহাদিগকেই দায়ী করা উচিত, তখন যদি দুর্ভিক্ষ হয়, আর ভারতবাসী বলিতে পাইবে না 'রাজার দোষে দুর্ভিক্ষ হইল।'

ভারতবাসীরা হঠাৎ পরিবর্ত্তন বা বিপ্লবের পক্ষপাতী নহে। একটা অসাধারণ কিছুর আবদার তাহাদের নাই। তাহারা বর্ত্তমান প্রথারই কিঞ্চিৎ সংস্কার চাহে মাত্র। তাহারা চাহে যে রাজশক্তির সহিত প্রজা-শক্তি মিলিত হইয়া রাজতন্ত্র দৃঢ়তর হউক; রাজায় প্রজায় আন্তরিক যোগ স্থাপিত হউক। তাহারা গভর্ণর জেনারেলের সদস্য সভায় কতিপয় ভারতবাসীকে সদস্যরূপে দেখিতে চাহে। তাহারা প্রত্যেক প্রদেশের সদস্য সভায় ভারতবর্ষীয় সদস্য দেখিতে চাহে। শাসন বিষয়ক সমস্ত বাদানুবাদে তাহারা স্বীয় মত প্রকাশ করিতে চাহে।

প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া ব্যবস্থাপক সভা আছে; ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে এই সভাগুলিতে কতিপয় নির্ব্বাচিত ভারত-বাসী প্রবেশ লাভ করেন। এ প্রণালী সন্তোষজনক ফল উৎপাদন করিয়াছে। এই ব্যবস্থাপক সভাগুলি যদি আরও বিস্তৃতিলাভ করে, তবে রাজতন্ত্র দৃঢ়তর হইবে এবং রাজায় প্রজায় আন্তরিক যোগ বর্দ্ধিত হইবে। প্রত্যেক প্রদেশে কুড়ি হইতে চল্লিশটি করিয়া জেলা আছে। এক এক জেলায় দশ লক্ষ বা তাহারও অধিক জনসংখ্যা।—

জেলাগুলি একটি করিয়া সভ্য নির্ব্বাচন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে।

১৮৩৩ এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ৺মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিখ্যাত ঘোষণাপত্রে, সমস্ত উচ্চ রাজকর্ম্মে ভারতবাসীকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু নামতঃ প্রবেশাধিকার না দিয়া, কার্য্যতঃ দেওয়া উচিত। সিবিল সার্ব্বিস, শিক্ষাবিভাগ, পূর্ত্তবিভাগ, ডাক বিভাগ প্রভৃতি সর্ব্বত্র ভারতবাসীর উন্নতি অব্যাহত হওয়া উচিত। এই সকল বিভাগে ইংরাজও যে প্রয়োজন তাহার কোনই সন্দেহ নাই। আমাদের সহায়স্বরূপ, নেতাস্বরূপ, আমরা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইব। তবে তাঁহারা যে ঐ সকল পদগুলি একচেটিয়া করিয়া লইবেন, ইহাতেই আমাদের আপত্তি। বাৎসরিক হাজার টাকা বা তাহার অধিক বেতনের যতগুলি রাজকর্ম্ম আছে, তাহাতে বেতন ও পেন্সনে ইংরাজগণ এক কোটি ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড পান, আমরা পাই ত্রিশলক্ষ পাউণ্ড মাত্র। শিক্ষিত ভারতবাসীর প্রতি ইহা নিতান্ত অবিচার।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড আছে, এবং অনেক গ্রামে গ্রামসমিতি গঠিত হইতেছে। পূর্ব্বকালে এরূপ সমিতি বা মণ্ডলী (Village Community) ছিল। হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যকালে দেশময় এইরূপ স্বায়ত্ত শাসনকারী মণ্ডলী বিস্তৃত ছিল। ইংরাজ শাসনে তাহা লুপ্ত হইয়াছে। এই নূতন গ্রামসমিতিগুলি সেই পুরাতন মণ্ডলীরই অনুকরণ। গবর্ণমেণ্ট যদি যত্নের সহিত ও বিশ্বাস স্থাপনের সহিত সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারেন তবে দেশের অনেক মঙ্গল হয়। এই সমিতিগুলিকে কতকটা ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। তাহাদের হস্তে কোনও কোনও প্রয়োজনীয় কার্য্যভার

উপস্থিত হয়, সে সকলের—বিচারভার নহে—আপোসে মিট্‌মাট্ করিয়া দিবার ভার এই গ্রামসমিতিগুলিকে দেওয়া যাইতে পারে। তাহারা স্থানীয় অভিজ্ঞতা সহযোগে সহজে উচিত মীমাংসায় উপনীত হইতে সক্ষম হইবে। সাক্ষীগণ দূর আদালতে যাওয়ার কষ্ট ও পরিশ্রম হইতে মুক্তি পাইবে। সর্ব্বোপরি, এই গ্রামসমিতি, রাজা ও প্রজার আন্তরিক যোগের সেতু স্বরূপ হইবে।

ভারতগবর্ণমেণ্টকে প্রজার সহিত অধিকতর সংযোগে আনিবার জন্য, গবর্ণমেণ্টকে সমধিক লোকপ্রিয়, লোকহিতকর ও দৃঢ় করিবার জন্য, এই কতিপয় উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। ভূতকালে বিজ্ঞতম শাসন কর্ত্তাগণ,—যেমন মনরো, এলফিন্‌ষ্টোন্, বেণ্টিঙ্ক,—ভারতবাসীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া, দেশের মঙ্গলসাধনে যত্নবান ছিলেন। মহাজনগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত সেই পন্থার অনুসরণই এখন আবশ্যক। সমস্ত সভ্য-দেশেই, সুশৃঙ্খলার সহিত শাসন করিবার পক্ষে জনসাধারণের সহায়তা একান্ত আবশ্যক। অন্য দেশের পক্ষে যাহা প্রয়োজন—ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা আরও অধিক প্রয়োজন। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির খাদ্যাখাদ্যবিচারে যে পরিমাণ সাবধানতার আবশ্যক, রোগীর পক্ষে তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক সাবধানতা অবলম্বনীয়। ভারতবর্ষ দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষপীড়ায় জর্জ্জরিত।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

মালিক মহম্মদের পদ্মাবত

এবং

আলোয়াল কৃত অনুবাদ।

মালিক মহম্মদ প্রণীত পদ্মাবত কাব্যে উল্লিখিত আছে, তিনি ৯২৭ সালে সের সাহের রাজত্ব সময়ে এই পুস্তক প্রণয়ন করেন, সম্ভবতঃ ১০৪৫ সালে বাঙ্গালী কবি আলোয়াল এই পুস্তকের একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করেন, তিনিও মূল পুস্তক রচনার সময় ৯২৭ সাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; অথচ ৯৪৭ সালে সের সাহের রাজত্ব আরম্ভ হয়, সের সাহের উদ্দেশে প্রশংসাসূচক পদ পদ্মাবত কাব্যের অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। গ্রীয়ারসন্ সাহেব অনুমান করেন, লিপিকারের প্রমাদবশতঃ ৯৪৭ সালের স্থলে ৯২৭ সাল লিখিত হইয়াছিল; এই অনুমান স্বীকার করিতে হইলে বলিতে হইবে, বর্ত্তমান সময়ের ৬৩ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ মূল পুস্তক রচনার ৯৮ বৎসর পরে যে পুঁথি দৃষ্টে আলোয়াল অনুবাদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেই পুঁথির লিপিকার মহাশয়ও ৯৪৭ সালের স্থলে ৯২৭ সাল লিখিয়াছিলেন; সুতরাং এই ভ্রম আধুনিক মুদ্রাকরগণের নহে, বহুপূর্ব্বে পুঁথিলেখকগণ ইহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন।

মীর মহম্মদের পদ্মাবত হিন্দীসাহিত্যে এক অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে, ইহাতে মালিক মহম্মদের হিন্দুসমাজ এবং হিন্দুশাস্ত্রের সঙ্গে প্রগাঢ় এবং অকৃত্রিম প্রীতি সূচিত আছে, এই কাব্য মুসলমানের

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, হিন্দুভাবাপন্ন কাব্যখানি ২৬৩ বৎসর পূর্ব্বে এক জন বাঙ্গালী মুসলমান মার্জ্জিত এবং সংস্কৃতাত্মক সুললিত পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মালিক মহম্মদের নিবাসভূমি অযোধ্যার অন্তর্গত জয়স গ্রাম, এজন্যই তাঁহাকে আমরা 'মালিক মহম্মদ জয়সী' উপাধিবিশিষ্ট দেখিতে পাই। ইনি সৈয়দমহীয়ুদ্দিনের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন; রাজপুতকুলের প্রসিদ্ধ সোলন সিংহ ইহাঁর একান্ত সুহৃৎ ছিলেন, তাঁহারই সহিত অকৃত্রিম বন্ধুত্বনিবন্ধন, তিনি রাজপুত যোদ্ধৃগণের প্রাচীন কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হন। মালিক মহম্মদ জয়সগ্রামের কতিপয় হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন,—তাঁহার রচিত পদ্মাবত কাব্যে সংস্কৃতশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির বিশেষ নিদর্শন আছে। পদ্মাবত কাব্য তিনি সের সাহকে উৎসর্গ করেন। মালিক মহম্মদ শেষ জীবনে সাধুজীবনের জন্য খ্যাতিলাভ করেন। তিনি ফকির হইয়া আমেথির রাজার এক মঠে জীবনের শেষভাগ যাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে তাঁহার বরে আমেথির রাজা এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। তাঁহার শব বহু সমারোহের সহিত আমেথি-রাজ স্বীয় প্রাসাদ প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ করেন, এখনও সেই সমাধিস্থানে সম্মান দেখাইবার জন্য লোকবৃন্দ সমবেত হইয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন, মালিক মহম্মদের পদ্মাবত কাব্য একখানি ধর্ম্মের রূপক। হিন্দীসাহিত্যের ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত গ্রীয়ারসন্ সাহেবও এই মত প্রচার করিয়াছেন।* ইহার কবিত্ব ও উন্নত আদর্শ সম্বন্ধে গ্রীয়ারসন্ সাহেব লিখিয়াছেন, "মালিক মহম্মদের আদর্শ অতি উচ্চ ছিল, এই

* "It is also an allegory describing the search of the soul for wisdom ...

মুসলমান সাধুর রচনায় হিন্দুগণের ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত সুগভীর সহানুভূতি ও প্রীতির ভাব পরিদৃষ্ট হয়।"* হিন্দী পদ্মাবত গ্রন্থের মূল এবং ইংরাজী অনুবাদ সম্প্রতি এসিয়াটিক্ সোসাইটী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

মুসলমানের ধর্ম্মবিশ্বাসের সঙ্গে মালিক মহম্মদের ধর্ম্মমতের সমন্বয় করা যায় কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করিতে আমরা সমর্থ নহি—মুসলমান ধর্ম্মসাহিত্যে আমাদের প্রবেশ নাই। তবে বোধ হয় এ কথা বলা যাইতে পারে যে, মালিক মহম্মদ মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে ত্রুটি না করিয়া উদার বৈদান্তিক মতের প্রচার করিতে বেশী প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রাচীন হিন্দীসাহিত্যের উপর বৈদান্তিক ধর্ম্মের অতি প্রবল প্রভাব দৃষ্ট হয়, তুলসীদাস "সজ্জন এবং অসজ্জন সকলের পদসরোজেই" প্রণাম জানাইয়া রামায়ণের মুখবন্ধ করিয়াছেন, যেহেতু সাধু এবং অসাধু সকলেই সেই মহান সর্ব্বব্যাপী আত্মা হইতে সমুৎপন্ন। তুলসীদাসের রামায়ণে ভক্তি ও জ্ঞানের যে অপূর্ব্ব সংমিশ্রন দৃষ্ট হয়, মালিক মহম্মদের লেখনীদ্বারাও সেইরূপ ধর্ম্মভাবই সূচিত হইয়াছে। আমাদের যেন মনে হয় সেই ভাবের ধর্ম্মকথা কবি মুসলমান শাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত হন নাই—যেহেতু জগতে পাপের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করিতে মুসলমান এবং খ্রীষ্টানগণ সয়তানের প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু মালিক মহম্মদ "কীন্হেসি বহু ঔষধ বহু রোগ," "কীন্হেসি অমৃত কীন্হেসি বিষ" প্রভৃতি বহুবিধ পদে রোগ এবং ঔষধ, অমৃত এবং বিষ প্রভৃতি সমস্তই ভগবানের দান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

* "Malik Mahamod's ideal was high and throughout the work of the Musalman ascetic there run veins of the broadest charity and

হিন্দুগণ যেরূপ ভগবানের লীলায় বিশ্বাস করেন, মালিক মহম্মদও তাহাই করিয়াছেন,—"তুমিই কাহাকে ঠাকুর কাহাকে দাস করিয়াছ," "তুমিই মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়া পুনরায় মাটিতে পরিণত করিতেছ।"* এখানেও পাপ এবং দুঃখের ব্যাখা করিতে শুভ ঈশ্বরের পার্শ্বে বিদ্রোহী দুষ্ট-ঈশ্বর কল্পিত হয় নাই। কবির দর্শনাত্মক ধর্ম্মকথা নির্ম্মল ও উন্নত চিন্তার পরিচয় দিয়া ভক্তিমূলক হইয়াছে। আমরা সেই সকল অংশে হিন্দুবিশ্বাসের অনুকূল কথা পাইয়াছি। কবি হিন্দু পণ্ডিতগণের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। তিনি হিন্দু ও মুসলমান কাহারও পর নহেন, তিনি জাতিনির্ব্বিশেষে সমস্ত মনুষ্যজাতির হৃদয়ে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন করিতে সমর্থ। প্রসিদ্ধ সাধু কবিরের শব সমাধিস্থ কি শ্মশানস্থ হইবে, ইহা লইয়া হিন্দু ও মুসলমানগণ বিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

মালিক মহম্মদ যখন ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতেছেন—"সমস্ত জীবের উপর তাঁহার অপার করুণা, শত্রু মিত্র কাহাকেও তিনি বিস্মৃত নহেন, ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গকেও তিনি ভুলেন নাই। সমস্তের খাদ্যের জন্য স্বীয় অপার ভাণ্ডার অটুট রাখিয়াছেন। এমন দাতা আর কে আছেন, যিনি নিজে না খাইয়া পরের আহার জোগাইতেছেন। তাঁহার শক্তির কথা কে বলিবে, তিনি পর্ব্বতকে রেণুতে পরিণত করিতেছেন। তিনিই প্রকৃত ধনপতি, যুগে যুগে ধন বিতরণ করিতেছেন, অথচ তাঁহার ভাণ্ডার টুটিতেছে না। ইহা জানিয়া মন গর্ব্ব করিও না, গর্ব্ব যে করে সে

---

* কীন্হেসি কোই নিমরোসী কীন্হেসী কোই বরিয়ার।

বর্ব্বর।"* তখন সর্ব্ব ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণ এক ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া অবনত মস্তকে এই উপদেশ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। কিন্তু এতদ্ব্যতীতও তাঁহার রচনায় সুস্পষ্টরূপে বেদান্তের মত প্রচারিত হইয়াছে। "প্রাণ নাই তবু তিনি জীবিত, হস্ত নাই তথাপি তিনি সকল কর্ম্ম করিতেছেন, চক্ষু নাই তথাপি সকল দেখিতেছেন, কর্ণ নাই তথাপি সকল শুনিতেছেন।"† এই পুস্তক রচনার বহু-কাল পরে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে "অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি" ইত্যাদি লিখিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মালিক মহম্মদ সম্রাট সের সাহকে এই পুস্তক উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশে কবির অনেক স্তুতিবাদ আছে, তাহাও হিন্দুভাবাপন্ন, যথা—

"ডোলে গগন ইন্দ্‌ ডর কাঁপা।
বাসুকি জায় পাতালহিঁ চাপা।"

---

* "তা কর দৃষ্টি জো সব উপরাহীঁ।
মিত্র শত্রু কোই বিসরে নাহীঁ॥
পংখ পতঙ্গ ন বিসরে কোই।...
সবৈ খবাহ আপ নঁহি খাই।
সবে দেহনিত ঘটন ভঁডারু॥
পরবত টহি দেখত সব লোগু।...
যুগ যুগ দেতঘটা নহিং উভয় হার অস কীহু॥
এসো জানি মন গর্ব না হোয়।
গর্ব করৈ মন বাবর সোয়।"

† "জীব নাহিং পৈ জিয়ে গুসাংই।
কর নাহিং পৈ করৈ সবাই॥
নয়ন নাহিং পৈ সব কছু দেখা।

পদ্মাবতীর ঐতিহাসিক বিবরণের সঙ্গে কাব্যোল্লিখিত বিবরণের স্থানে স্থানে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। কবি অনেক কল্পিত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, একটি জ্ঞানবৃদ্ধ শুকপক্ষীকে প্রেমের বার্ত্তাবহ নিযুক্ত করিয়াছেন, কাব্য-হিসাবে কবির পক্ষে ইহা কোন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না। মরাল-দূত, কোকিল-দূত, মেঘ-দূত এবং পদাঙ্ক-দূতের পার্শ্বে এই শুক-দূতটিও অনায়াসে একটি স্থানের দাবী করিতে পারেন।

ভীমসেনের নাম পদ্মাবত পুস্তকে রত্নসেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আলাউদ্দিন চিতোরজয়ে অসমর্থ হইয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন। পদ্মাবতী ও ভীমসেনের মৃত্যুর পর আলাউদ্দিন সাশ্রুনেত্রে তাঁহাদের পুত্রদ্বয়কে আলিঙ্গন করিয়া নিজে তাহাদের অভিভাবকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কাব্য খানি ইতিহাসের উপাদান ভাঙ্গিয়া নূতন ভাবে গড়া হইয়াছে, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। কবির লেখনার এ অধিকার চিরদিনই আছে। কিন্তু কবি পদ্মাবতীর চিত্র আঁকিতে পারেন নাই। তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য বর্ণনোপলক্ষে অলঙ্কার শাস্ত্রের কোন উপমা বাদ পড়ে নাই, কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনাই বিস্তারিত ভাবে পাওয়া যাইতেছে। সেই "সুমেরু মেদিনা-সংকুল ভৌগলিক রূপ বর্ণনার" সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যের পাঠকমণ্ডলী বিশেষরূপে পরিচিত আছেন। কিন্তু মুসলমান কবির হস্তে পদ্মিনীর সতীমূর্ত্তি জাবন্ত হইয়া উঠে নাই,—পদ্মিনী সাধারণ ভাবে প্রশংসার্হ চরিত্রশালিনী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে হিন্দুর আদর্শ সতীত্ব উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই। আলাউদ্দিন ভীম সিংহের অতিথি হইলেন, সেই স্থানে পদ্মিনীর বিবেচনাহীন অসতর্ক কৌতূহল এবং মুকুরে আলাউদ্দিনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় এবং তৎপ্রসঙ্গে কবির

ভাল বোধ হয় নাই।* কবি হিন্দু সমাজের সঙ্গে বিশেষ রূপে পরিচিত ছিলেন, তিনি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি উদার অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু হিন্দুগৃহললনার যে ভীরুতা, যে লজ্জা, যে চরিত্রের বল, যে আত্মত্যাগ লোকচক্ষুর অন্তরালে বন ফুলের ন্যায় অতি সংগোপনে বিকাশ পায়, সেই ছবিটি বোধ হয় তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করিবার যথেষ্ট সুবিধা হয় নাই। বিশেষ সেই সময়ের রাজপুত কন্যা, যাঁহারা পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিতে পুড়িয়া সতীত্বের মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন, সেই জগৎ-বিখ্যাত ললনাকুলের শীর্ষস্থানীয় পদ্মিনীর উচিত মর্য্যাদা কবি রক্ষা করিতে পারেন নাই।

২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় কবি আলোয়াল মালিক মহম্মদের পদ্মাবত কাব্যের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুবাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক পুস্তকে এবং ১৩০১ সালের মাঘ মাসের সাহিত্য পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আলোয়াল আরাকান পতির হস্তে সুজা বাদসাহের নিধন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন এবং ঐতিহাসিক অপরাপর ঘটনার উল্লেখ দ্বারা তাহার সময় নিশ্চিত রূপে নির্দ্ধারণ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। তিনি আওরাঙ্গজীবের

* আলোয়াল এ সম্বন্ধে মূল হইতে আরও একটু অসংযত ভাবে অগ্রসর হইয়া পদ্মিনীর চরিত্র আরও একটু হীন করিয়াছেন, অনুবাদের সেই অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"সেই গৃহে আছে এক খিড়কির দুয়ার।
তথাতে আসিলা কন্যা সাহা দেখিবার।
দ্বার মেলি চন্দ্রাতপ তুলি বাম করে।
সমদৃষ্টে সুন্দরী সাহার মুখ হেরে।
প্রকাশ কমল ভেল অরুণ দরশে।
অপূর্ব্ব আদিত্য হেটে অম্বুজ আকাশে।

সিংহাসনারোহণ কালে একরূপ বয়ঃবৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং সেই সময় অনুবাদ খানি প্রণয়ন করেন। আমরা পাশাপাশি মিরমালিক মহম্মদের কয়েকটি অংশ এবং আলোয়াল কৃত অনুবাদ রাখিয়া পাঠকগণের নিকট উভয়ের শক্তির পরিচয় দিতেছি।

মূল পদ্মাবত।	আলোয়ালের অনুবাদ।
"সরবর তার পদ্মিনী আই।	"সরোবরে আসিয়া পদ্মিনী উপস্থিত।
খোপা ছোড়ি কেশ বিথরাই॥	খোঁপা খসাইয়া কেশ কৈল মুকলিত॥
শশিমুখ অংগ মলীগর রাণী।	সুগন্ধি শ্যামল ভাব ধরণী ছুঁইল।
তামঁহ ঝাপলহ অবধানী॥	চন্দনের তরু যেন নাগিনী বেড়িল॥
উলহই ঘটা পরাজগ ছাঁহা।	কিবা মেঘারম্ভ যোগে হৈল অন্ধকার।
শশী কী শরণ লীহ্ন রাহু যাঁহা॥	বিধুন্তুদ আসিল কিবা রাহু গ্রাসিবার॥
ছিপিগ যে দিন ভানু কী দশা।	দিবস সহিত সূর্য্য হইল গোপন।
তেহি নিশি নখত চাঁদ পরগাশা॥	চন্দ্র তারা লৈয়া নিশি হৈল উপাসন॥
ভুল চকোর দৃষ্টি তেহি লাবা।	ভাবিয়া চকোর আঁখি পড়ি গেল ধন্দ।
মেঘ ঘটামঁহ চন্দ দিখাবা॥	জীমূত সময় কিবা প্রকাশিত চন্দ॥
দশন দামিনী কোকিল ভাখৈং।	হাস্য সৌদামিনী তুল কোকিল বচন।
মৌং হৈং ধনুষ গগন লৈবাথৈং॥	ভুরুযুগ ইন্দ্রধনু শোভিত গগন॥
নয়ন সঁজল ছুই কেল করেহীং।	নয়ন খঞ্জন দুই সদা কেলি করে।
কুচ নারগ মধুকর রস লেহীং॥	নারাঙ্গী জিনিয়া কুচ সগর্ব্ব আদরে॥
সরোবর রূপ বিমোহা হিয়ে হিলোর করণে।	সরোবর মোহিত কন্যার রূপ হেরি।
পাঁউ ছুবে মগ পাঁউ লহরেং দে॥"	পদ দরশন হেতু করয় লহরী॥"

আলোয়ালের প্রতিভা মালিক মহম্মদের প্রতিভার অনেকটা অনুরূপ,—মূল হইতে অনুবাদ কবিত্বের হিসাবে ন্যূন নহে। উভয় কাব্যেই

সুচিন্তিত ভাব এবং কবিত্বপূর্ণ বর্ণনার মুক্ত পরিবেশন দ্রষ্টব্য। কবিদ্বয় যে স্বাভাবিক শক্তিশালী, তাহার নিদর্শন প্রতি পত্রেই আছে। প্রতি পত্রেই দু একটি উজ্জ্বল উপমা, অল্প কথায় অভিব্যক্ত সুন্দর কোন বর্ণনা কবিদ্বয়ের মনস্বাতার পরিচয় প্রদান করিবে। মালিক মহম্মদের রচনায় ধর্ম্মের কথা অধিকতর স্ফুট, আলোয়ালের রচনায় শাস্ত্রাধ্যায়নের প্রচুর নিদর্শন এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির পরিচয় সমধিক। আলোয়াল পাণ্ডিত্য হিসাবে মালিক মহম্মদ হইতে শ্রেষ্ঠ। রত্নসেনের বিবাহোপলক্ষে মালিক মহম্মদ শুধু তাঁহার ব্যায়াম ও যুদ্ধাদিতে কৃতিত্বের পরিচয় এবং পরীক্ষার অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু আলোয়াল সেই স্থানে নূতন একটি অধ্যায় জুড়িয়া দিয়াছেন, তাহাতে রত্নসেনের শাস্ত্রজ্ঞান প্রদর্শনস্থলে আলোয়াল পিঙ্গল প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণের গ্রন্থাদি অধ্যয়নের যে সংক্ষিপ্ত প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বিস্মিত হইবেন,—সেই অংশের ব্যাখ্যা করা সকল পণ্ডিতের বিদ্যায় কুলাইয়া উঠিবে না।

মূল কাব্যের প্রত্যেক স্থানেই ঈশ্বরের অপার করুণার প্রতি ইঙ্গিত আছে, তাহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। সুন্দরীগণের রূপবর্ণনা ও বিরহ-গীতি পড়িতে পড়িতে আমরা কবির সঙ্গে এক উন্নততর রাজ্যে যাইয়া উপস্থিত হই, সে স্থলে এই প্রণয়কাহিনী একটি অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-কাহিনীর রূপকের স্থান গ্রহণ করে। প্রভুর কথা বলিতে, মালিক মহম্মদ চিরবাগ্মী,—পাষাণের মধ্যে ক্ষুদ্র কীটকেও তিনি ভুলেন নাই, "যথা তথা ভক্ষ্য দান" করিয়া সকলকে তিনি পালন করিতেছেন, যে কোন কথা-প্রসঙ্গে কবির ভগবানের কৃপার কথা মনে হইয়াছে, আমরা মালিক মহম্মদকে সেই সেই স্থলে সাধুর বেশে দেখিয়া বিনীত ভাবে তাঁহার কবিত্বাদি সমালোচনার স্পর্দ্ধার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

কিন্তু রূপ বর্ণনা প্রভৃতি বিষয়ে আলোয়াল অনেক স্থলে মূলকে অতিক্রম করিয়াছেন।

"চন্দ্র তুল্য ছিল ধনি উজ্জ্বল বদন।
গ্রহণ লাগিল শুনি স্বামীর বচন।"
"পীরিতি কাঞ্চন মধ্যে পড়ে গেল শিশা।
ত্রাসযুক্ত হৈয়া দেবী হারাইলা দিশা।"
"যখন চিকন বস্ত্র করয় ঘোঁগট।
মেঘান্তরে অর্ক তারা কিঞ্চিৎ প্রকট।"

প্রভৃতি বহুবিধ স্থানে কৌতূকাবহ প্রতিভার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। পাঠক কাব্যকথা ছাড়িয়া দিলেও বৌদ্ধদিগের প্রভাব এবং অন্যান্য অনেক ঐতিহাসিকতত্ত্বসূচক প্রসঙ্গ পদ্মাবত কাব্যে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

হিন্দুর ভাবীদশা।

অতীতের আলোচনায় উপকার হয় একথা স্বীকার করি, কিন্তু ভবিষ্যতের আলোচনায় যে অত্যন্ত উপকার জন্মে ইহা কি অস্বীকার্য্য? যাহা অতীতের অধিগত হইয়াছে, তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও অধিকার নাই, সুতরাং পণ্ডিতেরা গতানুশোচনায় অভিমতি দেন নাই।

ভবিষ্যৎকে ছাড়িয়া কেবল অতীতের আলোচনা করা অলস, অকর্ম্মণ্য ও স্বল্পবুদ্ধি মানবের কাজ। অতীতের গরিমা ও মহিমায়

কেবল অতীতের গৌরব চিন্তায় কেহ কি কখন বড় হইয়াছে? কেবল চিন্তায় বড় হওয়া যায় না, চিন্তার সহিত কার্য্যকরী শক্তির সর্ব্বথা প্রয়োজন। ভবিষ্যতের গম্ভীর চিন্তায় আমরা ভাল, মন্দ, ক্ষতি, লাভ, উন্নতি, অবনতি প্রভৃতি বুঝিতে পারি। অতীতের সহিত বর্ত্তমান এবং বর্ত্তমানের সহিত ভবিষ্যৎ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে গ্রথিত; ভারতের ভাবী দশাটা একবার ভাবিয়া দেখিলে হয় না? মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী প্রভৃতি ভারতের বর্ত্তমান অধিবাসীমধ্যে পরিগণিত হইলেও, সমগ্র ভারতবর্ষ "হিন্দুস্থান" নামে অভিহিত হইবার যোগ্য; হিন্দুর ভবিষ্যতের উপরে সমগ্র ভারতভূমির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। হিন্দুর ভবিষ্যতে কি হইবে, পাদ্রী প্রভুরা তাহার এক চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, কিন্তু পাদ্রী মহাশয়েরা খৃষ্টান—হিন্দু নহেন; মুসলমান গ্রন্থেও ভারতের ভাবী দশার সুবৃহৎ চিত্র আঁকা আছে, কিন্তু ইহাঁরাও অ-হিন্দু; কেবল হিন্দুই হিন্দুর ঘরের কথা জানে বুঝে ও বলিতে পারে; একজন বৃদ্ধ হিন্দুর তুলিতে ভারতের হিন্দু জাতির ভাবী দশার চিত্র অঙ্কিত হইলে ভাল হয় না? কল্পনা বা খেয়াল দ্বারা এই চিত্র আঁকিব না, প্রত্যক্ষ জ্ঞানসম্ভূত বৈষয়িক বিবেক দ্বারা অঙ্কপাত-সহ এই চিত্র আঁকিয়া দেখাইবার আকাঙ্ক্ষা করি।

কোনও জাতি, সমাজ বা দেশের ভবিষ্যৎ বুঝিতে গেলে তাহার বর্ত্তমান অবস্থার দিকে সর্ব্ব-প্রথমে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। বর্ত্তমান, ভবিষ্যতের ছায়া স্বরূপ। বর্ত্তমানের দিকে চাহিয়া ঐ জাতি, সমাজ বা দেশের কতকগুলি শক্তির অনুসন্ধান করিতে হয়, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান শক্তি গুলির নাম এই,—(১) দৈহিক শক্তি, (২) রাজনৈতিক শক্তি, (৩) আর্থিক শক্তি, (৪) সংখ্যা শক্তি, (৫) সমাজ শক্তি, (৬) মানসিক শক্তি (৭) ভাষা ও সাহিত্যের শক্তি এবং (৮) আধ্যাত্মিক

(১) দৈহিক শক্তি।

প্রথমে হিন্দুর দৈহিক শক্তির কথা বলিব। হিন্দু রাজত্বের লোপ হইলে এদেশে গ্রীকেরা আসিয়া প্রবেশ করে এবং তাহাদের নিকটে হিন্দু পরাজিত হয়। গ্রীকের সমকালে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে অনেক স্থানের অনেক প্রকার ছোট বা বড় বীরজাতি ভারতে আসিয়া উপদ্রব করে, হিন্দু তাহাদিগের উপদ্রবে পর্য্যুদস্ত হয়। তদনন্তর সপ্ত শতাধিক বর্ষকাল ব্যাপিয়া মুসলমানেরা ভারত শাসন করেন। হিন্দুরাজত্বের লোপকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন পর্য্যন্ত, প্রায় একাদশ শতবর্ষকাল, ভারতের হিন্দু জাতি, বিদেশীয়ের গোলামী করিয়াছে। হিন্দুর যদি দৈহিক বল ছিল, তাহা হইলে হিন্দু যুদ্ধে পরাজিত হইল কেন? অনেকে বলিতে পারেন, ছলে ও কৌশলে মুসলমানেরা ভারতাধিকার এবং ভারতশাসন করিয়াছে। সাত শত বৎসরকাল কি ছলে কৌশলেই মুসলমানেরা হিন্দুস্থান শাসন করিয়াছিল? কেবল কৌশল ও কপটতায় পৃথিবীর কোন্ জাতি বড় হইয়াছে? সুধু কৌশল ও কপটতায় কয়দিন রাজত্ব রাখা যায়, আর কয় দিনই বা রাজ্যশাসন করা যায়? পৃথিবীর ইতিহাস দেখ, নরনারীর যৌবন, ছেঁচা জল, বালুর বাঁধ, আর মিথ্যাকথা যেমন স্থির থাকে না, কপটতার রাজত্বও তেমনি স্থির থাকে না। প্রাচীন রোমক, প্রাচীন গ্রীক, আধুনিক ইংরাজ, ফরাসি, রুষ ইহাঁরা কি কেবল ছল, কৌশল ও কপটতার উপরে নির্ভর করিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে অমর নাম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন? মহারাষ্ট্রীয়দিগের শিবাজি, শিখধর্ম্ম প্রবর্ত্তক নানক, যবনবৈরী গুরু গোবিন্দ, নাগপুরী বিমল রাও প্রভৃতি রাজনৈতিক ছল-বিদ্যায় অপটু ছিলেন না, কিন্তু মুসলমানকে তাড়াইতে পারিয়াছিলেন কি? তাঁহাদের হস্তে মুসলমান রাজত্বের লোপ

সিংহ, শ্রীমন্ত রাও, মানসিংহ, পৃথ্বীরাও প্রভৃতি যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা মুসলমানের সমকক্ষতায় যুদ্ধ করিয়া ভারতে হিন্দুরাজত্ব স্থাপন করিতে পারেন নাই। পাণিপথের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে, আমেদাবাদের আহবে, অনঙ্গপালের সমরে, পৃথ্বিরাজার রণে, সোমনাথের আক্রমণে, সর্ব্বত্রই মুসলমানের নিকট হিন্দুর বলহীনতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মুসলমান নিজের দোষেই ভারতরাজ্য হারাইয়াছে, হিন্দুর বৈরীতা বা প্রতিদ্বন্দ্বীতা তাহার পতনের কারণ নহে। নাদিরসাহ, তৈমুরলঙ্গ, মহম্মদ ঘোরী (আলাউদ্দীন) প্রভৃতি বার বার আসিয়া ভারতকে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন হিন্দু কি প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছিল? দৈহিক বল থাকিলে হিন্দুর এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। দৈহিক শক্তি থাকিলে, সপ্ত শত বর্ষাধিক কাল যবনের গোলামী করিয়া হিন্দুজাতি অধঃপতিত হইত না। নাদিরসাহ দিল্লীতে এক লক্ষ হিন্দু হত্যা করে; ইতিহাসে প্রমাণ নাই যে, নাদিরসাহ বা আলাউদ্দীন ছলে বা কৌশলে কোনও কার্য্য সমাধা করিয়াছিল। প্রকাশ্যভাবে সম্বাদ দিয়া, যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, ইহারা লুণ্ঠন ও নিহন-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। প্রধান প্রধান ঐতিহাসিকেরা লিখিয়াছেন "Their correspondence, if any, was never found to be *sub rosa.* They came in broad day-light and proclaimed the intended massacres by beats of tomtoms." সংখ্যায় হিন্দু, মুসলমানের অপেক্ষা কোনও কালেই কম ছিল না, সর্ব্বত্রই হিন্দুযোদ্ধার সংখ্যা অধিক ছিল, কিন্তু তাহাতেও হিন্দু জয়ী হয় নাই। জয়ী হইলে সাত শত বৎসরকাল গোলামী করিবে কেন? দৈহিক শক্তি থাকিলে, সাধ করিয়া কি কেহ গোলামী করে? দৈহিক শক্তি থাকিলে স্বধর্ম্মের

যবনের নিকটে প্রপীড়িত হইবে কেন? ভারতের নেপাল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত রাজা এবং রাজাদিগের সেনারা একত্র হইয়া অস্ত্র শস্ত্র ও ধন দিয়া, বুদ্ধি ও কৌশল সহকারে, মুসলমানের সহিত বার বার যুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু শেষে বিজয়লক্ষ্মী মুসলমানেরই প্রাসাদে গিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন; একথা বলা বাহুল্য, মুসলমানদিগকে সিন্ধুনদ পার হইয়া পর্ব্বত, প্রান্তর, জঙ্গল ও জাঙ্গাল ভেদ করিয়া, বহুদূর, দুর্গম ও ব্যয়জনক পথ হইতে সামান্যমাত্র লোক আনিয়া লড়াই করিতে হইয়াছিল। স্বীকার করি, অতীতকালে হিন্দুর মহাবলী ভীম এবং মহাযোদ্ধা অর্জ্জুন ও অভিমন্যু প্রভৃতি ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা "আপোষে" অর্থাৎ নিজে নিজে, হিন্দুতে হিন্দুতে, ঘরে ঘরে, লড়াই করিয়া একে অপরে হারাইয়া দিয়াছিলেন, তখন তুলনায় উৎকৃষ্টত্ব বা অপকৃষ্টত্বের সম্বাদ লইবার কেহ ছিল না; তখন ঘরেঘরেই লড়াই হইত, অপরের সহিত লড়াই হয় নাই। মুসলমানের হাতে পড়িয়া হিন্দুর গর্ব্ব খর্ব্ব হইল; হিন্দু বুঝিল "আমার অপেক্ষাও বীর আছে, আমার দৈহিক শক্তির অপেক্ষা মুসলমানের দেহের শক্তি অত্যন্ত অধিক।" হিন্দু বার বার চেষ্টা করিয়াও, শারীরিক ও মানসিক এই উভয় শক্তি সহযোগেও মুসলমানকে হটাইতে পারে নাই—মুসলমানকে বলহীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে নাই। তুলনায় হিন্দুর দৈহিক বল কোথায়? মুসলমানের গোলামী করিবার পরে, হিন্দুজাতি, পর্টুগিজ, ফরাশীশ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরাজ প্রভৃতির প্রায় তিনশত বৎসর কাল ব্যাপিয়া দাসত্ব করিতেছে। ইহারাও কি সকলেই কেবল ছলে বলে এই তিন শত বৎসর কাল নেপাল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত রাজত্ব স্থাপন এবং শাসন বিস্তার করিয়াছে? জেম্‌স্ মিল নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিকের সুবৃহৎ ভারতেতিহাসে দেখিতে পাই,

এসিয়ার কোন কোন স্থান হইতে ভারতে আসিয়া দুই দিন চারি দিনের চেষ্টায় এক একটা ক্ষুদ্র রাজত্ব স্থাপন করিয়া স্বাধীন নরপতি ভাবে রাজত্ব করিয়াছিল। হিন্দুরা চোখ কান বুঁজিয়া তাহা দেখিত; হাঙ্গামা আরম্ভ হইলেই দুই এক তরবারীর আঘাতে হিন্দু পলাইয়া যাইত। বর্ব্বর মূর জাতির দেহস্থ ধমণীতে মুসলমান শোনিত প্রবাহিত; এই মূরেরা প্রায় পঞ্চবিংশ বর্ষকাল মালাবার উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া সিংহল পর্য্যন্ত শাসন করে। বালি দ্বীপের লোকেরা চিরকালই হিন্দু (শৈব), এবং চিরকালই বিদেশীয়ের গোলাম। ইতিহাস পড়িয়া এবং ভারত ভ্রমণ করিয়া বুঝিয়াছি, ইংরাজের অপেক্ষা সর্ব্বত্রই হিন্দুর সেনা ও অস্ত্রের সংখ্যা অধিক ছিল। চিলিয়ানালা, মুদ্‌কী, গুজরাট প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়া অনেকে হিন্দুর দৈহিক শক্তির পরিচয় দেন,—দৈহিক শক্তি থাকিলে হিন্দু হারিবে কেন? দৈহিক শক্তি থাকিলে শত শত হিন্দু জাতি ও হিন্দু রাজ্য মুসলমান জাতি ও মুসলমান রাজ্যে পরিণত হইয়া গেল কেন? কেহ কেহ বলিবেন, তোপের মুখে হিন্দু উড়িয়া যায়, টিঁকিতে পারে না; এ কথায় বালকত্ব ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। কয়টা তোপ লইয়া ইউরোপীয়েরা ভারত জয় করিয়াছে? কয়টা তোপ লইয়া গ্রীক ও মুসলমানেরা হিন্দুস্থানে বিজয় পতাকা উড়াইয়াছিল? সতের জন মাত্র সেনা লইয়া একদিনেই বখ্‌তিয়ার খিলিজ বাঙ্গালা জয় করেন!* আর তের জন বৃটীশ গোরা অটল অচলোপরিস্থিত সুদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত, গোয়ালিয়র ও ইন্দোর সেনা-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত, আসিরগড় নামক মধ্য ভারতের সুপ্রসিদ্ধ দুর্গ হস্তগত করিয়া লয়! এখনও গরু কাটা হাঙ্গমায় যেখানে যেখানে হিন্দু

* অনেকে একথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রতিবাদে কোনও অকাট্য প্রমাণ বা

মুসলমানে লড়াই বাধিয়াছে, কচু কাটার মত মুসলমানেরা হিন্দুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া অথবা লাঠি দ্বারা হাত পা ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। হিন্দু এখনও বৃথা অহঙ্কার ছাড়ে নাই; এখনও বিশ্বাস করে "আমার শারীরিক বল ইংরাজ ও মুসলমান অপেক্ষা বেশী।" মহরম, চেহেলম, ঈদ্, রামলীলা প্রভৃতির উৎসবে হিন্দু ও মুসলমানে যখনই লড়াই হইয়াছে, হিন্দু ঘৃণিত ভাবে আহত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া পরাজিত হইয়াছে। এটোয়া, দিল্লী, বোম্বাই, মিরট, সালেম, পেশোয়ার প্রভৃতির অসংখ্য লড়াই ইহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও সাক্ষী, তবুও হিন্দু দৈহিক শক্তি লইয়া বৃথা বড়াই করিতে চাহে! তাহার পরে, ভারতের হিন্দু অধিবাসীর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিচার করিয়া দেখুন। বাঙ্গালীর শারীরিক বলের কথা না তুলাই ভাল; মাটিয়ারির রামদাস বাবু অথবা ঢাকার বাবু শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত কয় জন লোক আছেন? বলশালী লোকের সংখ্যা দুই, চারি, ছয় করিয়া অঙ্গুলিতে গণনা করা যায় এবং অঙ্গুলিতে গণনা করিতে করিতেই তাহা সমাপ্ত হইয়া যায়। ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া বাঙ্গালীর চির-কালই একটা রোগ। যে দেশে বার বছরের বালিকার গর্ভ সঞ্চার হয়, যে দেশের লোকের বলহীনতার অপনোদন জন্য কন্‌সেণ্ট্ আইনের প্রয়োজন, যে দেশে "হরিমতি"র মোকর্দ্দমার সংখ্যা প্রতি মাসে দুই চারি শত বলিলেই হয়, সে দেশের লোকের আবার বলশালীত্ব দেখাইতে লজ্জা হয় না? এদিকে মাদ্রাজীর দৈহিক বল বাঙ্গালীরই তুল্য; তেঁতুল-খাওয়া, লংকামরিচজীবি, পান্তাভাতভোজী মাদ্রাজী, বাঙ্গালী ভ্রাতারই অনুরূপ। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের শিক্ষিত পুরুষেরা পেনেল কোডের ভয়েই আতঙ্কিত, লাল পাগড়ী সিপাই দেখিলেই দরজা বন্ধ করেন। অশিক্ষিত লোকদিগের দৈহিক বলের কথা

ভাল। রাজপুত ও শিখ এখন সারমেয়তাড়িত মেষশাবকের অবস্থায় পতিত। ভারতের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত লোকেরা কিরূপে উদর পূরণ করিয়া শরীর ও আত্মাকে রক্ষা করে, পৃথিবীর প্রধান প্রধান জাতির গড়ে প্রাত্যহিক আহারীয় খরচের একটি তালিকা দেখিলে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

নাম।	গড়ে দৈনিক আহারীয় ব্যয়।	নাম।	গড়ে দৈনিক আহারীয় ব্যয়।
বৃটিশ দ্বীপ (মায় ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড, স্কট্‌লণ্ড ও ওয়েল্‌স্)	॥/০	অষ্ট্রিয়া	৶১০
ফ্রান্স	৵০	চিন	৶০
বৃটীশ আমেরিকা ...	।৶০	তুরস্ক	৵১৫
জর্ম্মণি	।/০	পারস্য	৵০
রুশ	।১০	মিশর	/১৫
		জাপান	/৫
		ভারত	৲১৫

হতভাগ্য ভারতের অধিবাসী—ঋষিদিগের, যোগীদিগের, জগতের প্রধান রাজন্যদিগের কামধেনু ভারতভূমির অধিবাসী—সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং ভারতভূমির অধিবাসী—প্রত্যহ গড়ে দুই বেলায় তিনটি মাত্র পয়সায় শরীর, মন ও আত্মাকে রক্ষা করে। এক বেলার ভোজনের ব্যয় গড়ে দেড় পয়সা মাত্র! একথা অসত্য নহে, ইহা পূর্ব্ব দিকে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় জ্বলন্ত সত্য। ভারতের কোটি কোটি লোক কেবল এক বেলা মাত্র আহার করে, লক্ষ লক্ষ লোক "চাবানা" (ছোলা ভাজা) খাইয়া এক বেলা উদর পূরণ করে, আর রাত্রে মকাইয়ের রুটি ও পুদিনার চাট্‌নী খায়। কোটি কোটি লোক কেবল লবণ মরিচ দিয়া পান্তাভাত খাইয়া জীবন ধারণ করে, লক্ষ লক্ষ লোক [illegible] ভারতবাসীর

সাংসারিক লোকের কখনও দৈহিক বল হয়? যোগী, ঋষি, সন্ন্যাসী বা মুনিদিগের হইলে হইতে পারে, সাংসারিক মানুষের তাহা হয় না, ইহা নিশ্চয়। দশ বৎসর গত না হইতে হইতে কতবার দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, মহামারী প্রভৃতির প্রকোপ হয় তাহা বলা যায় না। দৈহিক বল থাকিবে কেমনে? অসময়ে পুত্র হইলে যেমন সে পুত্র ভালরূপে বলবান, বুদ্ধিমান ও শ্রীমন্ত হয় না, সময় মত বৃষ্টি না হইলে শস্য সমূহও পরিমাণে অপ্রচুর এবং বলহীন হইয়া থাকে। বীর্য্যহীন শস্য খাইয়া দেহের অপকার ভিন্ন উপকার হয় না। আমি বাল্যকালে এক টাকায় একমণ দুই সের চাউল, দশ সের সর্ষপ তৈল, আড়াই সের ঘৃত এবং কুড়ি সের দুগ্ধ স্বহস্তে খরিদ করিয়াছি। এখন টাকায় আট সের চাউল, সাত পোয়া খাঁটি সরিষার তৈল, তিন পোয়া ঘৃত এবং সাত সের দুগ্ধ। খাইবে কি! পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক টাকায় ২৩ সের ভাল আটা বিক্রয় হইত, এখন সেখানে নয় সের আটা এক টাকায় বিক্রয় হইয়া থাকে। কি খাইয়া বলাধান হইবে বল দেখি? এ দিকে ধর্ম্মধ্বজী হিন্দু প্রচারক মহা সুযোগ বুঝিয়া, ঘৃত ও দুগ্ধের মহার্ঘতা দেখিয়া, অবলা গাভীর নামে হিন্দুকে ঠকাইবার জন্য গোরক্ষিণী সভা স্থাপনা পূর্ব্বক চাঁদা আদায় করিয়া আত্মসাৎ করিতেছে। কিন্তু গরু কাটা কোথাও বন্ধ হয় নাই; ছাউনীতে (কাণ্টনমেণ্টে), কসাইখানায় প্রতি নিয়ত শত শত গোহত্যা হইতেছে। একটি গাভীও রক্ষা হয় নাই, রক্ষা হইতেও পারে না। মোট কথা এই, যে জাতির প্রাত্যাহিক খোরাকের খরচ তিন পয়সা, যে জাতি দ্বাদশ শত বর্ষাধিক কাল ব্যাপিয়া গোলামী বিদ্যায় পটু হইয়াছে, তাহার আবার দৈহিক বলের পরিচয় কি? যাহার উদরে ভাত নাই, গাত্রাবরণের কাপড় নাই, লাঠি ধরিবার

ক্ষুধিত, পিপাসিত, কৃশদেহ, কাঙ্গাল ক্রীতদাসের ভাবী দশাকে কি কথনও মহত্ত্বব্যঞ্জক বলিয়া আশা করা যায়? এমন হতভাগ্য দেশ ও এমন হতভাগ্য তুচ্ছ জাতি পৃথিবীর ইতিহাসে কথনও স্থান পায় নাই, জগতের মানচিত্রে ইহাদের জন্মভূমি কথনও অঙ্কিত হয় না। বৃথা অহঙ্কার, বৃথা অভিমান পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুর ভাবী দশাটা একবার ভাবিয়া দেখিবে কি? আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। হে ভগবন্! সমাজসংস্কারক এবং স্বদেশহিতৈষীদিগের চক্ষু উন্মীলিত হউক, তাহাদের দুরপনেয় ভ্রম অপনোদিত হউক, বিনীতভাবে তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা।

(২) রাজনৈতিক শক্তি।

ভারতবাসী হিন্দুর রাজনৈতিক শক্তি কেবল সম্বাদ পত্রের বড় বড় প্রবন্ধে, টাউনহলের সুদীর্ঘ বক্তৃতায়, কংগ্রেসের "লেফফা দোরস্ত" রিজোলিউশনে। সমগ্র পৃথিবী খুঁজিয়া আসিলেও হিন্দুর এক কাঠা জমিও "নিজের" বলিবার নাই। ভারতে মুসলমান ইংরাজের গোলামী করিলেও, আরব্য, পারস্য, তুরস্ক, তাতার, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, মিশর, জাঞ্জিবার, কুর্দ্দিস্থান, মেসোপটেমিয়া, আলজিরিয়া প্রভৃতি দেশে তাহাদের স্বাধীন রাজ্য ও রাজত্ব আছে। আজি যদি মুসলমানকে ইংরাজ ভারতভূমি হইতে তাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলেও মুসলমানের চিন্তা বা আতঙ্ক নাই, তাহারা ভারতের সীমা পার হইয়া অসংখ্য স্বধর্ম্মীর সহিত মিলিয়া নিজের ধর্ম্ম, ভাষা, আচার, ব্যবহার, শাস্ত্র, সমাজ, স্বাধীনতা এবং শক্তিকে রক্ষা করিতে পারে; এইরূপ পরিবর্ত্তনে তাহাদের ক্ষতি নাই, বরং লাভই আছে। ভারতে মুসলমান গোলাম, ভারতের বাহিরে (স্বরাজ্যে) মুসলমান স্বাধীন! খৃষ্টানেরা ভারত হইতে তাড়িত হইলে [illegible] পৃথিবীর [illegible] তাহারা নিজের

তিব্বত, জাপান, শ্যাম প্রভৃতি প্রদেশে বাস করিতে সক্ষম হয়। স্বল্প সংখ্যক পার্শীরা পারস্যে গিয়া আবার প্রাচীন অগ্নি-উপাসকদিগের সহিত মিলিত হইতে পারে। কিন্তু ভাই হিন্দু! আজি যদি ইউরোপীয় পুরুষ তোমাকে ভারত হইতে নির্ব্বাসন করে, বল দেখি, তুমি কোথায় যাইবে? এই সুবিশাল বিশ্বসংসারে তোমার "নিজের" বলিবার এক কাঠা জমিও আছে কি? ভারতের সীমা পার হইলেই তোমাকে মুসলমান না হয় খৃষ্টান অথবা বৌদ্ধ হইতে হইবে! অ-হিন্দু না হইলে তোমার আর ভারত ছাড়া হয় না! অ-হিন্দু হইলে তোমার ভাষা, তোমার ধর্ম্ম, তোমার বেশ ভূষা, তোমার শাস্ত্র—এমন কি তোমার নাম ও রক্ত পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, তোমার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিবে না। রোমকেরা যখন য়িহুদীদিগকে য়িহুদ দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল, তাহাদের তখন কি দশা হইয়াছিল, পুরাতন বাইবেল পড়িয়া দেখিয়াছ কি? সাত কোটি য়িহুদির মধ্যে এখন পৃথিবীতে য়িহুদির সংখ্যা মোটে ৪০ লক্ষ! মাথা রাখিবার জন্য শৃগালীর একটা ভূগর্ত্ত থাকে, পাখীর মাথা রাখিবার জন্য বৃক্ষ কোটর বা নীড় আছে, মকর কুম্ভীরের জন্য নদ নদী আছে, বাঘ ভালুকের জন্য বন জঙ্গল আছে,—বল দেখি ভাই হিন্দু! তোমার মাথা রাখিবার জন্য জগতের কোনও স্থলে একটুকু, স্থানও আছে কি? শীত গ্রীষ্ম বা বর্ষায় যাহার মাথা রাখিবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত নাই, সমস্ত পৃথিবীতে যে জাতি "স্থানশূন্য," তাহার আবার রাজ-নৈতিক শক্তির পরিচয় দিতে লজ্জা হয় না?

(৩) আর্থিক শক্তি।

জাতীয় ধন বৃদ্ধি, জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। বোম্বাই ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম ধনী,

বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজে টাকাটা কোথাও গচ্ছিত থাকে না, কেবল জনসাধারণের মধ্যে অতি অল্প অল্প পরিমাণে বিভাগ হইয়া থাকে। যেখানে টাকা জমা আছে সেখানে তাহার ব্যবহার নাই, যেখানে টাকাটা জনসাধারণের মধ্যে বিভাজিত হইয়া গিয়াছে সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে অতি সামান্যমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছে. সেই সামান্য মাত্র টাকায় জাতীয় ধনবৃদ্ধির সহায়তা হয় না। ভারতের সহিত পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাজ্যের জাতীয় ধনের পরিমাণটা একবার তুলনা করিয়া দেখিলে হয় না? কৃষি, বাণিজ্য, ব্যবসা, আমদানী, রপ্তানী প্রভৃতিতে জাতীয় ধনের উৎপত্তি হয়; মুসলমানেরা বিদেশীয় রাজা ছিলেন একথা সত্য, কিন্তু তাঁহাদের শাসন সময়ে এ দেশের টাকা এ দেশেই থাকিত, এখনকার মত সমুদ্র পার হইয়া বিদেশে টাকা রপ্তানা হইত না, এবং বিদেশীর হস্তে বিদেশীর ভোগের জন্য টাকা চালান যাইত না। পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাজ্যের জাতীয় ধনের হিসাবটার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর দেখি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সমস্ত পৃথিবীর সভ্যরাজ্যের যদি মূলধন ১১০৲ টাকা হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত পঞ্চদশ সাম্রাজ্য গড়ে নিম্নলিখিত হিসাবে জাতীয় ধন প্রাপ্ত হয়েন।

রাজ্যের নাম।	জাতীয় ধন (গড়ে)	রাজ্যের নাম।	জাতীয় ধন (গড়ে)
বৃটীশ দ্বীপ	১৯৲	পর্টুগাল	১০৲
আমেরিকা	১৭৲	পারস্য	৩৷৵০
ফ্রান্স	১১৷০	স্পেন	৫৲
জর্ম্মণি	৭৲	তুরস্ক	৩৷৷০
অষ্ট্রিয়া	৬৷৷০	চীন	৪৷৷০
রুসিয়া	৮৲	জাপান	৩৷৷৵০
মিশর	৩৲	ভারতবর্ষ	১৷০

এই হিসাবে শত অংশের একাংশাপেক্ষাও কম ভারতবর্ষ প্রাপ্ত হয়। তাহাও ইংরাজের—বিদেশীয়ের হস্তে! ভারতের আর্থিক শক্তিটা বুঝিলে কি? দেশীয় রাজাদিগের কাহারও ঘরে নগদ টাকা নাই, প্রাচীন জমিদার বংশ ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়া আসিতেছে, আধুনিক জমিদারদিগকে গবর্ণমেণ্ট রেভিনিউ দিবার সময়ে টাকা কর্জ্জ করিতে হয়, চাকুরীবৃত্তিধারীবৃন্দ প্রায়ই কোনও প্রকারে কেবল মোটা ভাত ও মোটা কাপড় লইয়া অতি কষ্টে দিনপাত করেন, শেঠ-সওদাগরেরা যাহা পায় তাহা মাতৃশ্রাদ্ধে বা কন্যা পুত্রের বিবাহে অপব্যয় করে, আর দেশের চা, কাফি, জঙ্গল, খনি প্রভৃতি বিদেশীয়-দিগের হাতে। কৃষকের অবস্থার কথা না তুলাই ভাল। হিন্দুর ভবিষ্যৎটা কেমন উজ্জ্বল তাহা দেখিতেছ? অবশিষ্ট কয়টী শক্তি সম্বন্ধে আগামী বারে আলোচনা করিব।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ব্যাকরণ ও বাঙ্গালাভাষা।*

কতকাল পূর্ব্বে ব্যাকরণ অথবা শব্দশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। কেহ বলেন বেদের ভাষা হই-তেই প্রথম ব্যাকরণের উৎপত্তি হয়। কেহ বা বেদসৃষ্টির বহুকাল পরে ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে এইরূপ অনুমান করেন। ঋগ্বেদের একটি ঋক্‌পাঠে মনে হয় বৈদিক কালেও ব্যাকরণ শাস্ত্রের সবিশেষ প্রচার ছিল। ঐ ঋকৃটি এই ;—

চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়োহস্য পাদাঃ,
দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসোহস্য।

ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি,
মহো দেবো মর্ত্ত্যাঁ আবিবেশ ॥

টীকাকার সায়নাচার্য্য উদ্ধৃত ঋকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহার মর্ম্ম এই ;—এই শব্দ-ব্রহ্মের শৃঙ্গ চারিটি, নাম—আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত। তিন চরণ—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল। দুইটি মস্তক, সুপ্ ও তিঙ্। সাতটি হস্ত, সাত বিভক্তি। উরস্, কণ্ঠ ও মস্তকে ইনি বিরাজিত হইয়া সর্ব্বদা মানবের সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন।

যখন এই ঋক্ প্রকাশিত হয় সেই স্মরণাতীত কালেও যে সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল উহা অনায়াসে উপলব্ধি হয়। তাহার পর কত যুগযুগান্তর অতীত হইয়াছে, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, গর্গ, গালব, ইন্দ্র, চন্দ্র, আপিশলি, স্ফোটায়ন, শাকল্য, শাকটায়ন, পাণিনি, সর্ব্ববর্ম্মা, বোপদেব, সুভূতি প্রভৃতি বহুসংখ্যক সূত্রকার ও কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, ব্যাড়ি, জয়াদিত্য, বামন, জিনেন্দ্র, দৌর্গসিংহ, ভর্ত্তৃহরি, ভট্টোজিদীক্ষিত প্রমুখ অসংখ্য বৃত্তিকার ও ভাষ্যকার জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের পুরাতন মাতৃভাষা অথবা সংস্কৃতভাষার অসীম উন্নতি সাধন করিয়াছেন। উল্লিখিত শাব্দিকবৃন্দ ব্যাকরণ শাস্ত্রে এরূপ সকল অপূর্ব্বকৌশল সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন, উহা পাঠ করিয়া এখন বৈদেশিক বিদ্বদ্‌গণ পর্য্যন্ত সেই ব্যাকরণ শাস্ত্রের মুক্তকণ্ঠে অসীম প্রশংসা করিতেছেন। তাঁহাদের আবিষ্কৃত নিয়ম সমূহ যে কেবল সংস্কৃতভাষাকেই অক্ষয় দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে সুধু তাহা নহে, যে সকল ভাষা সংস্কৃত ভাষার অঙ্ক আশ্রয় করিয়া লালিত পালিত হইতেছে তাহারাও ঐ সকল অনুশাসন অনুসরণ করিয়া উপকৃত, ইহা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

সংস্কৃত ভাষা কোনও কালে সর্ব্বসাধারণের কথোপকথনের ভাষা

সর্ব্ববাদিসম্মত। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের কয়েকটি বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দী, মরাঠী, বাঙ্গালা, উড়িয়া, তেলেগু, আসামী প্রভৃতি কয়েকটি উপভাষা প্রচলিত। এই সকল ভাষা কোথা হইতে উৎপত্তি লাভ কবিল তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া কেহ বলেন ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন, কেহ কেহ বা পালি ও প্রাকৃত ভাষার দ্বার দিয়া ইহারা উৎপন্ন হইয়াছে অনুমান করেন। শেষোক্ত মতই বর্ত্তমান সময়ে সমধিক আদৃত। এই সকল ভাষার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবীতে অধিরূঢ়। হিন্দী ও মরাঠী অপেক্ষাকৃত উন্নত হইলেও উহাদের স্থান বাঙ্গালা ভাষার অনেক নিম্নে। যে সকল উত্তরপশ্চিম প্রদেশবাসী অথবা মহারাষ্ট্রবাসী বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে আপন আপন ভাষা হইতে বাঙ্গালার ঔৎকর্ষ স্বীকার করিয়া থাকেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাঘব পাঠক নামক একটি মহারাষ্ট্রীয় যুবক সংস্কৃতকলেজের এম্ এ ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেন, তিনি বেশ বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া তিনি এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সকলের মধ্যে মুক্তকণ্ঠে বলিতেন বাঙ্গালার ন্যায় উৎকৃষ্ট ভাষা ভারতবর্ষে আর নাই। এরূপ কোমল, মধুর পদাবলী এক সংস্কৃত ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় দৃষ্ট হয় না।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের হিন্দী অনুবাদকের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সহকারী পণ্ডিত কানাইলাল শাস্ত্রী পশ্চিমদেশবাসী হইয়াও বাঙ্গালা ভাষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি একদিন বেঙ্গলগবর্ণমেণ্টের পুস্তকালয়াধ্যক্ষ পণ্ডিত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়কে বলেন, "বাঙ্গালা ভাষার গঠন

তাহাতে ভাষার রীতি দোষ ঘটে না। আমরা যদি "ঘর্‌মে যায়গা" না বলিয়া "গৃহমে যায়গা" বলি তাহা হইলে অর্থবোধের ব্যাঘাত হয় না বটে কিন্তু খাঁটী হিন্দী হয় না। বাঙ্গালায় "ঘরে যাব" ও "গৃহে যাব" দুইই লিখিতে পারা যায়। বাঙ্গালা ভাষার গুণ এই যে, ইহাতে ইচ্ছামত সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু হিন্দী ভাষায় তাহা হয় না। এই জন্য বাঙ্গালার ন্যায় হিন্দী ভাষার উন্নতি হইতেছে না।"

হাইকোর্টের আসামী ভাষার অনুবাদক শ্রীযুক্ত রমাকান্ত বর্কাকাটী মহাশয়ের সহিত উক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যসংক্রান্ত কথোপকথন হয়। শাস্ত্রী মহাশয় প্রশ্ন করেন "আপনারা আমাদের নিকট-প্রতিবেশী হইয়াও কেন আসামী একটা স্বতন্ত্র ভাষা করিতেছেন। আপনারা বাঙ্গালা সাহিত্য ব্যবহার করেন না কেন?" তাহাতে বর্কাকাটী মহাশয় বলেন, "পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় কিংবা বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি যে প্রকার বাঙ্গালা লিখিয়াছিলেন, উহা যদি আপনাদের আদর্শ সাহিত্যের ভাষা হইত তাহা হইলে আমরাও আসামে উহা প্রচলিত করিতে পারিতাম। কিন্তু বাঙ্গালার চলিত কথা গুলি যখন সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হইতে চলিল, তখন আসামী চলিত ভাষাগুলি অপরাধ করিল কি? এই জন্য আমরা আসামীকে লিখিত ভাষায় পরিণত করিতেছি।"

বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে ভিন্ন প্রদেশবাসীদের এইরূপ উচ্চ ধারণা। এখন বিবেচনা করা কর্ত্তব্য বাঙ্গালা ভাষার এই উৎকর্ষের কারণ কি? আমরা বলিব সংস্কৃত ভাষার সহিত সন্নিহিত সম্বন্ধই ইহার উৎকর্ষের কারণ। প্রায় সহস্রাধিক বৎসর হইল এই ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে,

ইহার গতি, স্থিতি সমুদয়ই সংস্কৃতের অনুরূপ। দেশজ ও ভিন্ন দেশীয় বহুসংখ্যক শব্দ ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে সত্য কিন্তু তাহারা অধিকাংশ স্থলেই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই, কৌলিক বিধি নিষেধ বিসর্জ্জন দিয়া সংস্কৃতের অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আছে।

অনেকে বলেন প্রাকৃত ভাষা ও পালি ভাষার সহিতই সংস্কৃত ভাষার নিকট সম্বন্ধ, কিন্তু আমাদের মনে হয় বাঙ্গালা ভাষার সহিত উহা অপেক্ষাও নিকটতর সম্পর্ক। সংস্কৃত ও পালির বর্ণবিন্যাসভেদেই উহারা ভিন্ন ভাষা বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার বর্ণবিন্যাস সংস্কৃতের প্রায় অনুরূপ সুতরাং ইহা একপ্রকার কালান্তর প্রচলিত সংস্কৃতভাষা। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন তাঁহারা দুরূহ শব্দের অর্থ ব্যতীত রামায়ণ, হিতোপদেশ প্রভৃতি সহজ সংস্কৃত গ্রন্থের অর্থ অনায়াসে বুঝিতে পারেন, কিন্তু একজন বিদেশীয় পালিভাষাবিৎ ঐ সকল গ্রন্থের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। অবশ্য পালিভাষায় অসংখ্য উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে সত্য কিন্তু ভাষার প্রকৃতি ও সামর্থ্যের বিচার করিতে হইলে স্বীকার করিতে হয় বাঙ্গলাভাষা পালি অপেক্ষা অধিক উন্নত। আজ পর্য্যন্ত ও যে এই ভাষা নিজের প্রকৃতিগত ঔৎকর্ষ ও মাধুর্য্য হারায় নাই উহার একমাত্র কারণ ব্যাকরণের অনুশাসন। অনেকে বলেন প্রাকৃত ভাষার সহিতই সংস্কৃতভাষার অধিক নিকট সম্বন্ধ, কিন্তু প্রাকৃত ব্যাকরণ ও প্রাকৃত ভাষার সাহিত্য পাঠ করিয়া উহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্যই লক্ষিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের একজন পল্লীবাসী কৃষকও "যুধিষ্ঠির" শব্দটি উচ্চারণ করিতে পারে ও উহার অর্থ বুঝে; কিন্তু প্রাকৃতভাষার "জহিঠ্‌ঠিল" শব্দ উচ্চারণ করা ও উহার অর্থ বুঝা তাহার পক্ষে অতীব কষ্টসাধ্য। এইরূপ প্রাকৃতভাষার মণংসিনী, পসিদ্ধী, পবাসূ, সীসো, অজ্জা, কিবা, সিট্ঠি, পউত্তী, মঅণ, সাঅর, উইদ প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ও

প্রবৃত্তি, মদন, সাগর, উচিত প্রভৃতি আকারে লিখিত ও উচ্চারিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর পক্ষে শেষোক্ত শব্দগুলির অর্থ গ্রহণ করা যত সহজ পূর্ব্বোক্ত গুলি কদাচ সেরূপ নহে। এতদ্ভিন্ন ব্যাকরণের নিয়মগত সাদৃশ্য সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার অধিক। সংস্কৃতভাষার "তরুণি" শব্দ সংস্কৃত ও বাঙ্গলা উভয় ভাষারই স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু প্রাকৃত ভাষায় "তরুণি" শব্দ পুংলিঙ্গ। প্রাকৃত ব্যাকরণ প্রণেতা বররুচি লিখিয়াছেন ;—

"প্রাবৃট্ শরত্তরুণ্যঃ পুংসি।" ২৯।২। প্রাবৃট্, শরৎ, তরুণি ইত্যেতে শব্দাঃ পুংসি প্রয়োক্তব্যাঃ।

অতএব সংস্কৃত ভাষায় "ইয়ং তরুণি অতীব সুন্দরী" এইরূপ প্রয়োগ হয়। বাঙ্গালায়ও "এই তরুণী অতীব সুন্দরী" লেখা যায়। কিন্তু প্রাকৃতে লিখিত হইলে তরুণির পর একটি পুংলিঙ্গ বিশেষণ যোগকরা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত লৌকিক সংস্কৃতে যতগুলি স্বর ও ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হয় বাঙ্গালা ভাষায়ও অবিকল ততগুলিই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাকৃত ভাষায় ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, ঐ, ঔ এই কয়টি স্বর এবং ঙ, ঞ, শ, ষ, ন, য এই কয়টি ব্যঞ্জন বর্ণ নাই। আর প্রাকৃতের শব্দ গুলি এতই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যে একজন বাঙ্গালা ভাষাবিদের পক্ষে সংস্কৃত বুঝা যেমন সহজ, প্রাকৃত বুঝা তেমন সহজ নহে। প্রাচ্যা, আবন্তী, পাঞ্চালী, মাগধী, পৈশাচী প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ প্রাকৃত ভাষা বহুভাগে বিভক্ত। প্রকার ভেদে ইহাদের শব্দের রূপ ও ক্রিয়ার আকার কথঞ্চিৎ বিভিন্ন। এখানে উৎকৃষ্ট প্রাকৃত হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"হলা সউন্দলে ইঅং সঅংবরবহু সহআরস্স তুএ কিদণামহেআ বণজোসিণিত্তি ণোমালিআ ণং বিস্সুমরিদাসি।"

"অয়ি শকুন্তলে ইয়ং স্বয়ংবরবধূঃ সহকারস্য ত্বয়া কৃতনামধেয়া

"অয়ি শকুন্তলে এই সহকার তরুর স্বয়ম্বরবধূ তোমাকর্ত্তৃক বন-জ্যোৎস্না এইরূপ কৃতনামধেয়া নবমালিকা ইহাকে বিস্মৃত হইয়াছ ?"

এই স্থান পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় প্রথমটি ভিন্ন ভাষা ও শেষোক্ত দুইটি প্রায় এক ভাষা।

পালিভাষাও বাঙ্গালার ন্যায় উন্নত নহে। ইহার ব্যাকরণের নিয়ম অনেকটা সংস্কৃতের অনুরূপ বটে কিন্তু মহর্ষিকাত্যায়নের বিরচিত পালিব্যাকরণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, এই ভাষায় ঋ ৠ ঌ ৡ ঐ ঔ এই কয়টি স্বর ও শ ষ এই দুইটি ব্যঞ্জন বর্ণ নাই। ঌ কারকে ব্যঞ্জনের শ্রেণীতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে মতু ও বতু প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষস্থ নকারের লোপ হয়। মতিমান্, ধনবান্, ভানুমান্, বলবান্ প্রভৃতি শব্দ মতিমা, ধনবা, ভানুমা, বলবা, প্রভৃতি আকারে উচ্চারিত হইয়া থাকে। ইহাতে রেফ, রফলা, মফলা, যফলা, বফলা প্রভৃতি নাই। পুত্র, শ্রমণ, অশ্ব প্রভৃতি শব্দ এই ভাষায় পুত্ত, সমণ, অস্স প্রভৃতি আকারবিশিষ্ট হইয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। এখানে একটি পালিশ্লোক উদ্ধৃত হইল।

ন পুপ্ফগন্ধো পটিবাতমেতি,
ন চন্দনং তগরমল্লিকাবা।
সতঞ্চ গন্ধো পটিবাতমেতি,
সব্বাদিশা সপ্পুরিসো পবাতি॥

ন পুষ্পগন্ধঃ প্রতিবাতমেতি,
ন চন্দনং তগরমল্লিকেবা।
সতাঞ্চ গন্ধঃ প্রতিবাতমেতি,
সৎপুরুষঃ সর্ব্বা দিশঃ প্রবাতি॥

গন্ধও বায়ুর বিপরীত দিকে যায় না। সৎলোকের গন্ধ বায়ুর বিপরীত দিকে যায়, সৎপুরুষের গন্ধ সকল দিকে প্রবাহিত হয়।

পালিভাষার সাহিত্য ও ব্যাকরণ পাঠ করিলে মনে হয় ইহা সংস্কৃতভাষার অসংযত উচ্চারণ ও অসংযত ব্যবহার দ্বারাই উৎপন্ন হইয়াছে। অনেক অশিক্ষিত ও গ্রাম্য লোকেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইত। তাহারা মুখে মুখে অভ্যাস করিয়া কিংবা নিজে রচনা করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিত উহা জনসাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল এবং কালক্রমে তাহাই পালিভাষা বলিয়া গণ্য হইল। এই পালিভাষা যথেচ্ছ উচ্চারণ ও বর্ণ-বিন্যাস দ্বারা নিজের স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে সত্য, কিন্তু অধিক কাল স্থায়ি হইতে পারে নাই। যেই বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার পুনরায় অভ্যুদয় হইয়াছে অমনি উহা মৃত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যাহা হউক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচাররূপ একটা প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত পালিকে লিখিত ভাষায় পরিণত করিবার আবশ্যক হইয়াছিল কিন্তু সংপ্রতি বিশুদ্ধভাবে উচ্চারিত ও লিপিবদ্ধ বঙ্গভাষাকে যদি আমরা অশুদ্ধ উচ্চারণ ও অশুদ্ধ বর্ণ-বিন্যাস দ্বারা নিম্নশ্রেণীর ভাষায় পরিণত করি, তাহা হইলে আমাদের কোন্ মহান্ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে? এই যে চিরন্তন সংস্কৃত ভাষার বহু শব্দ সহজে উচ্চারণ করা যায় না, হয়ত উহার বর্ণ-বিন্যাসের ও ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম তুলিয়া দিলে অনেকের পক্ষে উহা শিক্ষা করা সহজ হইতে পারে কিন্তু তজ্জন্য কি সংস্কৃতবিদ্‌গণ উহার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন? যদি উহার পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইত তাহা হইলে হয়ত এতদিন আর একটি অভিনব ভাষা আসিয়া বলপূর্ব্বক উহার স্থান অধিকার করিত। পরিবর্ত্তসহ নয় বলিয়াই চিরকাল ঐ ভাষা নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। বাঙ্গালাভাষাও যদি অভিনব

বর্ণবিন্যাস ও ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে স্বীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, তাহা হইলে ইহার অস্তিত্ব বহুকাল স্থায়ী হইবে নতুবা বিংশতি বৎসর অতীত না হইতে যে বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হইবে সেই ভাষা শিখিয়া কেহ বর্ত্তমান সময়ের লিখিত গ্রন্থের অর্থ বুঝিতে পারিবে না।

আমরা ব্যাকরণের নিয়ম ও বর্ণ-বিন্যাস অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য একান্ত অভিলাষী হইলেও ইহাতে ভিন্ন ভাষার শব্দ প্রবেশের বিরোধী নহি। ভিন্ন ভাষার শব্দ প্রবেশে ভাষার রীতি নষ্ট হয় না। সংস্কৃতভাষা অত্যন্ত রক্ষণশীল হইলেও উহাতে ভিন্ন ভাষার শব্দের একান্ত অভাব নাই। তামরস, পিক প্রভৃতি শব্দ পারস্যভাষা হইতে পরিগৃহীত।* ইহা ব্যতীত আরও এমন অনেক শব্দের নাম করা যাইতে পারে, যে সকল শব্দ সংস্কৃতের অঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় পারসী, আরবী, হিন্দী, উর্দ্দূ, পর্টুগিজ্, ইটালিক্, চীন, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার বহু শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালার আদিম অধিবাসীদের ভাষারও শেষ চিহ্ন কিঞ্চিৎ না আছে এমন নহে। ঐ সকল শব্দে যে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম চলিতে পারে না উহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নহে। তজ্জন্য কেহ কখনও ঐ সকল শব্দের উপর সংস্কৃতের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করেন নাই। তবে ব্যাকরণের কারক, বিভক্তি ও স্ত্রী প্রত্যয়াদি কোন কোন স্থলে ঐ সকল শব্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অতএব আমরা বাঙ্গালাভাষার গঠন প্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই বলিতে ইচ্ছা করি যে ইহাতে সহজ উচ্চার্য্য ও ভাবপূর্ণ সংস্কৃত শব্দ বহু-পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক। দেশজ শব্দগুলিও যাহাতে সংস্কৃতের সাদৃশ্যমূলক বর্ণবিন্যাস দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া সাধুভাষায় প্রচলিত হয় তজ্জন্য

যত্ন করা কর্ত্তব্য। ভাব প্রকাশের অনুরোধে সাধুভাষায়ও বৈদেশিক শব্দ গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু একটি বাক্যে একটি অথবা দুইটির অধিক বৈদেশিক শব্দ গৃহীত না হয়। বাঙ্গালা ভাষার গঠন প্রণালী সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে গিয়া আমি যে ধৃষ্টতা-প্রকাশ করিলাম, তজ্জন্য শ্রোতৃবৃন্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আমার ন্যায় অদূরদর্শী ব্যক্তির এই দুরূহ বিষয়ে কিছু না বলিলেও চলিত, তবে চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের প্রতি নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাঙ্গালাভাষার ব্যবহার সংক্রান্ত যে একটা কুসংস্কার আছে উহা দূর করিবার জন্য আমি ঐ কয়টি কথা বলিলাম।

সংপ্রতি আমি একটি গুরুতর বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিবার জন্য সভ্যবৃন্দের মনোযোগ প্রার্থনা করিতেছি। এই কথাগুলি বলাই আমার আজিকার সভায় প্রবন্ধপাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমি বিগত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতী পত্রিকায় কোন প্রসিদ্ধ লেখকের "বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত" শীর্ষক প্রবন্ধের একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশ করি, লেখক মহাশয় সাহিত্যপরিষদে উহার যে প্রতিবাদ প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক অভিমানী এবং তাঁহার লেখনী শাণিত। মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করাইয়া দিতে দুঃসাহসী হওয়ায় তিনি যেন একেবারেই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছেন। তিনি যেন মসীর পরিবর্ত্তে তীব্র বিদ্বেষবিষে লেখনী নিষিক্ত করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভ্রমগুলি অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

তাঁহাকে প্রতিবাদ করারূপ পাপের জন্য যে তীব্র দণ্ড তিনি আমার প্রতি বিধান করিয়াছেন, সে দণ্ড স্থিরচিত্তে গ্রহণ করিলাম এবং পুনর্ব্বার দণ্ডিত হইবার সম্ভাবনাসত্ত্বেও পুনর্ব্বার তাঁহার ভ্রমপ্রদর্শন করিয়া আমার যথাকর্ত্তব্য সাধনে ব্রতী হইলাম।

লেখক কবিহিসাবে একজন প্রতিভাসম্পন্ন লোক। কেহ একটা কোন

যে, সকল বিষয়েই তাহার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহরূপে মানিয়া লয়, তাহার সকল বাক্যই বেদবাক্যস্বরূপ প্রামাণ্য জ্ঞান করে; সুতরাং কবিবর যখন ব্যাকরণ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তপ্রয়োগের সহিত নিয়ম চালনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাহা ভুল হইল বা ঠিক হইল সে বিচার নির্ব্বিশেষেই ভক্তেরা তাহা গ্রহণে প্রস্তুত দেখিলাম, 'ধন্য ধন্য' 'পাণিনি পাণিনি' রব উঠিল। সুতরাং সত্যের খাতিরে আমাকে উহার সমালোচনা করিতে হইল। এখন তিনি যেরূপ বলিতেছেন, উহাতে বোধ হয় তিনি যেন ব্যাকরণপ্রণয়নকার্য্যে ব্রতী নহেন, সুধু কতকগুলি বাঙলা শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র, ব্যাকরণ যেন অন্য কেহ করিবেন। ইহা পূর্ব্বে জানিলে উহা লইয়া আলোচনা করিতাম না; কিন্তু জানিবার কোন উপায়ই ছিল না, কেননা তিনি যেরূপ গুরুগম্ভীরভাবে অমুক কথা মানি, অমুক কথা মানি না, ক্রিয়াপদবিশেষের অমুক নামটা ঠিক নহে, উহার স্থলে অমুক নাম রাখা গেল ইত্যাদি রূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন এবং অভিনব মত প্রবর্ত্তনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন ও সূত্র সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যয় কল্পনা করিতেছেন; তাহাতে নূতন মত প্রবর্ত্তক বৈয়াকরণ না বলিয়া কি বলিব?

এইবার তাঁহার উত্তরগুলির বিচার করা যাউক। আরম্ভেই তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া একটা অতি বড় সত্যের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়াছেন এবং তাঁহার শ্রোতৃ ও পাঠকবর্গের চক্ষেও ধাঁদা লাগাইয়া দিয়াছেন। ইহা দুঃখের বিষয় আমার নামে এক বিপুল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব্বেই আমি উহার সমালোচনা করিয়াছি। এই অভিযোগ শিশুজনোচিত ও হাস্যকর। তাঁহার প্রবন্ধ সাহিত্যপরিষদে আহূত বহুসংখ্যক সভ্যের সমীপে পঠিত হইয়াছিল। যে প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে, উহা প্রকাশিত হইয়াছেই মনে করিতে হইবে। কেননা

করিলে পাঠ করিতেও পারেন নাও পারেন, তথাপি তাহা প্রকাশিত বলিয়া গণ্য করা হয়, আর গৃহস্বামীদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়া যদি জবরদস্তি শুনাইয়া দেওয়া হয়, তবু উহা প্রকাশিত বলিয়া গণ্য করা হইবে না? এ বিষয়ে কি আইন আছে জানি না, সরল মনে সমালোচনা করিতে গিয়া আমি যে কোন অপরাধ করি নাই এ ধারণা আমার অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। আমি লেখক মহাশয়ের প্রবন্ধের যে কয়টী বিষয়ে ভ্রম প্রদর্শন করি তন্মধ্যে তিনি অধিকাংশ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সুতরাং ঐ কয়টী বিষয়ে বিতণ্ডা অনাবশ্যক। যে কয়টী বিষয় লইয়া তিনি তর্ক করিয়াছেন, উহা যথাক্রমে আলোচিত হইতেছে। লেখক তাঁহার গৌরচন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন ঃ—

"তর্কের বিষটা কি, অধিকাংশ সময়ে তাহা বুঝিবার পূর্ব্বেই তর্ক বাধিয়া যায়। সেটা যতই কম বোঝা যায়, তর্কের বেগ ততই প্রবল হয়।"

এই কথা কয়টি পাঠ করিয়া আমার একটি গল্প স্মরণ হইতেছে ;—

কোন পল্লীগ্রামে এক বৈরাগী ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। যত সাধু ভক্ত তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়াছেন। বাবাজী যেই পাঠ করিলেন,—"ভুসি সে কাবল প্রভু, ভুসি সে কাবল," অমনি ভক্তগণের নয়ন হইতে শ্রাবণের বর্ষার ন্যায় ধারাপাত হইতে লাগিল। শ্রোতাদের ঐরূপ ভক্তিরসে আপ্লুত দেখিয়া বাবাজীরও উৎসাহ বৃদ্ধি হইল, তিনি পুনঃপুনঃ "ভুসি সে কাবল প্রভু, ভুসি সে কাবল" পাঠ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হঠাৎ সেখানে একটি গ্রামের তহশীলদার পাটোয়ারি উপস্থিত। সে পাঠক ও ভক্তগণের ভক্তির আধিক্য দেখিয়া পরিতুষ্ট হইল বটে, কিন্তু কথার অর্থ কিছুই বুঝিল না। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া শেষে গ্রন্থের দিকে তাকাইয়া বলিল, বাবাজী ও কি পাঠ করিতেছেন? "ভুসি সে কাবল প্রভু" নয়, "তুমি সে কারণ প্রভু তুমি সে কারণ।"

পাষণ্ডের আগমন।” এস্থলেও কতকটা সেইরূপ হইয়াছে। যেদিন লেখক মহাশয়ের “বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত” শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিত হয়, সেদিন এতদূর উচ্চ প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হয় যে, আমেরিকা আবিষ্কারের পর কলম্বসের ভাগ্যেও ততদূর ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। তাহাতেই আমি কয়েকটি ন্যায্য কথা কাগজে প্রকাশ করি। যে সকল প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার সূত্রগুলি গঠিত হইয়াছে, সেই গুলি প্রায়ই ভ্রমাত্মক। বাচাল, ছাগল প্রভৃতি খাঁটি সংস্কৃত শব্দ, বাঙ্গালা নয়; ণিজন্ত ধাতুর নৈমিত্তিক ধাতু নামকরণ হইতে পারে না; জিয়ন্ত শতৃ প্রত্যয়ান্ত নহে; দেখ্ ধাতু একমাত্রিক হইতে পারে না ইত্যাদি। এই ভ্রম গুলির অধিকাংশই লেখক স্বয়ং স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তথাপি পাষণ্ড আমার প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপের বিরাম নাই। তাঁহার ভক্তবৃন্দ মন্তব্য করিতেছেন ঃ—

“তোমরা সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়াছ, বাঙলা ব্যাকরণের কি বোঝ? ইহাকে সেকালের ব্যাকরণ মনে করিও না, ইহা খাঁটি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ ইত্যাদি ইত্যাদি।” তজ্জন্যই বলিতেছি, অভক্ত আমরা বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ না বুঝিতে পারিয়াই তর্কের বেগ বৃদ্ধি করিয়াছি, বুঝিতে পারিলে কি এমন হইত?*

---

* শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ বিএল, মহাশয় বলেন অদ্য রবীন্দ্র বাবু উপস্থিত থাকিলেই ঠিক হইত। এই বিতণ্ডায় পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের বুদ্ধি খাতে খাতে বহিয়াছে। প্রত্যেক বিষয়ে তর্কের দিকেই তাঁহার মন ধাবিত। হরন্লি সাহেবের পুস্তক না দেখা দৌর্ভাগ্যের কথা। তিনি কয়েকবার যেরূপ বৈজ্ঞানিক বৈয়াকরণগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় তিনি “শব্দ বিজ্ঞান” মানেন না।

ইহার উত্তরে পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী বলেন বিতণ্ডা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। দেশে একটা নূতন ব্যাকরণ প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সাহিত্যসেবী মাত্রেরই সে বিষয়ে

আমি লিখিয়াছিলাম বাঙ্গালায় সম্প্রদান কারক রাখিলে দোষ কি? তজ্জন্য লেখক্ কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মতের অনুসরণ করিয়া আমার প্রতি নানাবিধ বিদ্রূপ করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র নজির প্রাকৃত ব্যাকরণে সম্প্রদানকারক নাই। লেখক যদি প্রাকৃত ব্যাকরণখানি পাঠ করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় অতটা রসিকতার অবসর পাইতেন না। প্রাকৃত ব্যাকরণে কারক নামক কোন পদার্থই নাই, তাহাতে সম্প্রদান কারক থাকিবে কি? প্রাকৃত ব্যাকরণকার বররুচি লিখিয়াছেন;—

"প্রাকৃতে ষড়্‌বিভক্তয়শ্চতুর্থ্যা অভাবঃ।"

ইহা ব্যতীত তিনি কারক নামক কোন প্রকরণই লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি জানিতেন অশিক্ষিত স্ত্রীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরই প্রাকৃতভাষা ব্যবহার্য্য। এই সকল ব্যক্তি ঠিক কারকানুযায়িভাষা ব্যবহারে অক্ষম সুতরাং তিনি এই ভাষায় কারক প্রকরণ সন্নিবিষ্ট করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। বাঙ্গালা ত সুধু স্ত্রীজাতি কিংবা নিম্নশ্রেণীর ভাষা নহে অতএব ইহাতে কারকের অসম্পূর্ণতা কেন থাকিবে? বস্তুতঃ কর্ম্মকারক ও সম্প্রদান কারক দুইটী এক পদার্থ নহে।

কর্ম্ম কি? ক্রিয়া নহে অথচ ক্রিয়াজন্য ফলশালী যাহা উহাই কর্ম্ম। আর কর্ম্মেতে উৎপত্তি, অবস্থান্তর, অথবা জ্ঞান এই তিনটি ব্যাপারের যে কোন একটি বিদ্যমান থাকা চাই। "ঘট করিতেছে" বলিলে ঘটে উৎপত্তি ব্যাপার বিদ্যমান আছে জানিতে হইবে। "কুণ্ডল করিতেছে"

মানি না একথা কেন উঠিল। আমি কেন জগতের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই 'শব্দ বিজ্ঞান' শ্রদ্ধার জিনিস। ভট্ট মোক্ষমূলরের ও মূর সাহেবের ভাষা বিজ্ঞানের মর্ম্ম আমি অতি সাদরে গ্রহণ করি। ঐ সকল মনীষী প্রত্যেকের শ্রদ্ধার পাত্র। বৈজ্ঞানিক [illegible] ফেলিয়া দিতে

বলিলে সুবর্ণের অবস্থান্তর হইতেছে মনে করিতে হইবে। আর "বেদ পাঠ করিতেছে" বলিলে বুঝিতে হইবে বেদ সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ হইতেছে।

সম্প্রদান কারক ওরূপ নহে। পূজা অনুগ্রহ অথবা কামনা করিয়া যদি কোন ব্যক্তিকে কোন বস্তু দান করা যায়, আর যদি গ্রহীতা সেই বস্তুতে স্বামিত্ব লাভ করে তাহা হইলে সম্প্রদান হয়। দীনকে অন্ন দান করিতেছে। এখানে দাতা অনুগ্রহ করিয়া অন্ন দান করিতেছেন আর গ্রহীতা তাহাতে স্বত্ব লাভ করিতেছে, সুতরাং এস্থলে গ্রহীতা দীন ব্যক্তি সম্প্রদান কারক। এই সকল লক্ষণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয়, কর্ম্ম ও সম্প্রদান এক নহে, এই দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। আর ইহাদের পদগত সৌসাদৃশ্যই বা কোথায়? কখন "আমাকে পুস্তক দাও" কখন বা "আমায় পুস্তক দাও," "মঠে ধন দান করিতেছে," "দুর্য্যোধনে কন্যা দিব যদি লক্ষ্য হানি," এই সকল স্থলে দেখা যায় সম্প্রদান কারকের প্রত্যেক উদাহরণে আকারগত সাদৃশ্য নাই। কখন "কে" কখন "য়" কখন "এ" বিভক্তিযুক্ত হইয়া সম্প্রদান কারকের পদ গঠিত হয়। আর সম্প্রদানকে কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলে একটি কর্ম্মস্থলে দুইটি করিয়া কর্ম্ম স্বীকার করিতে হয়। "দরিদ্রকে ধন দাও" এখানে দরিদ্রও কর্ম্ম ধনও কর্ম্ম। অতএব একদিকে লাঘব করিতে গিয়া অপরদিকে গৌরব স্বীকার করিতে হয়। আর সম্প্রদান কারকটা যদি নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় পদার্থই হইবে তবে পালিব্যাকরণকার কাত্যায়ন উহা পরিত্যাগ করেন নাই কেন?* সংস্কৃত ভাষার ন্যায় পালিভাষায় ত বিভক্তি দ্বারা সম্প্রদান কারক নির্ণয় করা যায় না। পালিভাষায় কখন সম্প্রদানে চতুর্থী কখন ষষ্ঠী কখন সপ্তমী বিভক্তি হইতে দেখা যায়। কখন "ভিক্‌খবে দানং দেতি" কখন "সঙ্ঘে দিন্নং মহপ্‌ফলং" কখন বা "বুদ্ধস্‌স বা ধম্মস্‌স

বা সম্প্রস্স বা দানং দেতি” ইত্যাদি প্রয়োগ হয়। কাত্যায়ন কি এতই মূর্খ ছিলেন্ যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বৈয়াকরণদের মাথায় যাহা আসিয়াছে, তাহা তাঁহার মাথায় আসে নাই। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন কর্ম্ম ও সম্প্রদানে আকাশ পাতাল প্রভেদ। তাই তিনি আপন ব্যাকরণ হইতে সম্প্রদান কারক তুলিয়া দেন নাই। অতএব প্রাকৃতের ন্যায় একটি অসম্পূর্ণ ভাষার সাদৃশ্যে বাঙ্গালার ন্যায় উচ্চ অঙ্গের ভাষা হইতে সম্প্রদান কারকের বিলোপ সাধন করা কোন প্রকারেই সমীচীন নহে।*

লেখক প্রসঙ্গ ক্রমে বাচ্যের কথা তুলিয়াছেন। আমার সমালোচনায় উহার প্রসঙ্গ ছিল না, অতএব ইহা বিচার্য্য বিষয়ের বহির্ভূত, তথাপি তিনি যখন তুলিয়াছেন কাজেই দুই এক কথা বলিতে হয়। তিনি বলেন ;—“সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় কেবল যে কারক বিভক্তির সংখ্যায় মিল নাই, তাহা নহে। তাহার চেয়ে গুরুতর অনৈক্য আছে। সংস্কৃত ভাষায় কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদের জটিলতা বিস্তর, এইজন্য আধুনিক গৌড়ীয় ভাষাগুলি সংস্কৃত কর্ম্মবাচ্য অবলম্বন করিয়াই প্রধানতঃ উদ্ভূত। “করিল” ক্রিয়াপদ “কৃত” হইতে, “করিব” “করিবে” কর্ত্তব্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।” একথা গুলি বোধ তাঁহার নিজের মন

* হীরেন্দ্র বাবু বলেন সম্প্রদান কারকের বাঙ্গালায় প্রয়োজন নাই। প্রবন্ধ লেখক বলিয়াছেন ‘রামকে বস্ত্র দাও’ এখানে রাম ও বস্ত্র এই উভয় কর্ম্ম মানিতে হয়। আমরা বলি বস্ত্র কোন কারক নহে।

ইহার উত্তরে পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহাশয় বলেন “সম্প্রদান কারক কেবল পাণিনি সুধু স্বীকার করিয়াছেন, তাহা নহে। গ্রীক্ লাটিন্ প্রভৃতি ভাষার কর্ম্মকারক ব্যতীতও Dative case অথবা সম্প্রদান কারক ছিল, ও আছে। ইংরেজী ভাষায় অবশ্য উহাকে আজকাল Indirect Object অনেক স্থলে বলা হয়। অতএব আমাদের দেখা উচিত আগতেরা সমস্ত সভা জনপদে বিদ্বন্মণ্ডলী মধ্যে সম্প্রদান

হইতে উৎপন্ন নহে, তাই তিনি এক সাহেবের গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য সবিশেষ উপদেশ দিয়াছেন। উক্ত সাহেবের যে একখানি ব্যাকরণ আছে তাহা আমরা জানিতাম না, বোধ হয় অনেকেই জানেন না, থাকিলেও তাহাই পাঠ করিয়া বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে যাওয়া আমাদের কর্ম্ম নহে। সে যাহা হউক সাহেব কি লিখিয়াছেন জানিনা, তবে লেখক বাচ্যের কথা বলিতে গিয়া প্রথমেই যে প্রকার ভ্রান্তিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় ইহা সাহেবের গ্রন্থপাঠের অসাধারণ ফল। সংস্কৃত ভাষায় যে কর্ত্তৃবাচ্যের বাক্যের জটিলতা অধিক, একথা তাঁহাকে কে বলিল? আমাদের ত বোধ হয় কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের বাকেরই জটিলতা অধিক, "বলীবৰ্দ্ধঃ শকটং বহতি," "যুবা গীতং শৃণোতি" "শিশুঃ শয্যায়াং শেতে" এই সকল বাক্যকে যদি কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্যে পরিণত করা যায়, তাহা হইলে "বলীবৰ্দ্ধেন শকটং উহ্যতে" "যূনা গীতং শ্রূয়তে", "শিশুনা শয্যায়াং শয্যতে" এইরূপ আকারে পরিণত হয়। অতএব এই উভয়বিধ বাক্যের মধ্যে কোন্ গুলি অধিক জটিল? যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ অথবা সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন কর্ত্তৃবাচ্যের বাক্য অপেক্ষা কর্ম্মবাচ্যের বাক্যেরই জটিলতা অধিক। কিন্তু আমাদের এখানে একটি কথা মনে হয়। সাহেব অথবা লেখক কর্ম্মবাচ্য বলিয়াই যখন "কৃত" "কর্ত্তব্য" লইয়া টানাটানি করিয়াছেন, তখন সন্দেহ হয় কর্ত্তৃবাচ্যের মুখ্যক্রিয়া "অকরোৎ" "করিষ্যামি" ইত্যাদির ন্যায় যে কর্ম্মবাচ্যেও "অক্রিয়ত" "করিষ্যতে" প্রভৃতি মুখ্যক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় এ সংস্কার তাঁহাদের নাই। নতুবা কর্ম্মবাচ্যের নাম করিয়াই "কৃত" "কর্ত্তব্য" ইত্যাদির কথা বলেন কেন? বস্তুতঃ "কৃত" "কর্ত্তব্য" ইত্যাদি মুখ্যক্রিয়া নহে, উহারা কৃৎক্রিয়া, অতএব এক হিসাবে উহারা

করেন, সুতরাং তাঁহারা কৃৎক্রিয়া ব্যতীত মুখ্য ক্রিয়ার তত ধার ধারেন না। আর কর্ম্মবাচ্য নিষ্পন্ন "কৃত" কিংবা "কর্ত্তব্য" হইতে যে "করিল" "করিব" উৎপন্ন হইয়াছে তাহাই বা মানিব কেন? আমরা যদি বলি "অকরোৎ কিংবা চকার" হইতে "করিল", "করিষ্যামি" কিংবা "করিষ্যাবঃ" হইতে "করিব" নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহাতেইবা কি ভুল হয়? উভয় পক্ষেরই অনুমান মাত্র, প্রমাণ ত কিছুই নাই। বর্ণগত সৌসাদৃশ্য উভয়েরই তুল্য। বরং "ময়া কর্ত্তব্যং" হইতেই "আমি করিব" না হইয়া যদি "অহং করিষ্যামি" হইতে "আমি করিব" নিষ্পন্ন করা যায় তাহা হইলে বেশী সোজা হয়। প্রাকৃত "অহ্মি" হইতে আমি হয় ইহাত সকলেই জানেন এবং ঢাকা প্রদেশে এখনও অনেকে "করিব" না বলিয়া "করিমু" বলিয়া থাকেন। অতএব কর্ত্তব্য হইতে "করিব" হয় নাই, "করিষ্যামি" হইতেই "করিব" হইয়াছে অনুমান করিতে হইবে। লেখক আরও বলেন "ব্যাঘ্রেণ রামঃ খাদিতঃ" ইহার তর্জ্জমা "বাঘে রামকে খাইল" 'বাঘে' কেন করণকারক হইল, 'রামকে' এখানেই বা দ্বিতীয়ান্ত পদ কেন হইল? এ খিচুড়ি সংস্কৃত ব্যাকরণের কোন পর্য্যায়েই পড়েনা।" তাঁহার এই বিরক্তি দেখিয়া মনে হয় ব্যাকরণকে যদি এক নিশ্বাসে দেশ হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এ দুঃখের কথঞ্চিৎ উপশম হইতে পারে। কিন্তু উপায় নাই, তাহা হইবে কি করিয়া? যাহা হউক কবিবর যদি আরও কিছুকাল উত্তমরূপে ব্যাকরণের অনুশীলন করেন, তাহা হইলেই সকল গোল চুকিয়া যাইবে। বস্তুতঃ 'বাঘে' করণ কারক নহে, কর্ত্তৃকারকেও "এ" এই বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত হইয়া থাকে। "রামকে" এই পদটি কর্ম্মকারক। কর্ম্মবাচ্য ও কর্ত্তৃবাচ্য উভয়েই কর্ম্মকারকে 'কে' বিভক্তি হইতে পারে [illegible]। লেখক বলেন

আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি কেন হইবে? "তাঁহাকে" এই পদটি ত কর্ম্মকারক নহে, কর্ত্তৃকারক। কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের কর্ত্তৃকারকে যে "কে" বিভক্তি হয় উহার সূত্র সকল বাঙ্গালা ব্যাকরণেই আছে। অতএব তাঁহাকে নাচিতে হইবে ইহার তর্জ্জমায় "তয়া নর্ত্তিতব্যম্" লেখায় কোন অসামঞ্জস্যই হয় না। তিনি এইরূপ আরও কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। সকলগুলিই প্রায় এক প্রকারের। "আমাকে তোমার পড়াইতে হইবে" ইহার অনুবাদে "অহং ত্বয়া বা তব পাঠয়িতব্যঃ" হইবে। কর্ত্তৃকারকে "র" বিভক্তি যুক্ত হয়, বিশেষতঃ কৃত্য ক্রিয়ার যোগে সংস্কৃত বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই কর্ত্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হইতে পারে।

লেখক মহাশয়ের অটল জেদ্, তিনি ঠাকুরাণী, মালিনী, কলুনী, জেলেনী প্রভৃতি শব্দ কোন প্রকারেই দীর্ঘ ঈকারান্ত ব্যবহার করিবেন না। তাঁহার কথার মর্ম্ম এই অধীন শব্দ বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গে "অধীনা" না হইয়া যখন "অধিনী" হয়, কলুর স্ত্রী "কল্বী" না হইয়া যখন "কলুনী" হয় তখন মালিনী প্রভৃতি হ্রস্ব ইকারান্ত না হইয়া কেন দীর্ঘ ঈকারান্ত হইবে? তাঁহার এই যুক্তি পাঠ করিয়া একটি গল্প স্মরণ হইতেছে;—

এক অধ্যাপকের কতকগুলি ছাত্র ছিল। উহাদের সকলেই বেশ পড়া শুনা করিত। একটি ছাত্র পড়াশুনা করিত না বটে কিন্তু অদ্বিতীয় চতুর ছিল। অধ্যাপক যখন কোন নিমন্ত্রণে যাইতেন, তখন কৃতবিদ্য ছাত্রদিগকেই সঙ্গে লইতেন, সুতরাং চতুর ছাত্রটি উহাতে বিরক্ত। সে একদিন গুরুপত্নীকে অনুরোধ করিল, তিনি অধ্যাপককে বলিলেন। অধ্যাপক বলিলেন ও কিছু পড়ে নাই, উহাকে লইয়া গিয়া কি করিব? তাহা শুনিয়া ছাত্রটি বলিল "মহাশয়! আমাকে লইয়া চলুন, যদি বিচার করিতে না পারি, তখন বলিবেন"। অগত্যা অধ্যাপক চতুর ছাত্রটি

অধ্যাপকের পশ্চাদ্‌ভাগে বসিল না, যেখানে বড় বড় অধ্যাপক বসিয়াছেন উহার নিকটে বসিয়া "রাভন" "রাভন" এইরূপ বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিল। ঐ অশুদ্ধোচ্চারিত শব্দটি একটি প্রাচীন অধ্যাপকের কানে বড় বাধিতে লাগিল। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন "আঃ কি বল? "রাভন" না "রাবণ" উচ্চারণ কর"। তাহা শুনিয়া অমনি চতুর ছাত্রটি পূর্ব্বপক্ষ করিল ;—

কুম্ভকর্ণে ভকারোঽস্তি
ভকারোঽস্তি বিভীষণে।
জ্যেষ্ঠপুত্রে কুলশ্রেষ্ঠে
ভকারোনাস্তি রাবণে?

সভাস্থ পণ্ডিতবর্গ অবাক্! এ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর নাই! লেখকের যুক্তিও কতকটা ঐ প্রকারের। "অধীন" শব্দ অধীনা হয় না "অধীনী" হয়, অতএব মাসী, পিসী, ঠাকুরাণী মালিনী প্রভৃতি কেন হ্রস্বইকারান্ত হইবে না? আমরা বলি অধীন শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে আকার মানিবে না কেন? যদি কেহ "অধীনা" লেখেন তাঁহাকে কেহ দোষী করিতে পারেন না, কেন না 'অধীনা' যেমন ব্যাকরণসঙ্গত তেমন শ্রুতিকটু-দোষ রহিত। অতএব বাঙ্গালায় যে কোন কোন স্থানে "অধীনী" প্রয়োগ আছে উহা ভাষার বিশেষত্ব নহে, প্রয়োগকর্ত্তার অনবধানতার ফল। তিনি যে কলুর স্ত্রী "কল্বী" হইবে না কেন বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, উহা ব্যর্থ হইয়াছে। কলু গুণবাচক উকারান্ত শব্দ নহে যে কোন বৈয়াকরণ উহার উত্তর ঈপ্ বিধান করিবেন। কলুর স্ত্রীকে "তৈল যন্ত্র-পরিচালিকা" ইবা কেন বলিব? ঐ শব্দটি জাতিবাচক উকারান্ত সুতরাং পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ত্রই "কলু" হইবে। এখনও পল্লীগ্রামের লোকে রামা কলু শ্যামা কলু ইত্যাদি বলে। লেখক বলেন "হ্রস্বইকে জোর

করি বাঙ্গালা ঈকারান্ত শব্দগুলি যে হ্রস্বইকারান্ত দীর্ঘঈকারান্ত নহে, ইহা তিনি জানিলেন কি করিয়া ? যদি কোন সংস্কৃতবিদ্ অধ্যাপক উদাত্তস্বরে তাঁহার কন্যাকে "পাঁচী" বলিয়া সম্বোধন করেন, তাহা হইলে লেখক কি তাঁহার ফাঁসির ব্যবস্থা করিবেন ? এ ত গেল ব্যক্তিগত উচ্চারণের কথা। তাহার পর দেশভেদেও উচ্চারণ বৈষম্য দেখা যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাবনার সন্নিহিত একটি পল্লীগ্রামে কোন ভদ্র লোকের একটি বালিকা পাড়া বেড়াইতে যাইতেছিল, তাহার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন "খুকি কোথা যাচ্ছিস্ ?" বালিকা উত্তর করিল শুনিলাম "মাসী-ঈ-রে বাড়ী যাচ্চি।" লেখক সেই নিরক্ষর বালিকাকে কি বলিয়া তিরস্কার করিবেন, তাহার অপরাধ কি ? সেত বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণের সূত্র পড়ে নাই। তাহার পর দেখিতে হইবে প্রায় সমুদয় বাঙ্গালা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দেরই শেষে "নী" না হয় ঈ যুক্ত থাকে, ইহার কারণ কি ? উহারা উহা কোথা হইতে পাইল ? এই 'নী' বা 'ঈ' বিশুদ্ধ সংস্কৃত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের অনুকরণ-সম্ভূত। কোন পল্লীর ব্রাহ্মণপত্নী শারদীয় পূজার সময় বেনারশী শাড়ী পরিধান করেন। উহা দেখিয়া সেই পাড়ার কোন ধীবরপত্নীও নকল বিলাতি বেনারশী শাড়ী পরে। বস্তুতঃ আসল বেনারশী শাড়ী ও নকল বেনারশী শাড়ী এক পদার্থ নহে। বেনারশী শাড়ী কীটবিশেষের মুখনিঃসৃত লালারূপতন্তু দ্বারা নির্ম্মিত, আর নকল বেনারশী শাড়ী সম্ভবতঃ কার্পাস সূত্রদ্বারা প্রস্তুত। একখানি সুবর্ণ-খচিত, অপর খানি সামান্য রঙ্গিল সূত্রে চিহ্নিত। উভয়ের মধ্যে বহুপার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের একই উদ্দেশ্য—পরিধানকারিণীদের আপন আপন দেহের শোভা সম্পাদনই উহাদের মুখ্য প্রয়োজন। একটি আসল, অপরটি তাহার নকল।

রাছে। ব্রাহ্মণীতে জেলেনীতে জাতিগত প্রভেদ থাকিলেও উভয়ের দেহের পরিমাণ সমান। ব্রাহ্মণীর যেমন দশ হাত শাড়ী না হইলে চলে না, সেইরূপ জেলেনীরও শাড়ীর পরিমাণ দশ হাত হওয়া আবশ্যক। অতএব 'ব্রাহ্মণী'র "ঈ" কারটি যদি দীর্ঘ হয়, তবে 'জেলেনী'র অপরাধ কি? তাহার "ঈ"কার জোর করিয়া কেন হ্রস্ব করা হইবে? আর চেষ্টা করিলেও যে সহজেই হ্রস্ব হইয়া যাইবে তাহাও বোধ হয় না। লেখক যদি হুকুম করেন ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালী রমণীরা শাড়ী গাউনের পরিবর্ত্তে ধুতি চাদর ও হ্যাটকোট্ ব্যবহার করুন, তাহা হইলে কোন্ বুদ্ধিমতী ললনা তাঁহার আদেশ অনুসারে কার্য্য করিবেন? বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণের সূত্র করিলেও কোন গ্রন্থকার গ্রন্থকর্ত্রীই স্ত্রীলিঙ্গ বাঙ্গালা ঈকারান্ত শব্দগুলির দীর্ঘত্বের বিলোপ সাধন করিবেন না, এ বিষয়ে আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস আছে। লেখকের বন্ধুগণও বলিবেন "কি করি ভাই অভ্যাস খারাপ, ভুলক্রমে দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে"।*

---

* হীরেন্দ্রনাথ বাবু বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে যাহা বলেন উহার মর্ম্ম এই—শব্দের প্রাদেশিক উচ্চারণ ধরিলে দিদি শব্দকেও "দিদী" লিখিতে হয়। এস্থলে শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ যাহা সেইরূপই বর্ণবিন্যাস করিতে হইবে।

ইহার উত্তরে পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহাশয় বলেন উচ্চারণের অনুরূপ বর্ণবিন্যাস (Phonetic) করিতে হইবে কি পদের অর্থের অনুযায়ী বর্ণবিন্যাস (Etymological) করিতে হইবে সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেক সমালোচনা করিয়াছেন এবং ইহা স্থিরই হইয়াছে যে বর্ণবিন্যাস Etymology অনুসারে করিতে হইবে। হীরেন্দ্র বাবু ছাত্রজ বনে সে সমুদায় পড়িয়াও আবার উচ্চারণানুযায়ী বর্ণবিন্যাসের পক্ষপাতী কেন? উত্তরে হীরেন্দ্র বাবু বলিলেন "আমি উচ্চারণানুযায়ী বর্ণবিন্যাসের পক্ষপাতী নহি, বোধ হয় রবীন্দ্র বাবুও নন।" শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী এম্, এ, বিএল্ মহাশয় তৎক্ষণাৎ রবীন্দ্র বাবুর বাংলা ক্রিয়ার তালিকা হইতে "বাংলা" শব্দটি দেখাইয়া হীরেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ বানান কোন্

লেখক এক মাত্রিক কথার অর্থ লইয়া অনেকটা রসিকতা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজে যাহা লিখিয়াছেন উহা বুঝিয়া লেখেন নাই ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তিনি বলেন মাত্রা ইংরাজিই কি বাংলাই কি, আর সংস্কৃতই কি! যদিচ প্রাচীন ভারতবর্ষ আধুনিক ভারতের চেয়ে অনেক বিষয়ে অনেক বড় ছিল তবু "এক" তখনও "এক" ই ছিল এবং "দুই" ছিল "দুই"।

একথা যদি সত্য হয় তবে তিনি এখনকার আড়াইও আড়াই ছিল এ কথা স্বীকার করিবেন না কেন? তিনি বোধ হয় এখনও আমাদের কথাটি প্রণিধান করেন নাই। কলিকাতায় পূর্ব্বে ৯৬ তোলায় সের ছিল, এখন কলিকাতায় ৮০ তোলায় সের। একসের কিন্তু একসেরই আছে। তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তি অবলম্বন করিয়া এখনকার একসেরের নাম ১৩ ছটাক ১ তোলা ৪ মাষা রাখিতে পারেন না। যদি বলেন তাহাই করিব, অর্থাৎ আড়াই মাত্রার নাম এক মাত্রা রাখিব, তাহা তিনি করিতে পারেন না। পূর্ব্বের এক সের অপেক্ষা এখনকার এক সেরে ১৬ তোলা কম হইয়া গিয়াছে, ইহা আমরা ঠিক জানি; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সময়ের আড়াই মাত্রা হইতে খাঁটি বাঙলা ব্যাকরণের সময়ে দেড় মাত্রা কমিয়া গিয়াছে, ইহা তিনি কি প্রমাণবলে জানিতে পারিবেন? কিছু কমিয়াছে সত্য, কিন্তু কতটা কমিয়াছে তাহা তিনি বলিতে পারেন না। তাঁহার মতে উচ্চারণের পরিমাণ অনুসারে "দেখ্" "মার্" প্রভৃতিকে একমাত্রিক ধাতু বলিলে "চল্" "রচ্" প্রভৃতি এক মাত্রিক হয় না। সকলেই জানেন দেখ্ ধাতুর "এ" ও মার্ ধাতুর "আ" অপেক্ষা চল্ ধাতুর "অ" অল্প সময়ে উচ্চারিত হয়। অতএব এ হিসাবে চল্ বল্ প্রভৃতি ধাতু গুলিকে একের ভগ্নাংশ মাত্রিক ধাতু বলিতে হয়। এইরূপ প্রত্যেক ধাতুর উচ্চারণ সময়ের বিভিন্নতা ধরিয়া

তাঁহাকে অসংখ্য ভগ্নাংশ কল্পনা করিতে হইবে। যদি তিনি বলেন আমি যুক্তি তর্ক মানি না, এক নিশ্বাসে যাহা উচ্চারিত হয়, তাহাই একমাত্রিক ধাতু, অর্থাৎ বাঙ্গালাভাষার বা সংস্কৃতভাষার সমুদয় ধাতুই মনোশ্লেবিক অর্থাৎ একমাত্রিক এইরূপ বলিব। আমরা বলি তিনি মনোশ্লেবিক বলুন আপত্তি নাই কিন্তু একমাত্রিক বলিতে পারেন না, কেননা মাত্রা শব্দের পূর্ব্বে "এক" এই বিশেষণটি যুক্ত করিলেই দুই তিন প্রভৃতি আছে স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি দুই বা তিন মাত্রিক ধাতু কোন্ গুলি? আর খাঁটি বাঙলা ব্যাকরণের আবির্ভাবের পূর্ব্বপর্য্যন্ত যত সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান অথবা ছন্দোগ্রন্থ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, সে সমুদয়ের প্রচলন বন্ধ করিতে হয়, কেননা ঐ সকল গ্রন্থের মতে সমুদয় ধাতু একমাত্রিক নহে। এখন বোধ হয় লেখক বুঝিয়াছেন, এককে দুই বলিবার সাধ্য কাহারও নাই এবং আমরাও দ্বিহাস্তিক বা বাহুহাস্তিক আহারকে একহাস্তিক বলিতেছি না। লেখক "মনোশ্লিবেল্" কথাটির প্রকৃত অর্থ না বুঝিতে পারিয়া স্বস্তিবাচনেই ভ্রম করিয়া বসিয়াছেন। ইংরেজীতে এক অক্ষরেও মনোশ্লিবেল্ হয়, দুই অক্ষরেও হয় তিন বা ততোহধিক অক্ষরেও হয়। যেমন "এডুকেশন্" এই কথাটির মধ্যে 'এড্' দুই অক্ষরের 'মনোশ্লিবেল্,' 'উ' এক অক্ষরের 'মনোশ্লিবেল্,' 'কে'ও দুই অক্ষরের মনোশ্লিবেল্, আর সন্ এইটি চারি অক্ষরের মনোশ্লিবেল্, কিন্তু এই মনোশ্লিবেল্ কথাটির সংস্কৃত প্রতিশব্দ এক মাত্রিক উক্ত নিয়মে দাঁড়ায় না। "ই" এই ধাতুটিকে আমরা মনোশ্লিবেলের প্রতিশব্দ এক মাত্রিক ধাতু নামে অভিহিত করিতে পারি, কিন্তু "দেখ্" এই আড়াই মাত্রিক ধাতুকে ইংরেজী মনোশ্লিবেলের নিয়মানুসারে এক মাত্রিক নাম দিতে পারি না। সংস্কৃতের

কিন্তু ইংরেজীর মাত্রা উচ্চারণ লইয়া উহা বোধ হয় কাহারই অবিদিত নহে।*

লেখক ণিজন্ত ক্রিয়ার নাম দিয়াছিলেন, “নৈমিত্তিক ক্রিয়া” আমাদের সমালোচনার পর তিনি আপন মত পরিহার করিয়াছেন, তথাপি দুই চারি কথা বলিতে ছাড়েন নাই। তিনি লিখিয়াছেন;—‘শ্রু’ ধাতু যে নিয়মে ‘শ্রাবি’ হয়, সেই নিয়মে ‘শুন্’ ধাতুর ‘শু’ ‘শৌ’ হইয়া ও পরে ইকার যোগে “শৌনিতেছে” হইত! হয়ত খুব ভালই হইত, কিন্তু হয় না যে, সে আমার বা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের দোষ নহে।”

শাস্ত্রী মহাশয় যে নিজন্ত ক্রিয়ার “নৈমিত্তিক ক্রিয়া” এইরূপ নাম করণ অনুমোদন করিয়াছেন উহা বোধ হয় না, তবে লেখক তাঁহার কথা বলিতেছেন কেন? তাহার পর লেখকের আপত্তি এই যে, ধাতুর উত্তর ণিচ্ করিলেই উহার আদি স্বরের বৃদ্ধি হইয়া যায় সুতরাং বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর ণিচ্ করা ভয়ানক বিপজ্জনক। কিন্তু তাঁহার অত বিপদের আশঙ্কা করা ঠিক হয় নাই। ণ কার ইৎ প্রত্যয় পরে বৃদ্ধি হয় এইরূপ যদি সূত্র করা যায়, তবেই বৃদ্ধি হইবে, নতুবা আপনা আপনিত বৃদ্ধি হইতে পারে না। ণিজন্ত কথাটি বহুকাল হইতে প্রচলিত। অভিধানে যেখানে প্রকৃতি প্রত্যয় লিখিত হইয়াছে, সেখানে অমুক ণিজন্ত ধাতুর উত্তর অমুক প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন ইত্যাদিরূপ

* হীরেন্দ্র বাবু বলেন “সংস্কৃত মাত্রার হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ আর ইংরাজী মাত্রার (Syllable) উচ্চারণ প্রায় একই রূপ।” ইহার উত্তরে পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন “Monosyllable” ইহার অনুবাদ “একস্বর” হওয়া উচিত। যে ধাতুতে একটি মাত্র স্বর থাকে এবং ব্যঞ্জন যতগুলিই থাকুক না কেন, তাহাকে Monosyllabic বা একস্বর ধাতু বলে। রবীন্দ্র বাবু “Monosyllable” ইহার অনুবাদ “[illegible]” [illegible] তিনি ভ্রম স্বীকার না

তাঁহাকে অসংখ্য ভগ্নাংশ কল্পনা করিতে হইবে। যদি তিনি বলেন আমি যুক্তি তর্ক মানি না, এক নিশ্বাসে যাহা উচ্চারিত হয়, তাহাই একমাত্রিক ধাতু, অর্থাৎ বাঙ্গালাভাষার বা সংস্কৃতভাষার সমুদয় ধাতুই মনোশ্লেবিক অর্থাৎ একমাত্রিক এইরূপ বলিব। আমরা বলি তিনি মনোশ্লেবিক বলুন আপত্তি নাই কিন্তু একমাত্রিক বলিতে পারেন না, কেননা মাত্রা শব্দের পূর্ব্বে "এক" এই বিশেষণটি যুক্ত করিলেই দুই তিন প্রভৃতি আছে স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি দুই বা তিন মাত্রিক ধাতু কোন্ গুলি? আর খাঁটি বাঙলা ব্যাকরণের আবির্ভাবের পূর্ব্বপর্য্যন্ত যত সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান অথবা ছন্দোগ্রন্থ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, সে সমুদয়ের প্রচলন বন্ধ করিতে হয়, কেননা ঐ সকল গ্রন্থের মতে সমুদয় ধাতু একমাত্রিক নহে। এখন বোধ হয় লেখক বুঝিয়াছেন, এককে দুই বলিবার সাধ্য কাহারও নাই এবং আমরাও দ্বিহাস্তিক বা বাহুহাস্তিক আহারকে একহাস্তিক বলিতেছি না। লেখক "মনোশ্লিবেল্" কথাটির প্রকৃত অর্থ না বুঝিতে পারিয়া স্বস্তিবাচনেই ভ্রম করিয়া বসিয়াছেন। ইংরেজীতে এক অক্ষরেও মনোশ্লিবেল্ হয়, দুই অক্ষরেও হয় তিন বা ততোঽধিক অক্ষরেও হয়। যেমন "এডুকেশন্" এই কথাটির মধ্যে 'এড্' দুই অক্ষরের 'মনোশ্লিবেল্,' 'উ' এক অক্ষরের 'মনোশ্লিবেল্,' 'কে'ও দুই অক্ষরের মনোশ্লিবেল্, আর সন্ এইটি চারি অক্ষরের মনোশ্লিবেল্, কিন্তু এই মনোশ্লিবেল্ কথাটির সংস্কৃত প্রতিশব্দ এক মাত্রিক উক্ত নিয়মে দাঁড়ায় না। "ই" এই ধাতুটিকে আমরা মনোশ্লিবেলের প্রতিশব্দ এক মাত্রিক ধাতু নামে অভিহিত করিতে পারি, কিন্তু "দেখ্" এই আড়াই মাত্রিক ধাতুকে ইংরেজী মনোশ্লিবেলের নিয়মানুসারে এক মাত্রিক নাম দিতে পারি না। সংস্কৃতের

কিন্তু ইংরেজীর মাত্রা উচ্চারণ লইয়া উহা বোধ হয় কাহারই অবিদিত নহে।*

লেখক ণিজন্ত ক্রিয়ার নাম দিয়াছিলেন, “নৈমিত্তিক ক্রিয়া” আমাদের সমালোচনার পর তিনি আপন মত পরিহার করিয়াছেন, তথাপি দুই চারি কথা বলিতে ছাড়েন নাই। তিনি লিখিয়াছেন ;—‘শ্রু’ ধাতু যে নিয়মে ‘শ্রাবি’ হয়, সেই নিয়মে ‘শুন্’ ধাতুর ‘শু’ ‘শৌ’ হইয়া ও পরে ইকার যোগে “শৌনিতেছে” হইত! হয়ত খুব ভালই হইত, কিন্তু হয় না যে, সে আমার বা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের দোষ নহে।”

শাস্ত্রী মহাশয় যে নিজন্ত ক্রিয়ার “নৈমিত্তিক ক্রিয়া” এইরূপ নাম করণ অনুমোদন করিয়াছেন উহা বোধ হয় না, তবে লেখক তাঁহার কথা বলিতেছেন কেন? তাহার পর লেখকের আপত্তি এই যে, ধাতুর উত্তর ণিচ্ করিলেই উহার আদি স্বরের বৃদ্ধি হইয়া যায় সুতরাং বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর ণিচ্ করা ভয়ানক বিপজ্জনক। কিন্তু তাঁহার অত বিপদের আশঙ্কা করা ঠিক হয় নাই। ণ কার ইৎ প্রত্যয় পরে বৃদ্ধি হয় এইরূপ যদি সূত্র করা যায়, তবেই বৃদ্ধি হইবে, নতুবা আপনা আপনিত বৃদ্ধি হইতে পারে না। ণিজন্ত কথাটি বহুকাল হইতে প্রচলিত। অভিধানে যেখানে প্রকৃতি প্রত্যয় লিখিত হইয়াছে, সেখানে অমুক ণিজন্ত ধাতুর উত্তর অমুক প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন ইত্যাদিরূপ

---

* হীরেন্দ্র বাবু বলেন “সংস্কৃত মাত্রার হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ আর ইংরাজী মাত্রার (Syllable) উচ্চারণ প্রায় একই রূপ।” ইহার উত্তরে পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন “Monosyllable” ইহার অনুবাদ “একস্বর” হওয়া উচিত। যে ধাতুতে একটি মাত্র স্বর থাকে এবং ব্যঞ্জন যতগুলিই থাকুক না কেন, তাহাকে Monosyllabic বা একস্বর ধাতু বলে। রবীন্দ্র বাবু “Monosyllable” ইহার অনুবাদ “[illegible]” [illegible] পড়িয়াছেন। তিনি ভ্রম স্বীকার না

লিখিত আছে। লেখকের মত গ্রহণ করিলে সমস্ত অভিধানের পুনঃ সংস্করণ করিতে হয়। তিনি বলেন "সংস্কৃতে পঠ ধাতুর উত্তরে ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া পাঠন হয়, বাংলায় সেই অর্থে পড়্ ধাতু হইতে "পড়ান" হয় "পাড়ন" হয় না"। ইহার সহিত নৈমিত্তিক নামের কি সাদৃশ্য আছে? পঠ ধাতু প্রাকৃতের ভিতর দিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে তজ্জন্য ঐরূপ পরিবর্ত্তিত আকারে পরিণত হইয়াছে। প্র পূর্ব্ব ণিজন্ত স্থা ধাতু অনট্ করিলে "প্রস্থাপন" হয়। প্রাকৃতে "পট্‌ঠন" বাঙ্গালায় "পাঠান" হইয়া থাকে। ভাবান্তরের মধ্য দিয়া আসাই বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের কারণ।*

লেখক দাগী শব্দ লইয়া কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। উহার উত্তরে আমরা এই বলিতেছি "দাগী" সংস্কৃত শব্দ নহে, সুতরাং উহার উত্তর কিজন্য স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ বিহিত হইবে। একটি কি দুইটি শব্দের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রত্যয় স্বীকার করিতে হয়, তজ্জন্যই ইন্ ভাগান্তের অন্তর্গত

---

* হীরেন্দ্র বাবু বাঙ্গালা ব্যাকরণসংক্রান্ত মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া যাহা বলিলেন উহার মর্ম্ম—বর্ত্তমান বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলি 'পতঞ্জলি' প্রভৃতি পদের সন্ধির নিয়ম ইত্যাদি অনাবশ্যক বিষয়সমূহে পূর্ণ হওয়ায় বালকগণের মস্তিষ্ক ভক্ষণকারী।

ইহার উত্তরে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্, মহাশয় বলিলেন—"আসার সময় গাড়ীতে বসিয়া অভিনব প্রণালীতে নির্ম্মিত ব্যাকরণ দেখিতেছিলাম। উহার সংস্কৃতানুযায়ী সূত্রগুলি বড় অক্ষরে ও চলিত কথার (অর্থাৎ মেছোনী ধোপানী প্রভৃতি কথার) সূত্রগুলি ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এক প্রকারে বালকদের মস্তিষ্ক খাওয়া হইত। এখন উভয় প্রকারে হইবে। মেছোনী ধোপানী প্রভৃতি কথার ব্যাকরণ শিখিয়া বালকদের যে কি বিদ্যা বাড়িবে বুঝিতে পারি না। স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে শৈশব হইতে ও সকল শিখিয়া আসিতেছে।

প্রবন্ধের মধ্যে হিন্দী মরাঠীভাষা অপেক্ষা বাঙ্গালার উৎকর্ষ এবং অধিক সংস্কৃতানুযায়িতা ও বিশুদ্ধির কথা থাকায় সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পণ্ডিত সখা রাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের নিকট প্রশ্ন করিলেন। সখারাম বাবু বলিলেন "বাঙ্গালা যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও সংস্কৃতের অধিক নিকটবর্ত্তিনী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই,

করিতে বলিয়াছিলাম। তিনি আলাপী ভারী প্রভৃতি কয়েকটি খাঁটি সংস্কৃত শব্দকে তাঁহার কল্পিত ই প্রত্যয়ান্তের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন তজ্জন্যই আমরা আপত্তি প্রকাশ করি। তিনি "ভারিণী" শব্দের উল্লেখ করিয়া উপহাস করিয়াছেন। যদি স্থল বিশেষে কেহ "ভারিণী" লেখে তাহা হইলে কি উহা অশুদ্ধ হয়।

লেখক "যখন" লিখিতে কেন বর্গ্য জ লেখা হয় না বলিয়া মহা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কথার মর্ম্ম এই ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের পণ্ডিতগণের দোষেই আমরা যখন শব্দের বর্গ্য জ হারাইয়াছি। কিন্তু আমরা এ প্রসঙ্গে এই বলিতে চাই ফোর্টউইলিয়ম্ কলেজের পণ্ডিতেরা "যখন" শব্দে অন্তঃস্থ "য" লিখিয়া বিশেষ কিছু অন্যায় করেন নাই। বাঙ্গালায় অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত শব্দের বর্ণগত সাদৃশ্য লইয়া গঠিত। যদ্ শব্দের য ও ক্ষণ শব্দের অপভ্রংশ খন শব্দ লইয়া যখন শব্দটি নিষ্পন্ন। রূপান্তরিত শব্দের অভ্যন্তরে পূর্ব্ব প্রকৃতি প্রত্যয়ের ছায়া লুক্কায়িত থাকে। 'যখন' বর্গ্যজ লিখিলে 'যে সময়' অর্থ নিষ্পন্ন হয় না। আমাদের বাঙ্গালাদেশে শেষ পর্য্যন্ত পালি ভাষার আধিপত্য থাকায় উচ্চারণ বৈষম্য ঘটিয়াছে। এদেশে পদের মধ্যে কিংবা অন্তে ব্যতীত অন্তস্থঃ য উচ্চারিত হয় না, পদের প্রথমে সর্ব্বত্রই প্রায় বর্গ্যজই উচ্চারিত হয়, তাই বলিয়া কি আমরা অন্তঃস্থ য ত্যাগ করিতে পারি? "যজ্ঞ" শব্দটির উচ্চারণ "ইয়জ্ঞ", কিন্তু বাঙ্গালা দেশে ওরূপ উচ্চারণ হয় না তজ্জন্য কি "জজ্ঞ" লিখিতে হইবে? তিনি বলিতে পারেন তাহাতেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু ক্ষতি আছে, যজ্ ধাতুর অর্থ "দেব পূজা" উহার উত্তর নঙ্ প্রত্যয় করিয়া এই পদটি উৎপন্ন হইয়াছে। বর্গ্যজ লিখিলে সে অর্থ হয় না। যদি আমরা বর্ণবিন্যাস বিষয়ে যথেচ্ছ আচরণ করি তাহা হইলে সহস্র সহস্র স্থলে বৈষম্য

হয় শস্য বিশেষ, আবার বর্গ্য জ থাকিলে অর্থ হয় বেগ, এখানে বর্ণ বিন্যাসেয় নিয়ম রক্ষা না করিয়া উপায় কি ?*

"বিস্‌মোল্লায় গলদ" কথাটি বৈজ্ঞানিক বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ে অত্যন্ত আদৃত। লেখকেরও এই কথাটির উপর অত্যন্ত ঝোঁক। তিনি উহার মনোহারিত্ব আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিবার জন্য কত যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন অলঙ্কারশাস্ত্র অনুসারে উক্ত কথাটি গুণের উদাহরণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সংস্কৃত, বাঙ্গালা না ইংরাজী কোন্ অলঙ্কারশাস্ত্রের কোন্ প্রকরণের কোন্ নিয়মানুসারে গুণের দৃষ্টান্ত হইতে পারে তাহা তিনি লেখেন নাই। আমরা যদি "বিস্‌মোল্লায় গলদ" না বলিয়া "স্বস্তিবাচনে ভ্রম" বলি তাহা হইলে ক্ষতি কি ? হয়ত তাহা হইলে তাঁহারা অত্যন্ত বিরক্ত হইবেন। আমাদের মনে হয় এক উপহাসস্থল ব্যতীত একথাটি অন্য কোথায়ও ব্যবহৃত হইতে পারে না। সাধুভাষায় একথাটি ব্যবহার করিলে কেবল যে বাক্যের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয় তাহা নহে, ভাষার প্রাণনাশ করা হয়।

* হীরেন্দ্র বাবু বলিলেন "যখন শব্দ ৪০০ বৎসরের পূর্ব্বের লিখিত কবিরাজ গোস্বামীর পুস্তকে 'জখন' এইরূপ বর্ণবিন্যাসে আছে। উহা কি আমাদের পক্ষে প্রমাণ নহে।"

ইহার উত্তরে পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন "যখন" শব্দটি সংস্কৃত 'যৎক্ষণ' শব্দ হইতে পালিভাষার দ্বার দিয়া আসিয়াছে। পালিভাষায় যদ্ শব্দ য এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। পালিভাষায় 'ক্ষ' নাই তাহার স্থলে 'খ' বসিয়াছে। পালি ব্যাকরণের সূত্রানুসারে 'ণ' স্থানে "ন" হইয়াছে। সূত্রটির অর্থ এই ;—রকারান্ত হকারান্ত ধাতুভিন্ন অনট্ প্রত্যয়ে দন্ত্য ন নই থাকে।

পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী বলেন প্রাচীন পুস্তক হইলেই যে তাহার অশুদ্ধ বর্ণবিন্যাস বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে উহার হেতু কি ? সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ লেখকগণ অনেক স্থলে ভুল লেখেন, তাহাই কি শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিব। আমার নিকট এক

[illegible]

ঐ কথাটি সর্ব্বত্র ব্যবহার করিয়া যদি তাঁহারা সন্তুষ্ট হন, বেশ হউন, আমরা ক্ষান্ত হইলাম। লেখক বলেন "থ্যাঁলো মাংস" তিনি বলেন নাই থ্যাঁৎলা মাংস বলিয়াছেন, মুদ্রাকরের অনবধানতায় থ্যাঁলো হইয়াছে। আমরা উহা স্বীকার করিয়া লইলাম।

প্রকৃত বাকবিতণ্ডা এই পর্য্যন্ত। এইবার আমার বাধ্য হইয়া একটি অবান্তর বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইবে। লেখক প্রবন্ধের শেষাংশে একস্থানে বলিয়াছেন ;—"যে কথা গুলি লইয়া আজ তর্ক উঠিল, তাহা এতই সোজা যে পাঠক ও শ্রোতাদের এবং সাহিত্যপরিষৎসভার সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চুপ করিয়া থাকাই উচিত ছিল।" বাস্তবিক সাহিত্য-পরিষৎসভা মহা উন্নত, তিনিও সাহিত্যসেবিসম্প্রদায়ে বিশেষ সম্মানিত, কথা কয়টিও সোজা বটে তেমন দুরূহ নহে ; কিন্তু তথাপি তিনি এই সোজা কথা কয়টির জবাব দিতে গিয়া পদে পদে যেরূপ স্খলিতপদ হইয়াছেন, তাহাতে চুপ করিয়া থাকিলেই তাঁহার অধিক বিচক্ষণতার পরিচয় হইত, সে বিষয়ে তাঁহার সহিত আমরা এবং সর্ব্বসাধারণেই একমত। প্রতিবাদ পাঠ করিয়া লেখক যে অসহিষ্ণুতার অসদ্দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তাহাতে সাহিত্যক্ষেত্রে পূর্ব্বের সভ্যতা ও আধুনিক সভ্যতার পার্থক্য নির্দ্দেশিত হইতেছে। সভ্যতাভিমানী আধুনিক লেখক প্রতি-বাদীকে "কুত্তা" "কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত" প্রভৃতি নানা অভিধানে পর্য্যন্ত অভিহিত করিয়াছেন। আর প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একবার ত্রিপুরা জেলার একটি পাঠাগারের কার্য্যদর্শী ও কলিকাতার একটি ভদ্রলোক বোধোদয়ের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া পত্র লেখেন। উহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় অধৈর্য্য হওয়া দূরে থাকুক, চির-কাল উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতি কিরূপ শিষ্টতা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন একখানি বোধোদয় হইতে তাহার নিদর্শন উদ্ধৃত

বোধোদয়।

একোনাশীতিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

ত্রিপুরা জিলার অন্তঃপাতী রূপসা গ্রামে যে রীডিংক্লব অর্থাৎ পাঠগোষ্ঠী আছে, উহার কার্য্যদর্শী শ্রীযুত মহম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহাম্মদ মহাশয়, বোধোদয়ের কতিপয় স্থল অসংলগ্ন দেখিয়া পত্র দ্বারা আমায় জানাইয়াছিলেন। তৎপরে কলিকাতাবাসী শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন ঘোষ ডাক্তার মহাশয়ও দুই তিনটি অসংলগ্ন স্থল দেখাইয়া দেন; ইহাতে আমি সাতিশয় উপকৃত ও সবিশেষ অনুগৃহীত হইয়াছি। তাঁহাদের প্রদর্শিত স্থল সকল সংশোধিত হইয়াছে। তাঁহারা এরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন না করিলে ঐ সকল স্থল পূর্ব্ববৎ অসংলগ্নই থাকিত। * * * * *

কলিকাতা।
২২শে পৌষ, সংবৎ ১৯৩১। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

উপসংহারে নিবেদন লেখক যদি বৈজ্ঞানিক নিয়মে সহজ ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে পারেন তাহা হইলে আমাদের লাভ বই ক্ষতি নাই। ব্যাকরণ অধ্যাপনা বর্ত্তমান সময়ে তত সুখকর নহে। ব্যাকরণের দিন ক্লাসে গেলেই সৌখীন ছাত্রেরা বলেন "পণ্ডিত মহাশয়! আজ ব্যাকরণ থাক একটা গল্প করুন।" কেহবা অনুবাদ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। নিতান্ত সুবোধ ছাত্র না হইলে রীতিমত ব্যাকরণপাঠে মনোযোগী হয় না। কবিবর যদি বিজ্ঞানসম্মত সহজ ও সরস ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে আমাদেরও ব্যাকরণ পড়ান সুখকর হইবে এবং ছাত্রমহলেও এসেন্স কিংবা গোলাপ জলের ন্যায় উহা সাদরে গৃহীত হইবে। লেখক একজন স্বভাবকবি, শৈশব হইতে কবিত্বের নন্দন-কাননে পুষ্পের সৌরভ, ভ্রমরঝঙ্কার ও কোকিলের কুহুরবের মধ্যে আনন্দে বিচরণ করিতেছিলেন, বৈয়াকরণগণের সৌভাগ্যক্রমে তিনি কণ্টকিত পথে পদার্পণ করিয়াছেন, ব্যাকরণের

বিশেষভাবে প্রচারের নিমিত্তই আমরা তাঁহার প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছিলাম।* তিনি ইহা বিকৃতভাবে লইয়াছেন ইহা পরিতাপের বিষয়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

মহাসভার সুখস্মৃতি।

"সকলজনউৎসাহিনী বাণীর" হৃৎস্পর্শী উদ্বোধনসঙ্গীতের সঙ্গে সমবেতকণ্ঠে, সম্মিলিতহৃদয়ে তিনদিন মায়ের পূজার পর, হায়! শেষদিন দূর হইতে বাষ্পাকুলনয়নে নীরব বিদায়সম্ভাষণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছি। আবাহনের উদ্দাম আনন্দের পর বিসর্জ্জনের এমন মর্ম্মান্তিক-বেদনা জাতীয় সম্মিলনসভায় ইতিপূর্ব্বে আর কোন দিন অনুভব করি নাই—এবার সপ্তদশ অধিবেশনের ইহাই অপূর্ব্ব বিশেষত্ব।

---

* হীরেন্দ্র বাবু বলেন, "বাঙ্গালা যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা এ সংস্কার অনেকের নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন বাঙ্গালায় সন্ধি সমাস নাই। তাঁহার মতে বাঙ্গালায় সংস্কৃত শব্দ যত না আসে ততই মঙ্গল। অতএব বাঙ্গালায় সংস্কৃত অধিক প্রার্থনীয় নহে। সংস্কৃতানুযায়ী বাঙ্গালা ব্যাকরণ বড় জটিল ও দুর্ব্বোধ।"

ইহার উত্তরে শ্রীযুক্ত রসিকলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন "লেখাপড়া শিক্ষায় যে কত শ্রম স্বীকার করিতে হয় উহা হীরেন্দ্র বাবু যত অধিক জানেন অত বোধ হয় কেহই জানেন না। অতএব শ্রম স্বীকার না করিলে কি বিদ্যা হয়? যিনি ভাষায় অধিকার লাভ করিতে চান তাঁহার ব্যাকরণে পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা যে ক্রমে সংস্কৃতানুযায়ী হইতেছে উহার প্রমাণ স্বয়ং হীরেন্দ্রবাবু। তিনি যতগুলি কথা বলিলেন সমুদয়ই বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, মহাশয় বলিলেন "রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহতপ্রভাবে এবং অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।" ইহার মধ্যে এমন কোন্ কথাটি আছে যাহা বালকেরা বুঝিতে পারে না, অথচ 'হইয়া' 'করিতে লাগিলেন' এই দুইটি পদ ব্যতীত সমুদয়ই সংস্কৃত কথা। ঐ সকল কথা কি প্রকারে হইয়াছে? উহা আমরা নিয়মবদ্ধরূপে সংস্কৃত হইতে পাইতেছি। এইরূপ বাঙ্গালাকে আমি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা বলি। তবে রবীন্দ্রবাবু যাহা করিতেছেন উহাও অপ্রয়োজনীয় নহে। চলিত বাঙ্গালা শব্দগুলির নিয়ম আবিষ্কার করিলে ক্ষতি কি?"

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিবশে যাহারা এতদিন আত্মসর্ব্বস্ব মাত্র ছিল, আজ কোন কল্যাণী-করস্পর্শে সঙ্গীতপ্রবাহে তাহারা জাতীয় প্রেমের প্রবল স্পন্দন অনুভব করিল। জাতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে পরস্পর এমন ভালবাসার আদানপ্রদান করিতে শিখিল। এই সঙ্গীতোত্থ অপূর্ব্বভাবের উন্মুক্ত স্রোত আজ দেশব্যাপী প্রবাহিত। জাতীয় মহা-সম্মিলনের সমুদায় ভবিষ্যৎ সুখ সৌভাগ্য এই ভাবের আশ্রয়ে ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে।

আর কে বলিতে পারে জাতীয় মহাসমিতি শুধুই কথার খেলা? শুধুই শূন্যের অট্টালিকা? আজ আমাদের জাতীয় মহাসমিতিরূপ বিরাট অট্টালিকার ভিত্তি গ্রথিত, জাতীয় দেহের মেরুদণ্ড প্রস্তুত। নতুবা সুদূর পুনানগরীর সেই সত্যব্রত, আত্মত্যাগী ব্রাহ্মণ সন্তানকে দেখিবামাত্র বঙ্গবাসী আমাদের প্রাণে এমন অনাস্বাদিতপূর্ব্ব প্রীতিরসের উদ্রেক হয় কেন? যাহা এতদিন শিক্ষাজনিত কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে শুধু কথায় বলিতাম, এবার তাহাই হৃদয়ে অনুভব করিয়াছি।

রাজনৈতিক অধিকার প্রদানের কর্ত্তা পরমেশ্বর। কিন্তু সেই বাঞ্ছিত অধিকার লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার প্রয়াস মানুষের ইচ্ছাধীন। জাতীয় মহাসমিতির সে পুণ্যপ্রয়াসে আর কেহ সন্দেহ করিবে না। ফলাফল ভবিষ্যতের অজ্ঞাত অন্তরালে লুক্কায়িত হইলেও মাতৃভূমির সেবায় সন্তানগণের সাধনার আন্তরিকতায় আজ আর কেহ প্রশ্নজিজ্ঞাসু হইবেন না। রাণী ভবানীর বংশধর মহারাজের এই মহা সভায় প্রকাশ্য যোগদান উহার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। শুধু এই নিঃস্বার্থ আন্তরিকতাটুকু এমন একটা জিনিষ যাহার মৃতুজীবন-সঞ্চারলক্ষণও অনুভবপূর্ব্বক সমুদায় ঈর্ষা দ্বেষ প্রতিকূলতা, এমন কি, পরাজয় পর্য্যন্ত [illegible] প্রতি দৃকপাত করিবার আবশ্যকতা-

কর্ত্তব্যসম্পাদন করিতে পারি, আবশ্যক হইলে যেন নিজের ক্ষণস্থায়ী তুচ্ছ জীবনটাকে মাতৃভূমির সেবাব্রতে অম্লানবদনে বিসর্জ্জন দিতে পারি। তাহাতে যদি পরাভব হয় বিন্দুমাত্র অনুতাপ নাই, শুধু কর্ত্তব্যের নিকট চিরবিশ্বস্ত ও ভগবানের প্রতি চিরনির্ভরপরায়ণ থাকিতে পারিলেই জীবন সার্থক হইবে। সার্ব্বজনীন কর্ত্তব্যের সাধন ক্ষেত্রে যে পরাজয় তাহা বিজয়েরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এ সত্য যেন আমরা কখনও না ভুলি।

প্রত্যাবর্ত্তনের সময় মহাসভার বহির্দ্বারে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবাক্রান্তহৃদয়ে অন্যমনস্ক অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিলাম, এমন সময়ে জনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান বন্ধু প্রীতিসম্ভাষণ করিলেন। কুশল জিজ্ঞাসার পরে তিনি 'আজ ভ্রাতৃসম্মিলনসভায় কিরূপ সুখানুভব করিলেন আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার মুখশ্রী কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইল, তিনি বলিলেন,—"ভাই, রেজলিউশানগুলি ত এইরূপে চিরকালই পাশ হইতেছে! আর বৃথা কেন ?"

তাঁহার হস্তে হস্ত স্পর্শপূর্ব্বক বলিলাম, "সেজন্য আমাদের একটুও চিন্তিত বা দুঃখিত হইবার আবশ্যক নাই। আজিকার দিনটা বৃথা বলিবেন না; আশা ও আনন্দের যথেষ্ট উপাদান দৈববলে সঞ্চিত হইয়াছে। আপনি শুধু একবার বলুন,—ইলাহি 'আক্‌বর হিন্দুস্থান।'"

উচ্ছ্বসিত প্রীতির আবেগে তিনি আমাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সোৎসাহে আমার নয়নে একাগ্র দৃষ্টিপাতে—একবার বলিয়া তৃপ্ত হইলেন না, পরম প্রীতি, ভক্তি ও বিশ্বাসভরে তিনবার বলিলেন,—"ইলাহি আক্‌বর হিন্দুস্থান!" অনুদার সাম্প্রদায়িকতা পরিহারপূর্ব্বক আজ হিন্দু মুসলমান শিখ জৈন পার্শী পরস্পর প্রীতির আদানপ্রদান করিতেছে ইহাই পরম লাভ, ইহাতেই সমুদায় সার্থক, ইহাই একদিন আমাদের বিপুলকালসঞ্চিত পাপকলুষকালিমা প্রক্ষালন করিবে।

শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

চতুর্দ্দশ ভুবন।

সপ্ত দেবলোক।

সপ্ত পাতাল ও সপ্ত দেবলোক লইয়া চতুর্দ্দশ ভুবন পরিগণিত। আমরা এই প্রবন্ধে সপ্ত দেবলোকের কথা বলিব।

মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে, ভূঃ—ভুবঃ—স্বঃ—মহঃ—জনঃ—তপঃ ও সত্য এই সপ্ত ভুবন, সপ্ত দেবলোক বলিয়া প্রখ্যাত, যথা—

ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথ মহর্জনঃ।
তপঃ সত্যঞ্চ সপ্তৈতে দেবলোকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

এখানে বিতর্ক হইতে পারে মেরুপর্ব্বত (বর্ত্তমান আলটাইপর্ব্বত) দেবলোক বলিয়া বিবৃত (স এষ পর্ব্বতো মেরুর্দেব লোক উদাহৃতঃ) তবে আবার এ সাতটী লোক কিপ্রকারে দেবলোক শব্দের বিষয়ীভূত হইল ?। তাহার হেতু এই, মেরুপর্ব্বত আদি দেবলোক ও মানবের আদি জন্মভূমি, তাহা ঠিকই, কিন্তু "দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্ব্বে।"*

প্রাচীন বংশং করোতি দেবমনুষ্যা দিশো,
ব্যভজন্ত। প্রাচীং দেবা দক্ষিণাং পিতরঃ, প্রতীচীং
মনুষ্যা উদীচীং রুদ্রাঃ।—কৃষ্ণযজুঃ।

এই প্রমাণানুসারে দেখা যায় উক্ত মুখ্য দেবলোক হইতে দেবতা ও মনুষ্যেরা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া যে ৭টী স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়া ৭টী প্রাচীন বংশের পত্তন করিয়াছিলেন, সেই ৭টী স্থানও দেবগণের বসবাসনিবন্ধন সপ্ত দেবলোক বলিয়া প্রথিত হয়। দৈত্য, দানব ও রাক্ষসাদি দ্বারা সপ্ত পাতাল অধ্যুষিত হইয়াছিল, তজ্জন্য উহা দেবলোক সংজ্ঞায় আহূত হয় নাই। তাঁহারা (পূর্ব্বদেবাঃ) দেবনাম দূরে পরিহার করিয়াছিলেন।

এখন কথা হইতেছে এই সপ্ত দেবলোক কি, এবং এইক্ষণে কোন্‌টী কি নামে পরিচিত। এবং কে কোথায় অবস্থিত ?।

বায়ু পুরাণে লিখিত আছে—

ভূর্লোকঃ প্রথমস্তেষাং দ্বিতীয়স্তু ভুবঃ স্মৃতঃ॥ ১৬
স্বস্তৃতীয়স্তু বিজ্ঞেয়শ্চতুর্থো বৈ মহঃ স্মৃতঃ।
জনস্তু পঞ্চমো লোক স্তপঃ ষষ্ঠো বিভাব্যতে॥ ১৭
সত্যস্তু সপ্তমো লোকো নিরালোক স্ততঃপরং॥ ১৮

ভূলোক প্রথম, ভুবর্লোক দ্বিতীয়, স্বর্লোক বা স্বর্গ তৃতীয়। মহর্লোক চতুর্থ—জনলোক পঞ্চম, তপোলোক ষষ্ঠ, এবং সত্যলোক সপ্তম। এই সপ্ত লোকের বাহিরে আরও স্থান ছিল—তাহা নিরালোক বলিয়া আখ্যাত। আলোকের অভাব বশতঃ অথবা উহা দুর্গ ও অনধিগম্য ছিল বলিয়া সেই অজ্ঞেয় অনধ্যুষিত স্থানকে ঋষিরা নিরালোক বলিয়া থাকিবেন।

আমরা এইক্ষণ এই সাতটী লোকের পদার্থ নির্ণয় করিয়া বর্ত্তমান কালের দেশ মহাদেশের সহিত উহাদের কাহার কি সম্বন্ধ আছে তাহা এবং উহাদের অবস্থানবিন্দু নির্দ্দেশ করিব।

১। ভূর্লোক...ভূ ও ভূস্‌ শব্দ একই। ঋষিরা ভূর্লোককে প্রথম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। উহাঁরা ভারতীয় ঋষি। বেদ ভিন্ন স্মার্ত পুরাণাদি অথবা পুরাণ 'স্বর্গে' প্রণীত হইয়াছে, আমরা এরূপ মনে করি না। পুরাণ-প্রণেতৃগণ ভারতবাসীই ছিলেন। কালকালের ব্যাসদেব পুরাণের ভিত্তি সংস্থাপয়িতা, সুতরাং তাঁহারা আপনাদের অধিষ্ঠানভূতা ভারতভূমিকেই এই প্রথম লোক অর্থাৎ ভূর্লোক শব্দে বিশেষিত করিয়াছেন। আমাদের মতে ভূর্লোক ও ভারতবর্ষ এক।

স্থলে যাস্ক, সায়ণ ও শ্রীধর প্রভৃতি সকলেই—ভূঃ শব্দে পৃথিবী অব-বোধিত করিয়াছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে পৃথিবী ও ভারত এক নয়। কিন্তু আমরা বলিতেছি—একদিন পৃথিবী ও ভারত এক ছিল। মহারাজ পৃথুর নামানুসারে তদীয় রাজ্য ভারতবর্ষ ত্রেতাযুগে "পৃথোরিয়ং" এই অর্থে পৃথ্বী বা পৃথিবী নামে আহূত হয়। পৃথুই গোরূপ-ধারিণী পৃথিবীর দোহন করিয়া দোহদক্ষ মেরুর সহায়তায় ভাস্বান রত্ন-সমূহের সমাহার করিয়াছিলেন। পৃথ্বী বা পৃথিবী শব্দের ফলিতার্থ (Secondary Meaning) ভূমণ্ডল, ভূমণ্ডল উহার মুখ্যার্থ নহে।

বিতর্ক করিবেন পুরাণপ্রণেতৃগণ পৃথিবী ও ভূর্লোকের এইরূপ পরিভাষা নির্দ্দেশ করিলেন কেন? যথা—

রবিচন্দ্রমসোর্যাবৎ ময়ূখৈরব ভাস্যতে।
সসমুদ্র সরিচ্ছৈলা তাবতী পৃথিবী স্মৃতা ॥৩
পাদ গম্যন্তু যৎকিঞ্চিৎ বস্ত্বস্তি পৃথিবীময়ং।
স ভূর্লোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোস্য ময়োদিতঃ ॥১৬

-৭অ-২অং বিষ্ণু পু।

এই পরিভাষা অদোষসংস্পৃষ্ট নহে। ইহা ব্যাহত। কেননা ঋষিরা এই পরিভাষা দ্বারা যে ভারতবর্ষের পরিচয় দান করিতেছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহই নাই, তাঁহারা ত ভারতকে চতুর্দ্দশ ভুবনের বাহিরের বস্তু বলিয়া জানিতেন না। যদি ভারত ও ভূ, ধরা, বসুন্ধরা প্রভৃতি একার্থবিমোষী না হইত তাহা ২... স্বর্গভ্রষ্ট ভারতবাসী দেবতারা কেন ভূদেব, ভূসুর, ধরামর শব্দে সংসূচিত হইবেন? বাস্কল-দৈত্যবিতাড়িত বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়েন। বিষ্ণুর তৃতীয় ক্রম দ্বারা ভারতভূমি (আর্য্যাবর্ত্ত) আক্রান্ত হইয়াছিল, তজ্জন্য ভারতভূমি বিষ্ণুক্রান্তা বিশেষণে বিশেষিত। যথা—

অশ্ব ক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।

সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তভূমি বিষ্ণুক্রান্তা, বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে চট্টল দেশ প্রসারী সমগ্র ভূমি রথক্রান্তা* এবং নর্ম্মদার দক্ষিণস্থ সাগরাবগাহী রথাদি-অগম্য, অশ্বগম্য ভূভাগ তৎকালে অশ্বক্রান্তা নামে আখ্যাত হইত। এখানে কি এই বসুন্ধরা শব্দে বিষ্ণুক্রান্তা ভারতভূমি সূচিত হয় নাই? বিষ্ণু কি ভারত ভিন্ন আর কোথায়ও যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন? অবশ্য সমগ্র ভূমণ্ডল ভিন্ন, বিতস্তিপ্রমাণ ভারতকেই একমাত্র চন্দ্র ও সূর্য্য, ময়ূখমালা দ্বারা উদ্‌ভাসিত করেন একথা বলাতে অব্যাপ্তি দোষ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু উহা পুরাণপ্রণেতার ভৌগোলিক জ্ঞানের লাঘব বশতই ঘটিয়াছিল। তৎকালে ভারত যে পাদগম্য ছিল—তাহার তাৎপর্য্য এই—পুরাণকর্ত্তারা—পৌরাণিক যুগে ভারতের যে সীমা নির্দ্দেশ করিতেছেন বৈদিক যুগে উহার সে সীমা ছিল না। পৌরাণিক যুগের বর্ণিত ভারতের সীমা এই—

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণং।
বর্ষং তৎ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥ ১
পূর্ব্বে কিরাতা যস্য স্যুঃ পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ। ৮

৩অ—২অং, বিষ্ণু।

কিন্তু বৈদিক যুগে পারস্য বা অপগস্থান এবং পূর্ব্বকিরাত পূর্ব্বোপদ্বীপ ভারতের সহিত সংলগ্ন ছিল না। তৎকালে সমগ্র কাশ্মীর—সমগ্র পঞ্জাব এবং সমগ্র বঙ্গভূমি পশ্চিম ও পূর্ব্ব সাগরের জরায়ু শয্যায় শায়িত থাকিয়া অভ্যুত্থানের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। মানদণ্ডরূপী মহান্ হিমাচল পূর্ব্ব ও পশ্চিমসাগরে অবগাহন করিয়া পৃথ্বীরূপিণী ভারতভূমির আয়াম নির্দ্দেশ করিতেছিল। তুর্ব্বশু ও যদু এই পশ্চিমসাগর পার হইয়া

* [illegible] যাবৎ চট্টল দেশতঃ।

স্বর্গ হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন।* তখন ভারতের তিনদিকে সাধারণ মানবের অলঙ্ঘ্য অনন্ত জলরাশি, উত্তরে—অলঙ্ঘ্য তুষারধবল ধবলশৃঙ্গসনাথ মহান্ হিমগিরি, সুতরাং এই সীমানার মধ্যগত ভারত, পাদগম্য ছিল। ভারতীয় লোকেরা পায়ে হাঁটিয়া এই ভারতের বাহিরে যাইতে পারিতেন না। তাই ভূর্লোক বা ভারতবর্ষ পাদগম্য বিশেষণে সমলঙ্কৃত, সমগ্র ভূমণ্ডলও একার্থে পাদগম্য বটে, কিন্তু এখানে সমগ্র ভূমণ্ডল পুরাণ প্রণেতার অভিলক্ষ্য ছিল না।

বেদও পুরাণকর্ত্তারা ভূর্লোক ও পৃথিবীর সাম্য বিঘোষণা করিয়াছেন, আবার এদিকে ভারত ও পৃথিবী অভিন্ন পদার্থ। সুতরাং ভারতবর্ষই যে ভূর্লোক তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই।

পুরাণে বর্ণিত আছে।—

তভোভূঃ পার্থিবোলোকো হ্যন্তরীক্ষং ভুবঃ স্মৃতং॥ ২০
পৃথিবীং চান্তরীক্ষং চ দিব্যং যচ্চ মহঃস্মৃতং।
স্থানান্যেতানি চত্বারি স্মৃতান্যার্ণবকানি চ॥ ১৩

৩৯অ—বায়ু উঃখণ্ড।

অর্থাৎ ভূর্লোক ও পৃথিবী এক, এবং অন্তরীক্ষ ও ভুবর্লোক এক, অপিচ পৃথিবী, অন্তরাক্ষ, স্বর্গ ও মহর্লোক সমুদ্রপ্রধান দেশ। এখন দেখ ভারতই পূর্ব্বে পৃথিবী নামে আখ্যাত ছিল কিনা ?—

রস মঞ্জরীতে লিখিত আছে—"পৃথ্বী তাবৎ ত্রিকোণা"—ভূমণ্ডল গোল, ভারত ত্রিকোণ, অতএব এই পৃথ্বী শব্দ দ্বারা ভারত সংসূচিত।

কালিদাস বলিয়াছেন—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য, স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥ কুমার

হিমালয় পর্ব্বত ভারত ভিন্ন সমুদয় ভূমণ্ডলের উত্তর দিক্ সংস্থও নহে—মানদণ্ড স্বরূপও নহে—উহা দ্বারা ভারতবর্ষেরই আয়াম পরিমাপিত হইতেছে। অতএব অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে ভারত একদিন পৃথ্বী বা পৃথিবী নামের বিষয়ীভূত ছিল।

অপিচ চরণ ব্যূহের ভাষ্যে বেদ শাখার স্থান নির্দ্দেশস্থলে যে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে—

> "পৃথিব্যামধ্যরেখা চ নর্ম্মদা পরিকীর্ত্তিতা।
> দক্ষিণোত্তরয়োর্ভাগে শাখাভেদশ্চ উচ্যতে॥ ১
> নর্ম্মদা দক্ষিণে ভাগে আপস্তম্ব্যাশ্বলায়নী।
> রাণায়নী পিপ্পলা চ যজ্ঞকন্যাবিভাগিনঃ॥ ২

কিন্তু নর্ম্মদা ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশে নাই এবং ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশেরও সে দ্বিধাবিভক্তি-সম্পাদিকা নহে। অতএব পৃথিবী ভূর্লোক ও ভারতের সমীকরণ অবশ্যই স্বতঃ স্বীকার্য্য? পৃথু রাজা ভারত ভিন্ন অন্য কোন বর্ষেরও রাজা ছিলেন না; সুতরাং তাঁহার রাজ্য তাঁহার নামে পরিচিত হইয়া পৃথ্বী বা পৃথিবী নাম ধারণ করিয়াছিল, ইহাই ধ্রুব। ফলতঃ পৃথিব্যপর নামা ভারতবর্ষ যে ভূর্লোক সহ অভিন্ন তাহা এক প্রকার স্বীকৃত সত্য।

২। ভুবর্লোক। ভারতের পশ্চিম দিকে অপগস্থান পারস্য ও বাহ্লিক-সনাথ স্বাধীনতাতার—ভুবর্লোকের অন্তর্গত। শাস্ত্রে ভুবর্লোক ও অন্তরীক্ষ এক বলিয়া কথিত। এখন আমরা সুনীল আকাশকে অন্তরীক্ষ ও সুদূরব্যাপী অনন্ত শূন্যকে আকাশ বলিয়া অবগত আছি। কিন্তু বৈদিক যুগে এই অপগস্থান প্রভৃতি ভূভাগ—নভঃ, অপঃ, অন্তরীক্ষ, সমুদ্র ও ভুবর্লোক এবং আমাদিগের পবিত্র পিত-ভমি মুখ্য স্বর্গ, আকাশ বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল।

উদীচ্য ভূমি বুঝাইত, আকাশস্থ কোন লোক সূচিত হইত না। অবশ্য শিরস্থ আকাশও উর্দ্ধদিক বটে, কিন্তু উর্দ্ধ শব্দ কেবল তদর্থবাচী ছিল না। পুরাণে লিখিত আছে—

ভূর্লোকঃ প্রথমস্তেষাং দ্বিতীয়স্তু ভুবঃ স্মৃতঃ॥ ১৬

দ্বিতীয়ং ভুব ইত্যুক্তোহন্তরীক্ষং ততোহভবৎ॥ ১৯—৩৯ অঃ,

বায়ু, উত্তরখণ্ড।

অতএব ইহাদ্বারা ভুবর্লোক ও অন্তরীক্ষের সাম্য সিদ্ধ হইতেছে। পুরাণের স্থলান্তরে বর্ণিত রহিয়াছে—

ভূম্যন্তরং যদাদিত্যাং অন্তরীক্ষং ভুবঃস্মৃতম্॥৪০—৩৯অ, বায়ু।

ভূমিসূর্য্যান্তরং যত্তু সিদ্ধাদিমুনিসেবিতম্।

ভুবর্লোকস্তু সোহপ্যুক্তো দ্বিতীয়োমুনিসত্তম্॥ ১৭

৭অ, ২অংশ, বিষ্ণু।

অতএব সূর্য্যলোক ও ভূলোকের মধ্যবর্ত্তী স্থান ভুবর্লোক। উহার পরিমাণ কত? পৃথিবীর তুল্য পরিমাণ—

যাবৎপ্রমাণা পৃথিবী বিস্তার পরিমণ্ডলাৎ।

নভস্তাবৎ প্রমাণং বৈ ব্যাসমণ্ডলতোদ্বিজ॥৪—৭অ, ২অং, বিষ্ণু।

এখন বিতর্ক করিতে পার—যাহা সূর্য্য ও ভূলোকের মধ্যগত, যাহার নাম নভঃ বা অন্তরীক্ষ সে আকাশ-বিহারী না হইয়া পাদস্পৃষ্ট অপগ-স্থানাদি হইল কি প্রকারে?

এ কথা ঠিক্, নভঃ ও অন্তরীক্ষ শব্দে আকাশ বুঝাইয়া থাকে, ইহা ত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাও জানে। তবে আমরা কেন এ সত্যের অপলাপ করিতেছি? কিন্তু বেদে অন্তরীক্ষ যে অপ্ ও সমুদ্র নামেও আখ্যাত হইত—সে অর্থ কি এখন অনুসৃত হইয়া থাকে? অতএব সংস্কারের বিরুদ্ধ কথা হইলেই তাহার কোন নিদান বা মূল নাই তাহা মনে করিতে

পরিগণনা করিয়াছেন। অপগস্থান সমুদ্রবহুল ছিল বলিয়া উহা নভঃ শব্দে আখ্যাত হইত। ঋগ্বেদে নভঃ শব্দ স্বর্গাদি লোকবাচক বলিয়া কথিত, যথা—জ্যোতিষ্মতি প্রতিমুঞ্চ তে নভঃ। তাহার হেতু উহা স্বর্গের আসন্ন ভূমি বলিয়া। ভুবর্লোক ভূ ও সূর্য্যলোকের মধ্য সংস্থ। এখানে এই সূর্য্য আকাশ-বিহারী জড়পিণ্ড নহেন, এখানে এই সূর্য্য শব্দ দ্বারা বৈবস্বত মনুর পিতা বিবস্বান্ বা সূর্য্য অববোধিত হইয়াছেন। সূর্য্য ও চন্দ্র বংশের প্রবর্ত্তয়িতারা আকাশচর জড় পদার্থ নহেন—পরন্তু মানুষ ছিলেন। মানুষ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের জায়গা, জমি ও ভূ-সম্পত্তিও ছিল ; সেই সেই ভূমি, সূর্য্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইয়াছে। আমরা মনে করি হরিবর্ষ অর্থাৎ বর্ত্তমান চীন তাতার লইয়া সূর্য্যলোক পরিগণিত ছিল। সূর্য্য ঐ দেশের রাজা ছিলেন। অথবা পরিমাণে উহা আরও ন্যূনাধিক হইতে পারে। কিন্তু চীন তাতার বা হরিবর্ষ যে সূর্য্যমণ্ডল তাহা নিঃসন্দেহ, কেননা সূর্য্যমণ্ডল ও ধ্রুবলোকের মধ্যস্থিত স্থান (মঙ্গোলিয়া) মুখ্য স্বর্গলোক। ঋগ্বেদে এই একটী ঋক্ আছে, যথা—

তিস্রোত্থাবঃ সবিতুর্দ্বা উপস্থাঁ একা যমস্য ভুবনে বিরাষাট্। ৬

৩৫সূ, ১ম।

সায়ণ উহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"দ্যাবঃ স্বর্গোপলক্ষিতাঃ প্রকাশমানা লোকা স্তিস্রস্ত্রিসংখ্যকাঃ সন্তি। তত্র দ্বৌ লোকৌ সবিতুঃ সূর্য্যস্য উপস্থা সমীপস্থানে বর্ত্তেতে দ্যুলোক ভূলোকয়োঃ সূর্য্যেণ প্রকাশিতত্বাৎ। একা মধ্যমা ভূমিঃ—অন্তরীক্ষ লোকঃ যমস্য ভুবনে—

ইহাদ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে যে ভূর্ভুবঃস্বঃ—এই ত্রিলোক মধ্যে ভুবঃ অন্তরীক্ষপদবাচ্য। বেদের এই সবিতাই পুরাণে সূর্য্য নামে বিবৃত এবং এই সবিতা ও সূর্য্য উভয়েই সূর্য্যবংশের আদি পুরুষ মানুষ সূর্য্য। যম

তাহাও আমরা জানি। কিন্তু গোহরণকারী বলের নিসূদন কালে ইন্দ্রদেব, মরুদ্‌গণ, অগ্নিদেব ও যমের এবং সরমার সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ যম ইন্দ্রের নিকট পুরস্কার স্বরূপ ভূবর্লোকের আধিপত্যও প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। যম পারলৌকিক জীব নহেন—তাঁহার বাড়ীতে চিত্রগুপ্ত নামক একজন কায়স্থ মুহুরি থাকার কথাও সম্পূর্ণ অলীক। জেন্দাভস্তাতে এই যমই যিম নামে আখ্যাত ও তাঁহার রাজ্য সুখময় বলিয়া বিবৃত। বেদের অন্যত্র বর্ণিত আছে—

ত্বং ভুবঃ প্রতিমানং পৃথিব্যাঃ ঋষ্ববীরস্য বৃহতঃপতির্ভূঃ।
বিশ্বমাপ্রা অন্তরিক্ষং মহিত্বা সত্যমদ্ধানকিরন্যস্ত্বাবান্॥ ১৩

৫২ সূ—১ম—ঋবে

হে ইন্দ্র! ত্বং পৃথিব্যাঃ প্রথিতায়া বিস্তীর্ণায়াভূমেঃ প্রতিমানং ভুবঃ প্রতিনিধির্ভবতি। যথা ভূলোকো মহানচিন্ত্যশক্তিঃ এবং ত্বমপি ইত্যর্থঃ। তথা ঋষ্ববীরস্য বীরয়ন্তি বিক্রান্তা ভবন্তি ইতি বীরাঃ দেবাঃ, ঋষ্বা দর্শনীয়া-বীরা যস্য সতথোক্তঃ তস্য বৃহতোবৃংহিতস্য প্রবৃদ্ধস্য স্বর্গলোকস্য পতির্ভূঃ পালয়িতা তথা অন্তরিক্ষং অন্তরা ক্ষান্তং দ্যাবা-পৃথিব্যোর্মধ্যে বর্ত্তমানমাকাশং বিশ্বং সর্ব্বমপি মহিত্বা। মহিত্বেন সত্যমাপ্রাইত্যাদি সায়ণঃ।

পিতৃণাং স্থান মাকাশং দক্ষিণা দিক্ তথৈব চ॥

৬—৩ অ—বৃহৎ পরাশর সং।

এখানে সায়ণ অন্তরিক্ষকে আকাশসংস্থ বলুন তাহাতে হানি নাই কিন্তু বেদের উক্ত উক্তি দ্বারা ২য় লোকের (ভুবর্লোকের) অন্তরিক্ষত্ব সপ্রমাণ ও সমর্থিত হইতেছে। ভুবর্লোক ও অন্তরিক্ষ এক ইহা বেদ ও পুরাণ উভয় শাস্ত্রদ্বারাই প্রদর্শিত হইল। এইক্ষণ আমরা দেখাইব অন্তরিক্ষ গন্ধর্ব্বদিগের আবাসভূমি গান্ধারাদি প্রদেশ ভিন্ন আর কোন

ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত আছে......"তয়োরিদ্ ঘৃতবৎপয়ো।

বিপ্রা রিহন্তি ধীতিভিঃ। গন্ধর্বস্য ধ্রুবে পদে॥ ১৪—২২ সূ—১ম

সায়ণ ইহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন গন্ধর্ব্বস্য ধ্রুবং পদং অন্তরীক্ষং—তথাচ তাপনীয় শাখায়াং সমাম্নায়তে—যক্ষ গন্ধর্ব্বাপ্সরোগণ-সেবিতমন্তরিক্ষং ইতি।

অর্থাৎ মেধাবিগণ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত গন্ধর্ব্বদিগের বাসভূমিতে অঙ্গুলি (কাজেই অঞ্জলি) দ্বারা ঘৃতবৎ জলপান (লেহন ?) করিয়া থাকেন*। অন্তরীক্ষ গন্ধর্ব্বদিগের দেশ, যক্ষ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরঃ প্রভৃতি দেবযোনিগণ তথায় বাস করে। †

এখন অনুসন্ধান করা যাউক মধ্যযুগে কোন্ স্থান গন্ধর্ব্ব লোক বলিয়া আখ্যাত হইত। আমরা রামায়ণে দেখিতে পাইতেছি—

শ্রুত্বা সেনাপতিং প্রাপ্তং ভরতং কেকয়াধিপঃ।
যুধাজিদ্‌গর্গসহিতং পরাং প্রীতিমুপাগমৎ॥ ১
স নির্যযৌ জনৌঘেন মহতা কেকয়াধিপঃ।
ত্বরমাণোঽভিচক্রাম গন্ধর্ব্বান্ কেকয়াধিপঃ॥ ২

---

* শীতে জল জমিয়া দুগ্ধ, দধি ও ঘৃতাকার ধারণ করা অসম্ভব নয়। অনেক পার্ব্বত্যভূমির জলও রক্ত, পীত ও শ্বেতকর্দ্দমাক্ত বলিয়া দ্রবীভূত ঘৃতের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে। হিন্দুদের সপ্ত সমুদ্রের জলও ঐরূপ পদার্থ। বস্তুতঃ গোয়ালার দধি দুগ্ধ দ্বারা সমুদ্র পূর্ণ থাকিত না, মেধাবীরা যে ঘৃতবৎ জল লেহন করিয়াছিলেন, তাহা এখন বরফের কল্যাণে আমরাও করি। আমরা কি বরফ চাটিয়া খাই না ? গান্ধারাদি দেশের জল বরফ, অর্দ্ধবরফ সব অবস্থারই ছিল ও এখনও আছে।

দত্তজ মহাশয় সায়ণের মতানুসরণ করিয়া "ধীতিভিঃ" অর্থ নিজকর্ম্মগুণে (সায়ণ—ধীতিভিঃ কর্ম্মভিঃ !!) করিয়াছেন, কিন্তু যাস্ক ধীতি অর্থ অঙ্গুলি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "স সপ্তধীতিভির্হিতঃ" ইতি ঋগ্বেদঃ।

† আদিত্যা গন্ধর্বা বিশ্বে সাধ্যাশ্চ পিতরস্তথা।

ভরতশ্চ যুধাজিচ্চ সমেতৌ লঘুবিক্রমৌ।
গন্ধর্ব্বনগরং প্রাপ্তৌ সবলৌ সপদানুগৌ ॥ ৩
শ্রুত্বা তু ভরতং প্রাপ্তং গন্ধর্ব্বাস্তে সমাগতাঃ।
যোদ্ধুকামা মহাবীর্য্যা ব্যনদংস্তে সমন্ততঃ ॥ ৪
ততঃ সমভবৎ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
সপ্তরাত্রং মহাভীমং ন চান্যতরয়োর্জয়ম্ ॥ ৫
হতেষু তেষু সর্ব্বেষু ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ।
নিবেশয়ামাস তদা সমৃদ্ধে দ্বে পুরোত্তমে ॥ ১০
তক্ষং তক্ষশিলায়াং তু পুষ্কলং পুষ্কলাবতে।
গন্ধর্ব্ব দেশে রুচিরে গান্ধার বিষয়ে চ সঃ ॥ ১১

বাল্মীকি—১০১ সর্গ উত্তরকাণ্ড।

অতএব তক্ষশিলা (টেক্‌শিলা), ও পুষ্কলাবতী (গজনী)-সনাথ গান্ধারদেশ গন্ধর্ব্বদেশ, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। অতএব এ স্বর্য্য লোক আকাশ বিহারী নহে কিন্তু আকাশবাচী পিতৃলোক মেরুপর্ব্বতের প্রতিবাসী পদার্থমাত্র। এবং ভুবর্লোকও আকাশে বা (শূন্যে) সংস্থ অন্তরীক্ষ নহে পরন্তু স্বর্গ ও পৃথিবীর (ভারতবর্ষ) অন্তঃ—ঈক্ষ্যমাণ ও তাহা নির্ব্যূঢ় ভৌম পদার্থ এবং তাহাও আমাদের গান্ধারাদি-দেশ বিলসিত অপগস্থানাদি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আফ্রিদি যুদ্ধে আফ্রিদি দেশে যে "গন্ধাব" নামক নগরের কথা শ্রুত হওয়া গিয়াছে তদ্দ্বারাও অপগস্থানের গন্ধর্ব্বদেশত্ব সুতরাং অন্তরীক্ষত্ব ও ভুবর্লোকত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

তবে আমরা বাহ্লীকাদি স্থানকেও কেন ভুবর্লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম? তাহার হেতু এই, চিত্ররথ প্রভৃতি গন্ধর্ব্বের বাস ঐ দেশে থাকা আমাদের অনুমান। পূজ্যপাদ প্রফুল্লবাবু তদীয় "গ্রীক হিন্দুতে"

সপ্তর্ষীণাং স্থিতির্যত্র যত্র মন্দাকিনী নদী।

দেবর্ষি চরিতং রম্যং যত্র চৈত্ররথং বনং ॥

সপ্তর্ষিগণ, বৈরাজ ভবনের (মেরু পর্ব্বতস্থ) সপ্ত গৃহে বাস করিতেন। উহা বর্ত্তমান আলটাই পর্ব্বতৈকদেশ। মন্দাকিনী নদী কিম্পুরুষ বর্ষের (তিব্বত) বিষ্ণুপদভূমিস্থ বিষ্ণুপদ সরঃসম্ভূতা, সুতরাং চৈত্ররথ বন উহাদের আসন্নবর্ত্তী বলিয়া আমরা দুর্যোধনের বন্ধনকর্ত্তা চিত্ররথ গন্ধর্ব্বকে স্বাধীনতাতারে লইয়া যাইতে চাই। "হেমকূটে চ গন্ধর্ব্বা বিজ্ঞেয়াঃ সাপ্সরো গণাঃ", গন্ধর্ব্ব নগরী স্ফীতা হেমকক্ষে নগোত্তমে"—ইহা দ্বারাও অনুমিত হইতেছে হেমকূট পর্ব্বত পর্য্যন্ত গন্ধর্ব্বদেশ প্রসারিত ছিল। উপনিষদে গন্ধর্ব্বেরা ঐন্দ্রজালিক বলিয়া প্রখ্যাত। আবার ভট্টমোক্ষ মূলর ও দত্তজ মহাশয় উহাদিগকে কুরুপাণ্ডবদের ন্যায় কল্পিত পদার্থ বলিয়া বিঘোষণা করিয়াছেন। হস্তিদর্শী নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্তের ন্যায় এখন সকলই অভাব পদার্থ হইতে চলিল। আমরা কিন্তু গান্ধর্বী বিবাহ রীতি ঐ অসদ্বস্তু হইতেই প্রাপ্ত !

২। স্বর্লোক···আমাদিগের তৃতীয় লোকের নাম স্বর্লোক বা স্বর্গলোক। বিষ্ণুপুরাণ কর্ত্তা স্বর্লোককে সূর্য্য ও ধ্রুব-লোকের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

ধ্রুবসূর্য্যান্তরং যচ্চ নিযুতানি চতুর্দ্দশ।

স্বর্লোকঃ সোঽপি বিদিতো লোকসংস্থানচিন্তকৈঃ ॥ ১৮

৭অ, ২অং বিষ্ণু।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে পৃথু ও বেণ রাজার পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ ধ্রুব ও সূর্য্যবংশের আদিপুরুষ মহারাজ বিবস্বান্ বা সূর্য্যের রাজ্যের অন্তর্গত যে ভৌম স্থান, তাহার নাম স্বর্লোক বা স্বর্গ। ইহা হইল স্বর্গের সীমার কথা। পুরাণ কর্ত্তা স্থলান্তরে কোন্ কোন্ স্থান লইয়া

রবিচন্দ্রমসোর্যাবন্ময়ূখৈরবভাস্যতে।
সসমুদ্র সরিচ্ছৈলা তাবতী পৃথিবী স্মৃতা॥ ৩
যাবৎপ্রমাণা পৃথিবী বিস্তার পরিমণ্ডলাৎ।
নভস্তাবৎ প্রমাণং বৈ ব্যাসমণ্ডলতোদ্বিজ॥ ৪
ভূমের্যোজনলক্ষেতু সৌরং মৈত্রেয় মণ্ডলং।
লক্ষাৎ দিবাকরস্যাপি মণ্ডলং শশিনঃ স্মৃতং॥ ৫
পূর্ণে শতসহস্রেতু যোজনানাং নিশাচরাৎ।
নক্ষত্রমণ্ডলং কৃৎস্নং উপরিষ্টাৎ প্রকাশতে॥ ৬
দ্বে লক্ষে চোপরি ব্রহ্মন্ বুধো নক্ষত্রমণ্ডলাৎ।
তাবৎ প্রমাণ ভাগেতু বুধস্যাপ্যুশনাঃ স্থিতঃ॥ ৭
অঙ্গারকোপি শুক্রস্য তৎপ্রমাণে ব্যবস্থিতঃ।
লক্ষদ্বয়েন ভৌমস্য স্থিতো দেব-পুরোহিতঃ॥ ৮
শৌরির্বৃহস্পতে শ্চোর্দ্ধং দ্বিলক্ষে সম্যগাস্থিতঃ।
সপ্তর্ষি মণ্ডলং তস্মাৎ লক্ষমেকং দ্বিজোত্তম॥ ৯
ঋষিভ্যস্তু সহস্রাণাং শতাদূর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ।
মেধাভূতঃ সমস্তস্থ জ্যোতিশ্চক্রস্থ বৈ ধ্রুবঃ॥ ১০
ত্রৈলোক্য মেতৎ কথিতং উৎসেধেন মহামুনে।
ইজ্যা ফলস্থ ভূরেষা ইজ্যা চাত্র ব্যবস্থিতা॥ ১১

৭অ—২অং বিষ্ণু

তৃতীয় হইতে ১১শ পর্য্যন্ত ৯টী শ্লোকে মহর্ষি পরাশর—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্তরীক্ষ বা "ভূর্ভুবঃ'স্বঃ"—এই তিন লোকের কথা বলিয়াছেন। ইহার—৩য় ও ৪র্থ শ্লোক পৃথিবী বা ভারতবর্ষ এবং ভুবর্লোক বা অপগস্থানাদি বিষয়ক, অবশিষ্ট ৭টী শ্লোক স্বর্গ ঘটিত।

আমরা ১৮শ শ্লোকে স্বর্গের সীমানা পাইয়াছি, আবার এথন যে

দ্বারা কি একটী স্থান সূচিত হইয়াছে ?—না। এই ছয়টী শ্লোক দ্বারা সৌর মণ্ডল, চন্দ্র মণ্ডল, নক্ষত্র মণ্ডল, বুধ মণ্ডল, উশনোমণ্ডল (শুক্রমণ্ডল), মঙ্গল মণ্ডল, বৃহস্পতি মণ্ডল, শনি মণ্ডল, সপ্তর্ষি মণ্ডল, ও এতৎ সমুদায় মণ্ডলের মেষীভূত (মধ্যের খুঁটা) ধ্রুব মণ্ডল—এই দশটী মণ্ডল সূচিত হইতেছে—এবং ১১শ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ দ্বারা বিবৃত হইতেছে যে এই দশটী মণ্ডলাত্মক স্থানের সমবায় সমুথ নাম স্বর্গ।

তবে কি আকাশের এই পৃথক্ পৃথক্ ৯টী গ্রহ, মহাগ্রহ ও উপগ্রহ এবং আকাশের সমস্ত নক্ষত্ররাজি লইয়া স্বর্গ পরিগণিত ?। আকাশে জ্ঞাত অজ্ঞাত যত জ্যোতিষ্ক রহিয়াছে, স্বর্গ বলিলে কি তাহাই বুঝা যাইবে ?। এই দশটী মহাগ্রহ কোটি কোটি যোজন দূরসংস্থ, ইহাদের প্রত্যেকটীই স্বতন্ত্র বা স্বাধীনলোক। ইহাদের সমষ্টি লইয়াই কি স্বর্গ পরিভাষা ?

না, তাহা কখনই নহে। এই দশটী মণ্ডলের একটীও নভশ্চর আকাশ বিহারী পদার্থ নহে। ১৮শ শ্লোকে বলিতেছে—

সূর্য্য ও ধ্রুব মধ্যগত স্থানের নাম স্বর্গ। ইহাতে কি আকাশের সমুদয় গ্রহ, উপগ্রহ নক্ষত্রমালা ফুরাইয়া গেল ? না তাহা কখনই নহে। তবে প্রকৃত কথা এই সূর্য্যমণ্ডল অর্থাৎ সূর্য্যের রাজ্য (হরিবর্ষ) এবং ধ্রুবের রাজ্য (রম্যকবর্ষ), ইহার মধ্যগত যে স্থান তাহা অর্থাৎ মেরুসনাথ ইলাবৃতবর্ষই স্বর্গভূমি। ঐ স্বর্গধাম চন্দ্র প্রভৃতি ৮ জনের রাজত্বের সমষ্টি আত্মক। অর্থাৎ এক সময়ে মুখ্য স্বর্গ, চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডল অর্থাৎ ২৭ নক্ষত্রের নামে নামধারী দেবগণ, মরীচ্যাদি সপ্তর্ষি মণ্ডল এবং বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি প্রভৃতি নামধারী ব্যক্তিদিগের রাজ্য লইয়া পরিগণিত ছিল। হর্শেলের নামে হর্শেল নক্ষত্রের নাম কল্পিত। ঐ রূপ আকাশের বুধের আবিষ্কর্ত্তা ভূমির বুধ,

বুধাদি নামে অলঙ্কৃত ছিলেন। পুরাণ কর্ত্তা তাঁহাদিগের কথা বলিয়াছেন, আকাশের জড় পিণ্ডগুলির কথা বলেন নাই।

মহর্ষি পরাশর ১১শ শ্লোকে বলিতেছেন এই ভূর্ভুবঃ স্বঃ নামক ত্রিলোকাত্মক ত্রৈলোক্য, ইজ্যাফলের ভূমি। এই ৩ স্থানে ইজ্যা বা যজ্ঞক্রিয়া প্রচলিত আছে। ইহাতে এমন অর্থ দ্যোতিত হইতেছে না যে ভূলোক ও ভুবর্লোকস্থিত লোকেরা যজ্ঞকারী এবং যজ্ঞকারীরা স্বর্গে যাইয়া সেই যজ্ঞের ফলভোগ করে। শ্লোকে স্পষ্টভাষাতেই এই তিনটি স্থানকে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানভূমি, ও ইজ্যার ফলভূমি বলিয়া বলা হইয়াছে। সুতরাং এই ৩টী স্থান যজ্ঞকারী মনুষ্যদিগের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। "ইজ্যাফলস্যভূরেষা" ইহাতে পরিষ্কাররূপেই বুঝা যাইতেছে যে পুরাণকর্ত্তা কেবল স্বর্গকে ইজ্যাফলের ভূমি বলেন নাই সমগ্র ত্রৈলোক্যকেই বলিয়াছেন।

দেব, দৈত্য, দানব, মানব ইঁহারা সকলেই কশ্যপ সন্তান। যদি তোমাদের কথা মত স্বর্গ ভুবর্লোক স্বতন্ত্র আকাশচর পদার্থ হয় তাহা হইলে কশ্যপ কুলীন ব্রাহ্মণের মতন এই ভূর্ভুবঃস্বঃ এই লক্ষ লক্ষ যোজন দূরস্থিত লোকত্রিতয়ে বিবাহ করিয়াছিলেন। পুরাণের কশ্যপের কিন্তু একমাত্র স্বর্গেই বাড়ী থাকার কথা পরিদৃষ্ট হয়। শ্বপুরও তাঁহার একদক্ষ ভিন্ন দুই ব্যক্তি নহেন? অতএব আমরা কি বায়ু পুরাণ ও কৃষ্ণ যজুর্বেদের প্রমাণ বলে বিশ্বাস করিব না যে কশ্যপ সন্তান দৈত্য, দানব, মানব ও দেবগণ আমরা ভৌমস্বর্গে একস্থানে জন্মিয়া ভৌমস্বর্গের একই ধরাতলস্থ ভুবর্লোক বা গান্ধারাদি গন্ধর্ব্ব নিবাস এবং ভূর্লোক বা আমাদিগের অধিষ্ঠানভূত এই ভারত ভূমিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছি? কশ্যপ মুনি স্বর্গ ভিন্ন ভারতাদি অন্য কোন স্থানে ছিলেন, ইহা কিংবদন্তী জানেনা, শাস্ত্রও অবগত নহে। অপিচ

ও ভূর্লোক বা ভারতবর্ষ উহার দক্ষিণে, সুতরাং এই লোক ত্রিতয়, যে একই সমতলস্থ ভৌম পদার্থ, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। ভাস্করাচার্য্যের মত এই—

ভূর্লোকাখ্যো দক্ষিণে ব্যক্ষদেশাৎ, তস্মাৎ সৌম্যেহয়ং ভুবঃ স্বশ্চমেরুঃ।
লভ্যঃ পুণ্যৈঃ স্বৈর্মহঃ স্যাৎ জনোহতোহনল্পানল্পৈঃ স্বৈস্তপঃ সত্যমন্ত্যঃ ॥৪৩

ভুবন-কোশ সিদ্ধান্তশিরোমণি।

ভূমেঃ পিণ্ডঃ শশাঙ্কজ্ঞ কবিরবি কুজেজ্যার্কিনক্ষত্র কক্ষা—
বৃত্তৈর্ব্বৃতোবৃতঃ সন্ মৃদনিল সলিল ব্যোম তেজো ময়োয়ং।
নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যা বিয়তিচ নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে
নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজ মনুজাদিত্য দৈত্যং সমন্তাৎ ॥* ২

ভুবনকোষ।

অতএব স্বর্গ, ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ এবং ভূলোক যে ভারতবর্ষ স্বাধীন তাতার অপগ স্থান এবং ইলাবৃত বর্ষ, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। এ স্বর্গ পারলৌকিক পদার্থ নহে, আকাশচর বস্তুও নহে। দেবতারা সময়ে সময়ে ভূলোকবাসী মনুষ্যদিগের সহায়তা গ্রহণ করিতেন। মনুষ্যেরা ধনুর্ব্বেদ আয়ুর্বেদশিক্ষা ও স্বর্গের সভাসমিতিতে যোগদান করিতে স্বর্গে গমন করিয়াছেন, ব্যাসদেব, গন্ধর্ব্ব লোক, পিতৃ লোক ও দেব লোকের জন্য পৃথক্ পৃথক্ মহাভারত প্রণয়ন করেন, এহেন স্বর্গাদি কি ভৌম পদার্থ না হইয়া আকাশচর পদার্থ হইতে পারে ?

অপি চ দেখ—ভৌম স্বর্গে যে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতখানা বাড়ী বা

* দেব (আদিত্য), দৈত্য, দানব ও মনুজ (মানবগণ) একই ভূমিপিণ্ডস্থ। সুতরাং এহেন দেবলোক স্বর্গ, পৃথিবী ছাড়া অন্য পদার্থ নহে। স্বর্গমর্ত্ত্যাদি চতুর্দ্দশলোকবাসীই এক মানুষ শব্দে আখ্যাত হইতেন। যথা—বায়ুপুরাণ—

চতুর্দ্দশৈব স্থানানি বর্ণিতানি মহর্ষিভিঃ।

মণ্ডল (গ্রামাদি বিশেষ) ছিল তাহা আমরা যজুর্ব্বেদেও পাইতেছি। যথা—

সপ্তঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে সপ্ত রক্ষন্তি সদমপ্রমাদং।

৫৬ক, অ৩৪, ৫৫। শুক্লযজুঃ।

মহীধর, যাস্ক ও দুর্গাচার্য্য এই ঋকের যে ভাষ্য ও টীকা করিয়াছেন, তাহা অতীব হাস্যজনক।* সপ্তঋষি অর্থ রশ্মি, শরীর অর্থ সূর্য্য। ইহা অপেক্ষা অর্থ ব্যভিচার আর কি হইতে পারে? ফলতঃ আমরা এই ঋকের এইরূপ প্রসাদগুণলব্ধ প্রাঞ্জলার্থ সঙ্গত মনে করি। যথা—

সপ্তঋষয়ঃ মরীচ্যাদ্যাঃ সপ্তর্ষয়ঃ, অগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ সপ্ত বা শরীরে দেহে প্রতিহিতাঃ অবহিতাঃ সাবধানাঃ সন্তঃ অপ্রমাদং জাগরূকং যথা স্যাৎ তথা সপ্ত সদং সপ্তর্ষিমণ্ডলানাং সপ্ত গেহানি রক্ষন্তি—দৈত্যদানবেভ্য ইতি শেষঃ।

মরীচি প্রভৃতি বা অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতি সপ্তঋষিদিগের স্বর্গে ৭ খানি বাড়ী ছিল। তাঁহারা সর্ব্বদা অবহিতচিত্তে জাগরূকভাবে উহা উপদ্রবকারী দৈত্যদানবাদি হইতে রক্ষা করিতেন। অতএব বিষ্ণুপুরাণকর্ত্তা এই সপ্তগৃহকেই সপ্তর্ষিমণ্ডল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহা বুঝিতে

---

* যাস্ক……সপ্তঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে রশ্ময় আদিত্যে সপ্ত রক্ষন্তি সদ মপ্রমাদং। সংবৎসরং অপ্রমাদ্যন্তঃ ইত্যাদি। সপ্তঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে ষড়িন্দ্রিয়াণি বিদ্যা সপ্তমাত্মনি সপ্তরক্ষন্তি সদ মপ্রমাদং ইত্যাদি।

দুর্গাচার্য্য… শৃণাতি সর্ব্বমিদমিতি শরীরমাদিত্যঃ, আশ্রয়ণাৎ বা সর্ব্বমিদমস্মিন্ আশ্রিতমিতি। তস্মিন্ সপ্তঋষয়ঃ রশ্ময়ঃ প্রতিহিতাঃ প্রত্যেকং হিতানিহিতাঃ। তে পুনঃ সপ্তৈব অন্যূনাধিকাঃ সন্তঃ সার্ব্বদিকমুদকমুপনয়ন্তঃ তেনেদ্ধান্তমাদিত্যং সদং সদেব অপ্রমাদং অপ্রমাদ্যন্তঃ অনুৎসর্গেন স্বস্য কর্ম্মণঃ রক্ষন্তি।

মহীধর … অধ্যাত্মবাদিনী জগতী। সপ্তঋষয়ঃ, প্রাণাঃ ত্বক্ চক্ষুঃ শ্রবণরসনা ঘ্রাণমনো বুদ্ধি লক্ষণাঃ। শরীরে প্রতিহিতাঃ ব্যবস্থিতাঃ তে এব সপ্তসদং সদাকাল

হইবে। এ সপ্তর্ষিমণ্ডল আকাশবিহারী সপ্ত নক্ষত্র নহে। ঋগ্বেদে আছে—

অতোদেবা অবস্তুনো যতোবিষ্ণুর্বিচক্রমে,

পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ॥

এই সপ্তধাম বা সপ্তভবন, যজুর্ব্বেদের সপ্তসদ এবং বিষ্ণুপুরাণের সপ্তর্ষিমণ্ডল—অভিন্ন পদার্থ।

এখানে বিতর্ক করিতে পার যদি, এই সূর্য্য, এই চন্দ্র, মাটীর মানুষ হয়, তাহা হইলে ঘটকর্পর নীতিসারে একথা লিখিলেন কেন? যথা—

গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদঃ,

লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ জলেষু পদ্মং।

ইন্দুর্দ্বিলক্ষং কুমুদস্য বন্ধুঃ,

যোযস্য মিত্রং নহি তস্য দূরং॥

এখানে ঘটকর্পর যে ৪ কোটী ১৮ লক্ষ ক্রোশ দূরের সূর্য্যকে আমাদের আসন্ন প্রতিবাসী ও আমাদের গৃহ প্রাঙ্গণচর চন্দ্রমাকে দ্বিগুণ দূর সংস্থ বলিয়াছেন, তাহার হেতু এই, তাঁহারা পুরাণের উক্ত শ্লোকগুলির প্রকৃতার্থ অবগত না থাকায় পুরাণোক্ত চন্দ্রসূর্য্যাদিকে আকাশের জড় পিণ্ড বলিয়া ঠাহরাইয়াছিলেন। এই মধ্যযুগের লোকেরা কি কেবল এই একটী কথায় ভুল করিয়াছিলেন? তাহা নহে, তাঁহারা রাশি রাশি প্রমাদের নিকট আত্মবলিদান করিয়া ভারতবাসীদিগকে আজি হিদেন ও নিগার প্রভৃতি বিশেষণের বিশেষ্য পদার্থে পরিণত করিয়া বসিয়াছেন!

অমরসিংহ বলিতেছেন * দৈত্য, দানব ও অসুর, ইহারা একই পদার্থ। কিন্তু উহাঁরা কি কেহ দিতি ও কেহ দনুর সন্তান বলিয়া

---

* [illegible] দানবাঃ।

পৃথক্ নহেন? দেব দৈত্যের যুদ্ধকালে অবশ্য দৈত্য ও দানবেরা একদলভুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই কি উহাঁরা এক হইতে পারেন। অসুরগণ, না দিতিজ, না দনুজ, উহাঁরা মাতা মনু ও মাতা অদিতির সন্তান সন্ততি, এবং আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব ভারত সন্তান, উহাঁরা কি হেতুতে—"শ্বানং যুবানং মঘবানং" এর ন্যায় একসূত্রে গ্রথিত হইলেন? এগুলি কি প্রমাদ নয়?

আত্মভূব্রহ্মা ও সুরজ্যেষ্ঠ মানুষ ব্রহ্মা দুই পৃথক্ বস্তু, একজন কল্পিত স্রষ্টা, অন্য জন সৃষ্ট ও মরণধর্ম্মশীল মানুষ। কেন এতদুভয়ের সাম্য বিঘোষিত ও তাহা আমূল ভারত সন্তান দ্বারা সমর্থিত হইল।*

কৃষ্ণের পুত্র শম্বরারি কামদেব, ও হর কোপানলে ভস্মীভূত মনোভব (শুদ্ধ বৃত্তি বিশেষ?) কামদেবে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ইহার একজন আধার, অন্যজন আধেয়। কেন ভারত সন্তানেরা ইহাঁদের সাম্যের † প্রতিবাদ না করিলেন?।

ফলতঃ ভৌগোলিক জ্ঞান ও যুক্তির অভাব বশতই এক সময়ের লোকেরা পুরাণ ও বেদাদি শাস্ত্রের অর্থ ব্যক্তি বিষয়ে ঘোরতর ব্যভিচার ঘটাইয়াছেন। এবং অনন্তর বংশেরা নির্বিচারচিত্তে সেই ভ্রান্তির অনুগমন ও পোষণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা শাস্ত্র লইয়া বিচার করিলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন—ইলাবৃত বর্ষ (Elysium) স্বর্গ, তাহা বর্ত্তমান আলটাই পর্ব্বতসনাথ মঙ্গোলিয়া।

মনুর পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র দেব, দানব, দৈত্য, মানব, "ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতা পিতৃভ্যো দেব দানবাঃ"—একপিতা

---

* ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবা ব্রহ্মন্ প্রধানা ব্রহ্মশক্তয়ঃ। বিষ্ণুপুরাণং।

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব। বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ব বিদ্যা প্রতিষ্ঠাং অথর্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ ইত্যাদি—মুণ্ডকোপ নিষৎ প্রারম্ভ।

মাতার সন্তান মানুষ দেবতারা অবশ্যই এমন স্থানবাসী হইবেন, যাহা পরস্পরের গম্য ও অধিগম্য ছিল? পুরাণাদির বিকৃতার্থের ভজনা বশতঃ—একটী ধারাবাহিক কুসংস্কার, বংশপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। ফলতঃ—কালিদাস যেমন নূতন শ্লোক রচনা ও তাল বৃক্ষের মৃত্তিকা গত ছায়ার স্থান খুঁড়িয়া নব নবতি কোটি টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমাদিগকেও শাস্ত্রাদির তাদৃশ অর্থের অনুসরণ করিতে হইবে, নতুবা অর্থলাভ ঘটিবেনা।

৪। মহর্লোক······ধ্রুব ও জন লোকের মধ্যগত স্থানের নাম মহর্লোক। আমাদিগের গণনা মতে রম্যক বর্ষ (আল্টাইপর্ব্বতের ঠিক্ উত্তরদিকস্থ সাইবিরিয়ার দক্ষিণাংশ) ধ্রুবলোক বলিয়া গণনীয়। এদিকে বর্ত্তমান চীনদেশ জনলোকের সহিত অভিন্ন সুতরাং এই দুই দেশের অভ্যন্তর ভাগে বিদ্যমান স্থানবিশেষ তৎকালে মহর্লোক নামে আখ্যাত হইত। কল্প শব্দের অর্থ প্রলয়। পূর্ব্বকালে প্রায়ই জলপ্লাবন হইত, ও তাহাতে লোকক্ষয় ঘটিত, উহারই নাম ছিল কল্প বা প্রলয়। বোধ হয় মহর্লোক উচ্চভূমি ছিল, প্লাবন পীড়িত লোকেরা তথায় যাইয়া আশ্রয় লইতেন। তজ্জন্য মহর্লোকের এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। যথা—

ধ্রুবাৎ জনান্তরং যচ্চ মহর্লোক স্তদুচ্যতে। ৪১
—৩৯ অঃ, বায়ু—উ খঃ।

ধ্রুবাদূর্দ্ধং মহর্লোকো যত্র তে কল্পবাসিনঃ।
এক যোজন কোটিস্তু মহর্লোকোঽভি ধীয়তে॥১২—৭ অঃ, ২অং, বিষ্ণু।

৫। জনলোক······পঞ্চম লোকের নাম জনলোক, সনন্দনাদি ঋষিগণ এই লোকে বাস করিতেন। যথা—

দ্বে কোটী তু জনোলোকো যত্র তে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।

অথর্ব্ববেদে লিখিত আছে—

"উদঙ্ জাতো হিমবতঃ স প্রাচ্যাং নীয়সে জনং ॥

অর্থাৎ হে উদ্ভিদ্! তুমি হিমালয়ের উত্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে হিমালয়ের পূর্ব্বদিকে জনলোকে নীত হইয়াছ। হিমালয়ের পূর্ব্বে বর্ত্তমান চীন ভিন্ন অন্য কোনদেশই নাই, অতএব বর্ত্তমান চীনই জনলোক। এই জন্যই চীনেরা আপনাদের দেশকে টিন্‌সান্ বা স্বর্গ রাজ্য কহে। উহা ভদ্রাশ্ব বর্ষের মধ্যগত।

৬। তপোলোক……জনলোকের উত্তরদিকে তপোলোক। যথা—

চতুর্গুণোত্তরে চোর্দ্ধং জনলোকাৎ তপঃ স্মৃতং।

বৈরাজা যত্র তে দেবাঃ স্থিতা দাহবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৪—৭ অঃ, বিষ্ণু।

এই তপোলোকে আদিমানব বিরাটের অনন্তর বংশ্য বৈরাজ নামক দেবগণ বাস করেন। সম্ভবতঃ কোরিয়া ও তৎ পশ্চিমস্থ সাইবিরিয়ার কিয়দংশ লইয়া এই রাজ্য পরিগণিত ছিল। এবং এই স্থলে গ্রীষ্মাধিক্য ছিল না বলিয়া, স্থানবাসীদিগকে দাহ বিবর্জ্জিত বলা হইয়াছে।

৭। সত্যলোক……তপোলোকের পরবর্ত্তী লোক সত্য বা ব্রহ্ম লোক নামে পরিচিত। সুরজ্যেষ্ঠ পরম বেদবিৎ দেবলোকের আদি কবি ব্রহ্মা এইস্থানে বাস করিতেন। যথা—

ষড়্‌গুণেন তপো লোকাৎ সত্য লোকো বিরাজতে।

অপুনর্মারকা যত্র ব্রহ্মলোকঃ সহি স্মৃতঃ ॥ ১৫—৭অ, ২অং—বিষ্ণু

সত্যস্তু সপ্তমো লোকো হ্যপুনর্মার্গ গামিনাং।

ব্রহ্মলোকঃ সমাখ্যাতো হ্যপ্রতিঘাত লক্ষণঃ ॥ ৩৯

বৈরাজেভ্যস্তথৈবোর্দ্ধং অন্তরে ষড়্‌গুণে ততঃ।

ব্রহ্মলোকঃ সমা খ্যাতো যত্র ব্রহ্মা পুরোহিতঃ ॥ ৮১—৩৯অ ২থ—বায়ু

এই ব্রহ্মলোক [illegible]

এখানে সূর্য্য ৬ মাস উদিত ও ৬ মাস অস্তমিত থাকিত। তজ্জন্য দেবতাদিগের এক দিন একরাত্রে আমাদের একটী পূর্ণবৎসর গণনা হইত। মন্বাদি শাস্ত্রে তাহা বিবৃত আছে, এবং তাহার প্রত্যেক বর্ণ সত্যগর্ভ। এই ব্রহ্মলোক ও উত্তর কুরুবর্ষ অভিন্ন, আমরা ইহাও মনে করিয়া থাকি। মহামতি তিলক উত্তর কুরুকে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। মেরু পর্ব্বত হইতে মানুষ যাইয়া উত্তর কুরু বা ব্রহ্মলোকে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমান ব্রহ্ম দেশ (বর্ম্মা) ও পূর্ব্বে ব্রহ্মলোক বলিয়া কথিত হইত, বাস্কল বিতাড়িত ইন্দ্র তথায় যাইয়া কিয়ৎকাল বসবাস করেন। সম্ভবতঃ উহা মুখ্য ব্রহ্মলোকের নামানুকরণে ব্রহ্মলোক বলিয়া আখ্যাত হইত, অমরাপুর তথায় অমরগণের সংস্থিতি বিঘোষণা করে।

আমরা সপ্ত দেবলোক দ্বারা আশিয়া খণ্ডের কতিপয় স্থান বিশেষিত করিলাম, আবার সপ্ত পাতাল ও আমেরিকাকে এক বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। তবে আফ্রিকা ও ইউরোপের নাম করিলাম না কেন? উহা কি চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ভূমণ্ডলের অংশ বিশেষ নহে?। হাঁ অবশ্যই, অংশ বিশেষ।

কিন্তু তৎকালে সেই মান্ধাতারও প্রপিতামহের আমলে আফ্রিকা সাগরগর্ভে শায়িত ছিল, সাহারা মরুভূমি তাহার প্রমাণভূমি। মিশর, আবিসিনিয়া ও কেপকলনি, গিনি মরক্কো প্রভৃতি অঙ্গুরীয়াকার ভূমি খণ্ড সদ্যঃপ্রসূত শিশু ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইউরোপ আফ্রিকার পূর্ব্বেই স্থলে পরিণত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আশিয়ার বয়সের অনুপাতানুসারে উহাকেও অপোগণ্ড স্তন্যপায়ী শিশু মনে করা যাইতে পারে। বৈদিকযুগে উহার পূর্ব্বভাগ মানুষের বাসের যোগ্য হইয়া আসিতেছিল। বরশিখ প্রভৃতি দৈত্যগণ যাইয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। বেদে

ও তদ্ বিকারে ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় Europe মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। যথা—

বধীদিন্দ্রোবরশিখস্য শেষোঽভ্যাবর্ত্তিনে চায়মানায় শিক্ষন্।

বৃচীবতোযৎ হরিয়ূপীয়ায়াং হন্ পূর্ব্বে অর্দ্ধে ভিয়সা পরোদর্ত্ত্॥

৫—২৭ সূ, ৬ ম, ঋগ্বেদ।

সায়ণ……অয়মিন্দ্রঃ চায়মানায় চয়মানস্য রাজ্ঞঃ পুত্রায় অভ্যাবর্ত্তিনে এতন্নামকায় রাজ্ঞে শিক্ষন্ ঈপ্সিতানি বসূনি প্রযচ্ছন্ বরশিখস্য অসুরস্য শেষঃ পুত্রান্ বধীৎ অবধীৎ অহিংস্যাৎ। বরশিখস্য পুত্রান্ কথমবধীৎ? ইত্যুচ্যতে, যৎ যদা অয়মিন্দ্রঃ হরিয়ূপীয়ায়াং হরিয়ূপীয়া নাম কাচিৎ নদী কাচিৎ নগরী বা তস্যাং পূর্ব্বে অর্দ্ধে প্রাগ্‌ভাগে স্থিতান্ বৃচীবতঃ বৃচীবন্নাম বরশিখস্য কুলোৎপন্নঃ পূর্ব্বঃ তদ্‌গোত্রজান্ বরশিখস্য পুত্রান্ হন্ অবধীৎ। তদা অপরঃ অপরভাগেস্থিতঃ বরশিখস্য জ্যেষ্ঠপুত্রঃ ভিয়সাদৎ দীর্ণোভূৎ।

দেবরাজ ইন্দ্র, রাজা চয়মানের পুত্র অভ্যাবর্ত্তীর প্রতি অনুগ্রহ চিকীর্ষু হইয়া বরশিখের পুত্রগণকে বধ করিয়াছেন। তিনি হরিয়ূপীয়ার পূর্ব্বার্দ্ধস্থিত বরশিখপুত্র বৃচীবানের বংশধরদিগকে বধ করেন। তখন তাঁহার অন্য এক পুত্র ভয়ে বিদীর্ণ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ ভয় পাইয়া পলায়ন করেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন।

গ্রন্থ সমালোচনা।

যুগল প্রদীপ।—শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা একখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস। আকার বেশ বড়, ছাপা ভাল, কাগজ ভাল। গ্রন্থকারের লেখাও ভাল। ননিবাবু বিশুদ্ধ সরল সরস ভাষায় সুন্দর পদ্য রচনা করিতে পারেন। মোট কথা এই পুস্তকখানি আর সকল বিষয়েই উৎকৃষ্ট, কেবল ইহাকে একখানি ভাল উপন্যাস বলা যাইতে পারে কিনা সে বিষয়ে আমাদের একটু ইতস্ততঃ আছে।

এই কাব্যখানিতে গ্রন্থকার তাঁহার কল্পনা শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু শুদ্ধ কল্পনার লীলা খেলাকে 'উপন্যাস বলিতে আমরা নারাজ। স্বভাব বা প্রকৃতি বলিয়া যে একটা পদার্থ আছে, উপন্যাস লিখিতে বসিয়া তাহাকে না মানিলে চলিবে কেন? উপন্যাসে কল্পনাকে স্বভাবের অনুগত হইয়া চলিতে হইবে। তাহা না হইলে সে উপন্যাস আরব্যোপন্যাসে পরিণত হইবে। উপন্যাস লেখা এক রকম ছবি আঁকা বই ত নয়? একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের হাতের আঁকা একটী ফুল বাগান দেখিয়া মনে হইবে ইহা যথার্থ ফুল বাগান। সেইরূপ একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাস পড়িয়া মনে হইবে, ইহা প্রকৃতি দেবীর হস্তরচিত একটী সজীব সমাজের চিত্র। কিন্তু ননিলাল বাবু যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহার স্থানে স্থানে বেশী রঙ পড়িয়া গিয়া উহার সহজ স্বাভাবিকতা নষ্ট হইয়াছে। তিনি যে আখ্যায়িকা গাঁথিয়া তুলিয়াছেন, একটু কাছে ঘেঁসিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে অনেক কাঁচা গাঁথনি ধরা পড়িবে। চরিত্রাঙ্কন বিষয়েও তাঁহার হাত এখনও পাকে নাই।

হরমোহন দত্ত বিল্বগ্রামের একজন ধনাঢ্য জমিদার। অন্নপূর্ণা তাঁহার একমাত্র কন্যা। হরমোহন একজন সদাশয় ও বিচক্ষণ ব্যক্তি।

একটী সদ্‌বংশজাত রূপগুণসম্পন্ন বালককে নিজের বাড়ীতে আনিয়া পড়াইতে লাগিলেন। বালকটীর নাম অমর, তাহার সঙ্গে তাহার একটী বন্ধু গুরুচরণ এবং তাহার মাতাও আসিল। কিছুদিন পরে হরমোহন অন্নপূর্ণার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দ্বারা পণ্ডিত ও পুরোহিত তারানাথ তর্কবাগীশকে বিবাহের দিনস্থির করিতে বলিলেন। তারানাথ একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ চন্দ্রচূড় যখন সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া গৃহত্যাগ করেন, তখন তাঁহাকে শপথ করাইয়াছিলেন, “দত্তাদগের যৌতুকাগারে তুইটী স্বুবর্ণপ্রদাপের মধ্যে যে মেয়ে লোকের হাতের লেখা একখান চিঠি আছে, অন্নপূর্ণাকে তাহার বিবাহের ঠিক তুইদিন পূর্ব্বে পড়িতে দিও।” এদিকে বেচারাম বাচস্পতি নামক আর একজন পণ্ডিতকে দত্তবাড়ীর দাসী শশীর মা আবার মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিল “আপনি দেখিবেন, সেই চিঠিখানা যেন অন্নপূর্ণার হাতে কোন ক্রমে না পড়ে।” এখন অন্নপূর্ণার বিবাহের সময় উপস্থিত, তাই তর্ক-বাগীশ ভাবিয়া আকুল হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সেই চিঠির মধ্যে কোন সর্ব্বনাশের কথা লেখা আছে, যাহা পড়িয়া অন্নপূর্ণা যাবজ্জীবন অস্থখী হইবে। তাই তিনি যাহাতে অন্নপূর্ণার বিবাহ শীঘ্র না ঘটে, সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি হরমোহনকে বলিলেন, তিন বৎসরের মধ্যে এ বিবাহ দিলে বরকন্যার অমঙ্গল হইবে। হরমোহন বিবাহ স্থগিত রাখিলেন। অন্নপূর্ণা জানিত অমর তাহারই বর, আবার অমরও জানিত অন্নপূর্ণা তাহারই স্ত্রী হহবে। এজন্য উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ পূর্ব্বরাগ জন্মিয়াছিল।

ইতিমধ্যে পশুপতি নামধারী একজন দস্যুপতি অন্নপূর্ণাকে ছলে কৌশলে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিল। সে এক ঘটকচূড়ামণিকে হরমোহনের কাছে পাঠাইয়া দিল; ঘটকচূড়ামণি পশুপতিকে মুরসিদা-বাদ জেলার একজন রাজপুত্র বলিয়া পরিচিত করিয়া, নবদ্বীপের কোন

অন্নপূর্ণার সহিত পশুপতির বিবাহ উভয়েরই মঙ্গলের জন্য হইবে। এই মদন ঘটক একজন নিতান্ত বেল্লিক ; আশ্চর্য্যের বিষয় এই, হরমোহনের ন্যায় একজন বিচক্ষণ বিষয়ী ব্যক্তি, তাহার কথায় ভুলিয়া গিয়া পশুপতির সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহের দিন স্থির করিলেন, সে ব্যক্তি রাজপুত্র কি জুয়াচোর একবার অনুসন্ধান করিয়াও দেখিলেন না।

অমর ও গুরুচরণ কলিকাতায় পড়িত। তাহারা বিবাহ দেখিতে বাড়ী আসিল। তাহারা বর দেখিতে গিয়া জুয়াচোর বলিয়া চিনিয়া ফেলিল ; কিন্তু তাহারা কোন কথা প্রকাশ না করিয়া দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। পরে গুরুচরণের মা তাহাকে চিনিয়া প্রকাশ করিয়া দিলেন। সে বরও টের পাইয়া তল্পীতল্পা বাঁধিয়া চম্পট দিল।

গুরুচরণ একজন পালোয়ান হইয়াছিল ; সে লক্ষ্ণৌনগরে গিয়া আউটরাম সাহেবের প্রাণ বাঁচাইল। সাহেব তাহাকে ও অমরকে খুব অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন। তখন সিপাহীবিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল। গুরুচরণ খুব স্ফূর্ত্তি করিয়া লড়াই করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অমর কিন্তু আর এক রকমের স্ফূর্ত্তিতে নিমগ্ন হইল। সে একদিন যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া এক অসামান্য রূপলাবণ্যবতী যুবতীকে তীরে তুলিল। এবং ঠিক গোবিন্দলালের ফ্যাসনে তাহার লাল ওষ্ঠাধরের মধ্যে ফুৎকার দিয়া তাহাকে বাঁচাইল। গোবিন্দলালের একজন উড়িয়া মালির সাহায্য দরকার হইয়াছিল, কিন্তু অমরনাথের তাহা হয় নাই। অমর নাথও গোবিন্দলালের ফ্যাসনে সেই রমণীর প্রেমে পড়িল। সে রমণী এক তাপসকন্যা, ঠিক শকুন্তলারই মত। নামটী তার ছায়া। তাঁহার পালক পিতা চক্ষু মুদিয়া ধ্যাননিরত থাকিতেন, আর তিনি অমরনাথের সহিত প্রেমালাপ করিতেন। পরিশেষে তাঁহাদের বিবাহ হইতে পারিবে না দেখিয়া অমরনাথ মনের খেদে সেই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া আসিল। পরে অমরনাথের সহিত সেই দস্যুপতি পশুপতির

শুনিল যে সে তাহারই জ্যেষ্ঠ সহোদর নরেন্দ্রনাথ; অমরকে তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চনা করিয়া দেশে দেশে ফিরিতেছে। নরেন্দ্র নাথ অনেক প্রলাপ বকিয়া এবং আধুনিক থিয়েটার যাত্রার ধরণে অনেক বিভীষিকা দেখিয়া মরিয়া গেল।

ইতিমধ্যে হরমোহন দত্তের মৃত্যু হইয়াছিল। অন্নপূর্ণা পিতার মৃত্যুর পরে তীর্থদর্শনে বাহির হইয়াছিল। সে বিন্ধ্যাচলে এক যোগিনীকে দেখিল। যোগিনী বলিলেন "বাছা! যৌতুক ঘরের মধ্যে যে যুগল প্রদীপ আছে, তাহা না খুলিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিও।" অন্নপূর্ণা কিন্তু বাড়ী আসিয়াই চাবি সংগ্রহ করিয়া সেই যুগল প্রদীপ খুলিয়া দেখিল। উহার মধ্যে যে চিঠি ছিল, তাহা পড়িয়া দেখিল। পড়িয়াই চক্ষুঃস্থির। সে চিঠিতে লেখা ছিল যে, অন্নপূর্ণা হরমোহন দত্তের কন্যা নহে, সে হরমোহনের গুরুকন্যা শারদা সুন্দরীর কন্যা। ঘটনাক্রমে উভয়ের মধ্যে অদল বদল ঘটিয়াছিল। শেষে জানা গেল, তপোবনের সেই ছায়াই হরমোহন দত্তের কন্যা; আর বিন্ধ্যাচলের সেই যোগিনী শারদা সুন্দরী।

অন্নপূর্ণা ইচ্ছা করিলেই সেই চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া এ সকল কথা গোপন করিতে পারিত, ও হরমোহন দত্তের সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী থাকিয়া চিরাভিলাষিত বর অমর নাথকে বিবাহ করিয়া সুখে জীবন কাটাইতে পারিত। কিন্তু সে তাহা না করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ছায়ার সহিত অমরের বিবাহ দিল। এবং নিজেই মাতৃস্থানীয়া হইয়া অমরনাথকে ছায়ার করে সম্প্রদান করিয়া বলিল "তবে আয় বাছা! তোরা দুজনে আমাকে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে একবার মধুর কণ্ঠে 'মা' ব'লে ডাক।"—

এইত হইল গল্প। এখন পাঠক অনায়াসেই দেখিতে পাইতেছেন, এই প্লটটীর গাঁথান কিরূপ কাঁচা।

হইল কেন? যাহাতে অন্নপূর্ণার বিবাহ কোন কায়স্থ বালকের সহিত না হয়, অবশ্যই ব্রাহ্মণ চন্দ্রচূড়ের তাহাই ইচ্ছা ছিল। তিনি একজন বিজ্ঞলোক, হরমোহনের হিতাকাঙ্ক্ষা, বিবাহের সমস্ত আয়োজন করাইয়া, সে বিবাহ পণ্ড করা তাঁহার ইচ্ছা হইতে পারে না। সুতরাং তিনি অন্নপূর্ণার বিবাহের ঠিক দুই দিন পূর্ব্বে সে চিঠি অন্নপূর্ণার হাতে দেওয়ার কথা কেন বলিলেন? বিবাহের প্রস্তাবের বহুপূর্ব্বে একথা ব্যক্ত করাতে লাভ ভিন্ন অলাভের কোন কারণত দেখা যায় না?

দ্বিতীয়তঃ, হরমোহনদত্তের ন্যায় একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহার একমাত্র কন্যা অন্নপূর্ণাকে যাহার সহিত এত বৎসর ধরিয়া বিবাহ দিবার সংকল্প স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্যে যাহাকে নিজের অভিভাবকতায় রাখিয়া মানুষ করিতেছেন, হঠাৎ বিনাদোষে সেই অমরনাথের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মিল কেন? তাঁহার সংকল্পচ্যুতি ঘটিল কেন? গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে হরমোহনের চরিত্রের দৃঢ়তা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"হরমোহনদত্তের নিষ্কলঙ্ক নামে...একটীমাত্র কলঙ্ক যে, তিনি কখনও কর্ত্তব্যসাধনসঙ্কল্পে কাহারও অনুরোধে বিচলিত হয়েন না।" এইরূপ লোকের নির্ব্বাচিত পাত্রকে ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত রাজপুত্রের সহিত কন্যার বিবাহোদ্যোগে গ্রন্থকার তাঁহার চরিত্রের সপিণ্ডীকরণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া যাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন, সেই বরের বাসস্থান, বংশ, বিষয়াদির অবশ্যই হরমোহন অনুসন্ধান করিবেন। তাহা কিছু মাত্র না করিয়া কেবল সেই বেল্লিক ঘটকের কথায় তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিলেন কেন?

তৃতীয়তঃ, অমর ও গুরুচরণ সেই দস্যুপতিকে চিনিয়াও তাহা প্রকাশ করিল না কেন? অমর অবশ্যই তখন অন্নপূর্ণাকে ভালবাসিত, সুতরাং অন্নপূর্ণা একজন দস্যুর হাতে পড়িবে, ইহা সে কিপ্রকারে সহ্য করিল? আর তাহারা পলাইলই বা কেন?

তাই বলিয়া ক্রমাগতই আকস্মিক ঘটনা ঘটাটা অস্বাভাবিক। অমর আর কোন রমণীকে না বাঁচাইয়া ঠিক ঠিক হরমোহনের ঔরসজাত কন্যাকেই বাঁচাইল, আর তাহার প্রেমে পড়িল? আবার অন্নপূর্ণা বিন্ধ্যাচলে আর কোন যোগিনীকে দেখিল না, ঠিক ঠিক তাহার মাকেই দেখিল? অমরনাথও হঠাৎ পশুপতিকে মৃত্যুশয্যায় দেখিতে পাইল। —ইত্যাদি।

উপরে লিখিত চারি দফা ঘটনার মধ্যে যে কোনটী স্বভাবসঙ্গত নিয়মে ঘটিলে, ননি বাবুর প্লট টিঁকিতে পারে না।

ননি বাবু যতগুলি চরিত্র আঁকিয়াছেন, তন্মধ্যে অমরনাথ, ছায়া ও পশুপতির চরিত্র ভাল রকম ফুটিতে পারে নাই। আবার রামধন সরকার, গুরু মহাশয়, মদন ঘটক, গুরুচরণ ও অন্নপূর্ণার চরিত্র অতি-রঞ্জিত হইয়াছে। গুরুচরণ বিবাহ করিল, তাহার নিজের বেশী কোন সম্পত্তি থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না, অথচ সে আউটরাম সাহেবের অনুগ্রহে যে ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল, প্রথমটা তাহা লওয়া সম্বন্ধে অনেকটা বৃথা 'আর্য্যামি' করিয়া অমরনামকে দিয়া ফেলিল। তাহার সেই তেলো মাথায় তেল ঢালিবার কি প্রয়োজন ছিল বুঝা যায় না। অন্নপূর্ণার চরিত্র গ্রন্থকার অত্যন্ত উচ্চ, উদার, অনবদ্য করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এক গড়িতে আর হইয়াছে।

এ গ্রন্থে পূর্ব্বরাগের ছড়াছড়ি অনেক আছে। উপন্যাসের সব প্রথম পৃষ্ঠাতে সবপ্রথম পংক্তি হইতেই গ্রন্থকার আধুনিক কালকে ও আধুনিককাল সুলভ ঘটনাবলীকে সুলভ বিদ্রূপ করিয়াছেন। তাহার কতকটা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"অনেক দিনের কথা। তখনও পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে বাঙ্গালা-দেশের অন্ধকার তিরোহিত হয় নাই। তখনও বঙ্গবাসী হ্যাটকোট পরিধান করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে শিখে নাই ও কাঁটা চাম্চে

ও জলচর জন্তু উদরসাৎ করিয়া, বাঙ্গালীজীবন পবিত্র করিতে আরম্ভ করে নাই; তখনও ইউরোপীয় বিজ্ঞানের গরীয়সী মহিমায়, ম্যালেরিয়া, ব্ল্যাকফিভার ও প্লেগ এবং তাহাদের সঙ্গে ভারতব্যাপী অনশনের করাল-মূর্ত্তি দেখা দেয় নাই। তখনও বাঙ্গালার ঘরে ঘরে কুইনাইন ও চিকেনসুপের ব্যবস্থা আরম্ভ হয় নাই। তখনও সভ্যতার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, বঙ্গললনার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে নাই। তখন আজিকার দেশ-বিখ্যাত, চসমাধারী, লম্বিতশ্মশ্রু সংস্কারক মহাশয় সবেমাত্র হামাগুড়ি দিতে শিখিতেছিলেন।"

অথচ সাত আট পৃষ্ঠা যাইতে না যাইতে গ্রন্থকার পাশ্চাত্য আলোক বিরহিত সেকালের দুগ্ধপোষ্য শিশুদের এমন সব প্রণয়দৃশ্য চিত্রিত করিয়াছেন যে তাহা তদালোকোদ্ভাসিত একালেও কল্পনা করা দুরূহ। পূর্ব্বরাগ জিনিষটা আমারা ভাল বুঝি না, কারণ আমাদের, সমাজে উহা আপ্তজলো জন্মে না। তবে আজকাল বিলাতী আলুর ন্যায় উহার কিছু চাষ আমাদের দেশে আরম্ভ হইয়াছে। তবু এখনও আমাদের সেই মনোবৃত্তিটীকে সম্যকরূপে চিনিবার অনেক দেরী। বিলাতী সমাজের চিত্রপাঠে বুঝা যায়, উহা একটী দুরন্ত, দুর্দ্দমনীয়, উদ্দাম, মনোবৃত্তি। উহা একবার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিলে হয়ত সেই হৃদয়কে সুস্নিগ্ধ কুসুম-সুরভি, শারদকৌমুদী-সমুজ্জ্বল নন্দনকাননে পরিণত করিবে, নতুবা তাহাকে উত্তপ্ত দুর্নিবার তৃষ্ণাসমাকুল মহামরুতে বিধ্বস্ত করিবে। একবার তাহাতে ধরা দিলে, সেই স্বপ্নময়, আবেশময়, আবেগময়, মোহময়, মদিরাময়, মধুময়, মনোবৃত্তির হাত হইতে নিস্কৃতিলাভ করা বড় কঠিন কথা। ননিবাবুর অমরনাথ কিন্তু যে অন্নপূর্ণার প্রেমে মজিয়া গৃহত্যাগী হইল, সে অল্প কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই আবার ছায়াকে দেখিয়া মজিয়া গেল—কোথাকার অন্নপূর্ণা কোথায় পড়িয়া রহিল। অন্নপূর্ণাও আবার আজীবন অমর নাথকে স্বামি-জ্ঞানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]বাৎসল্যে সম্বোধন করিয়া।

বলিল "বাছা! আমাকে একবার মা বলিয়া ডাক্।" বৈজ্ঞানিক যেমন অনায়াসেই তাপকে তড়িতে ও তড়িৎকে আলোকে পরিণত করিতে পারেন, সুদক্ষ ঔপন্যাসিকও দেখিতেছি ভালবাসাকে অনায়াসেই কখনও মধুর, কখনও বাৎসল্য, কখনও সখ্য রসে পরিণত করিতে পারেন। তবে কথা এই, ননি বাবুর এ বিষয়ে নজির আছে। কিন্তু আয়েষা জগৎসিংহকে ভাই বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, অন্নপূর্ণা তাহার একডিগ্রি উপরে উঠিয়াছেন! পাঠক দেখিলেন, 'সাল্লাহম্' এবং 'লোকহাসানে'র মধ্যে কত অল্প তফাৎ!

গ্রন্থকার একালের উপর আক্রোশযুক্ত, কিন্তু তাঁর যে সেকালের অপেক্ষা একালের সহিত পরিচয় বেশী তার চিহ্ন পদে পদে ধরা পড়ে। তিনি হরমোহনকে দিয়া কন্যার জন্ম'দিন' উৎসব সম্পন্ন করাইয়াছেন। আবার যে গুরুচরণের মাতা আত্মীয় বেচারামের বাড়ীতেও থাকিতে সম্মত না হইয়া স্বাধীনভাবে পর্ণকুটীরে বাস করিতেছিলেন, তিনি হরমোহন দত্তের বাড়ী দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া গভর্ণেসগিরি স্বীকার করিলেন কিরূপে?

এইরূপ আরও অনেক খুঁটিনাটী অসামঞ্জস্য আমাদের চোখে পড়িয়াছে। ননি বাবুর লিখিবার ক্ষমতা আছে। মাত্রাজ্ঞান ঠিক রাখিয়া গ্রন্থ রচনা করিলে তিনি কালে উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করিতে পারিবেন। এ পুস্তকেও তাঁহার আদর্শ খুব উচ্চ, ভাব পবিত্র ও সুরুচি সঙ্গত, বর্ণনা স্থানে স্থানে মনোহারিণী।

পূর্ণতা।

কি অপূর্ব্ব রত্ন তুমি রাখিয়া গোপনে
জাগাইছ তীব্র তৃষা সদা মোর মনে,
কোন্ পরাহত আশা, অব্যক্ত বাসনা
মেলিতেছে অহরহ লেলিহরসনা
এ হৃদয়তলে ; কোন্ অস্ফুট কাকলী
সমুদ্র গর্জ্জন হ'য়ে উঠিবে উথলি
বিশ্বতটে করিতে আঘাত,—নাহি জানি ;
সরমে সঙ্কীর্ণ হয় মরমের বাণী
যবে ভাবি কি বা চাব কি না দেছ তুমি ;—
অসার ঊষর এই নরমনোভূমি
তোমাসাথে বাঁধিয়াছ অনন্তবন্ধনে ;
চির অসম্পূর্ণ এই ক্ষুদ্র নরমনে
—স্বর্গের পূর্ণতা তুমি,—ফুটায়েছ ধীরে
পূর্ণ প্রেম শতদল নয়ন শিশিরে।

শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

পুরী—সমুদ্রতটে।

আজ ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথি। পুরীনগরী আজ আনন্দ উৎসবে উন্মত্ত। আজ শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর দোলযাত্রা এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জন্মোৎসব। সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। পূর্ণ চন্দ্রের রজতকিরণে সেই সৌধ অট্টালিকাময়ী নগরীর শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ণসুধাকরসমুজ্জ্বল সমুদ্রতীরের শোভা অনির্ব্বচনীয়!

পাঠক কখনও চন্দ্রালোকে পুরীর সমুদ্রতীরে বেড়াইয়াছেন কি? যদি বেড়াইয়া থাকেন ভালই; নচেৎ সেই মহৎ অপেক্ষাও মহান্, বিশাল মনোহর দৃশ্য লেখনী দ্বারা আঁকিয়া দেখাইতে পারি সে ক্ষমতা আমার নাই। সেই রজত-ধবল সৈকতভূমি—কোথায়ও উচ্চ, কোথায়ও নীচ—স্থানে স্থানে সৌধঅট্টালিকাখচিত—শুভ্র চন্দ্রকিরণ অঙ্গে মাখিয়া হাসিতেছে। সেই অনন্তপ্রসারিত, দিগন্তপ্রধাবিত, সুনীল সমুজ্জ্বল নীলাম্বুধি তরল স্নিগ্ধ শশিকরসম্পাতে এক অনুপম মাধুর্য্যময় দিব্যকান্তি ধারণ করিতেছে—যেন অনন্ত সংসাগরে চিদানন্দ-সুধা উছলিয়া উঠিতেছে। সম্মুখে, সুদূরে অনন্ত নক্ষত্রখচিত, ঈষৎ নীলাভ আকাশ সেই গাঢ় নীলোজ্জ্বল বারিরাশির মধ্যে হেলিয়া পড়িয়াছে—যেন অনন্ত আকাশ, অনন্তসাগরকে আলিঙ্গন করিতেছে। সুদূরে ঈষৎ কম্পমান সাগরবক্ষ চন্দ্রালোকে টলমল করিতেছে, কিন্তু তটপ্রান্তে উচ্চ ঊর্ম্মিমালা রজতমুকুট শিরে ধারণ করিয়া হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসিতেছে—আসিয়াই বেলাভূমি ডুবাইয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ সবেগে ছুটিয়া পলাইতেছে। বীচিমালার এই অবিশ্রান্ত লাস্যলীলা সৈকতভূমিকে একবার ভাঙ্গিতেছে, আবার গড়িতেছে,—

সুশোভিত করিতেছে। সৃষ্টির কোন্ সুদূর অতীত কাল হইতে এই লীলা খেলা চলিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আর বারিধির সেই গভীর বজ্রনির্ঘোষ, কর্ণকুহর ভেদ করিয়া অতি প্রচণ্ড আঘাতে হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দেয়,—খুলিয়া দিয়া হৃদয়ের অন্তস্তলে লুক্কায়িত গভীর ভাব সকল টানিয়া বাহির করে। তোমার পশ্চাতে চাহিয়া দেখ—ঐ অভ্রভেদী শ্রীমন্দির যেন পুরীনগরীর চূড়া রূপে বিরাজ করিতেছে; কিন্তু সুদূর সাগরবক্ষে দাঁড়াইলে দেখিবে নীল বারিরাশির মধ্যে যেন একটি কুবলয়কোরক ভাসিতেছে। অনন্ত সাগর যথার্থই অনন্তদেবের সুবিশাল প্রতিকৃতি। এই অকূল সাগরতটে দাঁড়াইলে সেই অনন্ত পুরুষের আভাষ হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তাঁহার অনাদি সৃষ্টির অসীম বিশালতা উপলব্ধি করা যায়। তাই ঐ একটি যুবক সমুদ্রতীরে রাস্তার ধারে একখানা কাষ্ঠাসনে বসিয়া ভাবে বিভোর হইয়া নির্নিমেষনেত্রে সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া আছে।

কতক্ষণ পরে যুবকটীর চৈতন্যোদয় হইল—তিনি অদূরে একটী সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সে সঙ্গীত, সমুদ্রের গভীর গর্জ্জনকে এক এক বার ভেদ করিয়া উঠিতেছে, আবার নামিতেছে—তাহার সুমধুর তান যেন অমৃত নিস্যন্দন করিতেছে। নবঘন সেই সঙ্গীত লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন—নিকটে গিয়া দেখিলেন একজন বৃদ্ধ বালুকার উপরে বসিয়া ভক্তি গদগদ কণ্ঠে একটী সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করিতেছেন।

* * * * *

শৃণোষ্যকর্ণঃ পরিপশ্যাসি ত্বম্
অচক্ষুরেকো বহুরূপ রূপঃ।
অপাদহস্তো জবনোগ্রহীতা

অণোরণীয়াং সং অসৎ স্বরূপং
ত্বাং পশ্যতো, জ্ঞান নিবৃত্তিরগ্র্যা।
ধীরস্য ধীর্য্যস্য বিভর্ত্তি নান্যং
বরেণ্যরূপাৎ পরতঃ পরাত্মন্॥

ত্বং বিশ্বনাভি র্ভুবনস্য গোপ্তা
সর্ব্বাণি ভূতানি তবান্তরাণি।
যদ্‌ভূতভব্যং তদণোরণীয়ঃ
পুমাংস্ত্বমেকঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ॥

একশ্চতুর্দ্ধা ভগবান্ হুতাশো
বর্চ্চো বিভূতিং জগতো দদাসি।
ত্বং বিশ্বতশ্চক্ষু রনন্তমূর্ত্তে
ত্রেধা পদং সংনিদধে বিধাতঃ॥

যথাগ্নিরেকো বহুধা সমিধ্যতে
বিকার ভেদৈ রবিকার রূপঃ।
তথা ভবান্ সর্ব্ব গতৈক রূপো
রূপাণ্যশেষাণ্যনু পুষ্যতীশ॥
একস্ত্বমগ্র্যং পরমং পদং যৎ
পশ্যন্তি ত্বাং সূরয়ো জ্ঞানদৃশ্যং।
ত্বত্তো নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ত্বয়ীহ
যদ্বাভূতং যচ্চ ভাব্যং পরাত্মন্॥

বৃদ্ধ এই স্তোত্র পাঠান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। পরে মুদিত নেত্রে কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবনিমগ্ন হইয়া রহিলেন। নবঘনও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরে বৃদ্ধ চক্ষু

"সেই জ্ঞানময় অনন্ত মহাবিরাটমূর্ত্তি—এই মহাসাগরের ন্যায় বিশাল, তাহা আমি ধরিব কিরূপে? ক্ষুদ্র মানবের তাঁহাকে উপলব্ধি করা অসম্ভব সুতরাং তাঁহাকে প্রেম করিবে কিরূপে? তাই আমার প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ এই মহাসাগরের তীরে বসিয়া কি প্রেমের গীত গাহিয়াছিলেন শুন:—

কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন সঙ্গীতক বরো
মুদাভিরী নারীবদনকমলাস্বাদন মধুপঃ।
রমাশম্ভু ব্রহ্মা সুরপতি গণেশার্চ্চিত পদো
জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

ভূজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচরী কটাক্ষেণ বিদধৎ।
সদাশ্রীমদ্ বৃন্দাবন বসতি লীলাপরিচয়ো
জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তে সহজ বলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রা মধ্যস্থঃ সকল সুরসেবাবসরদো
জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে॥

কৃপাপারাবারঃ সজল জলদ শ্রেণীরুচিরো
রমা বাণী রামঃ স্ফুরদমলপদ্মেক্ষণমুখঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিমুখগণোদ্গীত চরিতো
জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

রসানন্দী রাধাসরসবপুরানন্দন সুখী
জগন্নাথ স্বামী নয়ননপথগামী ভবতু মে॥

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথিমিলিত ভূদেব পটলৈঃ
স্তুতং প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধু র্বন্ধুঃ সকল জগতাং সিন্ধু সদনে
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

নচেদ্রাজ্যংরাজ্যং নচ কনকমাণিক্য বিভবো
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজন কাম্যাং বরবিধে।
সদাকালেকামঃ প্রথম পঠিতোদ্গীত চরিতো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামা ভবতু মে॥

হরত্বং সংসারং দৃঢ়তরমসারং সুরপতে
বরত্বং ভোগীশং সততমপরং নীরজপতে।
অহো দীনানাথ নিহিতমচলং নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামা ভবতুমে॥

এই "জগন্নাথাষ্টক" গাহিতে গাহিতে বৃদ্ধের ভাবাবেশ হইল তিনি নবঘনের দিকে চাহিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

"বলিতে পার, আমার সেই গৌরাঙ্গ সুন্দর কোথায়? এক দিন পুরীবাসী যাঁহার এই মধুর গানে মোহিত হইয়াছিল, আজ তিনি কোথায়? ঐ শুন পুরীবাসী আজ তাঁহার জন্মোৎসবে মাতিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে, কিন্তু আমার গৌর হরি আজ চারি শত বৎসর হইল, এই সমুদ্রতীরে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে! ঐ সমুদ্র, তীরে ছুটিয়া আসিয়া আমার গৌরকে ভাসাইয়া লইয়াছে।—সমুদ্র! সেই অমূল্য রত্ন উদরস্থ করিয়া তোমার বুঝি লোভ জন্মিয়াছে, তাই বার

ঐ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছ, আর ক্রোধভরে ঐ গম্ভীর গর্জ্জন করিয়া আকাশ কম্পিত করিতেছ? না—তুমি তাহাকে আর পাইবে না! সে যে আমার হৃদয়ের ধন—আমি তাহাকে হৃদয়-কন্দরে লুকাইয়া রাখিয়াছি!"

ইহা বলিতে বলিতে সেই মহাভাবপ্রাপ্ত বৃদ্ধের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। নবঘন তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন। পাঠক অবশ্যই চিনিয়াছেন এই বৃদ্ধ সেই নরোত্তমদাস বাবাজী।

কিছুক্ষণ পরে বাবাজীর চৈতন্য হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া নবঘনকে দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—

"বাবা! তুমি কে! তুমি এখানে কেন?" নবঘন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন

"আপনি একটু সুস্থ হউন, পরে বলিতেছি।"

"আমার জন্য ভাবিও না বাবা, আমার মধ্যে মধ্যে এরূপ হয়"

নবঘন বলিলেন "আপনি সাধু—মহাপুরুষ!"

বৃদ্ধ চাদর দিয়া গা ঝাড়িয়া বলিলেন "বাবা! আমি অতি দীন—আমি ক্ষুদ্র কীটানুকীট। ঐ অনন্ত আকাশে অনন্ত কোটী তারকা-রাজি—এই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমাদের এই পৃথিবী কত ক্ষুদ্র—এই সমুদ্রতীরের বালুকাকণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র! সেই পৃথিবীর তুলনায় মানুষ কত ক্ষুদ্র একবার ভাবিয়া দেখ—এই মহাসমুদ্রের বক্ষে যেন একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গ! বাবা, এই অনন্ত বিশ্ব রাজ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানুষের স্থান কতটুকু?"

নবঘন বিনীতভাবে বলিলেন—

"আজ্ঞে, তবে মানুষ কি কখনও বড় হইতে পারে না?"

মধ্যে এক বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর বস্তুর বীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে। সে কি? না, চিচ্ছায়া—সচ্চিদানন্দ অনন্ত পুরুষের প্রতিবিম্ব। কিন্তু সেই অমূল্য বস্তুর অস্তিত্ব কয়জনে বুঝিতে পারে? কয়জনে তাহার মূল্য বুঝে, বাবা! এই সংসারে অধিকাংশ লোকের মধ্যেই সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ টুকু ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া প্রায় নিবিয়া রহিয়াছে। জন্মান্তরীণ সুকৃতি বলে যিনি অনুশীলন দ্বারা সেই আগুন জ্বালাইতে পারেন, তিনিই মহাপুরুষ। যে যুগে এইরূপ একজন মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয়, সে যুগ ধন্য হয়! তখন সেই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার সংস্পর্শে আসিয়া অন্যান্য জীবের মধ্যেও লুক্কায়িত অগ্নিকণা বিনা আয়াসে জ্বলিয়া উঠে!”

“আজ্ঞে, মুক্তির কি তবে অন্য উপায় নাই? এই যে সহস্র সহস্র লোক তীর্থস্নান করিতেছে, জগন্নাথ দর্শন করিতেছে, ইহাদের কি মুক্তি হবে না? শুনিয়াছি শাস্ত্রে বলে, “রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।” ইহার অর্থ কি?”

“বাবা! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। এই শাস্ত্রীয় বাক্য যথার্থ, কিন্তু ইহার অর্থ অন্য রকম। “রথ” অর্থ শরীর, আর “বামন” অর্থ এই শরীরস্থ আত্মা। কঠোপনিষদে এই রথের উল্লেখ আছে, যথা,—

“আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।” আর কঠোপনিষদে এই “বামন” শব্দেরও উল্লেখ আছে, যথা,—

“মধ্যে বামনং অসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে।” অতএব জানা গেল, রথে কি না শরীরে, বামন কি না আত্মাকে দেখিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না—অর্থাৎ যিনি নিজ শরীরমধ্যস্থ আত্মাকে দর্শন করিতে পারেন, কি না শরীর মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তির অতীত সেই পরমাত্ম বস্তুকে উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনিই মুক্তিলাভ করেন। কারণ শ্রুতি বলেন “স যো হ বৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।” যিনি ব্রহ্মকে

উপস্থিত। এখন মানুষের বড়ই শোচনীয় অবস্থা। এখন লোকে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট জ্ঞানমার্গ কি ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিতে চেষ্টা না করিয়া মুক্তির সহজ উপায় সকল কল্পনা করিয়া লইতেছে। তাই অনেক স্থলে লোকে স্বকপোলকল্পিত মত ও শাস্ত্রার্থ বাহির করিয়া প্রবঞ্চিত হইতেছে ও অন্যকে প্রবঞ্চনা করিতেছে। "একবার তীর্থদর্শন করিলে বা তীর্থ স্নান করিলেই মুক্তি লাভ হয়," "হরিনাম একবার মুখে আনিলে যত পাপ ক্ষয় হয়, মানুষের সাধ্য কি তত পাপ করে"—ইত্যাদি মতসকল এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বাবা, মনে রাখিও, মানুষের সহিত ঈশ্বরের যে ব্যবধান তাহা পূর্ব্বে যতটুকু ছিল, এখনও ততটুকু আছে। পূর্ব্বে ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য মানুষকে যতটা কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হইত এখনও তাহাই করিতে হইবে। তাহার একচুলও এদিক ওদিক হইবার সম্ভব নাই। বরং মানুষ এখন অধিকতর মায়ার বশীভূত হওয়াতে ঈশ্বর হইতে আরও অধিক দূরে সরিয়া পড়িতেছে।"

"তবে তীর্থ দর্শনের কি কোন উপকারিতা নাই?"

"অবশ্যই আছে! তাহা না হইলে কত কত মহান্ সাধু পুরুষ এই সকল স্থানে আগমন করেন কেন? কিন্তু তীর্থ মাহাত্ম্য কয় জনে বুঝে বাবা?"

"আজ্ঞে সে কি রকম?"

"এই দেখনা কেন, বৎসর বৎসর কত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ নরনারী ৺গয়াধামে শ্রীবিষ্ণুপাদচিহ্ন দর্শন করিতেছে, কিন্তু কয় জনে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া কৃতার্থ হইতেছে? কিন্তু আমার শ্রীচৈতন্য সেই পাদচিহ্নের মধ্যে কি পরমবস্তু দেখিয়াছিলেন, যে তাহা দেখিবা মাত্র তাঁহার নেত্রযুগল হইতে যে প্রেমাশ্রু ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা আর কখনও থামিল না। এই জগন্নাথ মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি পাণ্ডাদিগের

অধিকাংশ যাত্রীর নিকট উহা অন্যান্য পদার্থের ন্যায় একটী জড় পদার্থ বিশেষ, তবে অবশ্যই ভক্তির বস্তু সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার শ্রীগৌরাঙ্গ উহার মধ্যে কি পরম পদার্থ দেখিয়াছিলেন যে অতি সঙ্কোচে, সম্ভ্রমে, সন্তর্পণে ভক্তিবিনম্র ভাবে উহা দর্শন করিতেন এমন কি সেই মূর্ত্তির নিকটে অগ্রসর হইতে সাহস করিতেন না—অতি দূরে, সেই গরুড় স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেন।"

ইহা বলিতে বলিতে বাবাজীর চক্ষে জল আসিল, তিনি চাদর দিয়া চক্ষু মুছিলেন।

"তাই বলিতেছি, তীর্থ মাহাত্ম্য অতি অল্প লোকেই বুঝিতে পারে। অধিকাংশ লোকের নিকট তীর্থ দর্শন গজস্নানের মত হয়। যখন তখন একটু ভক্তি শান্তি পবিত্রতার ভাব মনে আসিতে পারে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সংসার আবর্ত্তে পড়িলে তাহা কোথায় ধুইয়া যায়। তবুও লোকে যদি অর্থ ও মর্ম্ম বুঝিয়া তীর্থের অনুষ্ঠানাদি করিত তবে কতকটা স্থায়ী ফল হইত।"

"একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলুন।"

"যেমন এই তীর্থে একটা নিয়ম আছে যে, তীর্থ যাত্রী কোন একটা ফল মহাপ্রভুকে সমর্পণ করিবে, এজন্মে তাহা আর খাইবে না। এই ফল সমর্পণের মধ্যে অতি গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। ভগবানকে ফল সমর্পণ করার অর্থ তাঁহাকে কর্ম্মফল অর্পণ করা। পূর্ব্বে গৃহীলোকে তীর্থে আসিয়া কোন একটা ফল সমর্পণের ছলে স্বীয় কর্ম্মফল ভগবানকে সমর্পণ করিয়া যাইত, গৃহে ফিরিয়া গিয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিত, আর কর্ম্মে লিপ্ত হইত না। এখন লোকে এই অনুষ্ঠানের প্রকৃত মর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছে—এখন ইহা অর্থহীন প্রাণশূন্য বাহ্য আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে।"

কৃতার্থ হইলাম। আমার আর একটি জিজ্ঞাস্য আছে। আচ্ছা, পুরুষোত্তম ক্ষেত্র হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থ স্থান। এখানে জ্ঞান বিজ্ঞানের কথাত কিছুই শুনি না, কেবল ভোগরাগের কথাই শুনিতে পাই; লোকে ভোগ নিয়াই ব্যস্ত। জগন্নাথ মহাপ্রভু যেন এখানে কেবল ভোগ খাওয়ার জন্যই বিরাজমান আছেন?"

"বাবা! আজকালকার লোকেরা নিজেরা ভোগাসক্ত বলিয়া, তাহারা মনে করে, ঠাকুরও বুঝি কেবল ভোগ খাইতেই ভাল বাসেন। তাই তাহারা ভোগ লইয়াই ব্যস্ত। আর সেই ভোগই বা প্রকৃত ভক্তিপূর্ব্বক কয়জন লোকে দিয়া থাকে? তুমি দেখিবে, এখানকার অধিকাংশ পাণ্ডা মোহান্ত ঠাকুরকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজেদের ভোগ লালসা চরিতার্থ করে। ঈশ্বরে ভোগ্য বস্তু নিবেদন দ্বারা ভোগস্পৃহা ও বিষয়-বাসনার নিবৃত্তিই ভোগরাগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু এখন ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

নবঘন। আপনার নিকট অনেক তত্ত্বকথা শিখিলাম। এরূপ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ আর কখনও শুনি নাই। আপনার আকার প্রকার দর্শনে আপনাকে একজন সাধু মহাপুরুষ বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

বাবাজী। বাবা! আমি একজন নিতান্ত দীনহীন ক্ষুদ্র ব্যক্তি, এই ভবজলধির কূলে দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতেছি—এই মহাসাগরের কাণ্ডারি গৌরহরিই আমার একমাত্র ভরসা স্থল। ঐ দেখ, মহাপ্রভু এই বিশাল জলধির কূলে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "রে মোহাচ্ছন্ন জীব! তোমার ভয় নাই—ভয় নাই! মামেকং শরণং ব্রজ! একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। তাই তাঁহার শ্রীচরণে শরণ লইয়াছি। আমি তাঁহারই দাসানুদাস—আমার নাম শ্রীনরোত্তম দাস, আমি গোপালপুর মঠে

নবঘন। বটে ? আপনি গোপালপুরের মোহান্ত ? আপনার নাম পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। আজ আমার শুভদিন, মহাপুরুষের দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

বাবাজী। বাবা ! তুমি কে ? তোমার কথাবার্ত্তা ও সুন্দর আকৃতি দ্বারা তোমাকে সুশিক্ষিত উচ্চবংশীয় ভদ্র সন্তান বলিয়া বোধ হইতেছে।

নবঘন। আমার নাম নবঘন হরিচন্দন—আমার পিতা কনকপুরের রাজা অল্পদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন।

বাবাজী। কি, তুমি রাজা ব্রজসুন্দরের পুত্র ? ভাল, বাবা ! আমি শুনিয়াছি তুমি বি, এ, পাশ করিয়াছ, যাহা আমাদের দেশের কোন রাজা জমিদারের ছেলে এপর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। তোমার পিতার দেশ বিখ্যাত নাম, তাঁহার নিকট গিয়া কেহ কখনও রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসে নাই।

নবঘন। কিন্তু আমি এখন বড়ই বিপন্ন—ঋণের দায়ে এখন রাজগী যায় যায় হইয়াছে।

বাবাজী। কেন, তোমার কত টাকার ঋণ ?

নবঘন। মোহান্ত চতুর্ভুজ রামানুজ দাস দুইবছর আগে ৩৫ হাজার টাকার এক ডিক্রি করিয়াছিলেন, এখন সেই ডিক্রি জারি করিয়া মহাল ক্রোক দিবেন বলিলেন। আমি তাঁহাকে আরও কিছুদিন সময় দিতে বলিলাম, তাহা শুনিলেন না। এতদ্ভিন্ন খুচরা দেনাও প্রায় ২০ হাজার টাকা হইবে।

বাবাজী। (একটু বিষণ্ণ হইয়া) তাইত ? এ টাকা পরিশোধের কি কোন উপায় নাই ?

নবঘন। কোন উপায় নাই, মহালে যে বাকি বকায়া আছে তাহা দ্বারা সদর খাজনা শোধ হওয়া কঠিন, আমি এখন সম্পূর্ণ নিরুপায়,

দ্বারা পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত রাজগী রক্ষা হইল না! আমার মনে হয়, এই সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে বুঝি আমার দুঃখের অবসান হয়।

ইহা বলিয়া নবঘন চাদর দিয়া চক্ষু মুছিলেন।

বাবাজী বলিলেন—"বাবা! বিপদে এরূপ অধীর হইও না। এই সকল বিপদ কিছুই না, আকাশের মেঘের ন্যায় এই আছে এই নাই, তুমি যুবাপুরুষ, তুমি সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, রাজার ছেলে, রাজা। তুমি চেষ্টা করিলে ভগবানের কৃপায় নিশ্চয়ই অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে।"

বাবাজী ইহা বলিয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন, পরে আবার বলিলেন "বাবা তুমি বিবাহ করিয়াছ?"

"না"

বাবাজী আরো খানিকক্ষণ ভাবিলেন, পরে বলিলেন—

"বাবা! তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইতেছে, কিন্তু কি উপায়ে তোমার উপকার হয়, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। যদি দুই এক হাজার টাকার কাজ হইত, তবে আমি আমার গোপালের ভাণ্ডার হইতে তোমাকে বরং আপাততঃ হাওলাত দিতে পারিতাম, কিন্তু তোমার যে অগাধ টাকার দরকার, যাহা হউক, আমি ভাবিয়া দেখিলাম—তাহারও এক পথ আছে, তুমি কি মনে করিবে জানিনা—"

বাবাজীর কথা শুনিয়া নবঘনের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল, তিনি বলিলেন—

"মহাশয়! আপনি অতি দয়ালু আপনি কৃপা করিয়া আমার উপকারের কথা বলিতেছেন, তাহাতে আমি আবার কি মনে করিব?"

বাবাজী। বাবা! কথা এই, আমার নিজের কোন টাকা নাই, কিন্তু আমার একজন অনুগত ব্যক্তি আমাকে তাঁহার সম্পত্তির অছি নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় কোদণ্ডপুরের বীরভদ্র মর্দ্দরাজের [illegible] বলিতেছি। বীরভদ্রের নগদ ৫০

হাজার টাকা ছিল, তিনি তাহা তাঁহার কন্যাকে বিবাহের যৌতুকস্বরূপ উইলের দ্বারা দিয়া গিয়াছেন। সে কন্যাটীর এখনও বিবাহ হয় নাই। সে বয়ঃস্থা, পরম রূপবতী ও অশেষ গুণবতী, তবে তুমি রাজপুত্র, নিজেই রাজা—আমার শোভাবতী তোমার উপযুক্ত হইবে কিনা জানিনা। যদি সকল বিষয়ে তোমার উপযুক্ত হয়, তবে আমি তাহার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে পারি। তাহা হইলে তুমি আপাততঃ সেই টাকাটা দ্বারা সমস্ত দেনা শোধ করিতে পারিবে ও এই উপাস্থত বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিবে, আর আমিও তোমার ন্যায় রূপ গুণ সম্পন্ন উপযুক্ত বরের হস্তে সেই কন্যারত্নটীকে দান করিয়া তাহার পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারি। কিন্তু বাবা! সে টাকাটা আমার শোভাবতীর স্ত্রীধন, তোমাকে আবার তাহার সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

বাবাজীর কথা শুনিয়া নবঘন অভিরামের কথা স্মরণ করিলেন। অভিরাম শোভাবতীর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল, তাহাতে তাহার প্রতি নবঘনের মন কতকটা আকৃষ্ট হইয়াছিল। এখন আবার বাবাজীর মুখে তাহার রূপ গুণের প্রশংসা শুনিয়া তিনি বুঝিলেন শোভাবতী রূপে গুণে, কুলে শীলে তাঁহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় নাই, তৎপরে নবঘনের ঘাড়ের উপর এই এক মহাবিপদ উপস্থিত। যদি শোভাবতীকে বিবাহ করিয়া তিনি মনের মত স্ত্রী লাভ, সঙ্গে সঙ্গে ঋণ পরিশোধ, ও সর্ব্বপ্রকার সুখলাভ করিতে পারেন, তবে তাহাতে তিনি অসম্মত হইবেন কেন? তিনি নানারূপ চিন্তা করিয়া শেষে বাবাজীকে বলিলেন—

"মহাশয়! আমার আপাততঃ বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না।

এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারি ও পূর্ব্বপুরুষগণের রাজগীটা রক্ষা করিতে পারি, তবে আমার তাহাতে অমত নাই। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আমার মাতার সম্মতি লওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয় কথা, আমার এখন কালাশৌচ, বৈশাখ মাসের শেষে ভিন্ন বিবাহ হইতে পারিবে না।

বাবাজী। বাবা! তুমি যে কালাশৌচের কথা বলিতেছ, কন্যার পক্ষেও তাহাই। সেজন্য ভাবিও না, বৈশাখ মাসের শেষেই বিবাহের দিন স্থির করা যাইবে! আমি নিজে গিয়া তোমার মাতার মত জানিয়া আসিব! তাঁহার মত হইলে মোহান্ত চতুর্ভুজ রামানুজ দাসের নিকট আমি চিঠি দিলেই তিনি মহাল ক্রোক করা স্থগিত করিবেন। আমি যে টাকার কথা বলিলাম, তাহাও তাঁহারই নিকট আমানত আছে। সুতরাং তোমার ঋণ পরিশোধ ত এক মুহূর্ত্তেই হইবে। এদিকে বীরভদ্রের এক ভাই বাসুদেব মান্ধাতাও উইলের অছি আছেন, তাঁহারও মত জানা আবশ্যক হইবে। তবে আমি একথা নিশ্চয় বলিতে পারি যে তোমার ন্যায় বরের হস্তে শোভাবতীকে সম্প্রদান করা তিনি নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিবেন। আর একটা কথা আগেই বলিয়া রাখি। শোভাবতীর এক বিমাতা আছেন, তিনি হয়ত এ বিবাহে মত দিবেন না, এবং আমি শুনিয়াছি, তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহাতে এ বিবাহ না হয়, সে পক্ষে তিনি চেষ্টা করিবেন। কারণ এই টাকাগুলির উপর তাঁহাদের ভারি লোভ জন্মিয়াছে। যাহা হউক, আমরা চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই তোমার সহিত শোভাবতীর বিবাহ দিতে পারিব। রাত্রি অধিক হইয়াছে, চল আমরা এখন যাই। একবার মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে যা'বে কি? এখন দর্শনের বড় উৎকৃষ্ট সময়।

নবঘন উঠিয়া বলিলেন "চলুন।"

মন্দিরের সম্মুখে সুপ্রশস্ত "বড়দাণ্ড" জোৎস্নালোকে আলোকিত হইয়াছে। সিংহদ্বারের সম্মুখে সুচিক্কণ কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত অরুণ-স্তম্ভটি চন্দ্রকিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। তাঁহারা সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন ও প্রশস্ত সোপানশ্রেণী আরোহণ করিয়া মন্দিরের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। তখন মহাপ্রভুর সন্ধ্যা আরতি শেষ হইয়াছে, কিন্তু প্রাঙ্গনে সংকীর্ত্তন হইতেছে। মন্দিরের মধ্যে জনতা কম। তাঁহারা পশ্চিম দ্বার দিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আজ দোল পূর্ণিমা, তাই শ্রীমূর্ত্তিকে রাজবেশে সজ্জিত করা হইয়াছে। সুবর্ণনির্ম্মিত হস্তপদ, মস্তকে কনক কিরীটী, পরিধানে বহুমূল্য পট্টবস্ত্র, গলায় মনোহর পুষ্পহার ও মণিরত্নময় আভরণ স্তরে স্তরে সাজান, সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত ও আবির কুঙ্কুম রঞ্জিত। উচ্চ "রত্ন বেদি"র উপরে এইরূপ বেশভূষায় সজ্জিত তিনটী মূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছেন। পবিত্র ধূপ ধুনা ও চন্দন চুয়ার গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। ভক্তগণ কেহ রত্নবেদী প্রদক্ষিণ করিতেছেন, কেহ "জয় জগন্নাথ" রবে মহাপ্রভুর পাদমূলে পতিত হইতেছেন, কেহ দূরে দাঁড়াইয়া স্তোত্রপাঠ করিতেছেন, কেহ কাতরকণ্ঠে অশ্রুপূর্ণ নয়নে মহাপ্রভুর নিকট মনোগত প্রার্থনা জানাইতেছেন।

মহাপ্রভুর সম্মুখে কিঞ্চিৎদূরে গরুড় স্তম্ভ। নবঘন ও নরোত্তম দাস বাবাজী সেস্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। একজন শ্বেতবর্ণের ঘাঘরা পরা, বর্ষীয়সী নর্ত্তকী শ্বেত চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে নিম্নলিখিত জয়দেব পদাবলী গান করিল।

"শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল, ধৃতকুণ্ডল, কলিতললিতবনমাল।

জয় জয় দেব হরে॥

দিনমণিখণ্ডলমণ্ডল ভবখণ্ডন মুনিজন মানস হংস॥

কালিয় বিষধর গঞ্জন জনরঞ্জন যদুকুলনলিনদিনেশ॥

অমলকমলদললোচন ভবমোচন ত্রিভুবন ভবননিধান॥
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ সমরশায়িত দশকণ্ঠ॥
অভিনব জলধরসুন্দর, ধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্র চকোর॥
তবচরণে প্রণতাবয়মিতি ভাবয়, কুরুকুশলং প্রণতেষু
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বল নীতি॥

গায়িকার স্বর সুমধুর, উচ্চারণ পরিশুদ্ধ, গান সুরতানলয় সংযুক্ত। সেই সঙ্গীত শ্রবণে সকলে মোহিত হইল। বাবাজীর নয়নদ্বয় প্রেমাশ্রু প্লাবিত হইল। তিনি "জয় জগন্নাথ" বলিতে বলিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পরে নবঘন বাবাজীর সহিত মন্দির হইতে বাহিরে আসিলেন। তাঁহারা শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছেন, এমত সময়ে দেখিলেন একজন মলিনবসন, শীর্ণকলেবর লোক মহাপ্রভুর নাম বার-স্বার উচ্চারণ করিতে করিতে পাষাণ সোপানে মাথা ঠুকিতেছে আর রোদন করিতেছে। বাবাজী ও নবঘন তাহার অবস্থা দেখিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিতে লাগিল—

"আমি আর এজীবন রাখিব না—আজ মহাপ্রভুর মন্দিরে, তাঁহার সম্মুখে মাথা ঠুকিয়া মরিব। আমার উপরে তাঁহার একটুও দয়া হইল না? আমি আর ঘরে যাইব না—ঘরে যাইয়া কি করিব? আমার "পেলা কুটুম" দানা বিনা মারা যাইতেছে—আমার মরাই ভাল।"

পাঠক ইহাকে চিনিলেন কি? এ সেই মণি নায়ক। বাবাজী তাহাকে অভয় দিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

শ্রীযতীন্দ্র মোহন সিংহ।

শান্তি ও সংগ্রাম।

আর্য্য জাতির আদিবাসভূমি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ভারতবর্ষে আর্য্যদিগকে প্রথমতঃ পঞ্চনদ প্রদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়; তৎসম্বন্ধে মতভেদ নাই। সেই সীমান্ত ভূভাগ হইতে আর্য্যগণ ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। মুষ্টিমেয় আর্য্য-জাতি বহুবিধ প্রাকৃতিক ও মনুষ্য প্রদত্ত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে আপনাদের প্রাধান্য সংস্থাপন করেন। নিবিড় অরণ্য, সুপ্রশস্ত নদী, কৃশানুকল্প মরুভূমি এবং স্থানে স্থানে পর্ব্বতমালা, ইহার কিছুই বীর্য্যবান্ আর্য্য জাতির ঔপনিবেশিক উদ্যম প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, ভল্লুক, বিষাক্ত সর্প প্রভৃতি যে সকল হিংস্র জন্তু আদিম মানবের প্রায় সমকক্ষ শত্রু ছিল, ভারতভূমির অধিকারের জন্য সেই সমুদয়ের সহিতই আর্য্যদিগকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। সর্ব্বোপরি আদিম অধিবাসিদিগের বাহুবল খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত সুদীর্ঘ কাল আর্য্য সমাজের সমগ্রশক্তি নিয়োজিত ছিল। এইরূপ অবিশ্রান্ত সংগ্রামজনিত শিক্ষা দ্বারা প্রাপ্তযৌবন আর্য্যসমাজ অতিশয় ওজস্বিতা লাভ করিল।

অচিরকালমধ্যে আর্য্যদিগের লক্ষ্যসিদ্ধ হইল—ভারতবর্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানগুলি তাঁহাদের হস্তগত হইল। অনার্য্যদিগের কোন কোন জাতি নির্ম্মূল; কেহ কেহ তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত; অপরেরা হিংস্র জন্তুসঙ্কুল অরণ্য বা পর্ব্বতে তাড়িত। নানা স্থানে সমুন্নত সভ্যতাদীপ্ত আর্য্য রাজ্যসমূহ প্রতিষ্ঠিত; দেবভাষা নামধেয় আর্য্যভাষা সর্ব্বত্র ব্যবহৃত; আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যসাহিত্যের অপ্রতিহত প্রাদুর্ভাব। ফলতঃ

প্রকৃতিদেবী ভারতভূমিকে অন্য নিরপেক্ষ করিয়াছেন। উত্তরে হিমাচল এবং পশ্চিমে সুলেমান এই বিস্তীর্ণ মহাদেশকে এশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সমুদ্র তখনও সভ্যতার মুক্ত রাজবর্ত্মে পরিণত হয় নাই। তাই সময়ে সময়ে উত্তর পশ্চিমাংশে বৈদেশিক আক্রমণ সত্ত্বেও ভারতীয় আর্য্যগণ মোটের উপর বহিঃশত্রু হইতে নিরাপদ; অন্তঃশত্রু অনার্য্যগণ তখন নিতান্ত হীনবীর্য্য। সুতরাং তখন আত্মরক্ষার জন্য আর্য্যদিগের বিশেষ শক্তি প্রয়োগের সম্পূর্ণ প্রয়োজনাভাব। রাজা বা রাজবংশের পরিবর্ত্তনেও সমাজ নিরুদ্বেগ; কারণ সেকালে তাদৃশ অন্তর্বিপ্লবে প্রকৃতিপুঞ্জের শুভাশুভের বড় ইতর বিশেষ হইত না। ভূমি উর্ব্বরা, প্রচুরশস্যশালিনী; সামান্য আয়াসে আশাতিরিক্ত লাভ। জল বায়ু উষ্ণমণ্ডলের, কঠোর শীত বা তুষার-পাতাদি উৎপাত নাই। সামান্য পর্ণকুটীর বাসের পক্ষে যথেষ্ট; সামান্য বস্ত্রখণ্ড শীতনিবারণে সমর্থ; সামান্য ফলমূলে জীবন রক্ষা হয়। সুতরাং কোন দিকেই আর কঠোর উদ্যমের প্রয়োজন রহিল না।

যে বীর্য্যবান্ আর্য্যগণ বাহুবলে নিরন্তর শত্রু নাশ করিয়া আত্ম প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ অনায়াসে সমুদয় ভোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। তাই তাঁহারা আর এ সমুদয়ে তৃপ্ত হইতে পারিতেছিলেন না। যাহা বিনা ক্লেশে হস্তগত হয়, তাহাতে সুখ কোথায়? পূর্ব্বপুরুষাগত যে অমিত তেজ আর্য্যহৃদয়ে ধক্ ধক্ জ্বলিতে ছিল, তাহা কি অনায়াসলব্ধ সামান্য ফলমূল, পর্ণকুটীরাদিতে তৃপ্ত হইতে পারে? তাই আর্য্য হৃদয়ের উদ্দাম লালসা অন্যদিকে প্রধাবিত হইল। তাঁহারা প্রচার করিলেন পার্থিব সমুদয়ই তুচ্ছ; অতীন্দ্রিয়, অপার্থিব বিষয়ই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সেই দিন বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের আরম্ভ।

বরং যাহা তোমার আছে, তাহা অপরকে ভাগ করিয়া দাও ; যাহা নাই, তাহার লাভের জন্য বেশী ক্লেশ করিও না। নিজে ক্লেশ পাও, তাতেও ক্ষতি নাই ; তথাপি এই সকল সামান্য পার্থিব বিষয়ের জন্য অপরকে ক্লেশ দিও না। এইরূপে শান্তি অর্থাৎ ব্যক্তিগত ক্লেশের লাঘব এবং অন্যোন্যসংঘর্ষ নিরাকরণ হিন্দু সমাজের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। ইহাই হিন্দুর বিবাহ প্রণালী, যৌথপরিবার ও জাতি ভেদের অর্থ। নানা কারণ সমবায়ে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য এক—শান্তি। অদৃষ্টবাদও ইহাদেরই অনুচর। কারণ দ্বন্দ্ব ত্যাগ করিয়া বা নিজস্ব অপরকে দিয়া তুষ্ট থাকিতে হইলে মনকে একটা প্রবোধ দেওয়া আবশ্যক। সে প্রবোধ কি ? দ্বন্দ্বলভ্য বস্তু বাঞ্ছনীয় নয় ; তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই ; সেটা আমার লভ্যই নহে ; এমন কোন কারণ বর্ত্তমান, যাহার অস্তিত্ব আমাকে উহার দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিতেছে। সেই কারণ যা আমার অজ্ঞাত, সেটা আমার অদৃষ্ট। একমাত্র অদৃষ্টবাদই আমাদিগকে হীনাবস্থায় তৃপ্ত রাখে ; পক্ষান্তরে হীনাবস্থায় থাকিতে থাকিতে অদৃষ্টবাদ স্বতঃই উপস্থিত হয়।

কি ভাবে হিন্দুসমাজে ক্রমে ক্রমে শান্তিশীলতা প্রবেশ করে, তাহা দেখা গেল। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান হিন্দু জাতকে অন্য নিরপেক্ষ, আত্মনিবদ্ধ করিয়াছিল। তন্নিবন্ধনই হিন্দুজাতি দীর্ঘকাল অদৃষ্টে নির্ভর করিয়া সামান্য অবস্থায় শান্তিতে থাকিতে পারিয়াছিল। কিন্তু ভালই হউক, আর মন্দই হউক, 'তে হি নো দিবসা গতাঃ'।

সমুদ্র পথে ইয়ুরোপীয়েরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া আমাদের বিচ্ছিন্নতা দূর করিয়াছেন ;—আমরা সমগ্র পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছি। তাহার ফলে এখন আর সুখ ছাড়িয়া 'স্বস্তি' লইয়া থাকিতে পারিতেছি না। এখন হয় নিশ্চেষ্টতামূলক শান্তি ত্যাগ করিয়া আমরা

তীব্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, না হয় স্বহস্তে নিজ শ্মশান প্রস্তুত করিব। কাজেই জীবনাকাঙ্ক্ষা করিলে আমাদের সমাজকেও ভাঙ্গিয়া নবযুগের অনুযায়ী করিতে হইবে। কারণ সমাজের গঠন জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্যমেরই ছাপ, অধিকন্তু সমাজ কোন বিশিষ্ট আকারে গঠিত হইয়া গেলে জাতীয় আকাঙ্ক্ষা, উদ্যমও ন্যূনাধিকপরিমাণে তদ্দ্বারা নিয়মিত হয়।

জাতিভেদ, যৌথপরিবার, মুষ্টি ভিক্ষা প্রণালী প্রভৃতি অন্নহীনকে অন্নদান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা লঘুতর করিবার সফল চেষ্টা। হিন্দু সমাজে অভাবগ্রস্ত দুর্ব্বলের সাহায্য করিতে সবলগণ সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ভারতের ভূভাগ হইতে আমাদের বিচ্ছিন্নতা বশতঃ এসকলই সম্ভব হইয়াছিল। তাদৃশ বিচ্ছিন্নতা বশতঃই সমগ্র ভারতবর্ষের উৎপন্ন দ্রব্য একমাত্র আমাদেরই ছিল। ভূমিও অত্যুর্ব্বর; কাজেই খাদ্যোৎপাদনের জন্য সমুদয় অধিবাসীর পরিশ্রমের আবশ্যকতা ছিল না। বহুলোক পার্থিব হিসাবে আলস্যে জীবন কাটাইতে পারিত। অবশিষ্টেরা যে পরিশ্রম করিত, তাহাতেই তাহাদের অনুৎপাদক ব্যক্তিদিগের জীবিকানির্ব্বাহ হইত। সুতরাং তদবস্থায় সামাজিক শান্তিবর্দ্ধক পরার্থপরতার অবসর ছিল।

কিন্তু এখন আমাদের সে বিচ্ছিন্নতা নাই; সমগ্র ভারতবর্ষ আমাদের ভোগ্য নাই—পাশ্চাত্য জাতিগণ ভারতজাত খাদ্য দ্রব্যে ভাগ বসাইতেছে। অপেক্ষাকৃত খাদ্যাভাব ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল। আজকাল গ্রাম্য বাজারে পর্য্যন্ত যে ভাবে বন্য শাক বিক্রয় হইতেছে, তাহাতেই বোধ হয় সংসারবিরাগীকীর্ত্তিত স্বচ্ছন্দ বনজাত ও নির্ঝর জলে জীবন ধারণের কাল সন্ন্যাসীদেরও বেশী দিন থাকিবে না। ইংরেজ রাজত্বে পতিত অরণ্যেও যথেচ্ছ প্রবেশের অধিকার নাই। অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর ক্ষেত্রসমূহ কর্ষিত হইতেছে; কাজেই উৎপন্ন প্রাচুর্য্য পূর্ব্ববৎ নাই। যাহা উৎপন্ন তাহাও সমুদয় আমাদের হাতে

থাকে না। অধিকন্তু ইয়ুরোপের সংস্পর্শে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শ উচ্চ হইতেছে। তাই আমাদের অনুৎপাদক ব্যক্তিদিগের পোষণ ক্ষমতা হ্রাস পাইতেছে। বাধ্য হইয়া আমরা অধিকতর স্বার্থপর হইতেছি। তাহাই যৌথ পরিবারের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। যে যে ভাবে পারি, স্ব স্ব স্ত্রীপুত্রের অন্নসংস্থানে ব্যাপৃত আছি। তদ্দরুণ যদি অন্যের পৈত্রিক ব্যবসায় মাটী হইয়া যায়, তবুও লাভ দেখিলে পারতপক্ষে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি না। কাজেই ব্যবসায় ভেদ জনিত জাতিভেদ উচ্ছিন্ন হইতেছে; প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমেই কঠোরতর আকার ধারণ করিতেছে।

অতএব দেখা যাইতেছে আমাদের বিচ্ছিন্নতার লোপে আপনা আপনিই অতীত যুগের পরার্থপরতা এবং তজ্জনিত শান্তিশীলতা ও তদনুরূপ সমাজগঠন দূরীভূত হইতেছে। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে; স্বেচ্ছায় ও সোৎসাহে আমাদিগকে সংগ্রামশীল হইতে হইবে এবং সমাজকে তদনুকূল করিতে হইবে। আমি যে সংগ্রামের কথা বলিতেছি তাহা আইনসম্ভূত উপায়ে কিন্তু অতি তীব্র উদ্যমে ভোগ্য সংগ্রহের চেষ্টা মাত্র। অপ্রত্যক্ষ হইলেও এরূপ সংগ্রাম প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অপেক্ষা অল্প ভয়াবহ নহে; কারণ ইহাতেও পরাজিতের মৃত্যু নিশ্চিত। বর্ত্তমান যুগে যাহারা এরূপ সংগ্রামে পটু নহে, শিল্প ও বাণিজ্য-বহুল সমাজের সহিত প্রতিযোগিতায় কালক্রমে আমেরিকার ইণ্ডিয়ান-দের ন্যায় অবস্থাই তাহাদের ভাগ্যে সম্ভব।

আমরা ঐহিক চাহি না, পারত্রিকেই তুষ্ট, এইরূপ বলিতে ভাল-বাসি। পূর্ব্বে যখন পারত্রিকে তুষ্টি ঐহিক ভোগ্যের অন্তরায় হইত না, তখন এই কথায় কোনও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু অধুনা ঐহিক নিবৃত্তি আমাদিগকে আমাদের স্বদেশজাত ভোগ্য হইতে বঞ্চিত করিতেছে। ঐহিকপ্রিয় লোকের সহিত সংস্রব থাকিলে তন্নিবৃত্তি হিন্দুজাতিকে

ইহলোক হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিবে, সন্দেহ নাই। কারণ শরীরটা নেহায়েত ঐহিক এবং তাহার আবশ্যকীয় অন্নবস্ত্রাদিও তদ্রূপ। ভারতবর্ষের আর্থিক দুরবস্থা এবং তাহার ফলস্বরূপ পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ তাহারই প্রমাণ দিতেছে।

পাশ্চাত্যদেশবাসীগণ আত্মরক্ষার জন্য স্বদেশে প্রকৃতির সহিত অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিতে বাধ্য হইতেছেন। তাই সংগ্রামস্পৃহা ও জিগীষা তাঁহাদের প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ, লালসা অতি উদ্দাম। কঠোর জলবায়ুবিশিষ্ট অনুর্ব্বর ইয়ুরোপে তৃপ্ত থাকিতে না পারিয়া তাঁহারা বিদেশীয় ভোগ্যবস্তু আত্মসাৎ করিবার জন্য স্ব স্ব সমগ্র শক্তি ব্যক্তিগত ভাবে ও সম্মিলিত আকারে প্রয়োগ করিতেছেন। স্বদেশেও দুর্ব্বলদিগের প্রতি তাঁহারা তত কৃপাদৃষ্টি করিতে পারিতেছেন না। এরূপ অবস্থায় ভারতবাসীগণ তীব্রতেজে তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে না পারিলে, তাহারা যে অনুগ্রহ করিয়া ভারতের চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ভারতের গোলাঘরেই রাখিয়া যাইবেন, এরূপ মনে করা বাতুলতা মাত্র। ফলতঃ আমাদিগকে এখন অতি ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রস্তুত হইতে হইতেছে, অন্যথা আমাদের জীবন ধারণ অসম্ভব।

সেই প্রস্তুতি এইরূপ—শিক্ষার্থ প্রিয় পুত্রকে সাত সমুদ্রের পারে বিদেশে প্রেরণ করিতে হইবে, এবং দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, নিজ শক্তি ও সামর্থ্যের অনুযায়ী তাহাকে ব্যবসায় নির্ব্বাচন করিতে দিতে হইবে। উচ্চবর্ণের মানের খাতিরে অসমর্থকে পোষণ করিতে পারিতেছি না, ক্রমেই কম পারিব। আবশ্যক হইলে তাঁহাকে হীন কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, নীচজাতীয় কেহ শক্তিমান্ হইলে তাহার অভ্যুদয়ের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিব না; যেহেতু অন্যথা তাহার উন্নত অবস্থাটুকু বিদেশীয় কাহারও ভোগ্য হইবে; অথবা দেশীয় হীনতর

ব্যক্তির ভোগ্য হইয়া সমাজের উৎকৃষ্ট মনুষ্যত্বের বৃদ্ধির অন্তরায় ঘটাইবে। সাত পুরুষ ব্যবধান আত্মীয়ের ক্লেশের ভয়ে উদ্যমশীল যুবকের উন্নতির ব্যাঘাত না জন্মে, এরূপ ব্যবস্থা চাই। সমাজ যেন অলসের লীলাস্থল না হয়। এরূপ অবস্থায় পরিবার প্রতিপালনের শক্তি বিকশিত না হইতে পরিবার বৃদ্ধি করিতে কাহাকেও সুযোগ দেওয়া যাইবে না। এই সকলের সংক্ষিপ্ত অর্থ জাতিভেদ, যৌথ পরিবার ও বাল্য বিবাহের লোপ। যদি তাহাই হয়, তবে নিঃসহায় স্ত্রীলোকদিগের জন্য অর্থোপার্জ্জনের পন্থা পরিষ্কার করিতে হইবে। তখন বিবাহ ভেদও ন্যূনাধিক পরিমাণে উঠিয়া যাইবে, এবং বিধবাদিগকে ইচ্ছা হইলে পুনরায় পতিগ্রহণে অনুমতি দিতে হইবে।

তখন সমাজে অদৃষ্টবাদের স্থান থাকিবে না। যদি অদৃষ্টবাদদ্বারা অকৃতকার্য্যতার দোষ ক্ষালন করা যায়, তবে উদ্যমের গুরুতর অন্তরায় ঘটে। অদৃষ্টবাদ মানুষকে ন্যূনাধিক পরিমাণে জড়বৎ, নিশ্চেষ্ট ও অল্পে সন্তুষ্ট করিবেই। একবার, ঊর্দ্ধ দুই তিন বার, বিফলমনোরথ হইলে অদৃষ্টে নাই ভাবিয়া অদৃষ্টবাদী নিশ্চয়ই বিরত হয়। সেরূপ ক্ষণভঙ্গুর উদ্যম কখনও যাহারা অভীষ্টসিদ্ধির জন্য অদম্য অধ্যবসায় সহকারে চিরজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে, তাহাদের অত্যুৎকট প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে ক্রমে ক্রমে সংগ্রাম-লালসা বর্দ্ধন ও তদ্ধেতু কৃতকার্য্যতা লাভ হইলে মানুষ দেখিতে পায় যে, সাফল্য উদ্যম ও স্বাবলম্বনের অনুকরণ করে। তাহাতে অদৃষ্টে আস্থা ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া যায়। তাই হিন্দুগণ সংগ্রামপর হইলে অদৃষ্টবাদ এদেশ হইতে চলিয়া যাইবে; অথবা, অদৃষ্টবাদ চলিয়া গেলে আমরা অধিকতর উদ্যমশীল হইব।

বস্তুতঃ অন্যসমাজের সহিত প্রতিযোগিতায় রত উদ্যমশীল, উন্নতিপ্রয়াসী সমাজের রীতিনীতি যে কিয়ৎ পরিমাণে বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয়

রীতিনীতির ন্যায় এদেশেও তাহার প্রমাণ আছে। যাঁহারা মনে করেন, হিন্দুসমাজের রীতিনীতি বৈদিক যুগেও যাহা ছিল, এখনও তাই; তাঁহাদের নিকট আমাদের বক্তব্য নাই। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান গঠন আধুনিক। যখন আর্য্যগণ অনার্য্যদের অপেক্ষা সংখ্যায় ন্যূন এবং ক্ষুদ্র প্রদেশের অধিবাসী হইয়াও বর্ত্তমান ইয়ুরোপ যেমন অসভ্যজনাধ্যুষিত স্থানে করিতেছে, সেইরূপে সমগ্র ভারতবর্ষ আপনাদের ন্যায্য ভোগ্য বলিয়া মনে করিতেছিলেন, এবং যথাশক্তি অনার্য্যদের সহিত ঘোর সংগ্রামে রত ছিলেন, তখন আর্য্যসমাজের গঠন অন্যরূপ ছিল। জাতিভেদ বলিতে এখন যাহা বুঝায়, তখন সেরূপ কিছুই ছিল না। তখন যৌথপরিবার ছিল না, (স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেনকৃত—Introduction to the Study of Hinduism নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। বিধবাদের বিবাহ তখনও নিষিদ্ধ হয় নাই। একান্নবর্ত্তিত্বের অভাবে বাল্যবিবাহও অসম্ভব ছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের নিবৃত্তিমূলক শিক্ষা তখনও ভারত-ভূমিকে প্লাবিত করে নাই।

অন্য একটী সমাজের দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। চীনদেশে জাতিভেদ নাই; কারণ ভারতবর্ষের ন্যায় রক্তভেদ তথায় নাই। কিন্তু চীনবাসীগণ আমাদেরই ন্যায় প্রাচীনত্বের পক্ষপাতী; আমাদেরই মত আপ্তবাক্যে আস্থাবান্। গুরুজনে ভক্তি সম্বন্ধে তাঁহারা আমাদিগকেও অতিক্রম করিয়াছেন। সামাজিক শাসন চীনে বোধ হয় হিন্দুসমাজ অপেক্ষাও প্রবল। ব্যক্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। সেখানেও পরিবারে একান্নবর্ত্তিত্ব, বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রচলিত। কোর্টশিপ নাই, বঙ্গদেশের ন্যায় ব্যবসাদার ঘটকেরাই বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিবৃত্তিমূলক শিক্ষা চীনের মজ্জাগত হইয়াছে। তাঁহারাও হিন্দুদের ন্যায় সহিষ্ণু ও অল্পে তুষ্ট। অধিকন্তু চীনজাতি আমাদেরই ন্যায় অন্যনিরপেক্ষ, আত্মনিবদ্ধ।

হিন্দুসমাজের সহিত চীনসমাজের বিস্তর সাদৃশ্য ; ফলও উভয়ত্রই এক, উভয়ই উন্নতিবিহীন, প্রাচীনত্বের কঠিন চর্ম্মাবৃত নির্জীব দেহ-মাত্র। চীন ও ভারতবর্ষ দুই দেশই সম্প্রতি বিদেশের সংঘর্ষে আসিয়াছে। দুই দেশেই তদ্দরুণ প্রাচীন রীতিনীতি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন, এই দুই দেশেরই প্রাচীন শান্তিপ্রবণতা পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য সংগ্রামশীলতা অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যে সকল প্রাচীন রীতিনীতি তাহার অন্তরায় হয়, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই সকল পুরাতন বন্ধুকে বিদায় দেওয়া ক্লেশকর হইতে পারে ; তথাপি জীবনের মমতায় ইহাদের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে হইবে।

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লিখন সৃষ্টির ইতিহাস।

বর্ণ, উচ্চারিত শব্দ প্রকাশ করিবার সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র। সমস্ত বর্ণসমষ্টিকে বর্ণমালা কহে। চিত্রাঙ্কন প্রথা হইতে বর্ণলিখন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন হয় ; চিত্র বর্ণ দ্বারা চিত্রিত হইত, পূর্ব্বে লেখাও চিত্রিত হইত বর্ণ অর্থাৎ রং দিয়া, এজন্য লেখার এক একটি স্বতন্ত্র অংশের নাম বর্ণ হইয়াছে। এই প্রথার প্রথম প্রবর্ত্তন সময়ে কেবল মাত্র বিশেষ্যপদই তাহার আকারানুরূপ করিয়া চিত্রিত হইত ; 'ঘোড়া' লিখিতে হইলে সেকালে তাহারা একটি ঘোড়ার ছবি আঁকিত ; এইরূপে পশুপক্ষী, সজীব ও উদ্ভিদ প্রত্যেক অঙ্কন যোগ্য পদার্থই লিখিত হইত ;

লাল ফুল লিখিতে হইলে লোহিত বর্ণ রঞ্জিত একটি ফুল অঙ্কিত হইত; ক্রিয়া লিখিবার সময় চিত্রে যতদূর সম্ভব সদৃশ-কার্য্যের প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইত; বস্তু নিরপেক্ষ গুণ বা বিশেষণ (abstract qualities) লিখিবার সময়ই কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইত। এরূপ লিখন প্রণালীর নিদর্শন পুরাতন মিশর দেশীয় চিত্রলেখায় (hieroglyphics) আজিও বর্ত্তমান আছে। সংস্কৃত ভাষার মধ্যেও ইহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন রহিয়াছে। লেখার দুইটি সংজ্ঞা—(১) লিপ, (২) লিখ; এতদ্বারা বুঝা যায় প্রথমতঃ অক্ষর বর্ণলেপিত হইয়া সূচিত হইত এবং পরে আঁচড়াইয়া খোদিত করা বা দাগ দেওয়া (লিখ্) প্রবর্ত্তিত হয়,—যথা—শিলালিপি বা উড়িয়া পত্রলিপি।

যখন বাক্যসম্পদ অধিক হইয়া উঠিল, তখন উক্ত প্রকারে ভাষা প্রকাশ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িল। তখন হইতে অক্ষর সৃষ্টি আরম্ভ হইল। (অক্ষর অর্থাৎ যাহার ক্ষয় নাই;—বর্ণ কেন যে এ সংজ্ঞা পাইল তাহা ঠিক বলা যায় না। অক্ষরেরও ক্ষয় বা পরিবর্ত্তন আছে তাহা পরে দেখাইব।) অক্ষর সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র; স্বরের উচ্চারণ প্রকাশ করিয়া দেখাইবার সঙ্কেত।

আমাদের দেশের প্রথম উদ্ভাবিত অক্ষর বোধ হয় দেবনাগর। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ উক্ত অক্ষরকে এ দেশের নিজস্ব বলিয়া স্বীকার করেন নাই; তাঁহারা বলেন ইহা সেমিটিক অক্ষরোদ্ভূত,—অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর তাঁহার প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে স্বীকার করিয়াছেন যে, "সংস্কৃত অক্ষর সেমিটিক হইতে গৃহীত বলিয়া অনুমিত হইলেও, ইহা নিশ্চিত যে ইহার উপর গ্রীক প্রভাব লক্ষিত হয় না।" সংস্কৃত বর্ণমালা পৃথিবীর যাবতীয় বর্ণমালা অপেক্ষা অধিকতর শৃঙ্খলায় গঠিত। গীতের সাতটি স্বরের (স, ঋ, গ, ম ইত্যাদি) মত ইহার বর্ণ সকল কণ্ঠ স্বরের ক্রমিক স্তর অনুসারে সজ্জিত হইয়াছে।

খৃষ্ট জন্মেরও ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে দুই প্রকার বর্ণমালা প্রচলিত ছিল। ইহা দেখিয়া হণ্টর সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন, কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। পাশ্চাত্য জগতে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে গদ্যরচনা যখন হইতে প্রচলিত হইয়াছে লিপি প্রথাও অন্ততঃ পক্ষে সেইকাল হইতে উদ্ভাবিত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক ভারতে কবে গদ্যরচনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর বলেন "The most modern hymns in the Rig-Veda-Sanhita must have been composed previous to 800 B.C., previous to the *first* introduction of the *prose* composition."—History of Ancient Sanskrit Literature. তাহা হইলে এই নিদর্শনানুসারে ভারতে লিখন প্রথা খৃঃ পূঃ ৮০০ বৎসরের সমকালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

এক্ষণে প্রাচীন গ্রন্থ মধ্যে কি প্রমাণ পাওয়া যায় দেখা যাউক। পাশ্চাত্য জগতের প্রাচীন গ্রন্থ বাইবেল, এবং প্রাচ্যজগতের বেদ প্রভৃতি। বাইবেলে লেখা (Exodus ৩২।১৫, ১৬), পুস্তক (২৪।৭; ২৫।১৬), পুস্তক ও লেখা (Psalms ৫৬।৮; ৪০।৭; ৪৫।১) কালী, ও পেনের, ছাপা (Job ১৯।২৩) ও লেখন পট্টের (Proverb ৩।৩) উল্লেখ আছে।

বাইবেলের যে কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে Exodus বর্ণিত ঘটনার কাল খৃঃ পূঃ ১৪৯১, জোব ১৫২০, ও প্রভার্ব ১০০০ বলিয়া স্থির হইয়াছে। বাইবেল অবশ্য উক্ত কালের পরে রচিত হইয়াছে, তথাপি ইহা ভারতে গদ্য প্রবর্ত্তনার সমকালিক হইতেছে।

হোমরের কাব্যে (খৃঃ পূঃ ১০০০) এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মিশর এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রযায়ী, তৎপরে ভারত ও অন্যান্য প্রদেশ।

ভারতীয় সাহিত্যানুসন্ধানে জানা যায় যে 'ব্রাহ্মণে' লেখার কোন

উল্লেখ নাই ; কিন্তু 'ব্রাহ্মণ' রচনাকাল ৮০০—৬০০ খৃঃ পূঃ ; আমরা দেখিয়াছি গদ্য রচনা ৮০০ শতের পরই চলিয়াছিল, অতএব 'ব্রাহ্মণে' উল্লেখ না থাকিলেও উহাতে লিখন-প্রথার অনস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে না। সূত্র-সাহিত্য-কালে (৬০০—২০০ খৃঃ পূঃ) উহার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তখনও তাহা শ্রুতি নামে পরিচিত, লিখিত নহে।

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বৈদিক কালে ইহা অপরিজ্ঞাত ছিল। তিনি বলেন যে "আর্য্য-ঋষিগণ প্রত্যেক পদার্থ, বিদ্যা, শিল্প, কলা প্রভৃতির এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিয়া লইতেছিলেন ; বাণী বা সরস্বতী যেমন বিদ্যার দেবতা, তেমন লেখার কোন দেবতা নাই।" তিনি আরও বলেন যে, "সূত্র সকল পটল নামক অধ্যায়ে বিভক্ত, কিন্তু ব্রাহ্মণে এরূপ কোন বিভাগ নাই ; ইহাতে বুঝিতে হইবে ব্রাহ্মণের পরে এবং সূত্রের সময় লেখা প্রচলিত হইয়াছিল।" এই আধুনিকত্ব প্রমাণ করিতে গিয়াও তিনি ইহাকে খৃঃ পূঃ ৬০০ বৎসর হইতে প্রচলিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। পূর্ব্বকথিত উক্তির খণ্ডন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উচ্চারিত শব্দ প্রকাশের সাঙ্কেতিক চিহ্ন হইতেছে লেখা ; এবং সেই সঙ্কেত দেখিয়া আমার মনে বাক্য ভিন্ন আর কিছুরই উদয় হয় না ; এজন্য শব্দ, বাক্য ও বর্ণ বা অক্ষর একই পদার্থ বা অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ। ইহাদের জন্য স্বতন্ত্র দেবতা কল্পনার আবশ্যক হয় নাই। সূত্রে পটল বিভাগ আছে ব্রাহ্মণে নাই, কিন্তু এই বলিয়া কেমন করিয়া জানিব ব্রাহ্মণ লিখিত নহে? উক্ত অধ্যাপকের Selected Essays, নামক গ্রন্থ কতকগুলি প্রবন্ধ সমষ্টি, কোন পরিচ্ছেদ বা বিভাগ নাই, এতদ্দ্বারা কি প্রমাণিত হইবে উক্ত গ্রন্থ লিখিত নহে? ব্রাহ্মণে 'গ্রন্থ' শব্দের উল্লেখ আছে, এবং জ্ঞান, স্মৃতি, শ্রুতি বুঝাইবার জন্য 'বেদ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আচার্য্য গোল্ডষ্টুকরও তাঁহার এমতের খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি

দেখাইয়াছেন যে সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন সময়ের স্তোত্র (hymns) মধ্যে আমরা লেখার উল্লেখ পাই না, অথচ তৎপূর্ব্বরচিত গ্রন্থে আমরা উল্লেখ দেখি। ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণকালেও হয় ত লেখা থাকিতে পারে, গ্রন্থকর্ত্তা তাহার উল্লেখ করিবার অবসর পান নাই। ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ও তাঁহার উপাসক সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন—" * * উহার (বেদের) একটী নাম শ্রুতি। কিন্তু এই জনশ্রুতি সংহিতাবিষয়ে যেরূপ সঙ্গত, গদ্যে রচিত ব্রাহ্মণভাগের পক্ষে সেরূপ কিনা সন্দেহস্থল। সংহিতানিবিষ্ট শ্রুতি সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে যেরূপভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে, সে সময়ে সংহিতা সঙ্কলিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিলেই ও ব্রাহ্মণভাগ লিপিবদ্ধ হইলেই, সেরূপভাবে উদ্ধৃত করা সমধিক সঙ্গত হয়। ব্রাহ্মণবিরচক গ্রন্থকর্ত্তারা সংহিতানিবিষ্ট অনেক অনেক শ্লোকের কেবল প্রথমের দুই চারিটি পদমাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। সে সকল শ্লোক কোন প্রকারে প্রণালীবদ্ধ ও বিশেষরূপে প্রচারিত না থাকিলে এ প্রকারভাবে উদ্ধৃত করা সম্ভব বোধ হয় না। * * * ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সপ্তম পঞ্চিকার তৃতীয়াধ্যায়ে শুনঃশেপের উপাখ্যান আছে ; শুনঃশেপ 'অগ্নের্ব্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাং ইত্যেতয়র্চা' শব্দঘটিত ঋক্ পাঠ করিয়া অগ্নির আরাধনা করিলেন ; 'কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং ইত্যেতয়র্চা' শব্দঘটিত ঋক্ পাঠ করিয়া সর্ব্বদেবের আদিদেব প্রজাপতির আরাধনা করিলেন।" ইত্যাদি। ৯৬ পৃষ্ঠা, ব্রাহ্মণ ৮০০—৬০০ খৃঃ, পূর্ব্বে বিরচিত বলিয়া স্থির হইয়াছে।

ম্যাক্সমূলর আরও বলিয়াছেন যে, পাণিনিতেও কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু দেখা যাউক এ গ্রন্থে বাস্তবিকই কোন নিদর্শন আছে কি না। প্রথমতঃ ভাষা লিখিতভাবে বহু প্রচার দ্বারা বদ্ধমূল না হইলে ব্যাকরণের সৃষ্টি হইতে পারে না ; দ্বিতীয়তঃ ব্যাকরণের ন্যায় সাঙ্কেতিক ও পরস্পরে

দূর-সন্নদ্ধ সূত্র সকল কখনও লিখিত না হইয়া মনে মনে গ্রথিত হয় নাই; তৃতীয়তঃ উহাতে অচ ও হলের উল্লেখ দ্বারা সমগ্র বর্ণমালা লিখিত আছে। বর্ণমালাই যদি পাইলাম, তবে লেখার অস্তিত্ব অস্বীকার করিব কেমন করিয়া? চতুর্থতঃ পাণিনিতে 'বর্ণ' ও 'অক্ষর' এই কথা দুটি আছে। (মাননীয় অধ্যাপক মহাশয় ইহা দেখিয়াছেন ও ইহার অর্থ করিয়াছেন—কণ্ঠস্বরের আরোহাবরোহ। এ অর্থ কষ্টকল্পিত কি না সে বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে অজ্ঞ আমি অক্ষম, মীমাংসার ভার প্রজ্ঞাবানের উপর)। পঞ্চমতঃ এই ব্যাকরণে 'গ্রন্থ' শব্দের যথেষ্ট উল্লেখ আছে—'সমুদাঙ্‌ভ্যো যনোহগ্রন্থে ১।৩।৭৫; গ্রন্থাতাধিকে ৮।৬, ৩, ৭৯; অধিকৃত্যকৃতেগ্রন্থে, ৪।৩।৮৭; কৃতেগ্রন্থে ৪।৩।১১৬। উক্ত অধ্যাপক বলেন গ্রন্থ গ্রথ্ ধাতু নিষ্পন্ন, এজন্য ইহার অর্থ সন্দর্ভ হইতে পারে, পুস্তক নাও হইতে পারে, এই মত সমর্থনার্থ দেখাইয়াছেন ঋগ্বেদে ১।৬৭।৪ টীকাকার 'চৃতন্তি' ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'অগ্নিং উদ্দিশ্য স্তুতিগ্রথ্নন্তি কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ।' কিন্তু ষষ্ঠতঃ আমরা দেখিতে পাই পাণিনি 'যবনানী' ও 'লিপিকারের' ৩।২।২১ উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বৃত্তিকার কাত্যায়ন যবনানীকে যবনলিপি বলিয়া অর্থ করিয়াছেন। ম্যাক্সমূলর বলেন এ অর্থ গ্রহণ করিলে পাণিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কালের কিছু অর্ব্বাচীন হইয়া পড়েন। কিন্তু যবন বলিলেই গ্রীক বুঝাইবে কেন? গ্রীক ভিন্ন ফিনিসিয়গণও ত তৎকালে ভারতে বাণিজ্য ব্যপদেশে গতায়াত করিত, এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য জাতিও যবন সংজ্ঞায় অভিহিত হইতে পারিত। সপ্তমতঃ পাণিনি যতিচিহ্নের নাম দিয়াছেন 'বিরামঃ'; ম্যাক্স মূলর অর্থ করিয়াছেন যে ইহা লিখিত বিরামচিহ্ন নহে, স্বরবিরাম; কিন্তু লিখিত বিরামও কি স্বরবিরামের সঙ্কেত ভিন্ন আর কিছু? তিনি বলেন পাণিনীয় ব্যাকরণে 'র' বা 'রেফ' নাই (Ancient Sanskrit Literature); কিন্তু আমরা ব্যাকরণ খুলিয়াই শিবসূত্রের মধ্যে দেখিতে পাই 'হ, য, ব, রট্,'

'শ, ষ, সর্,' ইত্যাদি; এবং কাত্যায়ন রেফের অর্থ করিয়াছেন (৩।৩, ১০৮, ৪) এবং রেফকে রয়ের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়াছেন (৪।৪, ১২৮, ২) রেফ, রিফ্ ধাতু = হিস্ শব্দ করা। ইনি আরও বলেন যে বোপদেবের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে অনুস্বার ও বিসর্গ 'বিন্দু ও দ্বিবিন্দু' নামে অভিহিত হওয়ায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে সে সময় লিপিপ্রথা কিরূপ ছিল। এরূপ কোন লক্ষণ পাণিনিতে নাই। এক্ষণে কথা হইতেছে যে পাণিনীয় সূত্রগুলিকে সঙ্কুচিত করিয়া বোপদেব অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, (ডাক্তার রামদাস সেন ঐতিহাসিক রহস্য ৩য় ভাগ); এজন্য তিনি অনুস্বার বিসর্গ স্থানে ঐরূপ হ্রস্ব সঙ্কেত ব্যবহার করিয়াছেন সন্দেহ নাই। পাণিনি তাহা করেন নাই বলিয়া তাঁহার কি অপরাধ তাহা বোধগম্য হইল না।

প্রাতিশাখ্যে অধ্যেতি, অধীতে প্রভৃতি পদ থাকায় লিখিত পাঠের অর্থ বুঝাইতেছে; কিন্তু ম্যাক্সমূলর ইহাকে আয়ত্ত করা অর্থে (অধি + ই = অতিক্রম করিয়া যাওয়া) গ্রহণ করিতে চাহেন। কিন্তু সর্ব্বত্র নৈরুক্ত-মত (Etymological meaning), গ্রহণে গার্গ্য আপত্তি করিয়াছেন, তাহা ক্রমশঃ দেখাইব।

মনু বলেন (১০।১) ব্রাহ্মণেতর বর্ণ বেদ পাঠ করিতে পারে বটে কিন্তু ব্রাহ্মণই কেবল তাহার শিক্ষা দিতে পারে (প্রব্রুয়াৎ)। অধ্যাপক মুলর এই পাঠকে দুইভাগে বিভক্ত করিতে চাহেন—(১) গ্রহণাধ্যায়ন ও (২) ধারণাধ্যায়ন। প্রথম গ্রন্থ পাঠ, দ্বিতীয় আলোচনা বা স্বাধ্যায়। মনু যে পাঠের কথা কহিয়াছেন তাহা কি শেষোক্ত পাঠ? সে যাহা হউক না কেন, মনুতে "লেখিত" শব্দ পাওয়া যাইতেছে ৮।১৬৮; তৎপরে মহাভারতে পাওয়া যায়—

"বেদবিক্রয়ণশ্চৈব বেদানাং চৈব লেখকা।
বেদানাং দূষকাশ্চৈব তে বৈ নিরয় গামিনঃ॥"

ইহা দ্বারা মূলর দেখাইতে চাহেন যে মহাভারতের সময় বেদ লিখিত অবস্থায় ছিল না। কিন্তু লিখিত অবস্থায় না থাকিলে বেদ বিক্রয় করে কি করিয়া ? অর্থ লইয়া বেদ শিক্ষা দেওয়াকেই কি বিক্রয় বলা হইয়াছে ? যে কার্য্য নিষেধ করিয়া শাসন করিতে হয়, সে কার্য্য অবশ্য ঘটিয়া থাকে ; নিরয়গামী হইবার ভয় প্রাচীনধর্ম্মশাস্ত্রে পদে পদে দেখান হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া কি সে সমস্ত পাপই অননুষ্ঠিত রহিয়াছে ? খুন করিলে ফাঁশি হইবে, এ ভয়ে খুন কি হয় না ? আমার বোধ হয় বেদ লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই মহাভারতের উক্ত শাসন বাক্য।

হিতোপদেশে আছে—'পঞ্চতন্ত্রাত্তথান্যস্মাৎ গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে'। হিতোপদেশ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে (৫৫০) পারস্যাধিপ খসরু নসিরবানের হকিম বারজোই অনুবাদ করিয়াছিলেন। অতএব এ সময় লিপিপ্রথা বহু প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল সন্দেহ নাই।

সেকেন্দর শাহের (৩২৭ খৃঃ পূঃ) বহু পূর্ব্বে ভারতে বর্ণমালা প্রচলিত ছিল। মেগাস্থিনিস কিন্তু বলেন ভারতে উহা অজ্ঞাত ছিল (Prof. Lassen's Indian Antiquities), তাহাদের সমস্ত শাস্ত্রই অলিখিত। ষ্ট্রাবো বলেন যে নিয়রকস (সেকেন্দরের সেনাপতি) দেখিয়া আসিয়াছেন যে ভারতীয়েরা তুলার পাত (আলতার পাতের মত) করিয়া তাহাতে লেখে। এই দুই উক্তি পরস্পর বিরোধী নহে। লিখন প্রথা পরিজ্ঞাত হইলেও, তাহা তৎকালে গ্রন্থাদি সঙ্কলনে বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইত না। আদিম পুস্তক মাত্রেই (বেদ, মহাভারত, রামায়ণ, হোমর প্রভৃতির গ্রন্থ ইত্যাদি) পদ্যে গ্রথিত ; এজন্য তাহা মৌখিক আবৃত্তি দ্বারা শীঘ্রই আয়ত্ত হইত ; ভারতের আইন, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় পুস্তকই পদ্যময় ; ইহাতে তাহাদিগের লিপিবদ্ধের তত আবশ্যকতা ছিল না ; যখন গদ্য রচনা প্রবর্ত্তিত হইল তখন লিখিয়া রাখার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি হইয়াছিল।

Curtius বলেন যে ভারতবাসীগণ কোমল তরুত্বকে লিপি শিক্ষা করিত। ইহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে সংস্কৃত কাব্য আজিও সাক্ষ্য দিতেছে। (শকুন্তলা ও বিক্রমোর্ব্বশী নাটক)।

সেকেন্দরের বহু পূর্ব্ব হইতে উক্ত বিদ্যা ভারতে বর্ত্তমান ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম পুস্তক ললিতবিস্তরে (৭৬ অব্দে চীন ভাষায় অনূদিত হয়) উল্লেখ আছে যে শাক্যসিংহ বিশ্বামিত্র নামক অধ্যাপকের নিকট লিপি শিক্ষা করিয়াছিলেন; তিনি 'উরগসারচন্দনময়ম্' লিপিফলকে ৬৪ রকম লিপি শিক্ষা করিতেছেন, প্রধানতমগুলি এই—অঙ্গ (আধুনিক ভাগলপুর,—কাইথি নাগরী) বঙ্গ, মগধ, দ্রাবিড়, দক্ষিণ, ব্রাহ্মী (Burmese না কি?) খাস্য (খাসিয়া পার্ব্বতীয়), চীন, হূন, দেব (দেবনাগরী), সৌরষ্ট্রী, উত্তরকুরু ইত্যাদি। এ ঘটনা খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা। উহা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে বুঝিতে হইবে বাঙ্গালা ভাষা বুদ্ধের সমসাময়িক, ও সংস্কৃত তাহারও বহু পুরাতন। এই পুস্তকে পাণিনি উল্লিখিত যবনীলিপির কোন উল্লেখ দেখিলাম না।

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর বলেন, অশোকের বৌদ্ধ শিলালিপি ভিন্ন (খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী) ব্রাহ্মণ্যকালের কোন লিপি বর্ত্তমান নাই। অতএব অনুমান করিতে হইবে এই সময়েই প্রথম লিখন প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল (Ancient Sanskrit Literature) কারণ এই ফলকলিপির অক্ষর বৈদিক গাথা প্রকাশ করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে (Science of Language.)। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে এতৎপূর্ব্বে যে কিছুই ছিল না, তাহা কি করিয়া অনুমান করিব? তিনি শেষোক্ত পুস্তকের এক স্থানে লিখিয়াছেন যে অশোকের শেষ লিপিগুলিতে কথিত ভাষা লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। স্বীকার করি প্রথমে কথিত ভাষাই লিখিত হয়, এবং তাহাই লেখার গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়া সদা সঞ্চরণশীল কথিত ভাষা হইতে

পৃথক হইয়া ভিন্নরূপ হইয়া পড়ে। তখন পূর্ব্ব কথিত ভাষাই লিখিত বা সাধু হইয়া গমনশীল কথিত ভাষা হইতে পৃথক থাকিতে চাহে। যখন এই কথিত ভাষা লিখিত হইয়াছিল তৎকালেই যে অক্ষরও সৃষ্ট হইয়াছিল, পূর্ব্বে হয় নাই, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

আমরা উপরে যতগুলি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে দেবনাগর বর্ণমালাকে যতই আধুনিক ধরিয়া লই না কেন, তাহা যে বর্ত্তমান কালের ২০৫০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত ছিল তৎবিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

কথিত সংস্কৃত যখন লিখিত হইল, তখন কথিত সংস্কৃত রমণী ও নিরক্ষর ব্যক্তিদিগের সংস্কৃতের বিকৃত উচ্চারণ দ্বারা ক্রমশঃ সহজোচ্চার্য্য প্রাকৃতরূপে লিখিত সংস্কৃত হইতে বহুদূরে চলিয়া গেল। এই প্রাকৃত ভাষা হইতে গৌড়ীয় ভাষায় উৎপত্তি। (বিস্তৃত বিবরণ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকে দ্রষ্টব্য)।

বঙ্গভাষা এই গৌড়ীয় ভাষার অন্তর্ব্বর্ত্তী। এবং ইহাও যে বহু পুরাতন তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি (এবং বঙ্গ ভাষা ও ন্যায়রত্নের সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে)। শাক্যসিংহ বঙ্গলিপি শিক্ষা করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য জগতে সংস্কৃতকে সেমিটিক বংশ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে উক্ত বংশের অন্যান্য দায়াদের মত (হিব্রু, আরবী, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি) সংস্কৃতেও স্বরাপেক্ষা ব্যঞ্জনের প্রাধান্য অধিক ; ব্যঞ্জনা পূর্ণ মাত্রায় লিখিত হয়, কিন্তু স্বর কখনও নিরবয়ব এবং কখন বা সামান্য চিহ্ন দ্বারা সূচিত হয়। (Rev. R. Morris M.A., LL.D.) যথা—ব্যঞ্জন শব্দেই ৫টি হলেরই চিহ্ন আছে কিন্তু অকারের কোন আকার নাই ; চিহ্ন শব্দে চ ও হ স্পষ্ট লিখিত কিন্তু ই সঙ্কেতমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বাঙলা এ গুণটি সংস্কৃতের

নিকট হইতে পূরা মাত্রায় পাইয়াছে এবং স্থানে স্থানে ব্যঞ্জনকেও সঙ্কুচিত করিতে সমর্থ হইয়াছে যথা হ্ন, ক্র, ত্র, ণ্ট, ণ্ড ইত্যাদি।

বাঙ্গলার অক্ষর সংস্কৃত হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে এবং পুরাতন ও আধুনিক অক্ষরেও পার্থক্য বিস্তর। কিছুদিন পূর্ব্বের হস্তাক্ষরের সহিত বর্ত্তমান যুগের হস্তাক্ষর মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে। আমি ১৫০ শত বৎসর পুরাতন এক বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে কতকগুলি অক্ষরের ক্রম বিবর্ত্তন উদ্ধৃত করিলাম। কু লিখন সংক্ষেপের জন্য প্রাচীনকালে 'ঙ্গ' এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল। ন=ল (যে প্রদেশে ন স্থানে ল এবং ল স্থানে ন বলে, উচ্চারণ ঠিক করিতে পারে না সেই প্রদেশেই বোধ হয় এই 'নলয়োরভেদঃ' সূচিত হইয়াছিল); ত্ত=তু এই রূপ কেবলমাত্র যুক্তাক্ষরে আজিও বর্ত্তমান আছে, যথা কিন্তু বস্তু ইত্যাদি, কিন্তু পূর্ব্বে ত্তমার=তোমার লিখিত হইত। ভ্র=ভ্র; ক্র=ক্র; ত্র=ত্র; রফলা এখানে সকলের দেহ সঙ্কোচ করিয়া দিয়াছে। ণ্ট, স্ত, ণ্ড, ন্ড; কত=ক্ত=ক্ত; দ্ব=দু=দু পরিবর্ত্তন সহজ বোধ্য। এতৎ ভিন্ন তৎকালে র=ব এবং ৰ=র এইরূপে লিখিত হইত দেখা যায়। দেশের অবস্থা ও লিখনোপকরণ (কাষ্ঠ, প্রস্তর, পত্র ইত্যাদি) এবং অন্যান্য কারণ ভেদে লেখার নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে (Beame's Comparative Grammar, Bopp's Comparative Grammar এবং Morris' Historical Outlines of English Accidence দ্রষ্টব্য।) এক্ষণে ছাপা হওয়াতে অক্ষরের একটা নির্দ্দিষ্ট আকার স্থির হইয়া গিয়াছে এবং সকলে সেই আদর্শের অনুবর্ত্তী হইবার চেষ্টা করিয়া অক্ষরগুলিকে অব্যাকৃত রাখিতেছে।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দুর ভাবী দশা।

(৪) সংখ্যা শক্তি।

এই বারে হিন্দুর চতুর্থ শক্তির কথা বলিতে আকাঙ্ক্ষা করি, এই শক্তির নাম সংখ্যা শক্তি। হিন্দুর কোনও প্রাচীন গ্রন্থে হিন্দুর মোট সংখ্যা কখনই লিখিত হয় নাই; সেকালে সেন্সস্ বলিয়া কোনও গণনা ছিল কি না সন্দেহ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক স্থলে লিখিত আছে, জগদ্বিখ্যাত কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধে কুরুক্ষেত্রের সমর স্থলে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা একত্রিত হইয়াছিল। অক্ষৌহিণী বলিলে কি বুঝায় তাহা দেখাইতে গেলে এক পাতা অঙ্ক কসিতে হয়; স্থূল কথা এই, এই মহাপ্রসিদ্ধ সমরক্ষেত্রে ভারতবর্ষের তৎকালীয় সমুদয় প্রধান প্রধান হিন্দুরাজা, হিন্দুবীর, হিন্দু সমরকুশল রথী এবং অগণ্য সৈনিক পুরুষ একত্রিত হইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করি, এখন তাঁহারা কোথায়? তাঁহারা মৃত, একথা সত্য, কিন্তু তাঁহাদের বংশধরেরা কি তাঁহাদের সংখ্যা পূরণ করিয়াছে? নাদির সাহ, দিল্লীতে একাদশ লক্ষ হিন্দু দেখিয়াছিলেন, এখন দিল্লীতে এক লক্ষ হিন্দু আছে কি না সন্দেহ। নাদির সাহ, থানেশ্বরে (কুরুক্ষেত্রে) দেড় লক্ষ হিন্দু নিহত করেন, তাহার পরেও কুরুক্ষেত্রে ৬৭ হাজার হিন্দুর বাস ছিল। এখন সেখানে মোটে ৬ হাজার ৭ শত হিন্দুর বসতি। নাসিকে (পঞ্চবটীতে) শিবাজীর শাসনকালে একলক্ষাধিক যজুর্ব্বেদা ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, এখন সেখানে মোটে ১৪ হাজার ব্রাহ্মণের আবাস। আলাউদ্দীনের আক্রমণকালে চিতোর নগরে চারিলক্ষ ৫৬ সহস্র হিন্দুর বাস ছিল, এখন সেখানে তিন হাজার হিন্দুর বাস! আওরঙ্গজেব যখন "জিজিয়া" কর স্থাপন করেন, তখন প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক হিন্দুর সংখ্যা

করিয়া ট্যাক্স ধার্য্য করা হইত ; দেখা গিয়াছিল ৩১ জন মুসলমান আর একটি পরিবারভুক্ত হিন্দু সংখ্যায় সমান ছিল। অর্থাৎ শতকরা ৩ জন মুসলমান, বাকি হিন্দু। এখনকার সেন্সসে ভারতবর্ষে মুসলমান হিন্দুর সংখ্যায় প্রায় সমান সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুসলমানশাসন-কালে কতকগুলি নগরে হিন্দুর সংখ্যা কিরূপ ছিল আর ইংরাজ-শাসনে সেই সংখ্যার কিরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেখাইতেছি। ১৮৯১ অব্দের সেন্সস রিপোর্ট অনুসারে ইহা দেখাইলাম।

নগরের নাম	মুসলমানশাসনে হিন্দুর সংখ্যা	ইংরাজশাসনে হিন্দুর সংখ্যা
বৰ্দ্ধমান	দুই লক্ষ ৬৪ সহস্র	২৮ সহস্র
সাহেবগঞ্জ	৭৫ সহস্র	৯ ঐ
মুঙ্গের	৫২ ঐ	৪১ ঐ
পাটনা	৯ লক্ষ	৮৬ ঐ
আরা (সাহাবাদ)	৬৪ সহস্র	৩৯ ঐ
কানপুর	৭২ ঐ	২৫ ঐ
আগ্রা	৫ লক্ষ	৮৮ ঐ
ফতেপুর	২ ঐ	১ লক্ষ ১০ ঐ
এটাওয়া	৬০ সহস্র	২৬ ঐ
মথুরা	১ লক্ষ	৪৯ ঐ
আলিগড়	৪২ সহস্র	৩৭ ঐ
দিল্লী	একাদশ লক্ষ	৬ লক্ষ ১২ হাজার
কুরুক্ষেত্র	৩ লক্ষ	৮১২৬
কর্ণাল	২০ সহস্র	১৪ সহস্র

অযোধ্যা, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশেই মুসলমানের সংখ্যা অধিক, প্রাচীন ও বর্ত্তমান হিন্দুর সংখ্যা তুলনা করিয়া দেখিলে

হয় না? সর্ব্ব প্রথমে বর্ত্তমান (১৯০১) অব্দের সেন্সস রিপোর্ট অনুসারে ভারতের মোটামুটি লোকসংখ্যাটা জানা ভাল।

ভারতের লোকসংখ্যা।

(১৯০১ অব্দের রিপোর্ট)

বঙ্গদেশ—৭ কোটি ৭৪ লক্ষ ৪৪ সহস্র।

বোম্বাই প্রদেশ—৪ কোটি ৮৫ লক্ষ।

মাদ্রাজ প্রদেশ—৩ কোটি ৪২ লক্ষ।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ এবং অযোধ্যা—৪ কোটি ৮০ লক্ষ।

পঞ্জাব—২ কোটি ২৪ লক্ষ।

আসাম—৬১½ লক্ষ।

আজমীর-মারোয়ার—৪ লক্ষ ৭৬ সহস্র।

বরোদা—১৯ লক্ষ ৭ সহস্র।

পঞ্জাব দেশীয় মিত্ররাজ্য—৪৪ লক্ষ ২৪ সহস্র।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য—৩৭½ লক্ষ।

এইবারে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশঃ কিরূপ কমিয়া আসিয়াছে তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন।

প্রদেশের নাম।	মসলমানশাসনে হিন্দুর সংখ্যা	ইংরাজ-শাসনে হিন্দুর সংখ্যা
অযোধ্যা	২ কোটি ৭২ লক্ষ	৯৬ সহস্র
উত্তরপশ্চিমাঞ্চল	৯ ঐ ৪ ঐ	২ কোটি ৩২ লক্ষ
পঞ্জাব	২॥০ ঐ	১ ঐ ৬ ঐ
মধ্যভারত (মালব)	১॥০ ঐ	৯৯ ঐ
রাজপুতানা (সমগ্র)	২ ঐ	১ ঐ ১২ সহস্র
বোম্বাই প্রদেশ	৬ ঐ	২॥০ ঐ

ইহাতে বেশ বুঝা যায়, হিন্দুশাসনকালে হিন্দুর সংখ্যা যেরূপ ছিল,

মুসলমানশাসন সময়ে তাহা ছিল না, ইংরাজ আমলে আরও কমিয়া গিয়াছে। চিতোরের যুদ্ধে মুসলমানের হস্তে এত উপবীতধারী হিন্দু নিহত হইয়াছিল যে, তাহাদের উপবীত ওজন করিয়া ৭৪॥০ মণ হয়; এখনও সে দেশে গোপনীয় পত্রে ৭৪॥০ দাগ দেওয়া হয়, যে কেহ ঐ গোপনীয় পত্র খুলে সে অতগুলি হিন্দুহত্যার পাতকী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। বল দেখি, এত হিন্দু গেল কোথায়? প্রত্নতত্বশাস্ত্র আলোচনা করিলে জানিতে পারিবে, মুসলমানধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে, সমগ্র আফগানিস্থান, বেলুচিস্তান, সোয়াট এবং কাফ্রিস্থান প্রভৃতি হিন্দুর দেশ ছিল। রঘু রাজার দিগ্বিজয়ে ও প্রাচীন ভূগোলে তাহার প্রমাণ আছে। এখন সেখানে কেবল মুসলমান আর মুসলমান! ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার বর্ব্বর জাতি ভারতের প্রান্তদেশে বাস করিত, ইহাদের মধ্যে আফ্রিদি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ও সুশ্রী জাতি ছিল, ইহারা সকলে প্রাচীন হিন্দু-বংশাবতংস বলিয়া পরিচয় দিত, ইহাদের আচার ব্যবহারও হিন্দুর মত ছিল; প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল কাবুলের আমীর আবদর্ রহমন ইহাদের সকলকে মুসলমান করিয়া লইয়াছেন! বোম্বাই প্রদেশের "বোরা" নামক প্রসিদ্ধ মুসলমান জাতির সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ, দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইহারা সকলে আগরওয়ালা বেণে ছিল। মালাবার উপকূলের কালিকট প্রভৃতি নগরে যত মুসলমান বাস করে, জামোরীণের শাসন সময়ে ইহারা হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সবক্তাগীন, আলপ্তাগীন ও মীর কাশিমের আগমনের পূর্ব্বে ভারতে একটিও মুসলমান ছিল না, এখন ভারতে ১৫ কোটি মুসলমান, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ কি হিন্দু ছিল না? হিন্দুর সংখ্যা কমিয়াছে না বাড়িয়াছে? গ্রেগরী নামক পোপের পূর্ব্বে সমগ্র ইউরোপ কোনও বিশিষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত ছিল না, এখন সমগ্র ইউরোপ খৃষ্টান; কলম্বস এবং কাপ্তেন

আমেরিগো কর্ত্তৃক আমেরিকার আবিষ্কারের পূর্ব্বে তদ্দেশবাসীগণ অসভ্যজনোচিত ধর্ম্মাবলম্বী ছিল; এখন সমগ্র আমেরিকা খৃষ্টান; অষ্ট্রেলিয়ার সমুদয় অংশই খৃষ্টান রাজ্য ও খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীর বাস; তাহার পরে মুসলমানের সংখ্যা দেখ। সমস্ত তুরস্ক, পারস্য, আরব্য, তাতার, মিশর, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, সোয়াট, কুর্দ্দিস্থান, আফ্রিকার নানা প্রদেশ, ইউরোপের মূর জাতি, স্পেনের অংশ বিশেষ, জাঞ্জিবার, মলয় দ্বীপ, আফ্রিদিস্থান, ভারতের প্রান্তপ্রদেশ—এই সমুদয় স্থলই মুসলমানে আচ্ছন্ন। এতদ্ভিন্ন জগতের সকল দেশেই খৃষ্টান এবং মুসলমান আছে। বৌদ্ধেরা হিন্দু হইতে স্বতন্ত্র হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, এখন হিন্দু অপেক্ষা বৌদ্ধের সংখ্যা অধিকতর। ভারত ছাড়িয়া হিন্দুর সংখ্যা কোথায়? পৃথিবীর কোনও অ-হিন্দু দেশ হিন্দু হইয়া গিয়াছে কি? হইবার ভরসাও আছে কি? হওয়া সম্ভবপর কি? সমুদয় পৃথিবী নূতন ও পুরাতন এই দুই অংশে বিভক্ত, তন্মধ্যে পুরাতন পৃথিবীর অন্তর্গত আসিয়া নামক খণ্ডের এক অংশের নাম ভারতবর্ষ, এই ভারতবর্ষের খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী, মুসলমান, জড়োপাসক প্রভৃতির মধ্যে হিন্দু একটা জাতি। পৃথিবীর তুলনায় ভারত একটা সামান্য দেশ এবং হিন্দুর সংখ্যা আরও সামান্য। প্রতি বৎসরই সহস্র সহস্র হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান হইয়া যাইতেছে। পাদ্রী ওয়েল্ডন্ বলিয়াছেন, গত ২৫ বৎসরে ভারতবর্ষে নানা কারণে ৫৬ লক্ষ হিন্দু খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম কখনও "কল্‌মা পড়া" বা "বাপ্‌তাইজ্ করার ধর্ম্ম" মধ্যে গণ্য ছিল না, এখনও নাই, সুতরাং ইহা Proselytizing Religion নহে; অন্য সম্প্রদায় হইতে কাহাকেও হিন্দু করিয়া লওয়া অসম্ভব। হিন্দুর সংখ্যা বাড়িতেছে না কমিতেছে? কমিবার লক্ষ উপায় আছে, বাড়িবার একটা উপায়ও দেখিতেছি না। হিন্দুর মতে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই, বিধবা বিবাহ

থাকিলে বৃদ্ধির একটু ভরসা থাকিত ; লক্ষ লক্ষ বিধবার পুত্রোৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট হইতেছে। এদিকে আবার দেখ, কেহ যদি বিলাত গেলেন, কেহ যদি অ-হিন্দুর অন্ন স্পর্শ করিলেন, কেহ যদি হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধ আহার ব্যবহার করিলেন, কেহ যদি দেশাচার বা লোকাচারের বিরোধী হইলেন, তাহা হইলে তিনি হিন্দুসমাজভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। সুতরাং হিন্দুর সংখ্যা বাড়িতেছে না বরং কমিতেছে। অযোধ্যা, পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র হিন্দু মুসলমান হইয়া যায়। সেখানে যে সকল হিন্দু স্ত্রীলোক বেশ্যাবৃত্তি করে তাহাদের শতকরা ৯৫ জন মুসলমান হইতে বাধ্য হয়, কারণ মুসলমান না হইলে তাহাদের সুবিধা নাই। সে দেশে মুসলমানেরা একটা দরিদ্র হিন্দ বালক বা বালিকাকে ভিক্ষা করিতে দেখিলে তাহাকে রুটি খাওয়াইয়া দেয় এবং রুটি খাওয়াইয়া দিয়া বলে "তোমরা যবনান্ন গ্রহণ করিয়াছ", সুতরাং তাহারা মুসলমান হইয়া যায়। রাজপুতানার টঙ্ক, বাঙ্গালার মুর্শীদাবাদ, হয়দ্রাবাদের নিজামরাজ্য প্রভৃতি স্থানে হিন্দুর মুসলমান ধর্ম্ম-গ্রহণে সাহায্য দিবার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে; ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের খৃষ্টান-মিশন-ফণ্ড্ হইতে হিন্দুর খৃষ্টান হওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে ; অন্যধর্ম্ম হইতে হিন্দু হইবার কোনও সাহায্য, উৎসাহ বা উপায় আছে কি?* এখন জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুর সংখ্যা কমে না বাড়ে? দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতির ত কথাই নাই ; খৃষ্টান হওয়া, মুসলমান হওয়া, অ-হিন্দু হওয়া প্রভৃতির ত কথাই নাই ; এখন জিজ্ঞাসা করি, এইরূপে ক্রমশঃ

* পঞ্জাবের 'আর্য্যসমাজ' মুসলমান ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে পুনর্হিন্দুকরণ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। অল্পদিন হইল উক্তসমাজ কলিকাতায় কোন বাঙ্গালী খ্রীষ্টানকে হিন্দুত্বে পুনর্ব্বার দীক্ষিত করিয়াছেন। ভাঃ সং।

কমিতে থাকিলে, সংখ্যার আধিক্য কতদিন থাকিতে পারে? হিন্দুর ভবিষ্যৎটা কেমন উজ্জ্বল বুঝিতেছ কি? যাঁহারা বলেন, আবার হিন্দুরাজত্ব স্থাপিত হইবে, আবার সমস্ত ভারত—সমস্ত জগৎ—হিন্দুময় হইয়া উঠিবে, তাঁহারা তাঁহাদের কথার কোনও প্রমাণ দিতে পারেন না। যাঁহারা বলেন হিন্দুরা লাখে লাখে বাড়িতেছে তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রান্ত। হিন্দুর এখন আর যোগ বা গুণ নাই এখন কেবল বিয়োগ! আডিশন হইবার যে ভরসা টুকু ছিল, তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে ভরসা টুকুর সম্বাদ রাখ কি? দিন কতক ধূয়া উঠিয়াছিল, বৌদ্ধেরা ক্রমে ক্রমে হিন্দু হইয়া যাইবে; থিয়োসফিষ্ট সোসাইটির কর্ণেল অল্‌কট্ হিন্দুর মনস্তুষ্টির জন্য এই কথার প্রথম প্রসঙ্গ করেন, কিন্তু বেল পাকিলে তাহাতে কাকের যে কোনও উপকার হয় না কাক তাহা বুঝিয়াছে। পৃথিবীর সমুদয় বৌদ্ধ সাম্রাজ্য এই বৃদ্ধ লেখক তন্ন তন্ন করিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া আসিয়াছে; চীন, তিব্বত, জাপান, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, সিংহল দেখিয়া আসিয়াছি। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, বর্ত্তমান বৌদ্ধের সহিত হিন্দুর কখনই সম্মিলন হইবে না, হইতেও পারে না। সমুদয় বৌদ্ধ জাতিই প্রায় নাস্তিক এবং ধর্ম্ম, চরিত্র, শাস্ত্র, সমাজ, আচার, শুদ্ধতা, প্রভৃতি বৌদ্ধদিগের মধ্যে কিছুই নাই। পৃথিবীতে বৌদ্ধ জাতির যেমন অধঃপতন হইয়াছে এমন অধঃপতন আর কাহারও হয় নাই। কাণ্ডি, কলম্বো প্রভৃতি স্থানের বাজারে গিয়া দেখ, জবাই করা গরু এবং শূকরের মুণ্ড ঝোলান আছে, বৌদ্ধ তাহা বিক্রয় করে এবং খায়। হিন্দুর সহিত বৌদ্ধের মিলন একেবারেই অসম্ভব। হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধির ভরসা কোথায়? হিন্দুর ভাবী-দশা চিন্তা করিলে মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

(৫) সামাজিক শক্তি।

হিন্দুর পঞ্চম শক্তির নাম সামাজিক শক্তি। সামাজিক বন্ধন,

সামাজিক শৃঙ্খলা এবং সামাজিক একতা হইতেই এই শক্তি উদ্ভূত হয়। মনে কর, ক একটী দেশের নাম, এই দেশের উত্তরে খ, দক্ষিণে গ, পূর্ব্বে ঘ এবং পশ্চিমে ঙ। খ হইতে গ এবং ঘ হইতে ঙ এই সমুদয় দেশটিতে যদি এক ভাষা ও একই ধর্ম্ম প্রচলিত থাকে তাহা হইলে মানবসমাজের সামাজিক একতা ও শৃঙ্খলা বড় সুন্দর হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে পৃথিবীর অনেক স্থলে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়না। দেশ যত বড় হয়, ভাষা ততই ভিন্ন হয় এবং ধর্ম্ম এক থাকিলেও সামাজিক আচার ব্যবহার প্রভৃতি ভিন্ন হইয়া পড়ে, খণ্ড দেশে এইরূপ একতা সম্ভব, বৃহদ্দেশে সম্ভবপর নহে; কিন্তু তাহা হইলেও ভারতে হিন্দু সমাজে যেরূপ বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য এরূপ আর কোথাও নাই। তুরস্কে যদি এক মুসলমানের সহিত এক মুসলমানীর বিবাহ হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের একজন মুসলমান মোল্লার ভাষা ও পরিচ্ছদ ভিন্ন হইলেও তিনি ঐ বিবাহের পৌরোহিত্য করিতে পারেন। একজন জর্ম্মন (খৃষ্টিয়ান) পাদ্রীর ভাষা ভিন্ন হইলেও ইংলণ্ডের খৃষ্টীয় বিবাহের তিনি পুরোহিত হইতে পারেন, কিন্তু এক জন উড়িয়া বা আসামী ব্রাহ্মণ একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বিবাহে পৌরোহিত্য করিতে পারেন না। হিন্দুস্থানীর বিবাহে বোম্বাইবাসী, বোম্বাইবাসীর বিবাহে মাদ্রাজী, মাদ্রাজীর বিবাহে পঞ্জাবী কিম্বা পঞ্জাবীর বিবাহে বাঙ্গালী পুরোহিত হইতে পারে না। "ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ বিনির্গত" ইহা বেদবাক্য, বেদমতে সকল ব্রাহ্মণই এক পদবীতে উপবিষ্ট; শাস্ত্রকারেরা কেবল দেশ ভেদে পঞ্চবিধ গৌড়ীয় ও পঞ্চবিধ দ্রাবিড় এই দশ প্রকার ব্রাহ্মণ শ্রেণীর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের কেহ কাহারও হস্তে তৈয়ারী অন্ন গ্রহণ করেন না; এক বাঙ্গালা দেশে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, আচার্য্য, মহাব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা পরস্পরের গৃহে অন্ন গ্রহণ করিতে আপত্তি করেন। ভারতের অন্যান্য অংশে সার্দ্ধেক শতাধিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ

বাস করেন, ইহাঁদের নামও হয়ত অনেক পাঠক শ্রবণ করেন নাই। ইহাঁরা পরস্পর কাহারও অন্নগ্রহণ বা বিবাহাদি আদান প্রদান করেন না। অন্যান্য জাতির ত কথাই নাই ; এই প্রকার সকল বর্ণেই সহস্র সহস্র শ্রেণী আছে ; সামাজিক বন্ধন কেমন করিয়া দৃঢ় হইতে পারে ? তদ্ভিন্ন শাক্ত বৈষ্ণবের কিম্বা বৈষ্ণব শাক্তের অন্ন গ্রহণে প্রায়ই সন্দিগ্ধ, মাদ্রাজে শৈবেরা বিষ্ণুভক্তদিগের সহিত আহার করেন না। সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী উদাসী প্রভৃতিদিগের মধ্যেও জাতি ভেদ আছে; গৌড়ীয় শ্রেণীর বৈরাগীরা রামায়ৎ শ্রেণীর বৈরাগীদিগের অন্ন গ্রহণে অসন্তুষ্ট ; তান্ত্রিক অঘোরীদিগের অন্ন অন্য সম্প্রদায়ের তান্ত্রিকেরা প্রায়ই গ্রহণ করেন না। হিন্দু মরিয়া গেলেও জাতি ভেদের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় না। ব্রাহ্মণ মরিলে তাহার মৃতদেহ কেবল ব্রাহ্মণেই বহন করিতে অধিকারী। সমাজবন্ধনে একতা হয়, এরূপ একতা হিন্দুসমাজে অসম্ভব। মনে কর, আজি যদি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এইরূপ একটি আইন করেন যে মাংস আহার করিলে ভারতবাসী হিন্দুর প্রাণদণ্ড হইবে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জন কতক বাঙ্গালী, জনকতক উড়িয়া ও আসামী এবং রাজপুত বিদ্রোহী হইতে পারে, কিন্তু মান্দ্রাজ, বোম্বাই, গুজরাট, অযোধ্যা, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, মালাবার উপকূলস্থ হিন্দুর নেতারা কখনই এই বিদ্রোহে যোগ দিবেন না এবং একতায় বদ্ধ হইবে না ; তাঁহারা বলিবেন "ইহা সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধ আইন নহে, ইহা হিন্দুধর্ম্ম নাশের আইন নহে।" যাহার সহিত আহার চলেনা, বিবাহ চলেনা, যাহার জলপাত্রটি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারনা, তাহার সঙ্গে প্রকৃত সখ্য কয়দিন থাকে ? কয়দিন তাহার সহিত একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পার ? যদি বল, আহার বিবাহাদি না চলিলেও এক ধর্ম্মের (হিন্দু ধর্ম্মের) নামে একতা হইতে পারে, কিন্তু তাই বা কৈ ? উত্তরের হিন্দুধর্ম্ম দক্ষিণের হিন্দুধর্ম্ম নহে, পূর্ব্বের হিন্দুধর্ম্ম পশ্চিমের হিন্দুধর্ম্ম

নহে। শ্রাদ্ধ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি হিন্দুর বড় বড় ক্রিয়া ও প্রথা এক দেশ হইতে অন্য দেশে স্বতন্ত্র। তদ্ভিন্ন ধর্ম্মের প্রধান প্রধান অঙ্গ গুলিও সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ধর্ম্মবিশ্বাসও এক নহে। বঙ্গের কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি ভারতের আর কোনও হিন্দু সম্প্রদায়ে নাই; মান্দ্রাজের সুব্রামনি, মালাবারের নগ্‌কোয়েলা, বোম্বাইয়ের বিঠুল, বাঙ্গালার শীতলা, কচ্ছদেশের পুণিয়া, পঞ্জাবপ্রান্তের শোহাজা প্রভৃতি বিগ্রহমূর্ত্তি তদ্দেশেই সীমাবদ্ধ, অন্য দেশের লোকে তাহা জানেনা। সারস্বত ব্রাহ্মণবর্গ ক্ষত্রিয়ের হস্তে তৈয়ারী অন্ন আহার করেন, এবং ক্ষত্রিয় শিষ্যের সহিত একাসনে বসিয়া অবাধে ভোজন করিয়া থাকেন। ভারতের অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণের নিকট ইহা অ-হিন্দু জনোচিত ব্যবহার বলিয়া গণ্য হয়। সমগ্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সী বিশেষতঃ সমগ্র মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সার (মায় মহাশুর, কর্ণাট, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর এবং মালাবার উপকূল) ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও হাতে পানীয় বা ব্যবহার্য্য জল গ্রহণ করেন না, অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের হাতে জল খান। বাঙ্গালায় নাপিতের হাতে জল লওয়া অপবিত্র নহে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে নাপিতের জল অস্পৃশ্য। পঞ্জাবে ও কাশ্মীরে প্রায় সর্ব্বত্রই এমন কি ত্রিসন্ধ্যাযুক্ত বেদাচার্য্য ব্রাহ্মণের গৃহে মুর্গীমাংস নিত্য ভোজন, সে দেশে মুর্গীকে "চূচা" কহে, ভদ্রলোক অভ্যাগত হইলে চূচা মাংস দিয়া তাহার অভ্যর্থনা করা বড় সম্মানের কথা। বিকানীর, যশলমীর প্রভৃতি স্থানে মুসলমান ভিস্তিরা হিন্দু গৃহস্থের ঘরে পানীয় জল পর্য্যন্ত দিয়া থাকে। অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বড় বড় আসরে মুসলমান বাই নৃত্য করে অথচ সেই বিছানায় বসিয়া হিন্দুরা পাণ খায়, তামাক খায় এবং সরবত্ পাণ করে। বাঙ্গালায় বা আসামে অথবা অন্য প্রদেশে হিন্দুপুরুষ মুসলমানীর সহিত অবৈধ প্রণয়াসক্ত হইলে পতিত হয়; অযোধ্যা, পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে

প্রকাশ্যভাবে হিন্দুরা মুসলমানী বেশ্যাকে রাখে। মান্দ্রাজের নাইড়ু, পিলে, মুদালিয়র প্রভৃতি বড় বড় হিন্দুদের মুর্গীমাংস নিত্য ভোজন; মান্দ্রাজে চেটি এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন মুর্গী সকলেই প্রকাশ্যভাবে খায়। তাহারা ঘরে মুর্গী পোষে। বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে অতি শৈশবে কন্যার বিবাহ দেওয়ার প্রথা আছে; ভারতের অনেক স্থানে ব্রাহ্মণ কন্যারও ১৮ বৎসরে বিবাহ হয়। তাহাতেই বলিতেছি, আহারে, বিবাহে, ক্রিয়ায়, পরিচ্ছদে, উৎসবে কোনও বিষয়েই হিন্দুর পরস্পর একতা নাই। মালাবার উপকূলের ব্রাহ্মণেরা শূদ্রানার পাণিগ্রহণ করে এবং তাহাদের অপত্য ব্রাহ্মণ হয়; ত্রিবাঙ্কুরের হিন্দু-পুত্র হিন্দু-পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়না, মাতুলের বিষয় অধিকার করে; কোচিনে ব্রাহ্মণেও মাসীর কন্যা, মামীর কন্যা, খুড়ীর কন্যা, জ্যেঠার কন্যা প্রভৃতিকে বিবাহ করে; কচ্ছদেশে জ্যেষ্ঠ সহোদরের বিধবা ভার্য্যার পাণিগ্রহণের প্রথা আছে। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন রূপ—নানা মূর্ত্তি—দেখিলে কি? ক দেশের হিন্দুধর্ম্ম খ দেশের হিন্দুধর্ম্ম নহে কিন্তু ক দেশের খৃষ্টানধর্ম্ম আর খ দেশের খৃষ্টানধর্ম্ম অবিকল এক। উত্তরের হিন্দুয়ানী দক্ষিণের হিন্দুয়ানী নহে কিন্তু উত্তরের মুসলমানধর্ম্ম আর দক্ষিণের মুসলমানধর্ম্ম এক। তাহার পরে আর একটা কথা আছে, এটা খুব প্রয়োজনীয় কথা। দেশের যাহারা গণ্য, মান্য, বিদ্বান, বিবেচক, ক্ষমতাপন্ন এবং হিতৈষী তাহারা তোমাদের চক্ষের শূল, আর যাহারা ঠক-বিদ্যায় পটু, অলস, কুসংস্কারসম্পন্ন, নিঃস্ব, ক্ষমতাহীন, অকর্ম্মণ্য, স্বার্থপর, ধর্ম্মধ্বজী তাহারাই তোমাদের খুব প্রিয়। বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া যাঁহারা অতি উচ্চ উচ্চ সম্মানিত পদে নিযুক্ত হইতেছেন, নানা বিদ্যায়, নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিতেছেন, যাঁহারা ক্ষমতায় কেশরীতুল্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, বাগ্মীতায় বর্ক, ধনোপার্জ্জনে যাঁহারা পটু, দরিদ্র পালনে যাঁহারা রিক্তহস্ত, যাঁহাদের দ্বারায় নানা প্রকারে দেশের, জাতির

ও সমাজের হিতসাধন হইতেছে, তোমরা তাঁহাদিগকে সমাজ-চ্যুত করিবার জন্য বড়ই উৎসাহী; তবে কাহাকে লইয়া সমাজরক্ষা করিবে? জনকতক টিকিনাড়া, তিলককাটা, নিঃস্ব, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অলস, কপটাচারী, লোভী, "শিষ্যের মাথায় হাত বুলাইয়া খানেওয়ালা," বুড়ো গোঁড়া ব্রাহ্মণের দ্বারা কি সমাজ রক্ষা হয়? হিন্দুর সামাজিক শক্তি কোথায়? যাঁহাদিগকে সমাজের নেতা করিয়া রাখিয়াছ তাহারা পদার্থহীন। প্রাচীন রোমক জাতি সামাজিক শক্তির অভাবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে আর অতি পুরাতন প্রসিদ্ধ ও বিক্রমী য়িহুদীরা প্রায় লুপ্ত হইয়া পড়িল। পৃথিবীতে কোটি কোটি য়িহুদী ছিল, এখন ৪০ লক্ষের অধিক নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হিন্দুর ভবিষ্যতের ভরসা করা যায় কি? তবে কি তোমাদের ধর্ম্মপ্রচারকগণের দ্বারায় সমাজ রক্ষিত হইবে? তাহা অসম্ভব—কারণ তাহাদের শতকরা ৯৮ জন ব্যবসায়ী ধর্ম্মধ্বজী।

(৬) মানসিক শক্তি।

ষষ্ঠ শক্তির নাম মানসিক শক্তি। আধ্যাত্মিকভাবে ইহার অনেক অর্থ হইতে পারে কিন্তু ইংরাজিতে যাহাকে Intellectual Culture বলে এখানে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। মান্ধাতার আমলে কোন্ সময়ে তোমাদের কালিদাস, ভবভূতি, লীলাবতী, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি ছিল, তাহা এখন চিন্তা করিয়া অহঙ্কৃত হইও না; কারণ এক সময়ে সকল দেশেই বসন্ত আসে এবং কোকিলও ডাকে, সে কথাটা কিছু বড় কথা নহে; এখনকার বুদ্ধিগত উৎকর্ষণটা একবার ভাব কি? যাহা হইয়া গিয়াছে সেই টুকুই তোমার গৌরব, এখন আর বিন্দু বিসর্গও নাই, এখন সমগ্র হিন্দু জাতির দিকে চাহিয়া দেখ। কেবল বাঙ্গালা দেশের ইংরাজি শিক্ষিত জনকতক বাবু কিম্বা বোম্বায়ের জনকতক মারাঠা ব্রাহ্মণ অথবা

মাদ্রাজের জনকতক "আইয়ার" বা "আয়েংগার" এর দিকে তাকাইলে চলিবে না, সমগ্র হিন্দু সমাজের অবস্থা ভাবিয়া দেখ। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি পড়িয়া দেখ, লোকশিক্ষা (Mass Education) হিন্দু রাজত্বে কতদূর প্রচলিত ছিল; হিন্দু রাজত্বের হিন্দুর সহিত কিম্বা মুসলমান রাজত্বের হিন্দুসাধারণের সহিত এখনকার হিন্দুসাধারণের তুলনা করিলে, হিন্দুর হৃদয়ক্ষেত্র যেন সাহারা মরুভূমি বলিয়া বোধ হয়। যাহারা এখন শিক্ষিত বলিয়া গৌরব করেন তাঁহারা মৌলিকতা-বিহীন, তাঁহারা মুখ-ভারতী মাত্র, তাঁহারা শারীরিক ও মানসিক উন্নতিতে হীন। তোমরা বলিতে পার "আমরা সম্বাদ পত্র ও মাসিক পত্র চালাইতেছি," কিন্তু তোমাদের সম্বাদ পত্রে তোমরাই রং ফলাইয়া, তুলি ও কলম চালাইয়া, কত কি মনোমত আঁকিতেছ—কত কি লিখিতেছ ; আমরা ত তোমাদের গোলকধাঁধার ছবি বুঝিও না আর তোমাদের সসেমিরের লেখার সারবত্তা দেখিতে পাই না ; সারবত্তার মধ্যে এই টুকু যে, তোমরা মাসের মধ্যে পনের দিন মানহানির মকদ্দমা লইয়া ফৌজদারী আদালতে ঘুরাঘুরি কর আর আপনা আপনি ঘরে ঘরে মারামারি, পিটাপিটি, গালাগালি করিয়া মর। যখন তোমাদের "বেণের মশালা বাধা কাগজের মত" বড় বড় ধাউশ ঘুঁড়িরূপ সমাচার পত্র ছিল না, যখন তোমাদের নব্যভারতের শোভা বর্দ্ধনকারী রেল, তার বা ডাকখানা ছিল না, তখন টাকায় এক মণের অধিক চাউল, বার সের সর্ষপ তৈল আর আড়াই সের ঘি খাইয়াছি, এখন তোমাদের উন্নত ভারতে এক বেলাও পেট্ ভরিয়া খাইতে পাই না ; আর তোমাদের মানসিক শক্তির বন্যা এতই প্রবলা যে বোধ হয় ভারত যেন ডুবু ডুবু হইয়া পড়িল! প্রকৃত মানসিক শক্তি হইলে যে সমস্ত গুণ হয় তাহারও কিছুই লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না। দারিদ্র্যদুঃখ সকল গুণের নাশক, সকল উন্নতির বিঘ্নকারক ;

ইহা কি জান না? যাহার পেটে ভাত নাই, গাত্রাচ্ছাদনের বস্ত্র নাই, শীত গ্রীষ্মে বর্ষায় মাথা রাখিবার স্থান নাই, তাহার আবার মানসিক শক্তি কোথায়? তোমাদের কংগ্রেসকে তোমরা শিক্ষিত ভারতবাসীর "খুব মানসিক চিন্তা, শিক্ষা ও চর্চ্চার ফল" বলিয়া থাক, কিন্তু এই পঞ্চদশবর্ষ কালব্যাপী কংগ্রেস-বক্তৃতায়, নিত্য নিত্য সমাচার পত্রের প্রবন্ধে, বর্ষে বর্ষে বিলাতের আন্দোলনে, অগণ্য আবেদন পত্রে আর তিনশত চৌষট্টি দিনের লেক্‌চর বা স্পিচে যাহার বিন্দু বিসর্গও করিতে পার নাই, তখনকার মানসিক চিন্তাবলে বলীয়ান হিন্দুর বাঁশের লাঠিতে এক দিনেই তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

(৭) ভাষা ও সাহিত্যশক্তি।

সপ্তম শক্তির নাম ভাষা ও সাহিত্যের শক্তি। একা ভারতবর্ষে প্রায় ৩৩৩ প্রকার ভাষা প্রচলিত আছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। পাদ্রী লং সাহেব বলিতেন, ভারতের একটা নদীর এধারে যে ভাষা ঐ নদীর ওধারে সে ভাষা নয়। কথাটা অসত্য নহে। একা বাঙ্গালাভাষারই ১৭ প্রকার মূর্ত্তি দেখান যাইতে পারে। হিন্দী, গুজরাটী প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাহাই। তবে আশ্চর্য্য ও প্রশংসার সহিত একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়, ভারতের সর্ব্বত্রই উর্দ্দু একরকমই ভাষা, উহার মোটেই বিকৃতি হয় নাই। কিন্তু যাহারা উর্দ্দু জানে না অথবা উর্দ্দু যাহাদের মাতৃভাষা নহে তাহাদের কাছে উর্দ্দু কেন, সকল ভাষাই বিকৃত। লাহোরের উর্দ্দু আর আমেদাবাদের উর্দ্দু এক; ঢাকার উর্দ্দু আর করাচি বন্দরের উর্দ্দু একই। পেশোয়ার, আটক প্রভৃতি প্রান্ত প্রদেশস্থ অনেক মুসলমানে পস্তু ভাষায় কথা কয় কিন্তু উর্দ্দু কহিলে তাহাতে পস্তু মিশায় না। ইরাণপ্রবাসী এবং আরব্যপ্রবাসীও সেই একই রূপের উর্দ্দু বলিয়া থাকে। ভারতের

হিন্দুর ভাষার একতা কোথায়? "যোজনান্তরে ভাষান্তর"—সুতরাং ভাষার শক্তিতে এক হওয়া ভারতবাসী হিন্দুর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। ভারতে কখনও এক ভাষা থাকিবে না। সমগ্র ভারতের ভাষা ইংরাজি হওয়া অসম্ভব হইতেও অসম্ভবপর। ভারতের যেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে, তেমনই থাকিবে, কখনও এক ভাষা হইয়া উঠিবেনা এবং উঠিতে পারে না। ভারতবর্ষ আমেরিকা নহে, সুতরাং আমেরিকার কথা স্বতন্ত্র; ভারত কখনও আমেরিকা হইবে না ইহা নিশ্চয়। ভাষা এক না হইলে সাহিত্যও এক হইবে না সুতরাং এক দেশের ভাষা অন্য দেশের লোকের কথোপকথনে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না। ইংরাজি কখনও জনসাধারণের ভাষা হইবে না ইহা স্থির কথা। বাঙ্গালা ভাষার তুলনায় হিন্দি, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী, কানাড়ী, তামিল, মালয়লী প্রভৃতি ভাষার সাহিত্য অতীব দরিদ্র। ভারতবাসীর "ভাষা এবং সাহিত্যশক্তি" মোটেই নাই বলিলেই হয়, এখনও এদেশে রিডিং পাবলিক হয় নাই সুতরাং ভাষাও সাহিত্য শক্তির উপরে ভবিষ্যতের ভরসা কোথায়?

এতক্ষণ যাহা লিখিয়া আসিলাম তাহাতে নির্ভরসারই কথা, কিন্তু তথাপি এই নির্ভরসার মধ্যে ভরসা আছে, এই ঘোর নিরাশার মধ্যে মনোমোহিনী আশা আছে, এই অমানিশার আকাশে জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রের অভাব নাই। ভারতবাসী হিন্দুর এই মহারোগের প্রতীকারের এখনও ভরসা আছে।

কিন্তু বৈদ্যশাস্ত্রমতে, হাকিমি প্রথায় কিম্বা আলোপ্যাথিক অনুসারে এ রোগের ঔষধ নাই। প্রতীকার আছে—হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসায়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার নীতি এই যে, যাহাতে উৎপত্তি তাহাতেই নিবৃত্তি Simili Similibus Curatur. হিন্দুর যাহাতে পতন তাহাতেই উত্থান। কবি বলেন—

যে মাটিতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে।
বারেক নিরাশ হলে কে কোথায় মরে?

যে মাটিতে হিন্দু পড়িয়াছে সেই মাটি ধরিয়াই হিন্দুকে আবার উঠিতে হইবে। জগতের ইতিহাস পড়িয়া দেখ, এই সুবিশালা পৃথিবীর মধ্যে কেবল দুইটি সভ্যজাতি ভিন্ন আর কোনও সভ্যজাতিই পরাধীন নহে—একটির নাম হিন্দু, অপরটির নাম য়িহুদী। কতকগুলি অসভ্য বর্ব্বর জাতি এবং এই দুইটি জাতি ভিন্ন পৃথিবীর সকল জাতিই এক্ষণে স্বাধীন; হিন্দু ভিন্ন সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই এক্ষণে স্বাধীনতা আছে। ইহাদের পতনের কারণ কি জান? মানব ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইলে সকল গুণ, অধিকার, ক্ষমতা ও ভোগ হইতে বঞ্চিত হয়। ব্যক্তি সম্বন্ধে এই নিয়ম, জাতি ও দেশ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। হিন্দু ও য়িহুদী যে দিন হইতে ধর্ম্ম-বিমুখ হইয়াছে সেই দিন হইতে ইহাদের লক্ষ্মী শ্রী চলিয়া গিয়াছেন। একদা ধর্ম্মবলেই হিন্দু ও য়িহুদী এই দুই প্রাচীন জাতি সমগ্র বিশ্বসংসারের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ধর্ম্মবলের হীনতাই ইহাদের অধঃপতনের মূল। ইহারা বহু শতাব্দী কাল ব্যাপিয়া ধর্ম্মের যেরূপ অযথা অপমান করিয়াছে—ধর্ম্মের নামে যেরূপ পাপজনিত অন্যায় অত্যাচার করিয়াছে—তাহারই কুফলস্বরূপ বহুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া ইহারা নানা প্রকারে কষ্ট ভোগ করিতেছে, এখনও পুরাতন পাপের সম্যক প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। ভগবান বলিয়াছেন—

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তিতে॥

অর্থাৎ "আমাকে (ঈশ্বরকে) সতত যে ব্যক্তি প্রকৃত ভক্তির সহিত ভজনা করে, সে ব্যক্তি নিরুপায় হইলেও তাহার আমি এমন সুউপায় করিয়া দিই যাহাতে (পার্থিব অভাব ত সামান্য কথা!) মুক্তি পর্য্যন্ত তাহার নিকটে অনায়াসসুলভ হইয়া উঠে।" শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শেষ

শ্লোক কি মধুর! কি অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক প্রত্যাদেশে পরিপূর্ণ! সঞ্জয় কহিতেছেন—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থোধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্ম্মম॥

অর্থাৎ "হে রাজন্! যেখানে ভগবান আছেন (অর্থাৎ তাঁহার কৃপা আছে), সেখানে বিজয়, লক্ষ্মী শ্রী, বল, বিক্রম, বিভব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে, ইহা নিশ্চয়।" হিন্দুর বেদ হইতে রামায়ণ এবং রামায়ণ হইতে পুরাণাদি পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া দেখ, একমাত্র ধর্ম্মবলের সহায়তায় হিন্দু সকল বিষয়েই জগতের শ্রেষ্ঠতম হইতে সমর্থ হইয়াছিল, এই জন্য হিন্দু শাস্ত্রকার পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন "স্বল্পমপিধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ" অর্থাৎ স্বল্পমাত্র ধর্ম্ম বলেও মহৎ ভয় (বিপদ) হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে দিন হিন্দুর ধর্ম্ম হইতে পতন হইয়াছে, সেই দিন হিন্দুর স্বাধীনতা, শ্রী, জয়, নীতি, বিদ্যা, বিভব, বিক্রম, প্রভৃতি সকলই লোপ পাইয়াছে। It is righteousness that exalteth a nation—সততাই (ধর্ম্মবলই) জাতীয় উন্নতির কারণ। মহামতি খৃষ্ট বলিয়াছেন—First seek the kingdom of heaven then everything shall be added unto you অর্থাৎ প্রথমে আধ্যাত্মিক রাজ্যের পথিক হও তাহা হইলে সকল (পার্থিব সুখ—পার্থিব রাজ্য) তোমার হস্তগত হইবে। বস্তুতঃ, ঋতুরাজ বসন্ত সমাগমে যখন সুন্দর সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে সরোজিনী প্রস্ফুটিতা হয়, তখন মধুপান জন্য ভৃঙ্গবৃন্দকে কেহ কি ডাকিয়া আনে? তাহারা যেমন আপনা হইতেই সরোবরে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মকৃপা হইলে—ধর্ম্ম পথে স্থির থাকিলে—সকল ক্ষমতা, সকল গুণ, সকল অধিকার আপনা হইতেই জন্মে। আইস, আমরা আবার ধর্ম্মবলে বলীয়ান হই। তখনকার ব্রাহ্মণেরা কেবল ধর্ম্মবলেই সমস্ত মহাবীর

ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের পরিচালক স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহাভারতে হবির্যবা নামে এক ঋষি বলিয়াছিলেন “এই মহাপ্রকাণ্ড সমর ক্ষেত্রে মহারথীগণ অসংখ্য শাণিত অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যাহা করিতে সমর্থ হইতেছে না; ধর্ম্মবলীগণ তাহা এক কটাক্ষে (বিনা অস্ত্রে) সমাধা করিয়া দিতে পারেন।” যোগীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উদ্বেলিত-হৃদয় অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন “হে পাণ্ডববীর! তুমি নিমিত্তমাত্র স্বরূপ, আমি (কটাক্ষে) পূর্ব্ব হইতেই (ঐশী শক্তিতে) ঐ সকল অসংখ্য বীরকে নিহত করিয়া রাখিয়াছি।” তাহাতেই বলিতেছি, ধর্ম্মবলই আমাদের ভরসা—সেই ধর্ম্মবলই আবার অধঃপতিত হিন্দুর মহা আশা। গ্রীক, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি জাতি আমাদিগকে তীর, তোপ, তরবারী প্রভৃতি দ্বারা জয় করিয়াছে; আইস, আমরা সকল অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ধর্ম্মবল—ব্রহ্মশক্তি দ্বারা কটাক্ষে মাভৈঃ মাভৈঃ রবে সমগ্র পৃথিবীকে জয় করিয়া আবার সসাগরা পৃথিবীর নেতা হই। ফ্রান্সের মহাপণ্ডিত জাকোলিয়ং বলিয়াছেন, “ভারতের হিন্দুর রাজনৈতিক শক্তি ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে কিন্তু তাহাদের একটা শক্তি এখনও খুব প্রবল; ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি বা মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় তাহাদের ধর্ম্মবল এখন প্রচ্ছন্ন; যদি এই শক্তি আবার জাগিয়া উঠে ভারতের হিন্দুজাতি সমগ্র জগতের আবার একাধীশ্বর হইবে, ইহা নিশ্চয়।” ঈশ্বর করুন, জাকোলিয়তের লেখনীর উপরে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হউক। “আনন্দ-মঠ” নামক রাজনৈতিক নবন্যাসে অমর বঙ্কিম্ জননী ভারতভূমির তিনটি মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন—মা যাহা ছিলেন, মা যাহা হইয়াছেন, মা যাহা হইবেন। হিন্দুর ভাবীদশার মূর্ত্তি এখনও আশাময়ী।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

মুঙ্গের।

বেহার প্রদেশে যে সকল লোচনস্পৃহনীয় সুরম্য নগর আছে, মুঙ্গের তাহাদের অন্যতম। স্থানটী ক্ষুদ্র হইলেও এখানকার বিবিধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, পুরাতন ভগ্নাবশেষ, স্থানবিশেষের কৌতূহল-জনক প্রাচীন নামাবলী এবং আরও অনেক পদার্থ দর্শককে অশব্দ ভাষায় অতীতের অনেক কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই স্থানের শিলাসঙ্কুল উচ্চ ভূভাগোপরি প্রাচীরবেষ্টিত প্রাচীন দুর্গের চিহ্ন দেখিলে প্রবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ, অজ্ঞাতকুলশীল রাজা কর্ণ এবং ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিকের লীলাকমল মীরকাসীম ক্রমান্বয়ে দর্শকের মানসচক্ষে প্রতিভাত হন। এই ভাগে ইংরাজদিগের বিচারালয়, ধর্ম্মমন্দির, বিলাসভবন, সরোবর এবং অত্যুন্নত তোরণ সুসজ্জিত থাকায় কেমন সুন্দর 'উজ্জ্বলে মধুরে মিশিয়াছে!' কষ্টহারিণী ঘাট নাম শুনিলে ত্রেতাযুগের রামচন্দ্রের মূর্ত্তি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। কলকলস্বনা, বহুপরিসরা, উত্তরবাহিনী ভাগীরথী নগরীকে তিনদিকে বেষ্টন করিয়াছে। অদূরে বিপণিভাগের কোলাহল, গঙ্গাজলবাহিনী রমণীগণের মৃদু মধুর সঙ্গীত, রেলওয়ে শকটের হুস্ হুস্ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। দূরে পীরপাহাড়ের শৃঙ্গে বিচিত্র সৌধ, আরও দূরে অন্তর্দাহী ধূমায়মান সীতাকুণ্ড! এখানে প্রাচীন কাহিনীপূর্ণ সুড়ঙ্গ, ওখানে তাল ও আবলুস কাষ্ঠের রমণীয় দ্রব্যসম্ভার, সেখানে চণ্ডীস্থান, ওদিকে চুণার প্রস্তরের স্মৃতিচিহ্নসম্বলিত গোরস্থান! নবীন পরিব্রাজকের নয়ন মন আকর্ষণ করিবার উপযোগী চুম্বকগুণযুক্তের ন্যায় এখানে ভূরি ভূরি পদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মুঙ্গের নাম কেন হইল এ সম্বন্ধে অনেক মত ভেদ আছে। কেহ

কেহ বলেন, 'সৃষ্টির প্রারম্ভে এখানে মদ্‌গল নামা কোনও ঋষির আশ্রম ছিল বলিয়া পূর্ব্বে এইস্থান মগদলপুরী বা মগদলাশ্রম নামে অভিহিত হইত, তদনুসারে বর্ত্তমান নাম মুঙ্গের হইয়াছে। অনেকে হরিবংশকে প্রামাণ্য স্থির করিয়া বলেন যে, গাধিরাজ বিশ্বামিত্রের অন্যতম কুমার রাজা মগদল এই প্রদেশের অধিপতি থাকিয়া আপনার নামানুসারে স্থানটীর নাম রাখেন, পরে কালক্রমে উক্ত নাম বিকৃত আকার ধারণ করিয়া মুঙ্গের হইয়াছে। অগাধ ধীসম্পন্ন ডাক্তার বুকানন্ হ্যামিলটন ৮।৯ শতাব্দীর পুরাতন, সুতরাং হরিবংশেরও প্রাচীন, একখানি তাম্রশাসনে মদ্‌গগিরি নাম দৃষ্টে অনুমান করেন যে, উল্লিখিত মগদল ঋষি ও রাজা উভয়ই কল্পনা-মূলক, পর্ব্বতের নামানুসারে স্থানের নামকরণ হইয়াছে। বহুদর্শী শ্রীযুত উইলিয়ম্ হাণ্টার বলেন যে, পূর্ব্বকালে এইস্থানে মুদ্‌গ নামক কলাই প্রচুর জন্মিত বলিয়া তদনুসারে এই স্থানের নাম হইয়া থাকিবে। অপিচ,- স্থানীয় লোকের মধ্যে এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, পূর্ব্বে অত্রত্য পাহাড়ের পাদদেশে যে সকল হিন্দু সন্ন্যাসী বাস করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কোনও মহাতপা ঋষি ভাগীরথী গর্ভস্থ এক শৈলোপরি কঠোর তপস্যান্তে, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে, স্থলে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করতঃ তাহার নাম মুনিগিরি বা মুণি গির্ বা মুন্‌গীর রাখিয়া, গঙ্গাদেবীর জলময়ী তনু যাহাতে উহার পাদদেশ সতত বিধৌত অথচ ভগ্ন না করে এই মর্ম্মে এক প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। সেই হইতে গঙ্গাদেবী স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া আসিতেছেন। কেহ জরাসন্ধ ও কেহ কর্ণরাজকে পুরীর প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। শেষোক্তের নাম অদ্যাপি দুর্গাভ্যন্তরস্থ কর্ণচৌড়া নামক স্থানে ঘোষিত হইয়া থাকে, এবং তথায় ইংরাজের প্রথম আগমন কালে এক অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইত। হুমায়ুন বাদসাহের রাজত্বের প্রারম্ভে আনুমানিক ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে হীরারাম নামে একজন রাজপুত ও রামরায় নামক এক মদ্যবিক্রেতা

সম্রাটের সৈন্যদল সহ এতদ্দেশে আসিয়া এইস্থানে বাস করিতেছিল, এবং আপনাদের অবস্থা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া বাদসাহের সনন্দ গ্রহণ পূর্ব্বক এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ইহার অনেক বর্ষ পরে সাহসুজা উক্ত দুর্গের জীর্ণসংস্কার ও অন্য এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া উক্ত স্থানের নাম হাবেলী মুঙ্গের রাখেন। আরবী ভাষায় হাবেলী শব্দের অর্থ গৃহ বা অন্তঃপুর।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মুঙ্গের দুর্গমধ্যে একখানি তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছিল, উহাতে যে শাকাঙ্ক লিখিত ছিল, সার্ উইলিয়ম জোন্সের মতে তাহা ৩৩ সম্বৎ=২৪ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব। জেম্‌স্ প্রিন্সেপ বলেন উহা ৩৩ নহে, ১২৩; এবং কাপ্তেন উইল্‌ফোর্ডের মতে তাহা ১৩২ সম্বৎ। ডাক্তার হাণ্টার বাহাদুর উহাতে দেবপালের নাম দেখিয়া স্থির করেন যে, উহা সংবৎ না হইয়া পালবংশীয় রাজাদিগের প্রচলিত কোনও শাক হইবে; যেহেতু উক্ত রাজা ১০৫২ ও ১০৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোনও সময় প্রাদুর্ভূত ছিলেন। উক্ত ফলকের লিপি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, রাজা দেবপাল অসংখ্য হস্ত্যশ্বরথে পরিবৃত ও বহু নরপতিবৃন্দে পরিস্তূয়মান হইয়া এই স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন, এবং তদীয় তরণীবৃন্দে ভাগীরথী বক্ষ আচ্ছাদিত হইয়া প্রকাণ্ড নৌ-সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মুসলমান রাজত্বে, এইস্থানে যে সকল রাজকীয় কর্ম্মচারী বাস করিতেন তাঁহাদের উল্লেখ করিয়া কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ শ্রীযুত ব্লকম্যান সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন—

"১১৯৫ খৃষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি চুনার দুর্গের অন্তঃপাতী স্বকীয় জাগীরভূমি হইতে আসিয়া বেহার নগর আক্রমণ ও অধিকার করিলে মুঙ্গের তাঁহার কোনরূপ বাধা জন্মায় নাই। এই যুদ্ধের অবসানে বেহার নগরে মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ বাস করিতে লাগিলেন, এবং

দক্ষিণ বেহারে মুঙ্গের মর্য্যাদায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। তখন এই প্রদেশ বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল, পরে ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলক ইহাকে দিল্লীর অন্তভূর্ক্ত করেন। ১৩৯৭ সাল হইতে এই প্রদেশ জৌনপুর রাজ্যের অধীন হইয়া বুলোল লোদীর সময়ের পর হইতে আফগান নেতৃগণের হস্তে পতিত হয়। ১৪৯৪ অব্দে পাঠানেরা বঙ্গেশ্বর সুলতান হুসেন সাহের বশ্যতা স্বীকার করিলে, তদীয় তনয় যুবরাজ দানিয়াল ১৪৯৯ অব্দে দিল্লীশ্বর সিকন্দর লোদীর সহিত বেহারের সন্নিকটে সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের পর এই প্রদেশ পুনরায় বঙ্গদেশের অন্তর্গত করেন। কিন্তু এই বিষয়ে ষ্টুয়ার্ট সাহেব বঙ্গদেশের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, সিকন্দরের পক্ষীয় দুইজন অমাত্য বাঢ় নগরে যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই মর্ম্মে সন্ধি করেন যে, সম্রাট কখনও বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবেন না, কিন্তু বেহার, ত্রিহুত ও সরকার (পরগণা) সারণ তাঁহার অধিকৃত থাকিবে। যুবরাজ দানিয়াল উত্তর বেহারের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে অভিষিক্ত হইয়া ১৪৯৭ অব্দে মুঙ্গের দুর্গের জীর্ণ সংস্কার করেন। ১৫২১ খৃষ্টাব্দে নসীব সাহ্ উক্ত সন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া ত্রিহুত আক্রমণের পর স্বীয় জামাতা মখ্‌দুম আলমকে এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তারূপে হাজীপুরে সংস্থাপন করেন। এই সময় মুঙ্গের বঙ্গীয় রাজাদিগের বেহার সৈন্যের প্রধান আড্ডা হইয়া পড়ে, কিন্তু অত্রত্য প্রধান সেনাপতি কুতবখাঁ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে সেরসাহকর্ত্তৃক পরাজিত হইলে শেষোক্তের প্রভুত্ব অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে।

“সের সাহের সময় মুঙ্গের, পাঠান ও বঙ্গদেশ প্রত্যাগত সম্রাট হুমায়ুনের যুদ্ধক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছিল। ১৫৪৫ সাল হইতে সেরসাহতনয় ইস্‌লাম সাহের প্রতিনিধি মিঞা সলেমান মুঙ্গের শাসন করেন। ইস্‌লাম সাহের উত্তরাধিকারী মহম্মদ আদিলসাহের রাজত্বকালে সলেমান স্বাধীনতামানসে বঙ্গেশ্বর বাহাদুরসাহের সহিত সখ্য সূত্রে

আবদ্ধ হন, এবং উভয়ে মিলিয়া ১৫৫৭ সালে সূরযগড়ার অনতিদূরে আকবরের সৈন্যদর্শনে পলায়মান আদিলকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত ও নিহত করেন। ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে সলেমান বঙ্গ ও বেহারের শাসনকর্ত্তা হইলেও আকবরের সার্ব্বভৌমিকত্ব স্বীকার করিতেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় মধ্যম পুত্র দায়ুদ সাহ সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া আকবরের বশ্যতা অস্বীকার করিলে সম্রাট ১৫৭৪ সালে বেহার অধিকার করেন। ইহার ছয় বৎসর পরে বঙ্গের সৈনিকবিদ্রোহ উপস্থিত হইলে মুঙ্গের বহুকাল অভিযানকারী আকবরকর্ম্মচারীগণের আশ্রয়ীভূত হইয়াছিল। রাজা তোড়লমল মুঙ্গেরে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়া ভাগলপুরের শিবিরস্থ বিদ্রোহীদিগের ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের গতিরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং হিন্দু জমীদারগণের সহায়তায় তাহাদের খাদ্যসামগ্রী বন্ধ করিয়া বিদূরিত করিয়াছিলেন। তিনি এখানকার দুর্গের পুনঃ সংস্কার করেন।

"এই স্থানে বেহার ও বঙ্গবিজেতা মানসিংহের অবস্থিতি কালে তদীয় প্রিয় অনুচর সাহ্ দৌলত তাঁহাকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কাসীম খাঁ নামক জনৈক কর্ম্মচারী মুঙ্গের সরকারের ভারপ্রাপ্ত হইয়া অনতিদীর্ঘকালপরে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। সাহ্ জাহানের রাজত্বের প্রথম বর্ষে সৈয়দ মহম্মদ মুখতার খাঁ মুঙ্গেরের তাউলদার নিযুক্ত হইয়া গয়াজেলাস্থ ডুমরাঁওএর উজ্জৈনিয়া রাজাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উক্ত বাদসাহের রাজত্বের শেষভাগে তদীয় মধ্যম পুত্র বঙ্গের শাসনকর্ত্তা যুবরাজ সুজা এখানে কিছুকাল অবস্থিতি করেন, পরে ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে পিতার শঙ্কটাপন্ন পীড়ার সংবাদ শুনিয়া বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করত রাজকীয় সিংহাসন দাবী করিলে মুঙ্গের তাঁহার সাজসজ্জার কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়ে, এবং পরবৎসর বারণসীর অন্তঃপাতী বাহাদুরপুরে

দারাসুখ-তনয় সলেমান কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পুনরায় এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৬৫৯ অব্দে সুজা আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক কদওয়ায় পরাস্ত হইয়া পুনশ্চ এখানে আসিতে বাধ্য হন, কিন্তু মীরজুম্লা শেরঘাটী গিরিপথে সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে প্রথমে রাজমহলে ও পরে ঢাকায় পলাইতে বাধ্য করেন। মুঙ্গেরে তখনকার প্রসিদ্ধ বিদ্বান, কবি ও অস্‌রফ্ আখ্যাধারী মোল্লা মহম্মদ সৈয়দের সমাধি আছে। এই সময়কার ঐতিহাসিকেরা লিখিয়াছেন যে, ইনি কাস্পীয়ানসাগরতীরবর্ত্তী মজন্দরান্ নিবাসী মোল্লা সালীর পুত্র, এবং আওরঙ্গজেব-পৌত্র বঙ্গবেহারের শাসনকর্ত্তা আজিম উস্ সাহের একান্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। ইনি বহুকাল উক্ত সম্রাট-দুহিতা, প্রসিদ্ধা কবি জেব-উন্নিসা বেগমের শিক্ষক ছিলেন। কবি বঙ্গদেশ হইতে মক্কা যাইবার কালে ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে মুঙ্গেরে প্রাণত্যাগ করেন, এবং এই খানেই ইঁহাকে সমাহিত করা হয়। অদ্যাপি এখানে ইঁহার গোর দৃষ্ট হইয়া থাকে।"

মীরকাসীম বঙ্গভূমি হইতে ইংরাজদিগকে তাড়াইবার বাসনায় এখানে রাজধানী স্থাপিত করিলে মুঙ্গের অতিশয় প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। যে আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য মুঙ্গের এখনও বিখ্যাত তাহার কারখানা এই সময় স্থাপিত হয়। গুর্গণ খাঁ (বা গ্রিগরী খাঁ) নামে ইস্পাহান দেশীয় একজন আর্মেনী বস্ত্রবিক্রেতা মীরকাসীমের বিশ্বাসভাজন সেনাপতি হইয়া দুর্গের মধ্যে একটী সামরিক গোলা (arsenal) সংস্থাপন করেন, এবং ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে উদয়নালায় সুবাদারের শেষ পরাজয় না হওয়া পর্য্যন্ত এই স্থান বঙ্গবেহারের অগ্রগণ্য ছিল। কেল্লার মধ্যে নদীর উপকূলে যেখান হইতে দুইজন ধনকুবের শেঠকে ইংরাজদিগকে সহায়তার সন্দেহে হস্তপদ সুদৃঢ় বন্ধন করিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া নিহত করা হইয়াছিল, সেই স্থানের চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। মীরকাসীম ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অযোধ্যায় পলাইয়া যাইবার প্রাক্কালে,

তাহাদের আগমন নিবারণের নিমিত্ত মুঙ্গেরের ৩ মাইল দক্ষিণ দুখড়া-নালায় সেতু তোপে উড়াইয়া দেন তাহারও ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মুঙ্গের ভাগলপুরের একটী সবডিবিজন ছিল। ভাগলপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বৎসরে কয়েক মাস তথায় থাকিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। উক্ত সনের ১৫ই জুলাই ইউইং নামে জনৈক ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারী ভাগলপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের সহকারীরূপে মুঙ্গেরে নিযুক্ত হন, সেই সময় হইতে মুঙ্গের স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে মুঙ্গেরে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন, কিন্তু ভাগলপুরের জজ বৎসরে দুইমাস তথায় যাইয়া জেল ও দেওয়ানী আদালত পরিদর্শন এবং দায়রার মোকদ্দমার বিচার করিয়া থাকেন।

এই নগর দুইভাগে বিভক্ত,—সাহেবদিগের বাসস্থান ও সরকারী গৃহাধিষ্ঠিত দুর্গ, এবং পূর্ব্ব-দক্ষিণে বিস্তৃত সবিপণি দেশীয়গণের আবাস-পল্লী। প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গ উচ্চ পার্ব্বত্য জমীর উপর অবস্থিত এবং দীর্ঘ-প্রস্থে চারি হাজার ও সাড়ে তিন হাজার ফিট লম্বা। বিশাল খরপ্রবাহা গঙ্গা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের পাদদেশে থাকিয়া পশ্চিম দিক রক্ষা করিতেছেন, অন্য তিন দিকে বিস্তৃত ও গভীর পরিখা। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে উত্তর দিকের প্রবেশদ্বার লালদরওয়াজার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে সুরম্য স্থান সকল দৃষ্টিপথে পতিত হয়। অনুন্নত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলার সম্মুখবর্ত্তী দুই বৃহৎ সরোবরের মধ্যদিয়া রাজপথ দক্ষিণাভিমুখে চলিয়াছে; উক্ত টিলাসমূহের একতম কর্ণচৌড়া নামক উচ্চভূমি খণ্ডের উপর বিজয়নগর-মহারাজের সুদৃশ্য অট্টালিকা, অন্য একটীর উপর সাহ্ সাহেবের প্রাসাদ। এই শেষোক্ত গৃহে এইক্ষণ জেলার কর্ত্তা কালেক্টর সাহেব বাস করিতেছেন, তৎপশ্চাতে আকবরতনয় সাহ্ সুজার বিলাসিতাপূর্ণ রাজভবন অধুনা পাপীতাপী বন্দিগণের কারাগারে (জেলখানায়)

পরিণত হইয়াছে। উল্লিখিত শৈলযুগলের মধ্যভাগে লৌহতারগ্রথিত প্রাচীর বেষ্টনের মধ্যে কোম্পানীর বাগান, এবং কিয়দ্দূরে পরিষ্কৃত নিম্নতর ভূমিভাগে সরকারী গৃহরাজি এবং বিশুদ্ধ বায়ুপূর্ণ অপসরবাঞ্ছিত সাহেবদিগের নয়ন মনের প্রীতিকর ভিন্ন ভিন্ন নিকেতন।

এখানকার কষ্টহারিণী ঘাট অতিসুন্দর। বহুসোপানযুক্ত ঘাটের উপরিভাগে বৃহদায়তন ইষ্টকালয়ে বহুসংখ্যক দেবমন্দির গীতবাদ্য স্তোত্র পাঠে সর্ব্বদা মুখরিত হইয়া রহিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বের ঘাটে প্রায়শ স্ত্রীলোকেরা স্নান করিয়া থাকে। নদী অত্যন্ত প্রশস্ত ও বেগবতী, স্রোতের প্রতিকূলে চলা বাষ্পীয় পোতেরও দুঃসাধ্য, কেহ জলমগ্ন হইলে স্রোতোবেগে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায় তাহার নির্ণয় করা যায় না। ঘাটের উভয় পার্শ্বে অনেকগুলি মগ্নশৈল আছে, তাহাতে স্রোত প্রতিহত হইয়া দ্বিগুণবেগে প্রবাহিত হয়, সুতরাং এরূপস্থানে সম্পূর্ণ অবগাহন বড়ই আশঙ্কাজনক। একদা স্নানযোগে কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক যুবক পিতা মাতা পত্নীর সম্মুখে ঘাটে ডুব দিয়া আর উঠিতে পারিল না, প্রবল জলস্রোতে তাহাকে কোথায় লইয়া গেল বহু চেষ্টায়ও তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। এখানকার নদীতীর জলের সহিত লম্বভাবে রহিয়াছে, কিন্তু দুর্গের প্রান্তভাগ এত সুদৃঢ় যে এতাদৃশ স্রোতোবেগ সুদীর্ঘকালেও ইহার কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই।

উল্লিখিত রাজবর্ত্ম পূর্ব্বদ্বারে অস্ত হইয়াছে, সেই দ্বারকে ঘড়ী দালান বা ক্লক টাওয়ার (clock tower) কহে। এই প্রকাণ্ড সিংহদ্বারের উপরিভাগে সুদৃশ্য তোরণোপরি একটী বৃহৎ ঘড়ী আছে, তাহার শব্দ অনেক দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। এখান হইতে বাহির হইলেই কোলাহলপূর্ণ পূর্ব্ব সরাইএর দোকান পংক্তি, এবং বাঙ্গালী ও পশ্চিমদেশীয়ের আবাসভবন। মুঙ্গের লৌহকার্য্যের নিমিত্ত বিখ্যাত। পূর্ব্বে এখানে উৎকৃষ্ট দ্বিনলবিশিষ্ট বন্দুক ও তরবারি প্রস্তুত হইত, অধুনা অস্ত্র আইনের

কঠোরতায় উক্ত কারবার অনেকাংশে খর্ব্ব হইয়া পড়িলেও, দোনলা বন্দুক, পিস্তল, তরবারির ঢালাই, মুষ্টি ও স্বর্ণ রৌপ্যের দ্রব্যাদি এখনও পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই ক্ষরকপুরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানকার বুট জুতা ও ক্যাবিনেট বিলাতি জিনিসের প্রায় সমকক্ষ। তালের ছড়ি, আবলুসের বাক্‌স, কৌটা, পাথরের থালা বাটি প্রভৃতি অতিশয় সুন্দর ও বিখ্যাত। চণ্ডীস্থান অঞ্চলের কৃষ্ণ মৃত্তিকায় অতি উৎকৃষ্ট সুরাই বা কুঁজা প্রস্তুত হয়, এবং উহাতে রং করিবার নিমিত্ত সীতাকুণ্ডের লাল মৃত্তিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে এক প্রকার নিকৃষ্ট সাবান দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ৭ ভাগ চর্ব্বির সহিত ১ ভাগ মসিনার তৈল মিশ্রিত করিয়া চুণ ও সাজিমাটিনির্ম্মিত পাত্রে জ্বাল দিলে প্রস্তুত হয়। শ্লেটও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, এবং মুঙ্গের পাহাড়ের শিখর হইতে বহু সংখ্যক শিবলিঙ্গ পূজার্থ শিবমন্দিরে প্রেরিত হইয়া থাকে।

চণ্ডীস্থান—চণ্ডীস্থানে তত্রত্য গ্রাম্য দেবতা চণ্ডীদেবীর অধিষ্ঠিত এক পাহাড় আছে, তাহার গহ্বরের অভ্যন্তরে ইষ্টক সাহায্যে যে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে তন্মধ্যে চণ্ডীদেবীর চতুর্ভুজা শিলাময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা। কথিত আছে, কোন সময় ভারতবর্ষের দুই জন প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী নরপতি কর্ণ ও বিক্রম উক্ত দেবতার বরপ্রার্থী হইয়াছিলেন। রাজা কর্ণ মন্দিরের অনতিদূরে কর্ণচৌড়ায় বাস করিতেন এবং মন্দিরে আসিয়া কঠোর দৈহিক তপস্যায় তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিতেন। তিনি প্রত্যহ দেবীর সম্মুখে ঘৃতপূর্ণ অত্যুত্তপ্ত বৃহৎ লৌহকটাহে আত্মবলি স্বরূপ আপনাকে নিক্ষিপ্ত করিয়া তাঁহার প্রসাদ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তৎকৃপায় দৈনিকপ্রাপ্ত সওয়া মণ সুবর্ণ সঞ্চিত না রাখিয়া ব্রাহ্মণ, অন্ধ, আতুর ও বিপন্ন লোকদিগকে বিতরণ করিতেন। এইরূপে কর্ণের নাম দেশ বিদেশে প্রচারিত হইলে রাজা বিক্রম

ঈর্ষান্বিত হইয়া ছদ্মবেশে কর্ণের দাসত্ব স্বীকার করত, তিনি যে উপায়ে ঈপ্সিত লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহার রহস্য অবগত হইলেন। তিনি তপস্যায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করিবার বাসনায় তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা স্বীয় মনোহর বপুর ত্বক্ উত্তোলন পূর্ব্বক উত্তপ্ত রাজ-শোনিতে দেবীর অর্চ্চনা করিলেন, এবং কৃচ্ছ্রের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্ষতস্থানে লবণ ও লেবুর রস উত্তমরূপে মালিস করিয়া পুনরায় তপ্ত ঘৃতকটাহে আত্মোৎসর্গ করিলেন। এইরূপ দুঃসাহসিক কর্ম্মে নিযুক্ত রাজার প্রতি দেবী অতিশয় প্রীতা হইলেন, এবং অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া ভক্তের মহিমা জ্ঞাপনার্থে আপনিও বিক্রমচণ্ডী নামে আখ্যাত হইলেন। উপরোক্ত রাজা কর্ণ ও বিক্রমাদিত্য কে এবং কোন্ সময় প্রাদুর্ভূত ছিলেন সে সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা একমত হইতে পারেন নাই। ভারতবর্ষে উক্ত নামধেয় অনেক ব্যক্তি ছিলেন। তবে, ভাগলপুরের কর্ণগড় ও মুঙ্গের দুর্গের কর্ণচৌড়া যাঁহার নির্ম্মিত রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহারই সমকালবর্ত্তী।

পীর পাহাড়—ইহা মুঙ্গের হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পূর্ব্বদিকে এবং অনুমান এক শত হস্ত উচ্চ। ইহার উত্তর দিকে গঙ্গানদী, দক্ষিণ পার্শ্বে রাজপথ এবং উভয় পৃষ্ঠে উপরে উঠিবার রাস্তা আছে, কিন্তু কেবল উত্তর পার্শ্বের ক্রমোন্নত বঙ্কিম পথেই গাড়ী যাতায়াত করিতে সমর্থ। পাহাড়ের উর্দ্ধদেশের উত্তর দিকে কোনও ধার্ম্মিক মুসলমান পীরের (সন্ন্যাসীর) কবর থাকায় শৈলের নাম পীরপাহাড় হইয়াছে। উর্দ্ধদেশের সমতলীকৃত দক্ষিণ ভাগে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ স্যর মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর কে, সি, আই, ই বাহাদুরের বারান্দাযুক্ত একটি সুরম্য, সুসজ্জিত দ্বিতল অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। অট্টালিকার সম্মুখস্থ উদ্যানে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পের গাছ রহিয়াছে, এবং তাহার পূর্ব্বধারে কয়েকখানি গোশালা ও পর্ণকুটীর। গ্রীষ্মকালে ইহার উপর বাস করিলে জাহ্নবী জলকণাবাহী শীতল সুগন্ধি পবন দেহমন মন্থন করিয়া

আনন্দসুধা উত্তোলন করে। তথা হইতে নিম্নে চিত্রাপিতের ন্যায় ক্ষুদ্র প্রতীয়মানা কলনাদিনী শুভ্রবসনা ভাগীরথী এবং অসংখ্য গৃহ-তরু-পশু-নরনারী প্রপূরিত নগর দর্শনে মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মে।

সীতাকুণ্ড—সীতাকুণ্ড মুঙ্গের নগরের প্রায় ৫ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহার অনতিদূরে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকুণ্ড নামে যে আর চারিটা কুণ্ড আছে, তাহাদের জল স্থির, শীতল, সমল ও পাণাবৃত হওয়াতে ভেককুলের রাজধানী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সীতাকুণ্ডের জল সেরূপ নহে, উহা অতি স্বচ্ছ, ধাতুমিশ্রিত, সুতরাং স্বাস্থ্যের পক্ষে মহোপকারী। ইহার জলের সোডাওয়াটার ও লেমনেড্ কলিকাতায় অপেক্ষাকৃত বেশী দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কুণ্ডটী দেখিতে উচ্চ তীর-বিশিষ্ট সমচতুর্ভুজ জলাশয়ের ন্যায়, ইহার চতুঃপার্শ্ব ইষ্টকরচিত ও লৌহরেলিং বেষ্টিত, এবং পার্শ্বের পরিমাণ অনুমান দ্বাদশ হস্ত হইবে। ইহা গঙ্গাতীরস্থ যে ভূমিখণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত তাহার নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের টিলা উত্থিত হইয়াছে, কুণ্ডের তল-দেশেও ঐরূপ প্রস্তর লক্ষিত হয়; কিন্তু বিশেষ এই যে, এই জেলার অন্যান্য কুণ্ডগুলি এক একটী পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত, কিন্তু সীতাকুণ্ডের সন্নিকটে সেরূপ কোন পাহাড় নাই। জলন্ত চুল্লীর উপর সংস্থাপিত জলপাত্রের ন্যায় ইহার নানাস্থান হইতে অনবরত বাষ্প ও জলবিম্ব উত্থিত হইতেছে। এই প্রকারে ভূগর্ভস্থ উত্থিত জল মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ জলনালী দ্বারা কিয়দ্দূরে নীত হইয়া খোলা মাঠের মধ্যে পাকা নর্দ্দমা বহিয়া বহুদূরে নিম্নতর ভূমিতে চলিয়া গিয়াছে। মৃত্তিকাচ্ছাদিত নিম্ন জলনালীর উষ্ণ জল অন্য এক সোপানযুক্ত খাত হইতে উত্তোলন করা যায়। কুণ্ডের জল অসহনীয় উষ্ণ, এবং যে যে অংশ হইতে সর্ব্বদা বিম্ব সকল উত্থিত হইয়া থাকে তথাকার জল সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ। ডাক্তার বুকানন্ হ্যামিল্টন ৭ই এপ্রিল সূর্য্যোদয়ের

অব্যবহিত পরে ফারনাইটের তাপমান যন্ত্রে বায়ুর উত্তাপ ৬৮ ডিগ্রী দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময় কুণ্ডের উষ্ণতম প্রদেশের তাপ ১৩০ ডিগ্রী হইয়াছিল। স্থানীয় পাণ্ডারা বলে যে বৎসরের কোনও কোনও সময় জল অনেক শীতল হইয়া থাকে, এবং ১৮৯৮ সালের বর্ষাকালে উহা কূল অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়ে উষ্ণতা অনেক হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল হ্যামিল্টন সাহেব ২০শে এপ্রিল সন্ধ্যার সময় বায়ু ও জলের উত্তাপ যথাক্রমে ৮৪ ও ১২২ দেখিতে পান, ২৮শে ঐ সময় বায়ু ৯০ ও জল ৯২ হইলে স্থানীয় লোকে কুণ্ডে স্নান করিয়া উহার জল আবিল করিয়া ফেলে। জুলাই মাসে বর্ষার প্রারম্ভে জল পুনরায় নির্ম্মল হইলে ঐ মাসের ২১শে তারিখ সূর্য্যাস্তের পর বায়ু ৯০ ও জল ১৩২ ডিগ্রী দেখা গেল। ২১শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় তাপমান যন্ত্রে বায়ুতে ৮৮ ডিগ্রী ও কুণ্ডের জলে ১৩৮ ডিগ্রী লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু জল এত গরম হইলেও ইহার উত্তাপে অন্নপাক করা যায় না।

কূর্ম্ম-পুরাণে বর্ণিত আছে যে, রামচন্দ্র লঙ্কাধিপতি রাবণকে যুদ্ধে নিহত করিলে পর দশাননের প্রেতাত্মা সর্ব্বদা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইত, সুতরাং তিনি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না, কারণ রাবণ রাক্ষসাচারী হইলেও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের সন্তান, এবং তপস্যাবলে দেবতাদিগকেও কিঙ্করের ন্যায় স্ববশে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি ব্রহ্মহত্যার পাপ মোচনের নিমিত্ত ভ্রাতা, পত্নীসহ নানা তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে দেবগন্ধর্ব্বসেবিত কষ্টহারিণী ঘাটে উপস্থিত হইলেন, এবং পাদ্যঅর্ঘ্যদানে সমাগত দেবতাগণের পূজা করিয়া সকলকে প্রসন্ন করিলেন। কিন্তু দেবতারা ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে পাপমুক্ত করিলেও রাক্ষসাপহৃতা সীতার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া তৎপ্রদত্ত অর্ঘ্যগ্রহণে অসম্মত হইলেন। সীতা ইতি-পূর্ব্বে অগ্নিপরীক্ষায় নিরপরাধা সপ্রমাণ হইয়াছিলেন, কিন্তু এবারেও

দেবতারা সর্ব্বসমক্ষে সেইরূপ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। দেবী জানকী অনন্যগতি হইয়া কল্পিত দোষক্ষালনার্থে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘকাল পরে অক্ষত শরীরে তথা হইতে উত্থিত হইলেন। তিনি উঠিবা মাত্র আকাশ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এবং অগ্নিকুণ্ড হইতে অজস্রধারে নির্ম্মল জল উত্থিত হইতে লাগিল। সেই সময় হইতে অদ্যাপি কুণ্ডমধ্য হইতে উষ্ণজল উত্থিত হইতেছে, এবং অগ্নিকুণ্ড সীতাকুণ্ড নামে পরিচিত হইয়া প্রধান তীর্থরূপে গণ্য হইয়াছে। প্রতিবর্ষে প্রায় ত্রিশ সহস্র লোক এ স্থান দর্শন করিতে আইসে, এবং রামনবমীর সময় এখানে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এখানকার পাণ্ডারা মৈথিলী ব্রাহ্মণ।

সীতাকুণ্ডের প্রায় ১০০ হস্ত উত্তরে ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যারিয়েট সাহেবের পরামর্শানুসারে জেলা বোর্ড মৃত্তিকা খনন করাইয়া আর একটী উষ্ণপ্রস্রবণ বাহির করিয়াছেন, তাহার জলের উষ্ণতাও প্রায় সীতাকুণ্ডের তুল্য। যন্ত্র সাহায্যে ইহার জল উত্তোলিত হইয়া নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডের ন্যায় মন্দারগিরি ও চন্দ্রনাথ পর্ব্বতেও এক একটী সীতাকুণ্ড আছে, কিন্তু তাহারা উষ্ণপ্রস্রবণ নহে। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কিন্তু এ জেলায় সীতাকুণ্ডের ন্যায় আরও কতিপয় উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত ইহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ—

সীতাকুণ্ডের প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণ ভূর্কা নামক পল্লীতে দ্বিতীয় প্রস্রবণ অবস্থিত। উহা তিনটী উৎসের সম্মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে। বৈশাখের প্রারম্ভে ইহার জলের উষ্ণতা ১১২° ডিগ্রী হইয়া থাকে। ইহার অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে ঋষিকুণ্ড নামে তৃতীয় প্রস্রবণ। ঋষিকুণ্ড একটী তীর্থ, এবং ইহার উদ্গীরিত জলপ্রবাহে ৯৭ হস্ত দীর্ঘ একটী

সমচতুর্ভুজ পুষ্করিণী সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু ইহার সামান্য উষ্ণতায় এতাদৃশ বৃহৎ জলাশয়ের জল সর্ব্বদা উষ্ণ থাকিতে সমর্থ নহে, সুতরাং লোকে তথায় স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে, এবং তৃণ, গুল্মও জন্মিতে দেখা যায়। ইহার তাপ ৭২° হইতে ১১৪° ডিক্রী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঋষিকুণ্ডের প্রায় ৮ ক্রোশ দক্ষিণে সুরম্য ভীমবাঁধ প্রস্রবণ। ইহার উত্তাপ ১৪৪° হইতে ১৫০° ডিগ্রী। ইহার তিন ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে মাল্‌নী পাহাড় নামক পঞ্চম উষ্ণপ্রস্রবণ। ইহা অঞ্জনা নদীর জনক এবং উষ্ণতায় উল্লিখিত উৎস সকল পরাভূত করিয়াছে। চল্লিশ হস্ত দীর্ঘ ও দ্বাদশ হস্ত প্রশস্ত এক প্রস্তরাচ্ছাদিত অদৃশ্য পথে কলকল নাদে প্রবাহিত এবং কিয়দ্দূরে গুহা পথে কথঞ্চিৎ পরিলক্ষিত হইয়া অবশেষে সমভূমে বহির্গত হইয়াছে। ইহার উষ্ণতা ১৫০ ডিগ্রীরও অধিক।

শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ।

ইংলণ্ড, ব্রিটিশ-উপনিবেশ ও ভারতবর্ষ।

সকলেই জানেন গ্রেটব্রিটেন, আয়র্লণ্ড, ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহ ও ভারতবর্ষ একত্র করিয়া যে সুবৃহৎ ভূভাগ হয়, ইলণ্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড যাহার প্রভু, তাহাকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলে। সুতরাং বিভিন্ন মহাদেশভুক্ত এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের একটি একতা আছে। বাগ্মীর বর্ণনায় এই সাম্রাজ্যে সূর্য্য কখন অস্ত যায় না, এবং ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশসমূহ প্রীতিবন্ধনে পরস্পর দৃঢ়সম্বদ্ধ বলিয়া কথিত হয়। অধুনা সাম্রাজ্যের ঐক্যবন্ধন দৃঢ়তর করিবার জন্য ইংলণ্ডের একদল প্রতাপশালী লোক অত্যন্ত প্রয়াসী,—তাঁহাদের

নাম ইম্পিরিয়ালিষ্ট এবং তাঁহাদের কবি রুডিয়ার্ড কিপ্লিং। ইম্পিরিয়ালিষ্ট সম্প্রদায় সাম্রাজ্য মধ্যে যে একতা ও প্রীতির অস্তিত্ব ঘোষণা করেন, তাহা কতদূর সত্য আমরা অদ্য অতি সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব। সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড ও ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা কি, এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের ইতিহাস দ্বারা ভারতের ভবিষ্যৎ কিরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা, তৎসম্বন্ধেও সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিব। এজন্য আমাদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে ভবিষ্যদ্বক্তা হইতে হইবে, আশা করি পাঠকগণ তাহা ক্ষমা করিবেন।

বলা বাহুল্য, উপনিবেশ সম্পর্কে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাই। পর্য্যটক ও রাজনীতিবিদ্‌গণের পুস্তকাদি হইতে আমাদের মতামত সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং মতসমূহের সত্যাসত্যের জন্য আমরা কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি না। আমরা প্রথমতঃ অষ্ট্রেলিয়া হইতে আরম্ভ করিব। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডের যুবরাজ ডিউক অব্ ইয়র্ক মেলবোর্ণ নগরে অষ্ট্রেলিয়াবাসিদিগের প্রথম যুক্ত মহাসভা (Federal Parliament) উন্মুক্ত করেন। এই মহাসভা স্থাপন দ্বারা সমগ্র অষ্ট্রেলিয়াবাসীগণ একীভূত ও তাহাদের মধ্যে জাতীয়ভাব দৃঢ়গ্রথিত হইয়াছে, তাহারা এখন কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশস্বরূপ গণ্য না হইয়া স্বাধীনভাবে জগতে স্বীয় নাম প্রচারেচ্ছু।* সুতরাং উক্ত যুক্ত মহাসভা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঐক্যসাধনের একটি অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়াতে পূর্ব্বে বহুসংখ্যক চীন ও

* এগার বৎসর পূর্ব্বে সার চার্লস ডিল্ক্ লিখিয়াছিলেন "Now most Australians think, and rightly think, that they are already able to hold their own if united among themselves by a closer federation" Problems of Greater Britain, vol, II. p. 483. See also Vol. I, p. 456.

জাপানী শ্রমজীবী বাস করিত। শ্বেতাঙ্গগণ যে সকল কার্য্যে অশক্ত ছিল, তাহারা তাহা অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিত, এবং শ্বেতাঙ্গদিগের অপেক্ষা অল্প মূল্যে তাহারা তাহাদের নির্ম্মিত দ্রব্যজাত বিক্রয় করিত। এই কারণে ঔপনিবেশিকগণের তাহাদের প্রতি হিংসা জন্মে, এবং তাহাদিগের স্বদেশীয়দিগকে অষ্ট্রেলিয়া আসা হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়া অষ্ট্রেলিয়ানগণ আইন বিধিবদ্ধ করে। তখন ইংলণ্ডের উপনিবেশসচিব আপত্তি করিলে নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের প্রধান মন্ত্রী সার হেনরি পার্ক্‌স্ প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করেন যে, "মহারাণীর রণপোতসমূহ, বা মহারাণীর স্থানীয় প্রতিনিধি, বা মহারাণীর উপনিবেশসচিব কাহারও ভয়েই আমরা আমাদের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিব না।" * সম্প্রতি জাপানের সহিত ইংলণ্ডের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং কোন উপনিবেশ কর্ত্তৃক জাপানীদের প্রতি ঈদৃশ আচরণ গুরুতর রাজনৈতিক বিরোধ উত্থাপন করিবার কথা। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সার হেনরি পার্ক্‌স্ আরও বলিয়াছেন যে, "মৌখিক রাজভক্তগণ যাহাই বলুন, আমাদের পুত্রদিগের আমলে অষ্ট্রেলিয়ায় স্বাধীনতন্ত্র স্থাপন অসম্ভব কথা নহে।" † বিখ্যাত আমেরিকান লেখক হেনরি জর্জ্জও অষ্ট্রেলিয়া পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছেন অষ্ট্রেলিয়াবাসিদের রাজভক্তি মৌখিকমাত্র, এবং তাহারা কার্য্যতঃ সকল বিষয়েই স্বাধীন। সার চার্লস্ ডিল্কির মতে অষ্ট্রেলিয়াবাসিগণ মনে করেন যে মাতৃভূমির সহিত অষ্ট্রেলিয়ার ঐক্যবন্ধন উপকারজনক না হইলেও তদ্দ্বারা আপাততঃ কোন ক্ষতি হইতেছে না; কিন্তু এই বন্ধন

* Problems of Greater Britain by Sir Charles Dilke, Vol II, p. 305.

† Morley's Critical Miscellanies (Macmillan's Colonial Library) p. 310.

দৃঢ়তর করার তাহারা সম্পূর্ণ বিরোধী।* নিউজিলণ্ডে ইংলণ্ডের সহ পার্থক্য স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী। ১৮৯০ সালের নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুরি পত্রিকার ব্ল্যাকওয়েল সাহেব বলিয়াছেন "যদি যুক্তরাজ্যের সহিত সম্মিলিত হওয়ার সপক্ষে ও বিপক্ষে নিউজিলণ্ডী ভোট সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইলে বিপক্ষের দিকে এক সহস্র ভোটও সংগৃহীত হইবে কি না সন্দেহ।" সত্য বটে দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে নিউজিলণ্ড সৈন্যপ্রেরণ করিয়াছে, কিন্তু ষ্টেড্ সাহেব বলেন চেম্বারলেন সাহেব বুয়ারদিগের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যতদূর হস্তক্ষেপ করিয়াছেন নিউজিলণ্ডে তাহার দশমাংশ করিলেই তথাকার অধিবাসিগণ রাজশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিত।† এই সমস্ত কথা আলোচনা করিয়া ফরাসি রাজনীতিবিদ্ টারগোর উপনিবেশের সহিত সুপক্ক ফলের তুলনা সত্য এবং ইম্পিরিয়ালিষ্টগণের উচ্চনিনাদিত প্রীতিঘোষণা সত্ত্বেও বর্ত্তমান শতাব্দীতে অষ্ট্রেলিয়ার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।‡

দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক অবস্থা পূর্ব্বেও ইংলণ্ডের পক্ষে বড় শুভকর ছিল না, ভবিষ্যতে যে আরও অশুভ হইবে তাহার লক্ষণ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান। জোয়ানেস্বর্গের বিভিন্ন দেশবাসী আউটল্যাণ্ডারগণ হীরকখনিদ্বারা প্রভূত ধনাগম করিয়া তথায় তাহাদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। ইহারা যদিও বুয়ারদিগের পক্ষপাতী না হউক, ইংলণ্ডের অধীনতা স্বীকারে কিছুতেই স্বীকৃত নহে।§ নেটাল্ ও কেপকলনির

* Problems of Greater Britain, Vol II, p. 481.

† Americanisation of England (Review of Reviews Annual for 1901) page 59.

‡ প্রফেসার সীলী Expansion of England গ্রন্থে সাম্রাজ্যের বন্ধন দৃঢ় করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, জনমর্লি (Critical Miscellanies, Vol. III), তাহা সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়াছেন।

§ Problems of Greater Britain, Vol. I, page 540.

সহিত সম্মিলিত হইতেও ইহারা ইচ্ছুক নয়, কারণ তদ্দ্বারা তাহাদের কোন লাভ নাই, কিন্তু ঐ সকল উপনিবেশের জাতীয় ঋণভার গ্রহণ করিলে যথেষ্ট ক্ষতি আছে। পূর্ব্বে জোয়ানেস্‌বর্গের অধিবাসিগণ বিদ্রোহী হইলে দক্ষিণ আফ্রিকার ডচ্‌গণ ইংরেজদের সাহায্য করিত। কিন্তু ইংরাজ বর্ত্তমান যুদ্ধে অন্তরীপবাসী সেই ডচ্‌দিগকে মর্ম্মান্তিক পীড়া দিয়াছেন, তাহাদের হৃদয়ে প্রতিহিংসাবহ্নি ধূমায়িত হইতেছে, সুতরাং ভবিষ্যতে ইংরেজের সহিত জোয়ানেস্‌বর্গের অধিবাসিগণের যুদ্ধ বাধিলে ডচ্‌গণ শেষোক্তের পক্ষই অবলম্বন করিবে ইহা অনুমান করিতে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নাই।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী পশ্চিম ইণ্ডিজ্ দ্বীপপুঞ্জ কালে সাম্রাজ্য হইতে বিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা অমূলক নহে। পূর্ব্বে জামেকাদ্বীপ ইক্ষুবাণিজ্যে খুব সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এখন রাজকোষ হইতে সাহায্য দ্বারা ফ্রান্স ও জর্ম্মনী বিট-চিনি ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া পশ্চিম ইণ্ডিজ উপনিবেশসমূহের নিতান্ত দারিদ্র্যদশা ঘটাইয়াছেন। তথাপি উহাদের এখন যেটুকু শ্রী আছে তাহা কেবল মার্কিণ রাজ্যের কল্যাণে। কতিপয় মার্কিণবাসী এখন তথায় কদলী বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া কতকগুলি লোকের অন্ন সংস্থানের উপায় করিয়াছেন, এবং বিনা করে জামেকার চিনি স্বদেশে আমদানী করিতে দিয়া যুক্তরাজ্য তদ্দেশবাসিদিগকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। পুনশ্চ, পশ্চিম ইণ্ডিজ উপনিবেশসমূহ, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অতি সন্নিকট, এবং স্পেনের নিকট হইতে কিউবা কাড়িয়া লইয়া যুক্তরাজ্য উহার সহিত বাণিজ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক উক্ত দ্বীপকে অত্যন্ত ধনশালী করিয়া তুলিতেছেন। ইহা দেখিয়া জামেকাবাসিদের সাম্রাজ্যবন্ধন শিথিল হইবে বিচিত্র নহে।

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডও যুক্তরাজ্যের অতি নিকটবর্ত্তী, আয়র্লণ্ডের

ন্যায় নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের অধিকাংশ অধিবাসীর ধর্ম্ম রোমান ক্যাথলিক। বহুকালাবধি ফ্রান্সে ইংরেজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের সমুদ্রতীরবর্ত্তী তিন শত মাইল উপকূল ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছেন। এখন নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড সমৃদ্ধিশালী উপনিবেশ, কেনেডার বহুচেষ্টাসত্ত্বেও সে কেনেডার সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছুক নহে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের বেলাভূমি ফরাসি-অধিকৃত থাকায় সীল ও তিমি মৎস্যের বাণিজ্যে উপনিবেশবাসীদিগের প্রভূত ক্ষতি হয়। এই কারণে বহুদিন যাবৎ তাহারা বিনিময় দ্বারা ফরাসি-দিগকে তাহাদের উপকূল হইতে অপসৃত করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডকে অনুরোধ করিতেছে। কিন্তু ইংরেজ গবর্ন্মেণ্টের সহিত ফরাসিদিগের বনিয়া উঠিতেছে না। বলপূর্ব্বক ফরাসিদিগকে বেদখল করিলে মিসরে তাহারা তাহার প্রতিশোধ লইবে, এই ভয়েও ইংরেজ উচ্চবাচ্য করিতেছে না। সুতরাং নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড দ্বীপবাসিগণ ন্যায়তঃই বিবেচনা করে যে সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া ইংলণ্ড তাহাদের স্বার্থ দেখিতেছেন না। পক্ষান্তরে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড যদি যুক্তরাজ্যের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে ফরাসিদিগের নিকট হইতে এই অধিকার ক্রয় করিয়া লওয়া কঠিন হইবে না। যুক্তরাজ্যের কোন সাম্রাজ্যও নাই যাহার ভয়ে তাহাকে ফরাসির আবদার সহ্য করিতে হইবে। এই কারণে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডেও সাম্রাজ্যপ্রীতি বড় প্রবল নহে।

কেনেডায় আপাততঃ রাজভক্তি কতকটা বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তথাপি কেনেডাও নিরাপদ নহে। কেনেডা যুক্তরাজ্য হইতে যত দ্রব্য ক্রয় করে, তত আর কোন দেশ হইতে— এমন কি ইংলণ্ড হইতেও— নহে। যুক্তরাজ্যের সহিত সম্মিলিত হইলে এই সকল দ্রব্যের উপর তাহাদিগকে মাশুল দিতে হইবে না। কেনেডায় বহুসংখ্যক প্রতাপান্বিত

আইরিশ অধিবাসী আছে, তাহারা সর্ব্বদাই ইংলণ্ডের বিপক্ষে। কেনেডার সৈন্যবল সামান্য, এবং সীমান্ত অরক্ষিত। যুক্তরাজ্য ও কেনেডা কোন প্রাকৃতিক সীমাদ্বারা পৃথগ্‌ভূত নহে, বাস্তবিক তাহারা একই দেশ। কেনেডার বড় বড় ব্যবসায়গুলি মার্কিণদিগের হস্তগত, উহার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মার্কিণদিগের যথেষ্ট হাত আছে। কেনেডা হইতে বহুলোক গিয়া যুক্তরাজ্যে বাস করে। আবার ক্লনডাইক স্বর্ণখণি আবিষ্কারের পর হইতে যুক্তরাজ্য হইতে কেনেডায় বহুলোকের সমাগম হইতেছে। এতদ্ব্যতীত কেনেডার একটি সমগ্র প্রদেশ—কুইবেক্—ফরাসি অধ্যুষিত। তাহারা সংখ্যায় সমগ্র কেনেডিয়ানদিগের এক তৃতীয়াংশ। তথাকার ভাষা, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ধর্ম্ম, সবই ফরাসি। ইংরেজাধীনতায় তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে বলিয়া তাহারা এখনও রাজভক্ত। সম্প্রতি কেনেডার যুক্ত মহাসভার (Dominion Federal Parliament) প্রধান মন্ত্রী সার উইলফ্রিড লরিয়ার ফরাসি। তথাপি কুইবেক্ হইতে প্রতি বৎসর বহুতর ফ্রেঞ্চ-কেনেডিয়ান যুক্ত-রাজ্যের নিউ ইংলণ্ড প্রদেশে গিয়া বাস করিতেছে। ফরাসিদের সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধটা চিরকালই কিছু তিক্ত, সেই সম্বন্ধ যদি কখনও আরও কিঞ্চিৎ কষায় হইয়া উঠে, তাহা হইলে কুইবেক্ লইয়া গোলযোগ বাধিবার বিশেষ সম্ভাবনা, কারণ ফ্রান্সের প্রতি কুইবেকবাসিদিগের গভীর শ্রদ্ধা। গোল্ডউইন স্মিথ্ প্রমুখ কেনেডিয়ান রাজনীতিবিশারদ-গণের মতে যুক্তরাজ্যের সহিত কেনেডার সম্বন্ধ দৃঢ়ীকরণ বাঞ্ছনীয়।

ইংলণ্ডের সহিত উপনিবেশসমূহের সম্বন্ধটা কিছু বিশেষ ভাবের। নাম মাত্র ইংলণ্ডের অধীন হইলেও কার্য্যতঃ উহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন, অনেক বিষয়ে ইংলণ্ড অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীন। ইংলণ্ডের রণতরী-সমূহ ঔপনিবেশিক বাণিজ্য ও উপনিবেশবাসিদিগকে বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে, অথচ ঔপনিবেশিকগণ ইংলণ্ডের জন্য

বাণিজ্যের দ্বার অবাধে মুক্ত করে না। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত স্বাধীন বাণিজ্যবাদী কব্‌ডেন বলিয়াছেন, “যাহারা আমাদের আইন মানে না বা আমাদিগের ট্যাক্স বহন করে না, যুদ্ধ হইলে আমাদের পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে যাহারা বাধ্য নহে, যাহাদের দেশের এক একর ভূমিতে আমাদের অধিকার প্রতিপন্ন করিতে গেলে হুলুস্থুল ঘটিবে, এবং আমাদের দ্রব্যজাতের উপর করস্থাপনেও যাহারা দ্বিধা করে না, তাহাদিগকে রাজভক্ত বলা হাস্যজনক।” গোল্ডউইন স্মিথ্ বলেন, “কলনিসমূহ যে, ইংলণ্ডীয় দ্রব্যজাতের উপর মাসুল আদায় করে, ইহা ইংলণ্ডের পক্ষে নিতান্ত অপমানের কথা, যদি উপনিবেশসমূহ সম্পূর্ণ স্বাধীন হইত, তাহা হইলে ইংলণ্ড তাহাদের সহিত বাণিজ্যসম্পর্কে সন্ধিস্থাপন করিতে অথবা যুদ্ধ করিয়া তাহাদের দেশে স্বীয় মাল আমদানীর পথ পরিষ্কার করিতে পারিত। ঔপনিবেশিক গবর্ণরগণ রাজনৈতিক হিসাবে শূন্য মাত্র। তাঁহাদের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নাই, কেবল যে কোন কার্য্য স্বয়ং আরম্ভ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই এমন নহে, আরব্ধ কার্য্যের উপরও তাঁহাদের হস্তক্ষেপের কোন শক্তি নাই।”* আবার উপনিবেশবাসিগণ বলিয়া থাকে যে সাম্রাজ্যের খাতিরে কোন অনাবশ্যকীয় যুদ্ধে যোগদান করিয়া তাহারা আপনাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিতে প্রস্তুত নহে।† বহুদিন পূর্ব্বে ১৮৮৩ সালের অক্টোবর মাসের নাইনটিন্‌থ্ সেঞ্চুরি পত্রিকায় ফর্‌বস্ সাহেব লিখিয়াছিলেন, “যদি ইংলণ্ড কোন বলশালী রাজ্যের সহিত গুরুতর যুদ্ধ বাধাইয়া দেয়, আমার ধ্রুব বিশ্বাস তাহা হইলে অষ্ট্রেলিয়া স্বাধীনতন্ত্রস্থাপন করিবে।” সুধীগণ! সমস্ত অবস্থা সম্যক্ বিবেচনা করিলে দেখিতে পাইবেন বর্ত্তমান বুয়র যুদ্ধে কতিপয় ঔপনিবেশিক সৈন্য প্রেরণে এই কথার

* Questions of the Day, S. V. ‘Empire.’
† Problems of Greater Britain, p. 483.

সভ্যতার হ্রাস হয় না। যুক্তরাজ্যের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট কেনেডিয়ানগণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন ঔপনিবেশিকদিগের মনেও তদ্রূপ ধারণাই বর্ত্তমান বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলিয়াছেন উপনিবেশবাসিগণের অবস্থা কতকটা অস্বাভাবিক, কেনেডাবাসিগণ যতকাল সাম্রাজ্যভুক্ত থাকিবে ততকাল ইংরেজ ও মার্কিণ উভয় অপেক্ষাই হীন বলিয়া বিবেচিত হইবে। স্বাধীন ব্যক্তি অধীনের প্রতি, উচ্চাবস্থ ব্যক্তি নীচজনের প্রতি যেরূপ কৃপাচক্ষে দৃষ্টি করে, ইংরেজ ও মার্কিণ উভয়েই কেনেডাবাসিকে সেইরূপভাবে দেখে।" * উপনিবেশসমূহের অবস্থা আলোচনা করিয়া সাম্রাজ্য-ভক্ত চেম্বারলেন সাহেবকেও বলিতে হইয়াছে যে কলনিগণ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে ইচ্ছা করিলে তদ্রূপ করিবার তাহাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। † সুতরাং উপনিবেশসমূহের স্বাতন্ত্র্য সম্ভাবনা নিতান্তই কবিকল্পনা নহে।‡

এখন উপনিবেশসমূহের কথা পরিত্যাগ করিয়া গ্রেট-বিটেন ও আয়র্লণ্ডের কথা অবতারণা করা যাউক। আয়র্লণ্ড চিরকালই ইংলণ্ডের কণ্টকবিশেষ। বুয়র যুদ্ধে কোন কোন আইরিশ বুয়রদিগের স্বপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছে ইহা সকলেই জানেন। ইংরাজ আয়র্লণ্ডে যে কঠোর শাসননীতি পরিচালন করেন, তাহার ফলে যুক্তরাজ্যে এখন ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার লোক বাস করে, যাহাদের জন্ম আয়র্লণ্ডে। আইরিশবংশ-সম্ভূত যত লোক এখন যুক্তরাজ্যে বাস করে, আয়র্লণ্ডের বর্ত্তমান অধিবাসিসংখ্যা এখন তদপেক্ষা কম। এই আইরিশ-আমেরিকানগণ অনেকে এখন যুক্তরাজ্যে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, এবং

* Americanisation of the World, p. 48.

† Do. p. 43.

‡ বলা বাহুল্য, লেখক উপনিবেশসমূহের স্বাতন্ত্র্যাবলম্বনের সমর্থন বা ইচ্ছা করিতেছেন না। অভিজ্ঞ পাশ্চাত্য লেখকদিগের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র।

আইরিশদিগের যত রাজনৈতিক আন্দোলনের গোড়া যুক্তরাজ্যে। সুতরাং ইংলণ্ড আয়র্লণ্ডকে স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষমতা না দিলে আয়র্লণ্ডের অধিবাসিগণ কালে স্বদেশ শূন্য করিয়া যুক্তরাজ্যে প্রস্থান এবং তথায় ইংলণ্ডের শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি করিবে অনেকে এরূপ অনুমান করিয়া থাকেন।

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থা কি? যে বাণিজ্য একদিন ইংলণ্ডের একচেটিয়া ছিল, তাহা এখন ক্রমশঃ যুক্তরাজ্য ও জর্ম্মনীর হস্তগত হইতেছে। যাঁহারা নিয়মিতরূপে সংবাদপত্র পড়েন, তাঁহারা জানেন ইহা লইয়া ইংলণ্ডে এখন কিরূপ আন্দোলন চলিতেছে। বুয়র যুদ্ধে যে ইংরাজ সেনার গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে এরূপ বলা যায় না। কিন্তু এতদুপলক্ষে ইউরোপীয় মহাদেশের অন্যান্য জাতির সহিত ইংলণ্ডের শত্রুতা নিঃসন্দেহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফ্রান্স ও জর্ম্মনীর সেনাবল ইংলণ্ড হইতে বহুশ্রেষ্ঠ। নৌ-বলে ফরাসিগণ ইংরাজ অপেক্ষা হীন হইলেও তাহাদের বৈজ্ঞানিক কলকৌশল ও রণপোতগঠন-প্রণালী ইংলণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জর্ম্মাণ সম্রাট ও আমেরিকা তাহাদের নৌ-বল বৃদ্ধি করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ললিতকলায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালির, দর্শনে জর্ম্মনীর, এবং বিজ্ঞানে আমেরিকার পশ্চাতে। ইংলণ্ডে এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি কিপ্লিং,—বার্ণস্, স্কট, ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ, কাউপার, সেলি, বায়রণ, টেনিসন ও ব্রাউনিংএর কাল হইতে কি অবনতি! রাজনৈতিক ক্ষেত্রের দৃশ্যও বড় আশাপ্রদ নহে। দলবদ্ধ-শাসন (Party-Government) প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। লর্ড সলস্‌বেরীর পর পীল, ডিস্‌রেলী, গ্লাডষ্টোন প্রভৃতির ন্যায় বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ আর কে আছে? মোটের উপর গ্রেট-ব্রিটেনের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সেদিন একজন বিজ্ঞ লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহা কিছুতেই অত্যুক্তি বলা যায় না। "গ্রেটব্রিটেনের

সন্তানগণের মধ্যে যাঁহারা নিরপেক্ষ তাঁহারা ইহা স্বীকার করিবেন যে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে গ্রেটব্রিটেন যেরূপ নিরাপদ ও উন্নত ছিল, তাহা হইতে এখন অনেক পতিত হইয়াছে, যদিও এখন পর্য্যন্ত সে মহৎ, শক্তিশালী ও গৌরবান্বিত আছে, তথাপি পূর্ব্বে যে সকল দেশ তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও তাহার পদানুবর্ত্তী ছিল, এখন গ্রেটব্রিটেনকে সেই সকল দেশের সহিত সমতুল্য হইয়া প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে।" * বস্তুতঃ যদি উন্নতি অবনতি, উত্থান পতন, জাগতিক নিয়মের অন্তর্গত হয়, তবে এখন ইংলণ্ডের উত্থানের দিন অবসান হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু যে জাতি এতকাল ধরিয়া জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহার অধঃপতন একদিনেই সমাধা হয় না,—ইংলণ্ডের সম্মুখে এখনও বহুকালব্যাপী গৌরবান্বিত কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে সন্দেহ নাই।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের অবস্থা কি, এখন অতি সংক্ষেপে আমরা তাহার আলোচনা করিব। উচ্চশিক্ষা ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে, এখন গবর্মেণ্ট নিম্নশিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিয়াছেন। কংগ্রেস দেশের একটি স্থায়ী অনুষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তদুপলক্ষ্যে পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে, প্রীতিবন্ধন স্থাপিত হইয়াছে, তিলক, নায়ার, তায়েবজী, মেটা, চালু, এখন আমাদের ঘরের লোক। বর্ত্তমান বড়লাটের মতেও ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহ সারবত্তায় উন্নতিলাভ করিতেছে, এবং দেশের কর্ত্তৃপুরুষগণ যাহাই বলুন না কেন, দেশীয় সংবাদপত্রসমূহকে একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। ভারতের অবস্থা এখন বিলাতে বেশী আন্দোলিত হইতেছে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অধিকতর পুস্তক ইংরাজীতে রচিত হইতেছে, প্রতি বৎসর শীতকালে

* Fortnightly Review, S. V. 'British Statesmanship', October, 1901.

অধিকসংখ্যক বিলাতবাসী ভারত পরিভ্রমণে আসিতেছেন। জাতিভেদ অল্পে অল্পে শিথিল হওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে,—বঙ্গে কায়স্থ-সমিতি, বৈশ্যসমিতি প্রভৃতি সংস্থাপিত হইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা শুভলক্ষণ এই, বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রবেশলাভের জন্য ভারতবাসী অধিকতর আগ্রহ দেখাইতেছে।* আমাদের বর্ত্তমান দারিদ্র্যই এ বিষয়ে আমাদের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিতেছে। আমরা দিন দিন আমাদের এতকালের অসারতা বুঝিতে পারিতেছি, অথচ লেফ্‌টেনেণ্ট বিশ্বাস, প্যারঞ্জপে, রণ্‌জিতসিংজী, তাতা, জগদীশ বসু, বিবেকানন্দ, সার শেষাদ্রিশেখর আয়ার প্রভৃতির দৃষ্টান্ত আমাদের আশা ও আত্মবিশ্বাস সজীব রাখিতেছে, চেষ্টা করিলে আমরাও অন্যের সমকক্ষ হইতে পারি ইহা বুঝিতে পারিতেছি, অত্যল্প সংখ্যক ভারতবাসী এখন সেনার নেতৃত্বগ্রহণে অধিকারী হইয়াছেন। আমাদের মধ্যে পালিয়া-মেণ্টের সভ্য হইয়াছেন, ব্যবস্থাপক সভায় আমাদের প্রবেশাধিকার কিয়ৎ পরিমাণে প্রসারিত হইয়াছে। যখন সাধারণের মত গবর্ম্মেণ্টের অনুকুল হয়, তখন গবর্ম্মেণ্টের পক্ষ বিলাতের মহাসভায় তাহা উল্লেখ করিয়া স্বীয়মত দৃঢ় করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, ইক্ষু-ব্যবসায়ের সাহায্যোপলক্ষ্যে (Sugar Bounty) তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

মৃত অধ্যাপক সার জে, সিলি বহুপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন ভারতবর্ষে যদি ইটালির ন্যায় জাতীয়ভাবের আন্দোলন উত্থিত হয়, তাহা হইলে ভারতে ইংরাজ রাজত্বের আয়ু পরিমিত হইয়া আসিবে।† ইংরাজ রাজত্বের অবসান হউক, এরূপ ইচ্ছা কোন ভারতবাসীই করিবেন না,

* চালের যে আর এক দিক আছে, তাহা অধুনা এত আলোচিত হইতেছে যে কেহ এদিকটা সম্যক্ ভাবিয়া দেখিতেছেন না। উপরে যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইল তাহা অঙ্কুরমাত্র, ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে কোন মহৎ পরিবর্ত্তন একদিনে সংসাধিত হয় না, অল্পে অল্পে শক্তি লাভ করে।

† Expansion of England, Second course, Lec. IV.

এবং এটা আমাদের মঙ্গলের কথাও নহে। তবে জাতীয় ভাব বলিয়া একটা জিনিস যে আমাদের মধ্যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নতুবা তিলক-সাহায্য-ভাণ্ডারে পঞ্চাশ হাজারের উর্দ্ধ অর্থ সংগৃহীত হইত না, উত্তর-পশ্চিমের সার আণ্টনি ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড্‌ এবং আসামের কটন সাহেবের বিদায় কালে এরূপ সার্ব্বজনীন সহানুভূতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত না, এবং সার মাঞ্চুরজী ভবনগরী ভারতবর্ষে আসিয়া বড়লাটের সম্মানিত অতিথি হইলেও জন সাধারণের নিকট দাদাভাই নৌরজীর শতাংশের একাংশ সমাদরলাভে বঞ্চিত হইতেন না। নোয়াখালীর পেনেল সাহেবের ব্যাপারেও দেখা গিয়াছে যে দেশের নীচ শ্রেণীর মধ্যে এই জাতীয়ভাব অলক্ষ্যে কিরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

পূর্ব্বে ইউরোপের—এবং সঙ্গে সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে আমাদেরও—ধারণা ছিল যে এসিয়া ভূখণ্ডের জাতিসমূহ চিরকাল অর্দ্ধসভ্য অবস্থায়ই থাকিবে। কিন্তু এসিয়া আফ্রিকা হইতে একধাপ মাত্র উচ্চে, এই চিরন্তন বিশ্বাস এখন সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়াছে। জাপান প্রাচ্য-ভূমের মুখ আলোকিত করিয়াছে, এবং জাপানের গৌরবে আমাদেরও গৌরব বাড়িয়াছে। সম্প্রতি দায়ে ঠেকিয়া ইংলণ্ড জাপানের সহিত সন্ধি করিয়াছেন, এবং এতদ্দ্বারা জাপান পাশ্চাত্য মহাশক্তিপুঞ্জের রাজ-নৈতিক গণ্ডির মধ্যে তুল্য শক্তিমান্‌রূপে নিঃসন্দেহ অধিষ্ঠিত হইয়াছে। চীন সাম্রাজ্যও গাঝাড়া দিয়া উঠিতেছে, বিদেশীয় রাজনৈতিকগণ তাহার নবোদ্যমে ইতিমধ্যেই বিভীষিকা দেখিতেছেন। আফগানি-স্থানের আমীর মৃত আবদুর রহমন একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বলিয়া ইউরোপেও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যেমন প্রাচ্য দেশের প্রতি প্রতীচ্য জগতের শ্রদ্ধা বাড়িতেছে, তেমনি ভারতবর্ষীয়দিগেরও নিজের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস জন্মিতেছে। এইরূপ

বিশ্বাসই উন্নতির মূল এবং আমাদের পক্ষেও ফলোপধায়ক হইবে সন্দেহ নাই।

জাপানের সহিত ইংলণ্ডের সন্ধির কথা উপরে একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছে। এই সন্ধি হইতে আর একটি ফল উৎপন্ন হইবে। এতকাল ইংরেজের সহিত রুসের মানসিক যেরূপ ভাবই থাকুক বাহিক সৌহার্দ্যের কোন প্রকার অভাব ছিল না। জাপানের সহিত ইংলণ্ডের সন্ধির স্পষ্ট উদ্দেশ্য কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া হইতে রুসকে দূরে রাখা। সুতরাং এখন ইংলণ্ডের সহিত রুসিয়ার স্পষ্ট বৈরিতা জন্মিল। ইহার ফলে ইংলণ্ডের রুস্‌ভীতিবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজের রুসভীতিতে আমাদের একটু লাভ আছে। সার চার্লস ডিল্ক্‌ বলেন "রুস আমাদের অতি সন্নিকটে, তাহার মহাপরাক্রান্ত সেনাবল বিদ্যমান, সুতরাং ভারতবাসিদিগের ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনায় কর্ণপাত করা আমাদের খুবই উচিত।"* পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন আমাদের লাভ কোথায়। শত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষার দুই উপায় আছে, সেনাবল বৃদ্ধি এবং প্রজার সহানুভূতি আকর্ষণ বা সাহায্যলাভ। ভারতবাসিগণ যেরূপ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ও করপ্রপীড়িত, তাহাতে সৈন্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। অতএব বাধ্য হইয়া গবর্মেণ্টকে দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

উপরে ইংলণ্ড ও উপনিবেশসমূহের যেরূপ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, এখন তাহার সহিত ভারতের ভবিষ্যতের সম্বন্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিব। যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ উপনিবেশসমূহ অন্ততঃ অষ্ট্রেলিয়াও—ইংলণ্ডের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে, তাহা হইলে এরূপ মনে হইতে পারে যে আমাদের উপর ইংরাজশাসন কঠোরতর হইবে, কারণ 'শাসনরজ্জু শিথিল করিলে পরিণামফল অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় হওয়া অসম্ভব নয়'। কিন্তু এরূপ কোন ঘটনা ঘটিলে ইংলণ্ডের মনে এই সত্যটি আরও দৃঢ়মুদ্রিত হইবে যে চিরকাল কোন দেশের উপর আধিপত্য করা সম্ভবপর নহে, এবং

* Problems of Greater Britain, Vol II, page 128.

ইহা বুঝিয়াই ইংলণ্ড সেই শাসন দেশীয়দিগের প্রীতির ভিত্তির উপর গ্রথিত করিয়া তুলিতে অধিকতর যত্নপর হইবেন। ব্রিটিশসাম্রাজ্য হইতে দুই একটি উপনিবেশ চ্যুত হইলে দৃঢ়তর প্রীতিবন্ধনদ্বারা সাম্রাজ্য-ভুক্ত অন্যান্য দেশসমূহে আধিপত্য স্থায়ী করিবার জন্য ইংলণ্ডের আকাঙ্ক্ষা বাড়িবে। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অপরিমিত ও অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত ইম্পিরিয়ালিষ্টিক ভাবই ইংলণ্ডের প্রধান শত্রু। ইহাতে আত্মা-ভিমান অযথা বৃদ্ধি পায়, এবং পরের ন্যায্য অধিকারের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। কোন উপনিবেশ সাম্রাজ্যচ্যুত হইলে ইংলণ্ডের উদ্দাম আত্মম্ভরিতা খর্ব্ব ও বিশ্বব্যাপী আত্মগ্রাসিতা সংযত হইয়া আসিবে। তখন ইংলণ্ড আমাদের অভাব অভিযোগগুলি গর্ব্বোদ্ধত ভাবে অবহেলা না করিয়া একটু অধিকতর সহানুভূতির চক্ষে দেখিবেন। এখন অনেক ইংরাজের ধারণা তাঁহারা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, ইহাতে তাঁহাদের কোন লাভ হইতেছে না, কেবল আমাদেরই উপকার হইতেছে। কিন্তু ইংলণ্ডে ভারতবর্ষসম্বন্ধে জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল অমূলক ধারণা বিদূরিত হইবে। এখনই কেহ কেহ বুঝিতেছেন ইংরাজের শাসন 'জ্ঞানালোকিত স্বার্থপরতা' মাত্র।* উপনিবেশ হারাইয়া ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যোন্মত্ততা কমিয়া গেলে, বিপদে সমুদ্রপরপারস্থিত উপনিবেশিক ভ্রাতৃবৃন্দের সাহায্যলাভাশা তিরোহিত হইলে, যখন ইংলণ্ডের জ্ঞান চক্ষু সম্পূর্ণ উন্মীলিত হইবে, তখন সে বুঝিবে ভারতবর্ষকে চিরদরিদ্র রাখা স্বর্ণডিম্বপ্রসূ হংসীবধের ন্যায়, এবং ইংলণ্ডের ধনবৃদ্ধি করিতে হইলে ভারতকেও ধনশালী করা আবশ্যক।*

* Mr. Thorburn Fabian Societyর লেকচারে 'England's policy in India'—one of 'enlightened self interest.' এইরূপ বলিয়াছেন।

* শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত ফাল্গুনের ভারতীতে দেখাইয়াছেন প্রত্যেক ভারতবাসী গড়ে ইংলণ্ড হইতে বার্ষিক তিন শিলিংএর জিনিস ক্রয় করে। পক্ষান্তরে প্রত্যেক কেনেডাবাসী যুক্তরাজ্য হইতে গড়ে বার্ষিক পাঁচ পাউণ্ডের দ্রব্য খরিদ করে। সুতরা প্রত্যেক ভারতবাসী ইংলণ্ড হইতে ঐ মূল্যের দ্রব ক্রয় করিলে ইংলণ্ড ভারত হইতে বার্ষিক প্রায় দেড় শত কোটি পাউণ্ড উপার্জ্জন করিতে পারিতেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পাশ্চাত্যজাতিসমূহের মধ্যে ইংলণ্ডের সর্ব্ববাদী-সম্মত শ্রেষ্ঠতা ও অপ্রতিহত গৌরবের এখন হ্রাস হইয়াছে। দুএকটি উপনিবেশ হস্তচ্যুত হইলে ইংলণ্ডের এই শ্রেষ্ঠতা ও গৌরবের আরও হ্রাস হইবে। ইংলণ্ড তখন লুপ্তগৌরব উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। আমাদের পূর্ব্ব অনুমান সত্য হইলে ভারতবাসীও তখন উন্নত হইবে। সুতরাং ইংরাজ আর তখন ভারতবর্ষীয়দিগকে কঠোর শাসনে রাখিয়া পাশ্চাত্য জগতের সম্মান হইতে অধিকমাত্রায় বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা করি-বেন না। ভারতবাসিদিগের সুশাসনের আর একটি আশা আছে। এতদিন আমেরিকার যুক্তরাজ্য সাম্রাজ্যাভিলাষী ছিল না। সম্প্রতি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ যুক্তরাজ্যের অধীন হইয়াছে। আমেরিকায় ইম্পিরিয়ালিষ্টিক ভাব এখনও ততটা বৃদ্ধি পায় নাই, সুতরাং ফিলিপাইনের শাসননীতি খুব উদার হওয়ারই সম্ভাবনা। যদি তাহাই হয়, তবে ইংলণ্ড গৌরব লালসায় এবং কতকটা লজ্জার খাতিরেও স্বীয় শাসননীতি উন্নত করিতে বাধ্য হইবেন। যে মার্কিণজাতি বাণিজ্য ও বিজ্ঞানে ইংরাজকে পরাভূত করিয়াছে, শাসনসম্পর্কেও তাহাদ্বারা পরাভূত হইতে ইংলণ্ডের আত্মাদর স্বভাবতঃই কুণ্ঠিত হইবে।

অতএব যে দিক দিয়া আলোচনা করা যাউক আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ গগণে আশার ক্ষীণ রশ্মি দেখিতে পাইতেছি। আমাদের অনুমান-গুলির সত্যাসত্য একদিন বা এক বৎসরে নির্দ্ধারিত হইতে পারেনা,—উহা সময়সাপেক্ষ। জাতীয় জীবনে এক শতাব্দীও বেশী সময় নহে। হয়ত কালে আমাদের অনুমান ভ্রান্তও প্রমাণিত হইতে পারে। কিন্তু ভ্রান্ত হইলেও উহা স্বাস্থ্যকর ও উপকারী, কারণ আশাপ্রদ। চতুর্দ্দিকে অবনতির অপবাদ ও দারিদ্র্যের হাহাকারের মধ্যে আমাদের পক্ষে এরূপ আশাবাক্যের আবশ্যকতা আছে।

রহস্য।

জীবনের মধুর প্রভাতে
বুঝি নাই কাহারে কি বলে,
মধ্যাহ্নের রবিকরে যেন
বুঝিনু সবারে দলে দলে।
দুরন্ত এ বিশাল বিশ্বেতে
ছুটোদিন শুধু দিবানিশি,
উদ্দাম উৎসাহে বুক বাঁধি
কোলাহলে রহিলাম মিশি'।
মেতে র'নু মহা মোহভরে
আত্মহারা হয়ে ছুটোদিন,
অজানিতে সন্ধ্যা এল ছুটে
ভূমিতলে হইনু বিলীন!

কোথা হতে এনু এজগতে—
মুহূর্ত্তেক তরে আসি শেষে
কোথা পুনঃ লুকাব কি জানি
এ প্রবাহে কোথা গিয়ে ভেসে!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

ব্রাহ্মণ কি পৃষ্ট ?

যে কোন ইংরাজি পুস্তক খুলিলেই প্রায় দেখা যায়, ব্রাহ্মণ হইতে এ দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ শব্দের ইংরাজি priest; ব্রাহ্মণজাতি = sacerdotal caste; ভারতবর্ষ priest-ridden দেশ; এ দেশে ব্রাহ্মণেরই হাতে সমস্ত ক্ষমতা—ব্রাহ্মণ ভূসুর, ভূদেব,—মনুষ্যমধ্যে দেবতা। অন্যান্য জাতি ব্রাহ্মণের পদানত, ব্রাহ্মণ স্বার্থের জন্য দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে।

এ দেশে যাঁহারা ঐতিহাসিক বা সামাজিক পুস্তক, প্রবন্ধ প্রভৃতি লেখেন, তাঁহাদের মধ্যেও এইরূপ বাক্য সকলের প্রতিধ্বনি অহরহ শুনা যায়। ব্রাহ্মণের হাতে স্বর্গের চাবি ছিল; ব্রাহ্মণ সেই চাবি না খুলিলে অন্যের স্বর্গদ্বার দিয়া প্রবেশাধিকার নাই। ব্রাহ্মণের এই বিষম অত্যাচারই এ দেশের অবনতির প্রধান কারণ।

ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে এইরূপ যে অপবাদ দেওয়া যায়, তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু এই অপবাদের সারবত্তা সকল সময়ে বুঝিতে পারা যায় না। এই অপবাদ সমূলক কি না, তাহার মীমাংসার জন্য "ভারতী"র পাঠকসমাজ ও বঙ্গের সুধীসমাজের নিকট উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য, প্রশ্নটি বড় গুরুতর; ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহার চেয়ে গুরুতর প্রশ্ন অতি অল্প আছে। প্রশ্নের গৌরব বিবেচনায় সুধীসমাজ প্রশ্ন-কর্ত্তার বিনীত আবেদনে কর্ণপাত করিলে অনুগৃহীত হইব।

কিন্তু তৎপূর্ব্বে খটকা কোথায়, বলা আবশ্যক। ব্রাহ্মণের আধিপত্য এ দেশে বহু সহস্র বৎসর হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও আছে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। এবং শ্রেণীবিশেষের এইরূপ একাধিপত্যের ফল ভাল না হইবারই কথা। একাধিপত্য উভয়ের পক্ষেই অনিষ্টজনক,

যিনি প্রভুত্ব করেন, ও যাঁহার উপর প্রভুত্ব চালিত হয়, উভয়ের পক্ষেই অনিষ্টজনক। ইংরাজি demoralisation শব্দের ঠিক বাঙ্গালা প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাইতেছি না, কিন্তু শ্রেণী বিশেষের চিরস্থায়ী আধিপত্য এই demoralisation আনয়ন করে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।*

কিন্তু অনিষ্ট হইয়াছে, এক কথা; ও কিরূপে অনিষ্ট হইয়াছে, অন্য কথা। ব্রাহ্মণ হইতে দেশের অনিষ্ট হইয়াছে স্বীকার করিলেও, কিরূপে সেই অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, তাহা লইয়া বিতণ্ডা চলিতে পারে। বিচারের ফল এক জিনিষ, বিচারের প্রণালী অন্য জিনিষ। যে প্রকৃত চোর সে দণ্ড পাইল, বিচারের ফল ঠিক হইল। কিন্তু যদি পুলিশের গড়া সাক্ষীর উপর নির্ভর করিয়া তাহার দণ্ডবিধান হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিচার-প্রণালীতে দোষ থাকিয়া যায়।

ব্রাহ্মণ হইতে দেশের অনিষ্ট হইয়া থাকে হউক; তজ্জন্য ব্রাহ্মণের তিরস্কার আবশ্যক হয় হউক; কর্ম্মফল হইতে যখন মুক্তির আশা নাই, তখন ব্রাহ্মণ নিজ দুষ্কৃতের ফলভাগী হইবেন, তাহাতেও দুঃখ নিষ্ফল। কিন্তু প্রশ্ন এই যে ব্রাহ্মণের হাতে ধর্ম্মের চাবি ছিল কিনা বা আছে কিনা? এই দেশ priest-ridden দেশ কিনা? ব্রাহ্মণ শব্দে "পুষ্ট" বুঝায় কি না?

মীমাংসার পূর্ব্বে প্রশ্নের অর্থটা পরিষ্কার করিয়া বুঝা আবশ্যক। ইংরাজি priest শব্দের অভিধানসম্মত অর্থ পুরোহিত। ব্রাহ্মণ-জাতিকে priestly classs বলা হয়; অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি পুরোহিতের জাতি।

Priest শব্দের এই অর্থ স্বীকার করিয়া লইলাম। ব্রাহ্মণ বস্তুতই

* 'Demoralisation'এর শব্দার্থ ও ভাবার্থ উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া "নীতি-শৈথিল্য" এইরূপ বাঙ্গলা প্রতিশব্দ করিলে কেমন হয়?—ভাঃ সং।

পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ী। ব্রাহ্মণেরই পৌরোহিত্যে অধিকার আছে, অন্যের বোধ করি নাই। পৌরোহিত্য ও যাজন যদি একই অর্থে প্রযুক্ত ধরা যায়, ব্রাহ্মণেরই যাজনে অধিকার। কাজেই ব্রাহ্মণজাতি priestly class বলা অসঙ্গত নহে।

কিন্তু একটা কথা আছে। ব্রাহ্মণমাত্রের পৌরোহিত্যে বা যাজনে অধিকার থাকিতে পারে; কিন্তু ব্রাহ্মণমাত্রই যাজক নহে, পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ী নহে। যাজনে অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু সেই অধিকার প্রয়োগে সকলে শাস্ত্রানুসারে বাধ্য কিনা জানি না, শাস্ত্রজ্ঞেরা বলিতে পারেন।

ফলে কিন্তু ব্রাহ্মণমাত্রই পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী নহেন। একালে ত নহেন; সে কালেও ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ব্রাহ্মণ পরশুরাম ক্ষত্রিয় রাজার পৌরোহিত্য করিতেন না, ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করিয়া বেড়াই-তেন। দ্রোণাচার্য্য পৌরোহিত্য না করিয়া ক্ষত্রিয় শিশুদিগকে অস্ত্র-শিক্ষা দিতেন ও নিজে লড়াই করিতেন। চাণক্য পণ্ডিতের শ্রাদ্ধে ভোজনে বোধ করি আপত্তি ছিল না; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তিনি মন্ত্রীত্ব করিতেন। নাটককর্ত্তাদের আসনে বিদূষকের পদ ব্রাহ্মণ সন্তানের একচেটিয়া ছিল। একালে ব্রাহ্মণের ছেলে জজিয়তি হইতে জুতা বিক্রয় পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন; যাজন অনেকেই করেন না, বোধ করি সংখ্যা ধরিলে অধিকাংশই করেন না। অতএব ব্রাহ্মণেরই পৌরোহিত্যে অধিকার থাকিলেও ব্রাহ্মণমাত্রই পুরোহিত নহেন। পুরোহিত মাত্রে ব্রাহ্মণ; কিন্তু ব্রাহ্মণ মাত্রে পুরোহিত নহেন। এদেশে priestly class ব্রাহ্মণ হইতে গৃহীত; কিন্তু ব্রাহ্মণজাতি priestly class নহে।

পুরোহিত হইতে দেশের যদি অনিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা ব্রাহ্মণের একাংশ হইতে হইয়াছে; সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতি হইতে হয় নাই। যে

তিরস্কার পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রাপ্য, তাহা সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতির প্রাপ্য নহে।

খ্রীষ্টানদের দেশে যে কোন ব্যক্তির পৌরোহিত্যে বোধ করি অধিকার আছে। যে কোন ব্যক্তির আছে বলা চলে না; অবশ্য পৌরোহিত্যের জন্য কিছু না কিছু উপযোগিতা,—qualification আবশ্যক, তবে সেই উপযোগিতা জন্মগতে বা জাতিগত না হইতে পারে। এদেশে জাতিটা অর্থাৎ কোন বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে জন্মটা সেই উপযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণবংশে জন্ম না হইলে অন্য গুণ থাকিলেও পৌরোহিত্যে অধিকার থাকে না।

কিন্তু ব্রাহ্মণ মাত্রই পুরোহিত ও যাজক নহেন; এরূপ স্থলে ব্রাহ্মণজাতিকে পুরোহিতের জাতি বলা ঠিক সঙ্গত কি না? এবং পুরোহিত জাতির যে দোষ তাহা ব্রাহ্মণ জাতির উপর ফেলা সঙ্গত কি না?

তারপর আর একটা কথা। Priest শব্দের অর্থে পুরোহিত ও যাজক শব্দ ব্যবহার করা সঙ্গত কি না? Priest বলিলে কি বুঝায় আগে দেখা উচিত।

খ্রীষ্টানদের দেশে যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই priest হইতে পারে না। সে যত বড় ধার্ম্মিক হউক, আর পণ্ডিত হউক, আর শাস্ত্রজ্ঞ হউক, ইচ্ছা করিলেই priest হয় না। ঐ কাজে নিযুক্ত হইতে হইলে একটা সনন্দ আবশ্যক। এবং নিয়োগের সনন্দ যে সে ব্যক্তি দিতে পারেন না। যেমন যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা মাত্রেই জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট, বা কনষ্টেবল হয় না, সেইরূপ যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই পৃষ্ট্ হয় না। সমাজসম্মত একজন নিয়োগকর্ত্তা থাকেন; তিনি যাহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন, তিনিই পৃষ্ট্ হন বা পুরোহিত হন। যে দিন হইতে নিযুক্ত হন, সেই দিন হইতে তিনি পৃষ্ট্। যে দিন

তিনি কাজে ইস্তফা দেন বা পদচ্যুত হন, সেই দিন হইতে তিনি আর পৃষ্ট্ নহেন।

রোমান ক্যাথলিকদের দেশে পৃষ্ট্ নিয়োগের কর্ত্তা পোপ স্বয়ং, ইংরাজদের দেশে রাজা স্বয়ং; অন্যান্য দেশে সমাজসম্মত অন্যান্য কর্ত্তা আছেন। পোপের নিয়োগে বা রাজার নিয়োগে কেহ পৌরোহিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে সাধারণকে তাহার পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। যিনি যে চার্চের অন্তর্ভুক্ত, তিনি সেই চার্চের অধ্যক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত পুরোহিতের শাসন মানিতে বাধ্য; নতুবা তিনি সে চার্চের অঙ্গীভূত নহেন। যেমন রাজনিযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটকে মানিব না বলিলে চলে না, তেমনি যথাবিধানে নিযুক্ত পুরোহিতকে মানিব না বলিলে চলে না। সাধারণের পুরোহিত নির্ব্বাচনে কোনরূপ স্বাধীনতা নাই।

আমাদের দেশে পুরোহিত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যে হইতে পারে না; কিন্তু যে কোন ব্রাহ্মণ যখন ইচ্ছা পৌরোহিত্য অবলম্বন করিতে পারে। কাহারও সনন্দ আবশ্যক হয় না। যদি সনন্দের দরকার হয়, সে যজমানের। যজমান যাহাকে ইচ্ছা পুরোহিত স্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। পণ্ডিতকেও পারেন, মূর্খকেও পারেন; ঋষিতুল্য লোককেও পারেন, গুলিখোরকেও পারেন; এ বিষয়ে যজমানের স্বাধীনতা অব্যাহত। তিনি কাহারও বাধ্য নহেন। তবে সাধারণতঃ পৌরোহিত্য বংশগত হইয়া থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা। এ দেশে সকল ব্যবসায়ই বংশগত হইবার ব্যবস্থা। এ দেশে দেওয়ানের ছেলে দেওয়ান হয়, সরকারের ছেলে সরকার হইবার অধিকার রাখে; একই বাড়ীতে সাত পুরুষ ধরিয়া কাজ করিতেছে, এরূপ পাচক, খানসামা, দরজী, ছুতার পর্য্যন্ত বিরল নহে। বাপের কাজ বেটাকে দেওয়াই এ দেশের গৃহস্থ লোকের ইচ্ছা; তবে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা

আছে। গুরুর ছেলে গুরু, পুরোহিতের ছেলে পুরোহিত, নাপিতের ছেলে নাপিত, দরজীর ছেলে দরজী, হইতেও পারেন, না হইতেও পারেন; সে গৃহস্থের ইচ্ছা। অনেক স্থলেই হইয়া থাকেন; কোথাও বা হন না।

তাহা হইলে খ্রীষ্টানী পৃষ্ট্ ও হিন্দু পুরোহিতের এইখানে অনেকটা বিভেদ। যে কোন ব্রাহ্মণসন্তান যখন ইচ্ছা যাজনবৃত্তি গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে পারেন—স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া, অন্যকর্ত্তৃক নিয়োগের বা সনন্দের প্রয়োজন হয় না। কোন সমাজসম্মত প্রভুশক্তির নিকট বাহাল বরতরফের আবশ্যকতা নাই। পুরোহিত স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বাধীন মনুষ্য; যাহাকে ইচ্ছা তিনি যজমান স্বীকার করিতে পারেন, নাও পারেন। যজমানও এস্থলে সম্পূর্ণ স্বাধীন; যাহাকে ইচ্ছা পুরোহিত গ্রহণ করিতে পারেন; কেহ তাঁহাকে এ বিষয়ে বাধ্য করেন না। ইচ্ছামত পুরোহিত নির্ব্বাচন করিলে তিনি সমাজভ্রষ্ট হয়েন না। খ্রীষ্টান পৃষ্টের এই স্বাতন্ত্র্য নাই। ইংলিশ চর্চ্চের অন্তর্ভুক্ত কোন গৃহস্থ রাজ-নিযুক্ত পুরোহিতের শাসন স্বীকার না করিলে তিনি ইংলিশ চর্চ্চ্ পরিত্যাগে বাধ্য হন। এ দেশে সেরূপ চর্চ্চ্ও নাই, সেরূপ বাধ্যবাধকতাও নাই।

তারপর পুরোহিতের কর্ত্তব্য লইয়া কি বিভেদ আছে দেখা যাইতে পারে। পুরোহিতের একটা কাজ প্রতিনিধিত্ব। তিনি উপাস্য ও উপাসকের মধ্যস্থ; উপাসকের প্রতিনিধিস্বরূপে তিনি উপাসকের পূজা উপাস্যের প্রতি অর্পণ করেন; এবং উপাস্যের তরফ হইতে উপাসককে পূজার প্রতিদান অর্পণ করেন, বা অর্পণ করিবার ভরসা দেন। এই অর্থে তাঁহার হস্তে স্বর্গের দ্বারের চাবি থাকে। তিনি যজমানকে উপাস্যের সম্মুখে উপস্থিত করেন, তিনি তাঁহার পরিচয় দিয়া দেন; তাঁহার হাত দিয়াই উপাস্য উপাসকের মধ্যে সমুদয় কারবার চলে। তিনি যেন

ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীল; তাঁহার হস্তেই এটর্ণির পাউয়ার আছে। তিনি ভিন্ন অন্যের হাত দিয়া উপাস্য উপাসকের মধ্যে কোন কারবার চলিবার যো নাই; চালাইলেও চলিবে না। কোর্টের স্বীকৃত উকীল ব্যতীত অন্যের হস্ত দ্বারায় যেমন নালিশ রুজু হয় না, সেইরূপ উপাস্যের স্বীকৃত পুরোহিতের হাত্র ভিন্ন অন্যের হাতে আবেদন গৃহীত হয় না।

ফলে পুরোহিত প্রতিনিধি, তাঁহার প্রতিনিধিত্ব দুই রকমের। এক শ্রেণীর পুরোহিত সমাজের প্রতিনিধি, আর এক শ্রেণীর পুরোহিত ব্যক্তির প্রতিনিধি। প্রাচীন ইহুদীরা জীহোবা দেবের উপাসক ছিল। জীহোবা ভিন্ন অন্য দেবতাকে তাহারা পূজা করিতে পাইত না, অন্যকে পূজা করিলে জীহোবা অত্যন্ত রাগ করিতেন ও শাস্তি দিতেন; ইহুদী জাতি জীহোবার আপনার লোক ছিল। জীহোবার মন্দিরের পাণ্ডারা সমগ্র ইহুদীজাতির প্রতিনিধিস্বরূপে জীহোবার উপাসনা করিত। পৌরোহিত্য বংশবিশেষে আবদ্ধ ছিল। এক সময়ে রাজা স্বয়ং ইহুদী জাতির প্রতিনিধিস্বরূপে পুরোহিত ছিলেন।

খ্রীষ্টান সমাজেও পুরোহিতের সমাজপ্রতিনিধিত্ব স্পষ্ট দেখা যায়। পোপ স্বয়ং ক্যাথলিক সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপে উপাসকমণ্ডলী ও উপাস্য দেবতার মধ্যস্থতা করেন। সমগ্র যাজক সম্প্রদায় পোপের অধীন ও পোপের নিযুক্ত। পোপের সনন্দ যাঁহার নাই, তিনি যাজক নহেন। প্রকৃতপক্ষেই স্বর্গের চাবি পোপের হস্তে। পোপ যে যজমানকে দরজা খুলিয়া দিলেন, তিনি প্রবেশে অধিকার পাইলেন; পোপ যাহার প্রতি বিরূপ তাহার প্রবেশ পথ রুদ্ধ। ক্যাথলিক সমাজের কোন ব্যক্তির ধর্ম্মজীবন স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নহে। চর্চ্চের বাঙ্গালায় সঙ্ঘ শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্যাথলিক সমাজে প্রত্যেক খ্রীষ্টানের ব্যক্তিগত জীবন সঙ্ঘের জীবনের অঙ্গীভূত। সঙ্ঘ ছাড়িয়া কোনও ব্যক্তি খ্রীষ্টান হইতে পারেন না। সঙ্ঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন

ব্যক্তি খ্রীষ্টান হইতে পারেন না; অন্ততঃ ক্যাথলিক সমাজের খ্রীষ্টান হইতে পারেন না। খ্রীষ্টান উপাসক স্বাধীনভাবে ঘরের ভিতর ঈশ্বরের স্তুতি-উপাসনা করিতেও হয়ত পারেন; কিন্তু সে স্তুতি-উপাসনার বিশেষ মূল্য আছে বোধ হয় না।

ক্যাথলিক সমাজ ভিন্ন অন্যান্য খ্রীষ্টীয় সমাজেও এইরূপ সঙ্ঘের গৌরব স্পষ্ট দেখা যায়। সঙ্ঘ ছাড়িয়া যেন ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নাই। সঙ্ঘের নির্দ্দিষ্ট পুরোহিত ভিন্ন অপরে খ্রীষ্টের মিনিষ্টার হইতে পারেন না। তাঁহার হাত দিয়া উপাসনা উপাস্যের নিকট পৌঁছিবে, তিনিই দেবতার স্বীকৃত ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীল, অন্যের হাত দিয়া নালিশ রুজু হইবে না।

ইংরাজ সমাজে রাজা স্বয়ং সঙ্ঘের অধ্যক্ষ। রাজা স্বয়ং যাজকতা করেন না; কিন্তু তিনিই যাজকমণ্ডলীর নিয়োগে কর্ত্তা ও অধ্যক্ষ। সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপে তিনি এই শক্তি চালনা করেন। সমাজ হয়ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাকে এই অধ্যক্ষতা প্রদান করিয়াছে। কিন্তু এখন আর সমাজের অর্থাৎ সঙ্ঘের কোন ব্যক্তির ধর্ম্মবিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নাই। রাজার নিয়োগে নির্দ্দিষ্ট যাজকেরা সমাজের পক্ষ হইতে সাধারণের কল্যাণজন্য ঈশ্বরের উপাসনা করে ও আবার ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য বিবিধ অনুষ্ঠানে সেই রাজনিযুক্ত সমাজসম্মত সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় পুরোহিতকেই আহ্বান করিতে হয়। রাজনিযুক্ত পুরোহিতেরা রাজ্যের মঙ্গলার্থ ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেন, দেশে দৈবোৎপাত উপস্থিত হইলে ঈশ্বরের প্রসাদনের জন্য দেশের হইয়া স্তবস্তুতি করেন; যুদ্ধবিগ্রহের সময় শত্রুনিপাতের জন্য ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। আবার ব্যক্তিবিশেষের জাতকর্ম্মে, নামকরণে, বিবাহে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সেই রাজনিযুক্ত সমাজসম্মত প্রতিনিধিকে ডাকিতে হয়। যেহেতু তিনিই খ্রীষ্টের মিনিষ্টার, অপরের সে অধিকার নাই।

ফলে খ্রীষ্টান সমাজে পুরোহিত মুখ্যতঃ সমাজেরও প্রতিনিধি, এবং

গৌণতঃ ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধি। আগে তিনি সমাজের প্রতিনিধি, পরে তিনি ব্যক্তিবিশেষের প্রতিনিধি; কেননা, সমাজ ছাড়িয়া ব্যক্তির ধর্ম্মবিষয়ক স্বাতন্ত্র্য নাই। প্রত্যেক খ্রীষ্টান খ্রীষ্টীয় সঙ্ঘের অঙ্গমাত্র।

ইংরেজ সমাজ ভাঙ্গিয়া যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ননকন্‌ফর্মিষ্ট সমাজ উৎপন্ন হইয়াছে, যাহারা রাজার অধ্যক্ষতা স্বীকার করে না এবং রাজনিযুক্ত পুরোহিতের শাসন মানে না, তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য অনেকটা আছে বটে, কিন্তু তথাপি তাহারাও আপন আপন ক্ষুদ্র চর্চ্চ্ বা উপসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাকে সেই সেই উপসঙ্ঘের অঙ্গস্বরূপে নির্দ্দেশ করিতে যেন ব্যাকুল। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শাসনপ্রণালীর যেন মূল ভিত্তিই এই, সঙ্ঘ হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তির অস্তিত্ব নাই। কাজেই যিনি সঙ্ঘেরও পুরোহিত, তিনিই ব্যক্তিরও পুরোহিত। তিনি সাধারণের হইয়া উপাসনা করেন, আবার তিনি ব্যক্তির হইয়া উপাস্যের প্রসাদন করেন। তিনিই খ্রীষ্টের নিরূপিত মিনিষ্টার।

ইউকেরিষ্ট-ঘটিত অনুষ্ঠানে খ্রীষ্টীয় সমাজের এই মৌলিক ভাবটা স্পষ্ট দেখা যায়। পুরোহিত মদ ও রুটি যথাবিধানে উৎসর্গ করিয়া দেন। এই উৎসর্গের পর সেই মদ ও রুটি যীশুখ্রীষ্টের রক্তমাংসে পরিণত হয়। তৎপরে সমবেত উপাসকগণ সেই রক্তমাংস বাটিয়া লন। এই অনুষ্ঠান খ্রীষ্টের সহিত সঙ্ঘের সম্মিলন ও একাত্মতা ব্যঞ্জন করে। খ্রীষ্টান সঙ্ঘ খ্রীষ্টের দেহ হইতে অভিন্ন। খ্রীষ্টের রক্ত ও খ্রীষ্টের মাংস সঙ্ঘের অস্থিমজ্জায় মিলিত আছে। খ্রীষ্ট ছাড়া সঙ্ঘ নাই; সঙ্ঘ ছাড়া খ্রীষ্ট নাই। এই পানভোজন অনুষ্ঠানের দ্বারা মাঝে মাঝে সেই একাত্মতা স্মরণ করাইয়া দিতে হয়। অথবা এই অনুষ্ঠানের দ্বারাই উভয়ের সম্মিলন সাধিত হয়, উভয়ের একাত্মতা সাধিত হয়। এই অনুষ্ঠান খ্রীষ্টীয় সমাজের সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠান, ইহার নিগূঢ় অর্থ ও তাৎপর্য্য লইয়া সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদ রক্তপাত যথেষ্ট হইয়াছে, ইতিহাসে তাহা লিপিবদ্ধ

আছে। খ্রীষ্টানগণের কল্পনা এই অনুষ্ঠানে বিবিধ নিগূঢ় তাৎপর্য্য অর্পণ করিয়া ইহাকে পরম গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

আমাদের দেশে বৌদ্ধগণ বুদ্ধের সহিত সঙ্ঘের কতকটা এইরূপ একাত্মতা স্বীকার করিতেন, খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠানের অনুরূপ কোন অনুষ্ঠান বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল কিনা, জানি না। ইহুদীদের মধ্যে ওরূপ অনুষ্ঠান কিছু ছিল কি? হয়ত খ্রীষ্টানেরা বৌদ্ধগণের নিকটই ঐরূপ অনুষ্ঠান পাইয়াছিলেন। একালের তান্ত্রিকগণের মদ্য-মাংসাদি পঞ্চ-মকার সাহায্যে সাধনার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক আছে কিনা, ঐতিহাসিকেরা বিচার করিবেন।

ফলে খ্রীষ্টীয় সমাজের এই অনুষ্ঠানে পুরোহিতের প্রাধান্য নির্ব্বিবাদে স্বীকৃত। সমাজসম্মত অর্থাৎ সঙ্ঘসম্মত পুরোহিত ভিন্ন অন্যের দ্বারা এই অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইতে পারে না। সেই পুরোহিত স্বয়ং সঙ্ঘের প্রতিনিধিস্বরূপে খ্রীষ্ট ও সঙ্ঘের মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া উভয়ের একাত্মতা সম্পাদন করেন। সেই পুরোহিতের মধ্যস্থতা ভিন্ন সঙ্ঘের, সুতরাং সঙ্ঘান্তর্গত কোন ব্যক্তির খ্রীষ্টানত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সেই পুরোহিতের হস্তে ইউকেরিষ্টের মহাপ্রসাদ লাভ না করেন, তিনি সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত নহেন, তিনি খ্রীষ্টান নহেন।

দেখা গেল, প্রাচীন ইহুদী সমাজে রাজা অথবা নির্দ্দিষ্ট পুরোহিতেরাই সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপে জীহোবার পৌরোহিত্য করিতেন। অপরের পৌরোহিত্যে অধিকার ছিল না। ইহুদী ভিত্তি হইতে উৎপন্ন খ্রীষ্টীয় সমাজে পুরোহিতের সেই সমাজপ্রতিভূত্ব বর্ত্তমান। পুরোহিত সমাজের প্রতিনিধি, সমাজসম্মত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মধ্যস্থ, কাজেই তদ্দ্বারা ব্যক্তিগত উপাসনা উপাস্যের সিংহাসন সমীপে প্রেরিত হওয়া আবশ্যক।

এদেশের ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য কিরূপ দেখা যাউক। এদেশে যখন হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজা আধিপত্য করিতেন, তখন রাজার নির্দ্দিষ্ট

পুরোহিত থাকিত। তিনি রাজার ও রাজ্যের কল্যাণ সাধনার্থ বিবিধ অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করিতেন। রাজার আপৎ শান্তির জন্য, রোগ-বিমুক্তির জন্য, অভ্যুদয়ের জন্য, সন্তানলাভের জন্য তাঁহাকে যাগযজ্ঞ, শান্তিস্বস্ত্যয়ন করিতে হইত। তদ্ভিন্ন রাজ্যের অমঙ্গলনাশের জন্য, অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টির জন্য, মারীভয় নিবারণের জন্য, শত্রুসংহারের জন্য তাঁহাকে বিবিধ অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে হইত। রাজা স্বয়ং রাজ্যের প্রতিনিধি, তাঁহার মঙ্গলে রাজ্যের মঙ্গল ও অমঙ্গলে অমঙ্গল। সেই জন্য রাজপুরোহিত সমাজেরও হিতান্বেষী সমাজসম্মত পুরোহিত ছিলেন স্বীকার করা যাইতে পারে। সমুদয় আথর্ব্বণিক অনুষ্ঠানে পারদর্শিতা দেখিয়া পুরোহিত নিযুক্ত হইত।

তদ্ভিন্ন রাজা যখন নিজ স্বর্গকামনায় বা কল্যাণকামনায় যাগাদি সম্পন্ন করিতেন, তখন কর্ম্মকাণ্ডে পারদর্শী ব্রাহ্মণের সাহায্য আবশ্যক হইত। একালে যেমন সামান্য লোকে দুর্গোৎসব করিবার জন্য ব্রাহ্মণের সাহায্য আবশ্যক করে, তখনও সেইরূপ যাগাদি অনুষ্ঠানের সময় অনুষ্ঠানাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্য আবশ্যক হইত। অধ্বর্য্যু, হোতা, উপহোতা প্রভৃতির কাজ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের দ্বারাই সম্পাদিত হইত, কেননা ব্রাহ্মণেরাই ঐ সকল বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে অভিজ্ঞ ছিলেন।

কিন্তু এই সকল ঋত্বিক প্রভৃতিকে পুরোহিত নাম দেওয়া চলে না। বস্তুতঃও সেকালে তাঁহাদিগকে পুরোহিত বলিত না। পুরোহিতের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, প্রত্যেক রাজসংসারে নির্দ্দিষ্ট পুরোহিত নিযুক্ত ছিল, কিন্তু যাগাদি সম্পাদনের সময় দেশ বিদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আহ্বান করা হইত। যজমান তাঁহাদিগকে অনুষ্ঠানবিশেষে সাহায্য করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন; অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবার পর তাঁহাদের আর যজমানের সহিত কোন সম্পর্ক থাকিত না। তাঁহাদিগকে যদি পুরোহিত বলিতে হয়, তাহা হইলে দুর্গোৎসবে যে মুচি ঢাক

বাজায়, তাহাকেও পুরোহিত বলা অসঙ্গত হয় না। এই সকল কর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পৃষ্ট্ বলা হয়, তাঁহাদের পৃষ্ট্ নাম সঙ্গত কি না জানি না; কিন্তু তাঁহারা পুরোহিত ছিলেন না ইহা নিশ্চয়, তবে যিনি পুরোহিত, তিনি হয়ত কোন এক ঋত্বিকের কার্য্যভার গ্রহণ করিতেন, সে স্বতন্ত্র কথা।

সে যাহাই হউক, একালে দেশে হিন্দু রাজাও নাই, রাজপুরোহিতও নাই। হিন্দু সমাজে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন, সমাজের প্রতিনিধি-স্বরূপে দেবার্চ্চনা করেন, বা সমাজের কল্যাণকামনার জন্য নিযুক্ত আছেন বা দায়ী আছেন, এরূপ কোন পুরোহিত বা পুরোহিতসম্প্রদায় অন্ততঃ একালে অস্তিত্বহীন।

বড় বড় দেবস্থানের বা তীর্থস্থানের পাণ্ডাদিগকে সমাজের প্রতিনিধি বলিতে পারি না। দূর দেশ হইতে তীর্থযাত্রীরা এই সকল দেবতার নিকট ব্যক্তিগত কল্যাণকামনায় উপস্থিত হয় এবং পাণ্ডাদিগের হাত দিয়া যখন পূজা দেয়, তখন পাণ্ডাদের অর্থাগমটাও মন্দ হয় না; কিন্তু এই পাণ্ডাদের সমাজপ্রতিভূত্ব নাই। ইঁহারা সমাজসম্মত, সমাজ-হইতে-নিযুক্ত পুরোহিত নহেন। যে কোন হিন্দু কোন পাণ্ডার মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতিরেকে বিশ্বেশ্বর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বিশ্বেশ্বরকে গঙ্গাজল ও বিল্বপত্র অর্পণ করিয়া আসিতে পারেন, কাহারও তাহাতে বাধা দিবার অধিকার নাই। স্থানবিশেষে হয়ত কোন পাণ্ডা বা মোহন্ত দেবতা-দিগকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন এবং অর্চ্চনার্থীদিগকে প্রবেশাধিকার দেন না, সেটা নিতান্তই গায়ের জোর মাত্র। অথবা সেস্থলে দেবতা পাণ্ডার নিজস্ব দেবতা, হিন্দু সমাজের দেবতা নহেন। যেমন আমার বাড়ীর ঠাকুরকে পূজা করিতে অন্যের অধিকার নাই, এও কতকটা সেইরূপ। আর এক কথা, মন্দিরসংস্পৃষ্ট পাণ্ডার পদবী সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ সমাজে নিকৃষ্ট স্থানে। আর যেখানে মন্দিরের প্রভুত্ব মোহান্তের হাতে,

সেখানে মোহান্তকেও পুরোহিত বলা যায় না। মোহান্ত ব্রাহ্মণ নহেন, তিনি সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসী যাজক হইতে পারেন না।

কাজেই বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপে দেবতার আরাধনা করেন, এরূপ পুরোহিত অস্থিত্বহীন। তবে ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন, এরূপ পুরোহিতের অসদ্ভাব নাই।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে গৃহস্থমাত্রেরই নিরূপিত ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছেন। জাতকর্ম্ম হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সমুদয় অনুষ্ঠানে তাঁহাকে ডাকিতে হয়, অথবা ডাকিবার প্রথা আছে।

ডাকিবার প্রথা আছে, কেননা এই সকল অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিবার জন্য অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন এবং গৃহস্থমাত্রেরই অভিজ্ঞতা নাই। কিন্তু যিনি অভিজ্ঞ তিনি পুরোহিত ডাকিতে বাধ্য কি? শাস্ত্রে এরূপ বিধান আছে কি, যে পুরোহিতের সাহায্য ব্যতীত কৃতী যজমান স্বয়ং কর্ম্ম সম্পাদন করিলে তাহার সে কর্ম্ম পণ্ড হইবে?

জাতকর্ম্ম হইতে, অথবা আরও একটু আগে গিয়া গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সমুদয় অনুষ্ঠানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের আবশ্যকতা; কেননা ঐ সকল অনুষ্ঠান অধিকাংশই শ্রৌত আচার, বৈদিক মন্ত্র সহকারে ঐ সকল অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের অর্থাৎ হিন্দুসমাজের উচ্চতর স্তরের, প্রত্যেক ব্যক্তিরই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে, বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পূর্ণ মাত্রায় অধিকার আছে। যে কোন গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, স্বয়ং কোনও পুরোহিতের, কোন ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতীত ঐ সকল ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন অনুষ্ঠানের অধিকারী। অবশ্য যে সকল স্থলে কার্য্য একাকী সাধ্য নহে, সেখানে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ডাকিতে হয়; কিন্তু তিনি পুরোহিতস্বরূপে আসেন না, তিনি ঠিকা কাজে ব্রতী হয়েন মাত্র। যে কোন গৃহস্থ, তিনি যদি দ্বিজাতিভুক্ত হন, তবে তিনি পুরোহিত না ডাকিয়া স্বয়ং যে

কোন শ্রৌত অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে পারেন। তাঁহারা স্বাতন্ত্র্য নিরঙ্কুশ।

সেকালের যাগযজ্ঞের স্থান একালে ব্রতপূজাদিতে গ্রহণ করিয়াছে। যাগযজ্ঞে যেমন অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্য আবশ্যক হইত, একালেও সেই-রূপ নৈমিত্তিক কাম্যকর্ম্ম ব্রতপূজাদির অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্য আবশ্যক হয়। আবশ্যক হয়; কিন্তু কোথায়? যেখানে বৃতী স্বয়ং দ্বিজাতি হইয়াও কর্ম্মে অনভিজ্ঞ। বৃতী স্বয়ং ব্রতপূজাদিতে অভিজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণ ডাকিতেই হইবে এইরূপ শাস্ত্রের ব্যবস্থা আছে কি? আমার বাটীর দুর্গোৎসবে আমি স্বয়ং পূজক হইলে পুরোহিতের বা মধ্যস্থের প্রয়োজন কোথায়? অবশ্য আমার দ্বিজত্ব থাকা আবশ্যক।

আর যদিই বা ব্রাহ্মণের সাহায্য আবশ্যক হয়, এ সকলই ত নৈমিত্তিক কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে, এই সকল ব্রতপূজাদির করণে লাভ আছে; কিন্তু অকরণে প্রত্যবায় নাই। ব্রতপূজা করিতে পারিলে, আমার ঐহিক বা পারত্রিক লাভ হইতে পারে; কিন্তু যদি আমি অসমর্থ হই, তাহা হইলে আমার লাভ না থাকিতে পারে, কিন্তু ক্ষতি কিছুই নাই, আমার স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ থাকে না, আমার হিন্দুয়ানিও যায় না, আমার সমাজচ্যুতিও ঘটে না। বস্তুতই হিন্দু সমাজের মধ্যে অতি সামান্য ভগ্নাংশমাত্রই অর্থসাপেক্ষ ব্রতপূজাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অধিকাংশ লোকে এ সকল ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠানে অক্ষম হইয়াও হিন্দুত্বচ্যুত বা স্বর্গপ্রবেশে অনধিকারী হয় নাই।

তারপর গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম। নিত্যকর্ম্মের অননুষ্ঠান দোষাবহ, অথবা প্রত্যবায়জনক। নিত্যকর্ম্ম অর্থাৎ সন্ধ্যোপাসনা, হোম, বলিকর্ম্ম, শ্রাদ্ধ, তর্পণাদি। তাহার উপর শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, ইষ্টদেবতা পূজা প্রভৃতি নিত্যকর্ম্মস্বরূপে অনেক হিন্দুগৃহস্থ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই সকল অনুষ্ঠানসাধনে পুরো-

হিতের সম্পর্ক অনাবশ্যক। ইহা মধ্যবর্ত্তী দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না; এবং যে গৃহস্থ এই সকল কর্ম্ম স্বয়ং সম্পাদন করেন; তিনি পুরোহিতরূপ কাণ্ডারীকে নৌকার কড়ি না দিয়াও ডঙ্কা বাজাইয়া স্বর্গ যাইবার অধিকার রাখেন।

তবেই কি নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানে, কি নৈমিত্তিক ব্রত পূজাদির আচরণে, কি শ্রৌত সংস্কারসাধনে দ্বিজ গৃহস্থ পুরোহিত ব্রাহ্মণের মধ্যস্থতা ব্যতীতও সমগ্র জীবনটা কাটাইয়া যাইতে পারেন। তাহাতে তাঁহার কোন প্রত্যবায় হয় না। তবে যে তিনি স্থলবিশেষে কর্ম্মপটু ব্রাহ্মণ আহ্বান করেন, সে কেবল আপনার অভিজ্ঞতা অভাবে, অথবা কোথায় কর্ম্মের অঙ্গহানি বা অসম্পূর্ণতা ঘটিবে এই আশঙ্কায়, অথবা যেখানে একাধিক ব্যক্তির সাহায্য আবশ্যক, সেই সকল অনুষ্ঠানবিশেষের সম্পাদনে। কাজেই পুরোহিতের হাতে স্বর্গের চাবি আছে একথা বলা চলে না।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে, এ সকলই ত দ্বিজাতির পক্ষে ব্যবস্থা, শূদ্রের পক্ষে কি হইবে? শূদ্রের ত কোন ধর্ম্মাচরণে অধিকার নাই, শূদ্রের ত ব্রাহ্মণের মধ্যস্থতা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। শূদ্রের পক্ষে ত ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন স্বর্গদ্বার রুদ্ধ। এবং বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অধিকাংশই শূদ্রশ্রেণীভুক্ত। দ্বিজাতিগণ যেন স্বাধীনভাবে ধর্ম্মাচরণে অধিকারী, কিন্তু এই বৃহৎ শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণের আনুকূল্য ব্যতীত ধর্ম্মাচরণে অনধিকারী ও কাজেই তাহারা ব্রাহ্মণের অর্থাৎ পুরোহিতের পদানত। ইহা কি ভয়ানক অত্যাচার নহে? শূদ্রের এই পরাধীনতার কৈফিয়ত কি আছে?

কিন্তু তাই কি? শূদ্র কি প্রকৃত ধর্ম্মাচরণে অনধিকারী? শাস্ত্রবেত্তারা উত্তর দিবেন। লেখক শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ; লেখকের যেরূপ বিশ্বাস, এখানে তাহাই লিখিত হইতেছে মাত্র।

শূদ্রের বেদপাঠে, বেদ উচ্চারণে, বৈদিক অনুষ্ঠানে অধিকার নাই। বৈদিক যাগযজ্ঞে শূদ্রের অধিকার নাই। কিন্তু তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ, পৌরাণিক ব্রত পূজাদিতে শূদ্রের অধিকার অব্যাহত। শূদ্র শিবপূজা করিতে পারে, শক্তিপূজা করিতে পারে, ইষ্টদেবতার পূজা করিতে পারে। পুরোহিতের দ্বারা করাইতে হয় না। তজ্জন্য ঐহিক বা পারত্রিক যে ফললাভ সম্ভব, তাহা শূদ্রের হস্তগত হইতে বাধা আছে কি ?

কেবল বৈদিক অনুষ্ঠানেই শূদ্রের অধিকার না থাকিয়া যদি অপর সমুদয় অনুষ্ঠানে অধিকার পূর্ণমাত্রায় থাকে, তাহা হইলে শূদ্রের স্বর্গপ্রবেশ নিষেধ হইল কি ? এরূপ ব্যবস্থা কোথাও আছে কি, বৈদিক অনুষ্ঠানের অকরণে স্বর্গবাস্ ঘটিতে পারে না ? বৈদিক অনুষ্ঠানে শূদ্রের অধিকার নাই, অপিচ বৈদিক অনুষ্ঠান শূদ্রের পক্ষে আবশ্যকও নহে। জীবনে বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ না করিয়াও সে তাহার স্বধর্ম্ম পালন করিতে পারে, এবং স্বধর্ম্ম পালনের সমগ্রফল হইতে সে বঞ্চিত হইবে না।

এক হিসাবে দেখিতে গেলে বলা যাইতে পারে ব্রাহ্মণ প্রণীত শাস্ত্র শূদ্রের প্রতি অত্যন্ত পক্ষপাত দেখাইয়াছে। দ্বিজাতির জন্য কঠোর অনুষ্ঠান, কঠোর তপস্যা, যাগযজ্ঞ, নানাবিধ সংস্কারাদি বিহিত হইয়াছে। সেই সকল শ্রমসাধ্য, ব্যয়সাধ্য, কঠোর অনুষ্ঠান শূদ্রের পক্ষে আদৌ আবশ্যক নহে। শূদ্রের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। শূদ্র সেই সহজ পন্থায় চলিলেই তাহার স্বধর্ম্মপালন হইবে; এবং কোন যমদূত তাহাকে নরকে টানিতে পারিবে না।

এই হিসাবে দেখিলে বলিতে হয় ব্রাহ্মণ আপনার জন্য কঠোর বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু শূদ্রের জন্য সহজ পথ ব্যবস্থা করিয়া বরং উদারতা দেখাইয়াছেন। এইরূপ ব্যবস্থা কোথাও আছে কি, যে ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য ব্যতীত শূদ্রের স্বধর্ম্মপালন চলিবে না? তবে শূদ্র ব্রাহ্মণকে সম্মান করিতে বাধ্য, সে স্বতন্ত্র কথা।

যতদূর দেখা গেল তাহাতে
আমাদের পুরোহিতে আকাশ পা
একটী সমাজকর্ত্তৃক স্বীকৃত নির্দ্দিষ্ট পদ
সেরূপ সমাজসম্মত কোন পদ নাই। ব্র
পদে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ব্রাহ্মণমাত্রই প
অপেক্ষা যাজক ব্রাহ্মণের অধিক সামা
ব্যবসায়ী অধ্যাপক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যাজন
সম্মান অল্প। খ্রীষ্টানদের দেশে পুরোহি
প্রভুশক্তি কর্ত্তৃক স্বপদে নিয়োজিত হয়
সে অন্যেরও নিকট পুরোহিত। আ
কোথাও নাই। হিন্দু সমাজে পোপ না
স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। কাজেই পুরোহি
হইতে নিযুক্ত হয় না। যে আমা
নহে। অন্য দেশে যেমন clergy
আমাদের দেশে সেরূপ দুই সম্প্রদা
clergyman নহে। আবার এ দে
যখন ইচ্ছা যজমান স্বরূপ গ্র
যজমান যে কোন ব্রাহ্মণকে যখন
পারেন। কোন বাধ্যবাধ কতা
খ্রীষ্টানদের দেশে পুরোহি
পুরোহিত কোন সমাজের
আপনার যজমানেরই প্রতি
এক গৃহস্থ পরিবার হইতে
গ্রাম্যদেবতার পূজক ব্রাহ্ম
সেখানে সমাজও ক্ষুদ্র, প্র

No. 412. May, 1899.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

৩৭ বর্ষ। ৬ষ্ঠ কল্প।
৪১২ সংখ্যা। বৈশাখ ১৩০৬—মে, ১৮৯৯। ৪র্থ ভা।

সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩০৬ সাল।

ইং ১৮৯৯-১৯০০।

শকাব্দা ১৮২১, সংবৎ ১৯৫৬।৫৭

ব্রাহ্মাব্দ ৭০-৭১।

*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
বৃ	র	বৃ	র	বৃ	র
৩১	৩২	৩১	৩২	৩১	৩০
*এ	মে	জুন	জু	আ	সে
†১৪	১৪	১৫	১৬	১৭	১৭
শ	সো	বু	শু	ম	বু
৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
ম	বৃ	শু	র	সো	বু
৩০	২৯	৩০	২৯	৩০	৩০
অ	ন	ডি	জা	ফে	মা
১৭	১৬	১৫	১৪	১২	১৪
বু	শ	সো	ম	বু	শ
৩১	৩০	৩১	৩১	২৮	৩০

বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ						কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
বৃ	র	বৃ	র	বৃ	র	‡১	৮	১৫	২২	২৯	ম	বৃ	শু	র	সো	বু
শু	সো	শু	সো	শু	সো	২	৯	১৬	২৩	৩০	বু	শু	শ	সো	ম	বৃ
শ	ম	শ	ম	শ	ম	৩	১০	১৭	২৪	৩১	বৃ	শ	র	ম	বু	শু
র	বু	র	বু	র	বু	৪	১১	১৮	২৫	৩২	শু	র	সো	বু	বৃ	শ
সো	বৃ	সো	বৃ	সো	বৃ	৫	১২	১৯	২৬		শ	সো	ম	বৃ	শু	র
ম	শু	ম	শু	ম	শু	৬	১৩	২০	২৭		র	ম	বু	শু	শ	সো
বু	শ	বু	শ	বু	শ	৭	১৪	২১	২৮		সো	বু	বৃ	শ	র	ম

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃ এঃ	৯	৮	৫	৪	১	২৯
পূর্ণিমা	১৩	১২	৯	৭	৫	৩
কৃঃ এঃ	২৩	২২	১৯	১৮	১৫	১৪
অমা—	২৭	২৬	২৩	২২	২০	১৮

শুঃ এঃ—শুক্র একাদশী। কৃঃ এঃ—কৃষ্ণ একাদশী।

*** পরীক্ষা—১৩ই বৈশাখ মঙ্গল বার, ১২ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি বার পূর্ণিমা। ২৭এ বৈশাখ মঙ্গল, ২৬এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি বার অমাবস্যা।

* বৈ—বৈশাখ বৃহস্পতিবারে আরম্ভ, ৩১শে শেষ। এ-এপ্রেল শনিবারে আরম্ভ, ৩০শে শেষ ইত্যাদি।

† ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈ, ১৪ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

‡ ১লা বৈশাখ বৃহস্পতি, ২রা শুক্র ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ রবি ২রা সোম ইত্যাদি।

বৈ—বৃহ—১,৮,১৫,২২,২৯; জ্যৈ রবি ১,৮,১৫,২২,২৯; ১৪,২১,২৮ এপ্রেল শনি; ১৪ ২১, ২৮ মে সোম ইত্যাদি।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃ এঃ	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮
পূঃ	২	২	৩	২	৩	৩
কৃঃএঃ	১৪	১৩	১৪	১৪	১৪	১৪
অঃ	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৭

*** পরীক্ষা—২৮এ কার্ত্তিক সোমবার, ২৮এ অগ্রহায়ণ বুধবার শুক্র একাদশী। ১৪ই কার্ত্তিক সোম, ১৩ই অগ্রহায়ণ মঙ্গল বার কৃষ্ণ একাদশী। এইরূপে দিন, বার ও তিথি ঠিক্ করিতে হইবে।